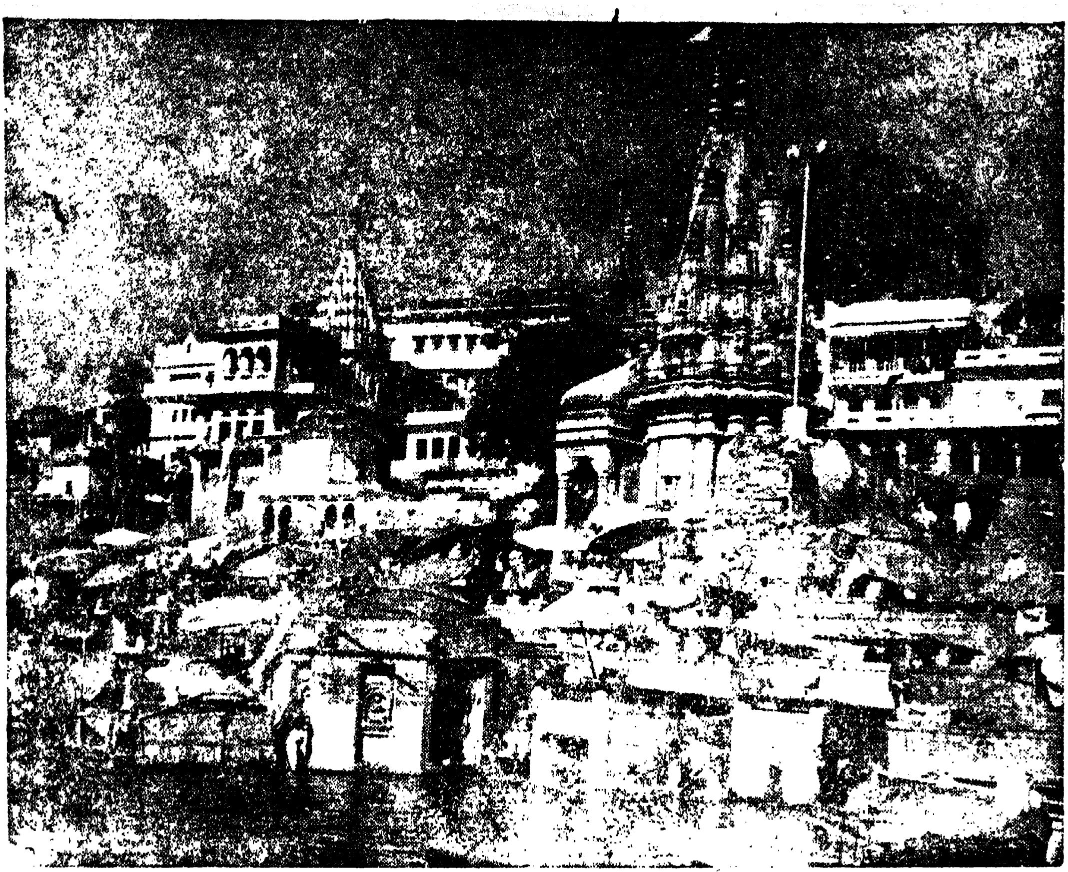
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

মহালয়া ১৩৫৩

অকাল বোধন

মা আসিতেছেন। বঙ্গের অঙ্গনতলে মায়ের বোধন-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে; বঙ্গব্যাপী অন্ধকারে মঙ্গলদীপের আলো জ্বলিয়াছে। বাঙালীর এ বোধন অকাল-বোধন। বাঙালী মাকে শুধু সুখের দিনেই চাহে নাই, দুর্দিনে সে দুরিতদলনী দুর্গা বলিয়া ডাকিয়াছে। বাঙালী কালের হিসাবে মাকে ভাবে নাই; কালের বিচার বিস্মৃত হইয়া কলা-কাষ্ঠাদিরূপে যিনি পরিণাম প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জননীস্বরূপে বরণ করিয়া নিজের ঘরে আনিয়াছে। দুঃখরূপ দর্পণে বাঙালী মায়ের ঈষৎ-সহাস ও অমল আনন প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং জননীর খড়্গপ্রভানিকর-বিস্ফুরণ ও শূলাগ্রকান্তিনিবহ আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করিয়াছে। সে রূপ দেখিয়া বাঙালী মাতিয়াছে এবং মায়ের চরণে একান্তভাবে আত্মনিবেদনের জন্য আকুল হইয়াছে। বাঙলার আজ বড় দুর্দিন; দুরন্ত এ অকাল; কিন্তু এ দুর্দিনে অতি ঘোর এই অকালেই বাঙালী মায়ের অকাল-বোধনের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করিতেছে; নহিলে বাঙালীর মাতৃপূজার বিশিষ্টতা থাকে না। যে জাতির প্রাণশক্তি আছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার চাপেও সে তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করিতে পারে না; বাহ্য বিচারকে গৌণ করিয়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতি একান্তভাবে কর্ম-জগতে তাহাকে প্রণোদিত করে। বাঙালীর মাতৃপূজার এই প্রবৃত্তি তাহার অন্তঃপ্রবৃত্তিতে পরিনিষ্ঠিত এবং সেই অন্তঃপ্রবৃত্তির আকর্ষণে বাঙালীর প্রাণে প্রাণে এই দুর্দিনেও মায়ের অগ্নিময় আহ্বান বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মাতৃপূজা ছাড়িতে পারিবে না; সে আজ আত্মশক্তিতে দৃঢ় হইয়া দেবীর অকালবোধনে প্রবৃত্ত হইবে। মহাশক্তিস্বরূপিণী জননীর প্রেরণায় বর্তমান বিশ্বব্যাপী আসুরিক অত্যাচার এবং অনাচারকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইবে। বাঙলার মহাশ্মশানেই আজ সে আনন্দময়ী জননীর উদ্বোধন করিবে। শক্তির পথে এ সাধনা, বীর্যের পথে এ সাধনা। এ সাধনা দুষ্কর, কঠোর এবং নিদারুণ। প্রতি-পদে প্রেতের বিভীষিকা ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে; কিন্তু দুরিত-দলনী দুঃখহারিণী জননীর সন্তানদল মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প হইতে বিচলিত হইবে না। তাহাদের ভৈরব সাধনার দৃপ্ত জ্যোতিতে দিগ্‌মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত দুর্যোগের মেঘজাল খণ্ড খণ্ড হইবে এবং শরতের অরুণ-লেখা আকাশের কোলে দেখা দিবে। সেই শারদ-প্রভাতে বঙ্গের সূর্যকরোজ্জ্বল অঙ্গনতলে মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইবেন। মাতৃপূজার শুভলগ্নে এই আশ্বাসই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।





ধম্মপদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
— কর্ত্তৃক অনূদিত

যমকবগ্‌গো

মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চ পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো ন দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং॥১॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,[১]
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভনে[২]
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে।

মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥ ২॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভনে,
সুখ তার পাছে ফিরে, ছায়া যথা কায়ার পিছনে।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্‌হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩॥

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলি বাড়িল॥

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥ ৪॥

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল॥

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥ ৫॥

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্ম্মে কয়।

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা॥ ৬॥

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে।

সুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং।
ভোজনম্হি চামত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং।
তং বে পসহতী মারো বাতো রুক্খং ব দুব্বলং॥ ৭॥

শরীরের শোভা খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত
ভোজনে রাখে না মাত্রা, বীর্যহীন, অলস সতত,
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে, ‘মার’ তারে মারে সেই মত।

অসুভানুপস্সিং বিহরন্তম্ ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং।
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং।
তং বে নপ্পসহতী মারো বাতো সেলং ব পব্বতং॥৮॥

অঙ্গশোভা নাহে খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত
ভোজনের মাত্রা বোঝে, শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিরত
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত!

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি।
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥ ৯॥

দমহীন সত্যহীন অন্তরে কামনা
গেরুয়া কাপড় তার শুদ্ধ বিড়ম্বনা।

যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতি॥ ১০॥

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে।

অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা॥ ১১॥

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার।

সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো।
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা॥ ১২॥

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য-সঙ্কল্পের কাছে সার মিলে তার।

যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠী সমতিবিজ্ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি॥ ১৩॥

ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে।

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠী ন সমতিবিজ্ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি॥ ১৪॥

ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা
সতর্ক যে মন তারে কি করে বাসনা!

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো॥ ১৫॥

হেথা মরে শোকে সেথা মরে শোকে
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে
ব্যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে।

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধি মত্তনো॥ ১৬॥

হেথা সুখ তার সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায়, বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি।
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভীয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো॥ ১৭॥

হেথা পায় তাপ সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ,
“এই মোর পাপ,” এই বলে তাপ—
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ!

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি
কত পুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি।
পুঞ্ঞং কতন্তি নন্দতি
ভীয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো॥ ১৮॥

হেথা আনন্দ সেথা আনন্দ
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত!
পুণ্য করেছি বলে আনন্দ,
সুগতি লভিয়া পরমানন্দ!

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি॥১৯॥

যে কহে অনেক শাস্ত্র বচন
কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি
—অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল ?
হয় কি সে জন শ্রেয়ের ভাগী ?

অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতি॥২০॥

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য
ধর্মের পথে করে বিচরণ,
রাগ দোষ মোহ করি পরিহার,
জ্ঞানসমাপ্ত, বিমুক্তমন
বিষয়বিহীন ইহপরলোকে
কল্যাণভাগী হয় সেইজন।

পুপ্‌ফবগ্‌গো

কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি॥১॥

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া[৪] ফুলের মতন।

সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি॥২॥

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকেতন
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন।[৫]

ফেনুপমং কায়মিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্‌স পপুপ্‌ফকানি অদস্‌সনং মচ্চুরাজস্‌স গচ্ছে॥ ৩॥

ফেনের মতন জানিয়া শরীর মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা' রে!

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোহব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥৪॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সুপ্ত পল্লী, মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয়।

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতো বসং॥৫॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পুরিতে তার তৃষা বাসনার, মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়।

যথাপি ভমরো পুপ্‌ফম্‌ বণ্ণগন্ধং অহেঠয়ং।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে॥৬॥

বরণ সুবাস[৬] না করিয়া হানি ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি,
যায় সে উড়ে,
সেই মত যত জ্ঞানী মুনিজন সংসার মাঝে করি বিচরণ,
পালান দূরে।

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনোহব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ॥৭॥

পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে
তাহে কাজ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখ রে!

যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফম্‌ বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো॥৮॥

যেমন রঙীন্‌ সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে।

যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফম্‌ বণ্ণবন্তং সগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি কুব্বতো॥৯॥

যেমন রঙীন্‌ সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম,[৭] বাণী কাজে খাটাইলে তাকে।

যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং॥১০॥

ফুলরাশি লয়ে যথা নানা মত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিধির কুশলকর্ম রচনা করিবে নর॥

---

১ পাঠান্তর—ধর্ম মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়

২ পাঠান্তর—কয়

৩ পাঠান্তর—নিষ্কাম যে, দম সত্ত্ব আছে যার মাঝে

৪। পাঠান্তর—কে গাঁথিয়া লবে

৫। পাঠান্তর—ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে গাঁথিয়া লইবে ফুলের মতন।
ফুলের মতন।

৬। পাঠান্তর—বর্ণগন্ধ

৭। পাঠান্তর—সুন্দর

[বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অনুবাদবিভাগও যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, একথা সর্বসাধারণের নিকট সুবিদিত নহে। বেদমন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংরেজ কবির রচনা-নিদর্শন পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন—একত্র সংগৃহীত হইলে তাহাতে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। প্রথম-যৌবনে বিদেশী কবিদের যে-সকল অনুবাদ তিনি করেন, 'প্রভাতসংগীত', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে রঘুবংশের কিয়দংশ এবং সংস্কৃত কতকগুলি প্রবচন ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়; গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে কৃত বেদমন্ত্রানুবাদের সংগ্রহ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৫০) প্রকাশিত হইয়াছে; মেঘদূতের শ্রীপ্যারীমোহন সেন কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে উহা পড়িয়া তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করিতে উদ্বুদ্ধ হন এবং উক্ত সংস্করণের একখণ্ড গ্রন্থের মার্জিনে মেঘদূতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি; এ পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদিত ধম্মপদ গ্রন্থের গদ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (১৩১২) পত্রে উহার প্রশস্তি প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলেন : "য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ-কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গবর্ণমেণ্টের দ্বারে ভিক্ষাকার্যের মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনোদিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?"

সম্ভবত এই সময়েই, চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত গ্রন্থের একখণ্ডের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই দীর্ঘকাল ইহা অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। এই অনুবাদের কথা তখন যাঁহাদের জানিবার সুযোগ হইয়া থাকিবে তাঁহারা ইতিমধ্যে পরলোকগত, বা এবিষয় সম্ভবত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে, 'য আত্মদা বলদা' বৈদিক মন্ত্রের একটি বিস্মৃত ও একটি অপ্রকাশিত অনুবাদ প্রকাশ-প্রসঙ্গে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই অনুবাদ বিষয়ে উল্লেখের কথা প্রচার করেন। এই আলোচনা পাঠ করিয়া শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র, জয়পুরপ্রবাসী শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার, তাঁহার পিতা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অকালপরলোকগত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাগজপত্রের মধ্য হইতে এই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া বিশ্বভারতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে ব্যবহার করিতে দেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ইহার একাংশ মুদ্রিত করিতে পারিয়া আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; অবশিষ্টাংশ বিশ্বভারতী পত্রিকার আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অনুবাদের সহিত মূল পালি শ্লোকগুলিও মুদ্রিত হইল।

বৌদ্ধশাস্ত্র পালিপিটক, বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক এই তিন ভাগে বিভক্ত। সুত্তপিটক দীঘ, মজ্‌ঝিম, অঙ্গুত্তর, সংযুত্ত ও খুদ্দক এই পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত; ধম্মপদ খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত। "জগতের যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদং তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদ গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থকারে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অন্তত একথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিকাব্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।...এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া, সুসংবদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন—যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদং গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধম্মপদে, কি গীতায় এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"—রবীন্দ্রনাথ

ধম্মপদ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যুগে যুগে অগণিত ধর্মার্থীকে পথপ্রদর্শন করিয়াছে। অধ্যাপক অ্যালবার্ট জে এডমণ্ডস তাঁহার কৃত অনুবাদের ভূমিকায় ধম্মপদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this......These old refrains from life beyond time and sense, as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been fire to many a muse. They burned in the brains of the Chinese pilgrims, who braved the blasts of the Mongolian desert, climbed the cliffs of the Himalayas, swung by the rope-bridge across the Indus where it rages through its gloomiest gorge and faced the bandit and the beast to peregrinate the Holy Land of their religion, and tread in the footsteps of the Master. Verses were graven on walls of the august temples at the command of Hindu emperors who abolished capital punishment, mitigated slavery, and established hospitals for men and animals, under the sway of this marvellous cult; and by Ceylon monarchs whose ruined reservoirs, as large as lakes, astonish us among the wonders of antiquity. And to-day after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won the admiration of Europeans and Americans in every seat of learning from Copenhagen to the Cambridges, and from Chicago to St. Petersburgh."

কবিসার্বভৌম-কৃত এই সার্বভৌমপ্রভাব ধর্মসূত্রাবলীর অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত।—সম্পাদক, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা।]





শিল্প-দৃষ্টি

শ্রীনন্দলাল বসু

রিয়্যালিটি কী কুমারস্বামী একটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে কোনো অভাববোধ থাকে না। অর্থাৎ, আর্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, চিত্রে এবং চিত্রের বিষয়বস্তুতে মিল না থাকলেও যখন অভাববোধ হয় না।

চীনেরাও এই কথাই বলেছেন। পাকা আর্টিস্টের কাজ কেমন? না, আশ্চর্যভাবে বস্তুর প্রতীতি হয়, অথচ কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—কালির পোঁচ, তুলির ছাপ, তা ছাড়া কিছুই নয়।

চীনেরা এইজন্য বলেন, টেকনিক কিছুই নয়। মনই আঁকে। মন যখন যেতে ইচ্ছা করে, তখন টেনে হিঁচড়ে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যায় তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পাকা আর্টিস্টের টেক্‌নিক বা ঠিক টেক্‌নিক হল, তন্ত্রের একটি শ্লোকে যেমন বলেছে, পাখির ওড়ার মতো, এক গাছ থেকে আরেক গাছে বসল, বাতাসে কোনো চিহ্ন রইল না।

কারো কারো এইটি হয়েছে, যে জিনিসই আঁকুন তাতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশ করা কি রকম? তোমার হাতটা ধ'রে এইখানে এইভাবে রেখে দিলাম, আবার তুলে নিয়ে অন্য স্থানে অন্য ভঙ্গীতে রাখা গেল, তোমায় ধরে ওঠালাম বা বসালাম, এই এক। আরেক হল—তোমার ভিতরেই আমি যদি প্রবেশ করতে পারি, তাহলে তোমার হাত নিয়ে পা নিয়ে আমি বা খুশি করতে পারি; উঠতে, বসতে, দৌড়তে, নাচতে কিছুতেই কোনো আয়াস লাগে না, বাধা হয় না—সেটা সহজও হয়, সত্যও হয়।

ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও খুব সুন্দর হয়; আশ্চর্য ছন্দ, আশ্চর্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল করে আর্টিস্ট হওয়া যায় না। ছোটো ছেলের কাজের গুণ বড়ো আর্টিস্টের কাজে পর্যায় যখন তিনি 'জ্ঞানে'র চরমে পেঁছে যান। কারণ বড়ো মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বিনা আয়াসে বড়ো মানুষও ছোটো ছেলের মতো হয়ে থাকেন জানি—তাঁকেই আমরা বলি সাধু বা পরমহংস।



শ্রীনন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে

এক জাপানি কবিতায় কবি বলছেন, তাঁর চেরি ফুল হতে সাধ হয়। মানুষ তো চেরি ফুলের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহান, তবে এরকম বিপরীত ইচ্ছা কেন?—তার মানে আছে। মানুষ মানুষ ব'লেই তার এমন ইচ্ছা হয়েছে, চেরি ফুলের ইচ্ছা হয় না মানুষ বা আর কিছু হতে। বিচিত্র পথে বিচিত্র লক্ষ্যে ধী ও অনুভূতি প্রসারিত হয় মানুষের। মানুষের চেতনা জগতের সর্বত্রই প্রবেশ করতে চায়। আরেক অর্থ এই ধরা যেতে পারে যে, মানুষ মানুষই থাকতে চায় অথচ চেরি ফুলও হতে চায়; মানবসত্তার যে অনন্ত জটিলতা, অশেষ মিশ্রণ, অপরিসীম ঐশ্বর্য, সবকে জয় করেই হাস্যময় চেরি



ফুলের সহজ শোভা নিয়ে সে ফুটে উঠতে চায়।

ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড়ো জিনিস। ওতে যা করেছে আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে তা করবার কল্পনাই করে নি। একটা নটরাজমূর্তি, একটা বুদ্ধমূর্তি বা ত্রিমূর্তি যতক্ষণ আছে—ভারত-শিল্প, ভারতসভ্যতা ওরই মধ্যে সম্পূর্ণ আছে। ওতে বিমূর্ত আইডিয়াকে মূর্তি দিয়েছে। স্বভাবের এটা - সেটার নানারকম প্রতিরূপ অনেকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু একটা করুণা বা মৈত্রী বা অন্য কোনো আইডিয়ার মূর্তি সমস্ত শিল্পজগতে দুর্লভ। চিহ্ন বা প্রতীক রচনা করে নি, প্রতিমা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ, আইডিয়ার 'বাচন' বা রূপায়ন ওখানে কষ্ট-কৃত কল্পনাকৃত নয়, রসিকের কাছে ওর বোধ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়। আইডিয়াই জন্ম নিয়েছে, আইডিয়াই মূ
হয়েছে।

এক সময় য়ুরোপ স্বভাবের হুবহু নকল করার দি ঝুঁকেছিল। সেটা আর্টের ঠিক রাস্তা নয়, তাতে শেষ পর্য তৃপ্তি দিতে পারে না। প্রতিক্রিয়ার বশে এখন স্বভাবকে এ বারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে; সেটাও অস্বাভাবিক, তা কোনো রস নেই। সমস্ত অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষ ভাবতে পারে না, দেখতেও পারে না। বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের তথ্য নি কী হবে? সেটাই যে আর্টের সত্য তা নয়। আর্টের বি আর আর্টিস্টের মন যেন বস্তু আর আলো। সূর্যের আ মাটি-পাথরে চুষে নেয়; সেই হল স্বভাবের অনুকরণকারী আর্ট কাঁচে, আয়নায়, জলে প্রতিফলিত করে; সেই হল ভারতীয় প্রাচ্য শিল্পের জাত। এ আর্ট খুব ক'রে অনুকরণ করতে য নি, খুব বেশি অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট বা অনুষঙ্গভীরু হবারও তার দরক নেই। এর যা সত্য তা রূপ ও অপরূপ দুই মিলিয়ে, দুইয়ে মাঝামাঝি বিরাজ করছে।

নিসর্গ চিত্রে বা ল্যান্ড্‌স্কেপে যে রস তা নব রসে কোনোটা নয়। বড়োজোর শান্তরস বলতে পার, বা একাত্মতা রস। চীনেরা, মনে হয়, লাওৎসের বাণী থেকে তা পেয়েছিল

একটা ভূদৃশ্যের মধ্যে একজন মানুষ।—ভূচিত্রটিই বিশে ক'রে আঁকবার বিষয় হলে মানুষটি আঁকতে চেষ্টা করা উচিত আর, মানুষটি আঁকাই যদি লক্ষ্য হয় তবে, ভূচিত্রটি এঁকে তুলতে যত্ন করা ভালো। ছবির বিষয়কে সামনা-সামনি বা হঠকারিতা সঙ্গে আয়ত্ত করতে গেলে তা এড়িয়ে যায়। প্রেমেরও যেম রীতি, তাতে বাঁকা ভঙ্গী আছে। যেদিকে যেতে চাও সেদিকে সোজা যাও না, যা বলতে চাও তা সোজাসুজি বল না; য চাও তা ব্যঞ্জনায় সুন্দর করে প্রকাশ কর—ইঙ্গিতে, ইশারায় তাইতে প্রেমিক আর প্রিয়া দুজনেই খুশি হয়, প্রেম সফল হয় আর্টই বল আর প্রিয়াই বল, তার সম্পর্কে হঠকারিতা ভালো নয়, 'না চাইলে' তাকে পাওয়া যায়।



ভূদৃশ্যের ছবিখানি কেবল গাছপালা, বালির চর, জলের ধারা এ'কে সম্পূর্ণ মনের মতো হল না—একটা কোথাও একটি ল্যাজঝোলা ফিঙে কি পাঁচনি-হাতে রাখাল কি উপুড় হয়ে একটা বাঁদর জল খাচ্ছে, এইটে এ'কে দিতে হল; অমনি দেখা যায়, সমস্ত ন'ড়ে চ'ড়ে কথা ক'য়ে উঠল। প্রাণের সঙ্গেই প্রাণের পরিচয়। উদাস বা সুন্দর ভূদৃশ্যের মাঝখানে ঐ ফিঙে পাখীটি, ঐ রাখাল ছেলেটি হল স্বয়ং আর্টিস্ট।

শিল্পে যে সিদ্ধ হয়েছে তার ভুল হয় না। গল্পে শোনা যায়, চীনা শিল্পীর পা লেগে কালির বাটি উলটে গেল হঠাৎ, সে হাত বুলিয়ে এ'কে দিল আশ্চর্য এক ড্রাগন। আঁকিয়ের মনেতে আঁকবার বিষয়টি ঠিক-ঠিক যখন আছে, তখন মন থেকে তুলে কাগজে রেখে দিলেই যেন হল। কিম্বা পর্দা সরিয়ে দিতেই যেন দেখা গেল কী আছে। এজন্য যে হাত, হাতিয়ার, কাল এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন তা থেকেও নেই; কারণ শিল্পীর এবং শিল্পরসিকের তার সম্বন্ধে কোনো হুঁশই নেই যেন। তীরধনুক নিয়ে অনেক নিশানা ক'রে, অনেক যত্ন ক'রে, লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করা যেতে পারে; তাতে লক্ষ্য বিদ্ধ হতেও পারে, না-হতেও পারে। আরেক, যখন লক্ষ্যই তীরকে আকর্ষণ করে নেয় চুম্বকের মতো—কোনো চেষ্টা নেই ব'লেই ভ্রান্তি বা চ্যুতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

কুটুমকাটাম ব'লে একটা কথা অবনীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবের বস্তু কী, শিল্প কী, কুটুমকাটাম কী, এটা ভাববার বিষয়। কোনো একটি মেয়েকে তিন রকম ক'রে পরিচিত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, মেয়েটি অমুকের মেয়ে, অমুকের স্ত্রী, অমুকের মা। দ্বিতীয়তঃ, সে হল মা, তার কোলে ছেলে আছে বা এমন কিছু লক্ষণ আছে যা অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু ভাবা যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ, সে মা নয়, স্ত্রী নয়, মেয়ে নয়, কোনো সম্বন্ধেই অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা নয়—সে নারী মাত্র। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় হল শিল্পের পরিচয়। একখণ্ড পাথরের কথা ধরা যাক। যখন তা এমন যে কারো কাছে জটাই বুড়ি, কারো কাছে গজকচ্ছপ, কারো কাছে শিব, আর-কারো কাছে আর-কিছু, তখন তা কুটুমকাটাম; বহু লোকের সঙ্গে বহু কুটুম্বিতাসূত্রেই তার পরিচয়। যখন তা পাথর সে কথা ঢাকা পড়ে গিয়ে দেখছি সেটি একটি নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট মূর্তি—হোক চাই শিব, হোক চাই পার্বতী, একই জিনিস, দুই বা বহু নয়, তখনই তা একজন শিল্পীর শীলমোহর-করা রচনা; তা সৃষ্টির প্রতিসৃষ্টি বা আর্ট। যখন তা পাথর এই পরিচয়েই তার জানছি বা মানছি তখন তা স্বাভাবিক সৃষ্টি, স্বভাবের জিনিস।

পূর্বদিকে সবুজ বনের মাথায় কাজলকালো মেঘ আমার এত ভাল লাগছে কেন—মনকে এমন ক'রে নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছু নয়, একই সত্তার একই চেতনার এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।

এক দিকে মেঘ আরেক দিকে আমি, তাই মেঘের সুখ আমাতে বা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিয়গুলি দরোজা-জানলা মাত্র। সেই পথে আমি ও আমার বিষয় মিলছে, মিশছে; একই চেতনায় নানারকম দোলা লাগছে, ঢেউ জাগছে।

কুণালজাতকে আছে কামলোকের কথা। তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। আমি বলি, তারও উপরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি, তাই অন্ধ-তা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে উঠে প্রাণে নিখিল-প্রাণের ছন্দস্পন্দ অনুভব করা গেছে। আনন্দলোকে রস। শাস্ত্রেই বলেছে, রসো বৈ সঃ।*

* শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের উক্তির সংগ্রহ। সংগ্রাহক শ্রীকানাই সামন্ত।



প্রফুল্লকুমার ও রাষ্ট্রভাষা

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার সর্বসাধারণের নিকট "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করিলেও মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠার জন্যই তিনি সাহিত্যিক বন্ধুগণের নিকট সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না, সেই কৃতিত্বকে স্মরণ করিয়াই "ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবি-সঙ্ঘ" তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করেন। কিন্তু "প্রফুল্লকুমার তাঁহার যথার্থ আত্মপ্রকাশের পথ সংবাদপত্র সেবায় লাভ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রাণমনে তিনি ছিলেন আজীবন সাহিত্যরসিক। নিশ্চয়ই সংবাদপত্র তাঁহার অনেকটা রস শুষিয়া লইয়াছিল।" সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের এই সুচিন্তিত অভিমত অন্তরের সহিত সমর্থন করিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই।



পঠদ্দশাতেই প্রফুল্লকুমার মাতৃভাষার সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বঙ্গভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বঙ্কিম পদক' প্রাপ্ত হন। দেশভক্ত তরুণ প্রফুল্লকুমার দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়াই প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত "ভাণ্ডার" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। নব-পর্যায়ের "বঙ্গদর্শন" এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রফুল্লকুমার ওকালতি ব্যবসায় সুরু করেন। কিন্তু ইতিপূর্ব হইতেই তাঁহার জীবনে যে সাহিত্যানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। ইহা তাঁহার আইন ব্যবসায়ের অনুকূল ছিল না। প্রফুল্লকুমার অল্প কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যে রাজপুত্রের গৃহ-শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। প্রবাসে অবস্থানকালে তিনি ১৩২০ সালের মাঘ মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় "আদমসুমারীতে বাঙ্গলার অবস্থা" শীর্ষক এবং ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় "জাতীয় জীবন ধ্বংসের কারণ" শীর্ষক যে দুইটি অতি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার সুধী-সাহিত্যিক ও মনস্বিগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রফুল্লকুমার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা লইয়া প্রফুল্লকুমার সংবাদপত্রসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আজ "আনন্দবাজার পত্রিকা" সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা দেশের অতি গৌরবের সামগ্রী।

সাংবাদিকের জীবন কিন্তু সাহিত্যনিষ্ঠ প্রফুল্লকুমারের জীবনকে একেবারে কবলিত করিতে পারে নাই। স্বল্প-অবসরের মধ্যেও তিনি সাহিত্যসাধনা হইতে বিরত ছিলেন না। তাঁহার প্রণীত 'অনাগত', 'বালির বাঁধ', 'লোকারণ্য', 'ভ্রষ্টলগ্ন' ও 'বিদ্যুৎলেখা'—এই কয়খানি উপন্যাসের ভিতর দিয়া প্রফুল্লকুমার বাঙ্গলার সংসার ও সমাজ-জীবনের সমস্যাসমূহের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত জীবনী "শ্রীগৌরাঙ্গ" এবং সামাজিক সমস্যামূলক গ্রন্থ "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" গ্রন্থকারের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। প্রফুল্লকুমারের অকৃত্রিম সাহিত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে'র সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি উহার কার্যনির্বাহক সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সাহিত্যসেবিগণের মিলন-সভা 'রবি-বাসরে'র প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই তিনি উহাতে অতি অন্তরঙ্গভাবে যোগদান করেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এবং বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির তিনি একজন উৎসাহদাতা ও সুহৃদ ছিলেন। প্রফুল্লকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মাতৃভাষা—বাঙ্গলা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। তাঁহার এই বিশ্বাস ও আশাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

"রবি-বাসরে"র বৈঠকে সদস্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ১৩৪৪ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে সর্বপ্রথম "বাঙ্গলা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা" বিষয়ে আলোচনা সুরু করেন। সেই অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুর এবং বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। প্রফুল্লকুমার সেদিন এক ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া নানা যুক্তি সহযোগে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত

করেন। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে, তিনি বলিয়াছিলেন,—"কংগ্রেসে যখন ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা উঠে, তখন মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেন যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত, কংগ্রেসও উহা অনুমোদন করেন। কিন্তু নানাদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বাঙ্গলারই রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা অধিক। বাঙ্গলা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা; তাহা ছাড়া উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের ভাষার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার খুব বেশী সাদৃশ্য। এই দুই প্রদেশের লোক বাঙ্গলা অনায়াসেই বুঝে। পক্ষান্তরে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বাঙ্গলা ভাষাভাষীর চেয়ে বেশী নহে। এগার কোটি লোক হিন্দী বলে, এ দাবী অমূলক। বিহার ও রাজপুতনার হিন্দীতে এত পার্থক্য যে, উহাকে দুইটি পৃথক ভাষা বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলা কম সহজবোধ্য নহে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা সাহিত্য গৌরবে বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গলা ভাষা বেশী ভাবপ্রকাশক্ষম; সুতরাং সর্বদিক দিয়াই বাঙ্গলা রাষ্ট্রভাষার দাবী করিতে পারে। সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান আজ নিম্নে, তাহার Inferiority Complex বা হীনতাবোধই ইহার কারণ। এই হীনতাবোধ ত্যাগ করিয়া যদি বাঙ্গলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলন করা যায়, তবে সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত।"

প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতার পর সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় নির্দেশ দেন যে, পরবর্তী অধিবেশনেও এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা চলিবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী অধিবেশনেও "বাঙ্গলা ভাষার" ভারতে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা" বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি প্রফুল্লকুমারের যুক্তিরই সমর্থন করেন। তৎপরে বিভিন্ন অধিবেশনে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ঐ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়া প্রফুল্লকুমারের অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে সময় রবিবাসরের সদস্য ছিলেন। তিনি এই সকল আলোচনায় বিশেষ মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন যে, রবি-বাসরের এই মূল্যবান আলোচনার বিষয় অন্য প্রদেশবাসীদের গোচর করা একান্ত কর্তব্য। তাঁহারই নির্দেশমত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজি ১৯৩৮ সালের মে মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় "A National Language for India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে প্রফুল্লকুমারের বক্তব্যটিই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল।

'বাঙ্গলা ভাষার রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার দাবী' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ১৩৪৫ সালের ১৯শে মাঘ তারিখে, মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ভবনে সাহিত্যসেবিগণের যে পরামর্শ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে প্রফুল্লকুমার বলেন যে, "হিন্দুস্থানী নূতন তৈয়ারী ভাষা। এইরূপ তৈয়ারী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না—ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। ভারতের কোন জীবন্ত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। হিন্দী ও বাঙ্গলা —এই দুইটি সেই দাবী করিতে পারে। এখানে সাহিত্যের সম্পদ দেখিতে হইবে। এই হিসাবে বাঙ্গলার দাবী সর্বাগ্রগণ্য। * * * * * হিন্দী কর্তৃক পরাজিতের মনোভাব লইয়া কাজ করিলে চলিবে না। বাঙ্গলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে এবং অনুবাদ দ্বারা উহাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষার যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এতদিন ধরিয়া আমরা অনবধানভাবে করিয়া আসিতেছিলাম, এখন সজ্ঞানে ও ঐকান্তিকতার সহিত তাহার বিজয় অভিযান করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত "বাঙ্গলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী" পুস্তিকায় প্রফুল্লকুমার বলিয়াছেন— "ফরমায়েস দিয়া রাষ্ট্রভাষা তৈয়ার হয় না। রাষ্ট্রভাষা হইবে একটা পূর্ণাঙ্গ ভাষা। বাঙ্গলা ও হিন্দী সেই দাবী করিতেছে। হিন্দীর চেয়ে বাঙ্গলার দাবী অনেক বেশী। কেবলমাত্র জনসংখ্যার উপর ইহার যোগ্যতা নির্ভর করে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, আমরা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত নই বলিয়াই অন্যান্য ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে উদাসীন। ইহা কতক সত্য বটে, কিন্তু যাহারা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাহাদের হিন্দী সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হই। * * * * * আমরা সাহসের সহিত বলিব, বাঙ্গলাই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত ভাষা—ইহা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না।"

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে, ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে, ১১শে বৈশাখ, ১৩৪৮ তারিখে, প্রফুল্লকুমার তাঁহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন— "কংগ্রেস যাহাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা হিন্দী নহে, হিন্দুস্থানী। হিন্দীওয়ালা ও উর্দ্দুওয়ালাদের মধ্যে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা হিসাবেই মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ঐ প্রস্তাব বাহির হয়। অথচ উক্ত হিন্দুস্থানী নামধেয় ভাষার না আছে কোন সাহিত্য না আছে কোন শব্দসম্ভার। উহা কোন ভাষাই নহে। সুতরাং সংঘর্ষ হিন্দী ও বাঙ্গলায় নহে; হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে। হিন্দী ভাষার দাবী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবধি হিন্দুস্থানীর পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন। বাঙ্গলাকে বাঙ্গলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীতে দৃঢ় সংকল্প হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

এই অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙ্গলা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী নানা যুক্তি সহকারে বিশেষভাবে সমর্থনপূর্বক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায়, ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রফুল্লকুমার সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।—"বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ভাবের প্রাচুর্যে, শব্দসম্পদে, লেখার বহুলতায়, ভাষাসম্পদে ভারতের অন্যান্য ভাষার মধ্যে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই সম্মেলন বঙ্গভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছে।" সাহিত্য-সেবক সমিতি বঙ্গভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী লইয়া যে ধারাবাহিক আলোচনা করেন তাহাতেও প্রফুল্লকুমার বিশেষভাবে যোগদান করিয়া ঐ দাবী যুক্তিতর্কসহ সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে সাহিত্যসেবিগণের প্রতিও বিশেষ অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্য তিনি সকল সময়েই কামনা করিতেন। বিগত চতুর্দশ বৎসরকাল ধরিয়া প্রফুল্লকুমারকে অনিবার্য কারণ ব্যতীত কখনও রবিবাসরের বৈঠকে অনুপস্থিত হইতে দেখি নাই। তাঁহার অকাল পরলোকগমনে এই সাহিত্য-বৈঠক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়।

প্রফুল্লকুমারের সাহিত্যালোচনা শ্রবণে সুধীজন মাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেন। বিরূপ সমালোচনা কালেও তাঁহাকে কখনও উগ্র ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। প্রফুল্লকুমারের মধুর প্রকৃতিই তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়।

বাঁশবাজি



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খোড়গাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছু নেই। তেলেভাজা দুর্গন্ধ পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সক্কলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু'একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি-চ্যাঙারি, খারা-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুড়ি সরা-মালসা, কলকে-ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাচের চুড়ি।



"খেলা সুরু হোলো না—আগেই পয়সা"

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, ঝিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলায়-বলায় ফুর্তি নেই এক রতি। পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না।

"আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।" আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়েস, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাঁদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে, তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

বাঁশগাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনেছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

"মাটিতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা?" কে একজন জিগগেস করলে।

না এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে, ভারিক্কি গলায়, 'না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা।'

'ঐ বুড়ো বুঝি?'

'হাঁ, ওই মন্তাজ।'

শনের দড়ির মত পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক'গাছি দাড়ি রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা টিপলে মতন, পেটটা দু পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁচকান চোখ দুটো তার চকচক করছে—সেইটুকুই তার যা-কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মন্তাজ সবাইর কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

"খেলা সুরু হল না, আগেই পয়সা?" কে-একজন ধমকে উঠলো।

'খেলা হয় কি করে? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে মাতল করছে। 'পড়ে যাব, মরে যাব'—এ কেমনতর কান্না? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে?

ছেলের কান্নাতে মন্তাজের ভ্রুক্ষেপ নেই। 'হবে, হবে, সুরু হচ্ছে এখুনি।' সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে যায়।

'খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা?' জিগ্‌গেস করলাম পাশের লোককে।

'এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।'

'তবে কে ছিল এতদিন?'

'ওর দাদা—'

'না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু'-একবার।' কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। 'সরস্বতী পুজোর সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয়নি—বেয়ে বেয়ে চূড়োয় উঠে আসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর দাদাই। আর যাই বলুন আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধ'রে রাখে তার—মন্তাজের।'

'কই ওর দাদা?'

'কে জানে!'

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মন্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ পয়সা দিতে রাজি নয়।



"পেটোপঠে এক"

অনন্যোপায় হয়ে মন্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছেলেটা। 'না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—'।

বাপ একবার তার হাত ধরে টান মারলো হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচালো একবার।

'হেঁঃ, ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না, পুঁচকে একরত্তি ছেলে।' বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ-কেউ তিরস্কার করলে।

মন্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

'পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে, উঠে আয়।'

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু'একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মন্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঁচিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপর।

'ওই ওর দাদা।' জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশেকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চার পাশে, গালে ও থুতনির নিচে কাটা ঘা, একটা ডংডনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই'র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।'

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মন্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুণ্ডলের গর্তে। কি যেন বলল বিড়বিড় করে। বোধহয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

'চলে আয়, ইন্তাজ।' ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টোটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি

আঁৎকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগ্‌দগ করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজে উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চন্দনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

'কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?' জিগ্‌গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়ীতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

'ন্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?' জিগ্‌গেস করল মন্তাজ।

'না।' দু' হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে, বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু' হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মন্তাজ।

'দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।'

আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘা-গুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখলাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম, চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, 'তার পর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্যে, তখন ওসব ঘা-টা কিচ্ছু দেখা যাবে না।'

'বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?'

'কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।'

'নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগ্‌বাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাদুরি কি!' আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে সুরু করেছে মন্তাজের দু'হাতে। চোট খাবার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদুড় না চামচিকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম মন্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরন্ত বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশী দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মন্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরী হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুঁটে ঘুঁটে ঘুরছে না জানি কোন জ্বলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে, ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম। ইন্তাজ ফসকাল না, মন্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মন্তাজ, কিন্তু যতই ফুরফুরে



"তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে"

পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

'আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—' কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মন্তাজ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দৌড়-খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মত ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা সুরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপর কি চাঁদদাড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, থুত্থুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি

(১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দূর প্রাচ্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রাচ্য এশিয়ার নানা দেশে প্রসার লাভ করে। সমুদ্রপথে ভারতের বণিকসম্প্রদায় বহুপূর্ব থেকেই শ্যাম, ইন্দোচীন যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এ সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা সেকালে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল এবং সেখানে কোন ক্ষমতাশালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। এই কারণেই ভারতীয়গণ অল্পকালের মধ্যেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন। গুপ্ত যুগের পূর্বেই যে সব হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বুজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয়রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্বুজ রাষ্ট্র বর্তমান কাম্বোডিয়া ও শ্যাম নিয়ে গঠিত হয়। চম্পারাজ্য আনাম প্রদেশের দক্ষিণাংশে এবং শ্রীবিজয় সুমাত্রার পালেম্বাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যবদ্বীপ ও মলয় উপদ্বীপের কতকাংশ শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনকালে স্থানীয় সভ্যতার মূল উপাদান। যতদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় ছিল, ততদিন ছিল এই সমস্ত রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন আছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করেছে। চম্পা, কম্বুজ, শ্যাম ও যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু মন্দির-গুলির মধ্যে শুধু যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবই পাওয়া যায় তা নয়। তাদের উপাদান, গঠন পদ্ধতি, মন্দিরগাত্রে প্রস্তরে কারুকর্ম, ভাস্কর্য প্রভৃতিতেও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পের অবনতি ঘটে। স্থানীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে কোন নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টিও করতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে ভারতীয় কৃষ্টির যেসব ধারা পৌঁছায় তা স্থানীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয় এবং নূতন সংস্কৃতির গঠনে সহায়তা করে। তার কারণ চীন দেশের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরণের, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই সে দেশের শিল্প ও সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশের ধর্ম ও দর্শন সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে প্রসারলাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তখন চীনারা ভারতীয় সভ্যতার সেই সমস্ত ধারাই গ্রহণ করল যা তাদের অতি নূতন ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে চীন দেশে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পৌঁছায় স্থলপথে। এ পথ আফগানিস্তান, বাহ্লীক (বাল্খ), মধ্য এশিয়ার নানা জনপদ—কাশগর, খোটান, কুচী প্রভৃতি হয়ে চীন দেশের উত্তরাঞ্চলে শান্‌শি ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ক্রমশঃ সেসব দেশে যাতায়াত সুরু করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্যদের চেষ্টায় আফগানিস্তান হতে চীন পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। গুপ্ত যুগের পূর্বেই এই সমস্ত দেশে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল ভারতীয় সভ্যতা। স্থানীয় সভ্যতার ধারাও একে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ধারাও মধ্য এশিয়ার পথে চীন দেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে একটি উন্নত ধরণের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হচ্ছে স্তূপ ও চৈত্য-বিহার। চৈত্য-বিহারগুলি গুহা-মন্দির বললেও ভুল হয় না। কারণ এ শিল্প পর্বত গাত্রের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গুহা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। একটি প্রশস্ত গুহায় চৈত্য স্থাপিত হত এবং সেই গুহায় পর্বদিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্মিলিত হতেন। এই চৈত্য-গুহার নিকটে পর্বত-গাত্রে আরও অসংখ্য গুহা নির্মিত হত। সেই গুহাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাঁরা সেখানে নির্জনে ধ্যান ধারণা ও অধ্যয়নে কালাতিপাত করতেন। এই ধরণের গুহা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই নির্মিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা দেখতে পাওয়া যায় বিহার প্রদেশে বরাবর পর্বতে। এই গুহার নাম 'লোমশ ঋষির গুহা'। এখানেও ভিক্ষুরা বাস করতেন। পরবর্তী যুগে ভাজা, নাসিক, কার্লে, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানেও এই ধরণের গুহা-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় গুপ্ত যুগে—তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তায়। প্রথম যুগের গুহাগুলির মধ্যে কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তীকালে এইগুলিকে অবলম্বন করে নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি চলে—গুহার মধ্যে নানা কারুকার্য, গুহার গাত্রে চিত্রাঙ্কন, প্রস্তরে নানা মূর্তির কল্পনা। এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের চরম পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় অজন্তার গুহায়। বৌদ্ধ শিল্পের এই সমস্ত ধারাই মধ্য এশিয়া ও চীন দেশ পর্যন্ত প্রসারলাভ করে।

মধ্য এশিয়ার পথে হিন্দুকুশ পর্বতের অন্তঃপাতী বামিয়েন নামক স্থানে এই বৌদ্ধ শিল্পের যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসরণ করে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের গুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গুহা-মন্দিরের প্রাচীর চিত্রের কতকাংশ এখনো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। সেই চিত্রগুলি অজন্তার প্রাচীর চিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। এই সমস্ত গুহার নিকটে পর্বতগাত্রে কতকগুলি বিরাট বুদ্ধমূর্তি ক্ষোদিত হয়েছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির ঊর্ধতা প্রায় ৯০ ফুট। এ ছাড়া আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাস্কর্যের ধারা অনুসৃত হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাকে Indo-Greek Art এই আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত গ্রীক স্থায়ীভাবে

বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খুব সম্ভব তাদের হাতেই এই নূতন শিল্প পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই শিল্প-পদ্ধতির চরম বিকাশ হয় কুষাণ যুগে—খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে। এই কারণেই বামিয়েন এবং মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে, এমন কি চীনের হোনান্ প্রদেশে ভাস্কর্যের এই বিশিষ্ট রচনাশৈলীর নিদর্শনই বেশী পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, গুপ্ত যুগে গ্রীকপ্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারাও যে, এ সব অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল তারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

খোটান ও কাশগরের নিকটবর্তী নানাস্থানে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসস্তূপ হতে প্রাচীন কালের নানা শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বৌদ্ধমূর্তি, চিত্রিত পট, ভারতীয় লিপিতে লিখিত নানা পুঁথি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধ-মূর্তি হতে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে বিশিষ্ট ধারার খোঁজ পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক। অনেক স্থলে এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে, অনেক মূর্তির মূল উপাদান তক্ষশীলা হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খোটানের নিকটবর্তী দান্দান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে। এই গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রের মধ্যে বামিয়েনের প্রাচীর চিত্রের মতই ভারতীয় ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। চিত্রের পরিকল্পনায় দুই এক স্থানে পারসিক প্রভাব চোখে পড়লেও মূল ভারতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিষয়বস্তু ও রচনা নৈপুণ্য হতেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই গুহাগুলিও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নীরব সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন যুগের চীনা পরিব্রাজকেরা এ অঞ্চলে আরও অনেক গুহা দেখেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চীনা পরিব্রাজক, হিউয়ান্-সাং খোটানের পথে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি বলেছেন—"ইয়ারকন্দের দক্ষিণে যে উচ্চ পর্বত-শ্রেণী আছে তা ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। সেই সব পর্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেই সব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকদের নির্জনে সাধনার স্থান।" এই সব গুহার সন্ধান এখনো পাওনা যায়নি। এ সব গুহাও যে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গুহা-মন্দিরের মতই ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

খোটান হতে যে পথ চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে এই পথের উপরে দান্দান-উইলিক হতে আরও পূর্বদিকে মিয়ান নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অনেক ধ্বংসস্তূপ আছে। এই সমস্ত স্তূপ হতে প্রাচীন যুগের যে বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খোটান অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এই নিদর্শনগুলি দুটি বিশিষ্ট যুগের। কতকগুলি হচ্ছে গুপ্ত যুগের অন্যগুলি পরবর্তীকালের, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের। প্রথম যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে ইন্দো-গ্রীক এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। পরবর্তী যুগের শিল্প চীনা ও তিব্বতী প্রভাবেই অনুপ্রাণিত।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচী প্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কুচীর নিকটবর্তী কিজিল নামক স্থানে বৌদ্ধ যুগের অনেক গুহা-মন্দির আছে। এই গুহা-মন্দিরগুলিকে তুর্কী ভাষায় 'মিং-উই' বলা হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে 'হাজার মন্দির'। স্থানে স্থানে এই সব গুহা-মন্দির যে সংখ্যায় ঠিক 'হাজার' না হলেও অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের গুহা মন্দিরে প্রাচীরচিত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে নানা দেশের প্রভাব বর্তমান। পারসিক, রোমক ও চীনা প্রভাব তাতে থাকলেও সে শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ অঞ্চলে যে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক রীতির অনুবর্তী।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মধ্য এশিয়ার পথ বেয়ে মিলিত হয়েছিল চীন সীমান্তে তুন্-হোয়াং নামক স্থানে। মধ্য এশিয়া হতে যে সব পথ চীনদেশে গিয়েছে তুন-হোয়াং তার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ স্থান চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও চীনযাত্রী নানা বিদেশী এখানে বসবাস করত। চীনযাত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও এখানে সামিয়িকভাবে থাকতেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। এই সব কারণে তুন-হোয়াং-এ নানা বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তুন্-হোয়াং পল্লীর নিকটে একটি ছোট নদীর ধারে অনুচ্চ পর্বতমালা আছে। এই পর্বতের নানা গুহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আকৃষ্ট করে। নিভৃত সাধনার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর বেশী ছিল না। সেই কারণে গুহাগুলি ক্রমশঃ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেই এই কাজ আরম্ভ হয় এবং সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে। অসংখ্য গুহা নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়। প্রতি গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত হয় এবং সর্বসমেত এক হাজার বৌদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়। চীনদেশে এ গুহাগুলি "হাজার বুদ্ধের গুহা" (Caves of the thousand Buddhas) নামে পরিচিত। এত বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের অন্যত্র ছিল না।

বৌদ্ধ শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলির স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মেলনে যে কি চিত্তাকর্ষক চিত্র-কলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রে ভারতীয়, পারসিক, চীনা প্রভৃতি নানা ধারার সমন্বয় ধরা পড়ে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির বিচার করলে তার মধ্যে বিভিন্ন রচনাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। ইন্দো-গ্রীক ও গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চীনা ও তিব্বতী প্রভাবে রচিত নানা বুদ্ধ মূর্তি ও পটচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

এই বৌদ্ধশিল্পের ধারা উত্তর চীনে শান্‌শি ও হোনান্ প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শান্‌শি প্রদেশে ইউন-কাং ও হোনান প্রদেশে লুঙ-মেন নামক দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এ অঞ্চল বিদেশী রাজাদের হস্তগত হয়। তাঁদের প্রথম রাজধানী তা-তং-ফু নামক স্থানের অতি নিকটেই ইউন-কাং অবস্থিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশমত ইউন-কাংএর পর্বতমালায় এই সময়ে বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ কাজে সহায়তা করেন। পর্বত গাত্রে বিরাট আকারের বুদ্ধ মূর্তি ক্ষোদিত হয়। অনেক মূর্তি প্রায় ৬০ হতে ৭০ ফুট।

লুঙ-মেন হোনান প্রদেশে চীনের প্রাচীন রাজধানী লো-য়াঙ নগরের নিকটে অবস্থিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লুঙ-মেনের পর্বতমালায় নানা গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এ গুহাগুলিও ইউন-কাংএর গুহার ধরণের এবং প্রায় একই যুগে নির্মিত। ইউন-কাং ও লুঙ-মেনের ভাস্কর্যে দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি ইন্দো-গ্রীক পদ্ধতি, অন্যটি গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি। সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছেও এই দুই শিল্প তাদের বিশিষ্ট রূপ হারায় নাই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এই সব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পীরা প্রভূত লাভের আশায় এ সব দেশে যাতায়াত করত, পরবর্তীকালে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল যুগে বঙ্গদেশের অনেক শিল্পী বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের জন্য তিব্বত পর্যন্ত যেত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অনীক নামক একজন বিখ্যাত নেপালী শিল্পী তিব্বতে যান। পরে চীন সম্রাটের আদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে যান এবং সরকারী শিল্প বিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হন। তাঁর হাতের নানা কাজ চীনা শিল্পীদের চমৎকৃত করেছিল।

ইউন-কাং ও লুঙ-মেনে যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আছে সে শিল্প চীনারা অতি শীঘ্রই আপন করে নিয়েছিল। যদিও তাদের প্রাচীন জাতীয় শিল্প ছিল, কিন্তু এই নূতন ভারতীয় ধারা নিজস্ব করে নিয়ে তারা সেই শিল্পের পরিপুষ্টি সাধন করে। ফলে পরবর্তীকালের চীনা ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব

(১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

মহাতপা

তপের তড়িৎ-সূত্রে ঐক্যে গাঁথি' শ্রেয় আর প্রেয়
অমোঘ মৈত্রীর মন্ত্রে চণ্ডালেও বক্ষে টানে কে ও!
ধ্যানোন্মীল ধ্রুবনেত্রে জাগে নবযুগের মৈত্রেয়।
এ ভারতে কার দৃষ্টি নির্নিমিখ আজ?
—গান্ধী মহারাজ।
অস্থিশীর্ণ কৃশতনু দৃঢ়দীপ্ত কৃশানুসুন্দর
ত্যাগের সর্বস্ব পণে মহাভিক্ষু গুর্জর-শঙ্কর
কটিবাস মাত্র সাজে ত্রিশকোটি দরিদ্র-নির্ভর।
পরজীবী গৃধ্নুদের কে বহিছে লাজ?
—গান্ধী মহারাজ।
ক্লীব ক্লিষ্ট লক্ষ্যহীন লক্ষপ্রাণে ঋতবাক্য যার
তিলে তিলে অলক্ষিতে অগ্নিতেজ করিছে সঞ্চার,
শৃঙ্খলে সংগীত হানি' বন্দী গাহে বন্দনা তাহার।
সুপ্তচিত্তে কার বাণী সমুদ্যত বাজ?
—গান্ধী মহারাজ।
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনি,' অপ্রেমেরে প্রেমের আগ্রহে
আলিঙ্গন দানিল যে বেদনার সর্পবিষে দ'হে,
শক্তি তার অপ্রহত জীবযজ্ঞে অনন্ত নিগ্রহে।
মানব মুক্তির এ কী সমূর্ত বিরাজ!
—গান্ধী মহারাজ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঁশবাজি

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা—সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলাম না। কেউ বললে, হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্য-সদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার সময় একআনা করে পয়সা দিতে পারত না মন্তাজ। যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না, পেটের ভিতরের ঘা?

মন্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কাছ কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠেঃ 'এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নির্ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি—'

মন্তাজ কিছুই বলল না। আক্কুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আত্মার কাছে শিশু-কণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মন্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো।

দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় শিল্প

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে চীনারা বিদেশী ধর্ম বলে অগ্রাহ্য মনে করে নাই। সে ধর্ম হতে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে চীনা মনীষীরা অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিল্পের ধারাকেও চীনা শিল্পীরা অগ্রাহ্য মনে করেনি। বরং সে শিল্পের অনুপ্রেরণায় তারা যে নূতন সৃষ্টি করল তা সমস্ত জগতকে আজও চমৎকৃত করে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর চীন হতে ভারতীয় শিল্পের এই ধারা জাপানে পর্যন্ত পৌঁছায়। ঐ সময়ে কোরিয়া হতে বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গেই জাপানের রাজধানী নারার নিকটে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৌদ্ধ বিহারের নাম হোরিয়ুজী। এই বিহারেই জাপানী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মন্দিরে যে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে তা অজন্তার চিত্রকলার অনুরূপ। এই চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যে সব শিল্পীদের হাতে এর সৃষ্টি হয়েছিল তারা নিখুঁত ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেই আদর্শই হোরিয়ুজীর চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে চিত্রকলায় জাপানী হাতের কোন বিশিষ্ট ছাপ নাই। চিত্রবিদ্যায় এই প্রথম দীক্ষা লাভ করবার অল্পকাল পরেই জাপানী শিল্পী চিত্রকলায় তার বিশিষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিল। বিদেশী শিল্পপদ্ধতি সে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

নাটকীয় কথা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নাটক সম্বন্ধ আমাদের সাহিত্যে এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই; বাংলা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব ও তাহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী, এবং প্রথম যুগের নাট্যকারগণের নাট্যরচনা-প্রয়াসের কথা অল্প-বিস্তর লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক; সেই সঙ্গে নাটকীয় প্রতিভার যে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে তাহা খোল-করতাল সহযোগে একরূপ কীর্তন বলিলেই হয়। অথচ, বাংলা সাহিত্যে না হউক—বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাটকের প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; নাটকের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয়কলায় নবত্বের লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টি হিসাবেও নাটকের একটা বড় মূল্য আছে,—নাট্যকারের প্রতিভাও একটা বড় কবি-প্রতিভা; এজন্য নাটকের রসবিচার কোন্ আদর্শে করিতে হইবে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে এখনও আমাদের মধ্যে জন্মে নাই, ইহাই আশ্চর্য। আমি এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ নাটকীয় রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, এবং প্রসঙ্গতঃ আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিব।

* * * * *

নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কথা এই যে, ইহা উপন্যাস বা কাব্যের মত একা একা ঘরে বসিয়া উপভোগ করিবার বস্তু নয়; যিনি নাটক রচনা করেন তিনিও, কবি বা ঔপন্যাসিকের মত, স্বকীয় কল্পনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না; কারণ, নাটকের রস-পরিণাম ঘটাইতে হইলে দর্শকমণ্ডলীর সহযোগিতা চাই; নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক এই তিনে মিলিয়া নাট্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনের মধ্যে দর্শক-চিত্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণই নাটকের সব চেয়ে বড় নিয়ন্তা। এই-খানেই কবিকেও মনুষ্যসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসিতে হয়—ব্যক্তি-মানসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা ঋষি-সুলভ দিব্যদৃষ্টির অভিমান ত্যাগ করিতে হয়; আর্টের ডিমোক্রেসী যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে-নাটক রঙ্গালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়—কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক।

আমাদের দেশে পূর্বকালে যে নাটক ছিল, আধুনিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—আমি সংস্কৃত নাটকের কথা বলিতেছি। সেখানে "আপরিতোষাৎ বিদুষাং" নাট্যাভিনয় সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইত না; যে 'সহৃদয় সামাজিকবর্গ' তাহা উপভোগ করিতেন, তাঁহারা ছিলেন চিত্তপ্রকর্ষবান রসিক-মণ্ডলী; এবং সম্ভবতঃ হিন্দু নাট্যশালা ঠিক আধুনিক রঙ্গালয়ের মত সাধারণের রঙ্গালয় ছিল না; রাজ-অন্তঃপুরের চিত্রশালাতেই অধিকাংশ নাটকের অভিনয় হইত। অতএব সে নাটক ছিল বিশেষভাবে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক; প্রাচীন য়ুরোপীয় নাটকের মত তাহা সর্বজনসেব্য ছিল না। ভারতবর্ষে নাটকের তেমন প্রসার ঘটে নাই এবং তাহার ধারাও নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই, বোধ হয় এই কারণেই। ইহারও মূলে আছে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে 'রস'ই ছিল মুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ।

মানুষেরই যে সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সর্ব-মানুষের মধ্যে সংস্কাররূপে বিরাজমান— মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্বিশেষ 'রস' বস্তুর দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত। য়ুরোপে তাহা হয় নাই—সেখানকার প্রকৃতি-উপাসক জাতিদের পিপাসা ছিল অন্যরূপ; তাহারা প্রাকৃত মানবজীবনকেই নাটকের দৃশ্য করিয়াছিল, সুন্দর-বোধের অপরবিধ সাধনায় মনকে বা Intellectকে যতই প্রাধান্য দিক, নাট্যকলায় তাহারা মানুষের জীবনের এই রহস্যকেই রসবস্তু করিয়াছিল। তাহার যে রস, সে রসের একমাত্র প্রমাণ এই যে, মানুষ মাত্রেই তাহাতে সাড়া দিবে—অন্ততঃ এক যুগের এক সমাজের সকল মানুষই সেই নাটকের অভিনয়দর্শনকালে নিজেরাও অন্তরে অন্তরে সেই অভিনয়ে যোগ দিবে; সেই যোগদানে যদি বাধা ঘটে তবে সেই নাটক যথার্থ নাটক হয় নাই। আধুনিক কালে য়ুরোপেও নাটকের সে রস-প্রমাণ আর নাই—এখন জীবনে দেহ অপেক্ষা মনই প্রাধান্য লাভ করায়, সে নাটক প্রকৃত জীবন-কাব্য—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত নহে; প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল ও পরবর্তীকালের রোমান্টিক নাটকের কল্পনা-গৌরব তাহাতে আর নাই। তথাপি অভিনয়-সাফল্যের প্রয়োজনে তাহাকেও কোন না কোন দিক দিয়া বহুজনচিত্তের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হয়—তাহারই কৌশল যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই নাটক রচনা করিয়া সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তেমন নাটক স্থায়ী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটকে যে রসকে দৃশ্য-কাব্যের আকারে রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃতজনসেব্য নয়; পরবর্তীকালে প্রাকৃত সমাজের প্রাকৃত রসপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় যে ধরণের নাট্য-লীলার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা যেমন খাঁটি নাটক হইতে পারে নাই, তেমনই সেই প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের আদর্শে নাটকাভিনয়ও বহুকাল পূর্বে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তারপর, যখন য়ুরোপীয় নাটকের অনুকরণে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখন যে বস্তু বিশেষ করিয়া চমক লাগাইয়াছিল, তাহা একটা বহিরঙ্গঘটিত ব্যাপার। নাটক-রচনার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, তাহার নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও—প্রকৃত নাট্যরস কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চেতনা জন্মিবার পূর্বেই—রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা ও বক্তৃতাই যে সেকালের নাগরিক বাঙালী সমাজকে উত্তলা করিয়াছিল, তার প্রমাণ—বাংলা নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় করিতে আমাদের বাধে নাই। আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তিও যেমন তাহার বিকাশের ইতিহাসও তেমনই অনুধাবনযোগ্য। জাতির রস-সংস্কারের অনুকূল নয় বলিয়া, এবং বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপযোগী নয় বলিয়া, এই বিলাতী বহিরঙ্গকে বজায় রাখিয়া নাটকের উন্নতি সাধন বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল। ধনীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সখের নাট্যাভিনয় একটা প্রমোদ মাত্র—নাটক হিসাবে তাহা প্রাণহীন; কারণ, সে নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চপ্রবাহী রসধারা সর্বজনহৃদয়াভিমুখী হইবার

উপায়ও ছিল না—আবশ্যকতাও ছিল না; অতএব তাহা জাতির চিত্ত-সাগর-সংগমে মিলিত হইয়া নাটকের রসপ্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিত না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা নাটক ও রংগমঞ্চ এমনই একটা বিড়ম্বনার মত, একটা ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজের ব্যর্থ প্রমোদ পিপাসার নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওদিকে তখন গ্রামে গ্রামে বাঙালীর খাঁটি বাঙালী-প্রাণ উন্মুক্ত আকাশতলে শামিয়ানা খাটাইয়া, ইতর-ভদ্রের বিরাট আসর জমাইয়া, সারারাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণযাত্রা ও নানা পুরাণ-প্রসংগের গীতাভিনয় শুনিতেছে। সহরের বাবুরাও তাহাদের প্রতি কম আসক্ত ছিলেন না; নাটক ছিল তাহাদের একটা পোষাকী আমোদ মাত্র; পোষাকী কথাটা এখানে উভয় অর্থেই সত্য।

এই যে যাত্রাগান, ইহারই রসপিপাসা আমাদের জাতিদেহের মজ্জাগত। এ রস-রসিকতা ঠিক জীবন-রস-রসিকতা নয়—ইহা ভাব-রস, বাস্তববিস্মৃতিজনিত একরূপ আত্মবিভোরতার রস; এই রসই দুর্বলচরিত্র, কর্মবিমুখ, অলস, কল্পনাপ্রবণ জাতির জীবনে সর্বকালে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় হইয়া আছে; বাংলা সাহিত্যে,—অর্থাৎ বাঙালীর অন্তর্জীবনের ধারাবাহিক কাহিনীতে—সেই আদিতেও যেমন, আজিকার এই অন্তেও তেমনই, এই গীতিরসই আর সকল রসকে পরাভূত করিয়া বাঙালীর চিত্তে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য বাঙালী মহাকাব্য লিখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই—তাহার মজ্জাগত বৈষ্ণব ভাবাকুলতা মহাভারতের কৃষ্ণার্জুন-চরিত্রকেও অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম নায়ক না করিয়া মহাভাবের ভাবুক করিয়া তুলিয়াছে, সেখানেও সেই যাত্রাগানের গীতিরসবস্তু নূতন পোষাকে—কেবলমাত্র লম্বশাটপটাবৃত হইয়া, মহাকাব্যের আকার-প্রাংশুতা মাত্র লাভ করিয়াছে।

(২)

উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত আবর্তমান সৃষ্টিচক্রের ঘূর্ণাবেগ-তাড়িত, দেহ-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময় গতি-শক্তিমান জীবন; অর্থাৎ সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দুর্ধর্ষ প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটি বিরাট কর্ম-যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য গতিমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্যে প্রভৃতির দ্বন্দ্ব যে অপূর্ব রসরূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহমন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ঘূর্ণাস্রোতে সে চকিতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাব-জীবনে বা মনোজীবনে সম্ভব নয়; তাহা ওই প্রবৃত্তিময় জীবনেই সম্ভব; নাটকের রস এই রহস্যের রস, তাই নাটক এই জীবনেরই দৃশ্য-স্বরূপ। নাটক মাত্রেই অভিনয়াত্মক এই জন্য যে, উহার কোন অংশই চিত্র নয়, ভাব নয়, স্মৃতি বা ধ্যানের বিষয় নয়; তাহাতে সৃষ্টির সেই অনাদি গতিধারায় জীবন মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটনাময় হইয়া উঠিতেছে, দশে ও কালে বিবর্তিত হইতেছে—একটা পরিণামমুখে দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছে। এই অর্থে ইহা দৃশ্যমাত্র—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির যোগ্য। যখন আমরা নাটকাভিনয় দেখি—তখন জীবনের একটা ঘটনাত্মক রূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; নাটকের যে Illusion তাহা আর কিছু নয়—অভিনয়ের মধ্যে আমরাও প্রবেশ করি—সেই ঘটনার ধারায় আমরাও যেন 'ঘটিতে' থাকি। ইহাকেই বলে নাটকীয় বস্তুর 'সাধারণী-করণ'—যাহা অপরের তাহা সকলের হইয়া উঠে, আমার চেতনা মানব-সাধারণের চেতনায় এক হইয়া যায়, একযোগে সকলের সংগে এই যে একই প্রকার অনুভূতি, ইহার মূলে আছে বিশুদ্ধ মানবতার প্রেরণা; সে প্রেরণা কোন বিশেষ আদর্শ, বিশেষ চিন্তা, বিশেষ মনোভাবমূলক নয়; কারণ, তাহাতে মানুষে মানুষে ভেদ আছে—ভিন্ন রীতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্ন মতের বাধা বা আবরণ আছে; সেখানে বিশুদ্ধ জীবন-চেতনা যেমন থাকে না, তেমনই ঘটনাত্মক জীবনের অবকাশ নাই—ভাবনা আছে, ভাবুকতা আছে, সংকল্প-বিকল্পের বিরোধজনিত নিষ্ক্রিয়তা আছে, নিস্তেজ প্রাণ-শক্তির বাদবিতর্ক আছে; তেমন জীবন নাটকোপযোগী, অর্থাৎ 'দৃশ্য' হইতে পারে না। এইরূপ জীবনের দৃশ্যও আধুনিক রংগমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে অভিনয়ের রস দর্শকের সাক্ষাৎ জীবনানুভূতির রস নয়—তাহাতে সে জীবনকে দেখে না, কতকগুলো ভাবনা-ধারণা-চিন্তাকে 'দৃশ্য'রূপে উপভোগ করে; এবং জীবন-চেতনার পরিবর্তে একরূপ মানস উত্তেজনা মাত্র অনুভব করে।

অতএব নাটক সার্থক হইতে হইলে তাহার উপাদান হইবে যে-জীবন—সে-জীবন স্থিতিশীল নয়—গতিমান, ভাবাত্মক নয়—কর্মাত্মক। সৃষ্টির প্রচণ্ড গতি-প্রবাহে—সেই বিরাট ঘূর্ণাচক্রের আবর্তন-মুখে মানুষের জীবনও যে গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং ঘটনাচক্রে তাহার যে অদ্ভুত বিকাশ ও পরিণাম—কেবল তাহারই রস প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর করানোই নাটকের একমাত্র কৃতিত্ব। নাটকের সহিত উপন্যাসের তুলনা করিলেই এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট বুঝিয়া লওয়া যাইবে। উপন্যাসে ঘটনার ধারা নাই, কাহিনীর পূর্ব-পর বিবৃতি আছে। সেখানে গ্রন্থকারও যেমন নিজেরই ভাবনা-ধারণা ধ্যান-কল্পনার বলে এবং স্মৃতিগত অভিজ্ঞতা হইতে, জীবনের একটা রূপ গড়িয়া তোলেন—তেমনই পাঠকও আপনার মানস-মুকুরে তাহার প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া একটা কল্পনা-রস আস্বাদন করিয়া থাকে—সে আস্বাদনে জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা অভি-জ্ঞতার অবকাশ নাই—ভাবগত রসোল্লাস আছে, প্রত্যক্ষদর্শনের চিত্তচমৎকার নাই। নভেলের জীবন কাহিনীগত জীবন—সে কাহিনী 'লিখিত' হইয়াছে, অর্থাৎ লেখক তাহা বলিয়া যাইতেছেন; তাহা আর ঘটিতেছে না—ঘটিয়া গিয়াছে; এবং লেখক তাহাকে নিজের ভাবদৃষ্টির দ্বারা যেমন দেখিয়াছেন, তাহার আদ্যন্তের যে অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই মত একটা রূপ তাহাকে দিয়াছেন। আমরাও যখন তাহা পাঠ করি তখন তাঁহার সেই ভাবনাকেই অনুসরণ করিয়া সেই পর্দার ভিতর দিয়া তাহাকে দেখি—সে পর্দার সংগে আমাদেরও মনের পর্দার নানা রং ও নানা নক্সার যতটা সাদৃশ্য থাকে ততটাই তাহাকে স্বীকার করি। এই স্বীকার আমরা সেই চেতনা দিয়া করি না—যে চেতনা দিয়া আমরা নাটকের জীবনকে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। তাই যখন কোন উপন্যাসকে নাটকের আকারে অভিনয়যোগ্য করিয়া তোলা হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে, উপন্যাসে আমরা যাহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম—নাটকে তাহা আস্বাদন করিতে বাধা ঘটে; সেখানে জীবনকে যেরূপে না দেখিলে আমাদের সেই চেতনার উদ্রেক হয় না, সেরূপ দেখিতেছি না; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, উপন্যাসের সেই জীবন সাক্ষাৎ-দৃশ্য জীবন নয়; তাহাতে যে গতি আছে, তাহা প্রাণের গতি নয়—মনঃকল্পিত গতি; তাহাতে যে তাপ আছে, তাহা ভাবের তাপ—বক্ষরক্তের তাপ নয়; তাহার কাহিনীও ঘটনা নয়—কল্পনা; তাহার রসও স্বতন্ত্র। কিন্তু নাটকে জীবনের যে রূপকে দৃশ্যমান করা হয় তাহা একান্তই ঘটনাত্মক, তাহার প্রতি মুহূর্তকে এক একটি ঘটনার লগ্ন বলা যাইতে পারে; সেখানে সকল কাজ, সকল কথাই সেই সেই ঘটনার লগ্নে, যেন স্ফুলিংগের মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটনার সেই লগ্নগুলিই মুখ্য, তাই সেখানে কথাগুলিও বাক্যময় ঘটনামাত্র; উপন্যাসের জীবন-চিত্রে এইরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। উপন্যাসে কাহিনীবস্তুর নাম প্লট; নাটকে কোন কাহিনী নাই—আগাগোড়াই 'action' বা ঘটনাবস্তু। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা actionরূপে দেখাইতে হয়। এ যেন একটা-কিছু আপনিই আপনার অন্তর্নিহিত বেগের বশে, নিজেরই নিয়তির তাড়নায়, কোন-একটা বিন্দু হইতে সহসা উদ্ভূত হইয়া, আকাশে, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিপথে, আগুনের রেখা টানিয়া অন্ধকার হইতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল! তাহার যে দীপ্তি তাহাও সেই বেগের দীপ্তি; যদি সে বেগ না থাকে তবে দীপ্তিও নাই, এই দীপ্তিই তাহার নাট্যরসরূপ; এজন্য যাহাকে action-রূপে ধরা যায় না, জীবনের সেই রূপ নাটকের উপযোগী নয়।

অতএব নাটকে আমরা জীবনকে, তাহারই নিজস্ব নিয়তি-নিয়মে, কেবলমাত্র ঘটনার মধ্য দিয়া একটা পরিণাম লাভ করিতে দেখি; সে পরিণাম আমাদের ইচ্ছানুরূপ নয়, কিন্তু আমাদের

গভীরতর চেতনার অনুমোদিত। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে কোন মত পোষণ করেন না—তিনিও জীবনের ভাবয়িতা নহেন, দর্শক মাত্র। জীবনের বাহিরে ও ভিতরে যত সমস্যা আছে, তাহা জীবনেরই—তাঁহার মনের নয়; জীবনের মূলে কোনও ধর্ম বা নীতিসম্মত আদর্শ আছে কি না সে জিজ্ঞাসাও তাঁহার নাই; তিনি কেবল জীবনের সেই গতিরেখাটি আবিষ্কার করিয়াছেন—সৃষ্টির সেই বিরাট গতিবেগের চক্রক্ষুব্ধ রেখায় মানব-জীবন যেভাবে যে মুখে আবর্তিত বা বিবর্তিত হইতেছে তিনি তাহারই রহস্য কেবল অনুভব করেন; বিচার করেন না, চিন্তা করেন না—অপরোক্ষ করেন। এই যে দর্শন ইহা যত গভীর ও ব্যাপক হয়, ততই নাটকে সেই দৃশ্যারস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। তখন নাটক আর শুধুই দৃশ্যকাব্য নয়—উচ্চতর কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে। এইরূপ কাব্যগুণাশ্রিত নাটক জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে, এবং এইজন্য সেক্সপীয়ার আজিও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু নাট্যকারও এমন কবি হইয়া উঠেন কোন্ গুণে? এক কথায় বলিতে হইলে—জীবনকে অতিশয় বিশুদ্ধ ও সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারার গুণে; সে দেখায় এমন একটা অনুভূতির উদয় হয়—যাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ রসিকতা। আমাদের দেশের দার্শনিক ভাষায় ইহাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দ বলে। জীবনের সেই 'সৎ' অর্থাৎ তাহার অন্তঃস্রোতের সেই খাঁটি 'অস্তি'-স্বরূপটির অখণ্ড অপরোক্ষ দর্শন যখন হয়, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যে বোধ এবং রসাস্বাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে উদ্রিক্ত হয়, তাহার তুল্য অনুভূতি মানুষের চেতনায় আর নাই। ঐ যে খাঁটি দৃশ্যরূপ (দর্শকের ভাব, ভাবনা, চিন্তা প্রভৃতির সর্ব প্রলেপ-মুক্ত) তাহারই দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র হইয়া আমরা তখন যে মুক্তি অনুভব করি, তাহা হইতেই পরম রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কারণ, জীবনকে যত প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে উপলব্ধি করি ততই আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়, আবার সেই প্রবুদ্ধ চৈতন্যই জীবনকে একটা লীলারূপে আস্বাদন করে। ইহাই প্রকৃত রসাস্বাদ; এই রসাস্বাদের জন্যই নাটকে জীবনকে বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া তাহাকে একটা আভিনয়িক রূপ দেওয়া হয়। তখন বাস্তব প্রয়োজন বা স্বার্থঘটিত সকল সংস্কার মুক্ত হইয়া আমরা আমাদেরই সহজ ও সুগভীর মানবতার চেতনায়—চিন্তাহীন, তর্কসংশয়হীন অকুণ্ঠিত অবাধ জীবনা-বেগকেই অনুভব করি ঃ যে-সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, পাপ-পুণ্যবোধ বাস্তবের অর্থাৎ জাগর-চেতনার কঠিন বন্ধনে আমাদিগকে এত উদ্ভ্রান্ত করিয়া থাকে, তাহারা তখন এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করে যে, মনে হয়, আমরা তাহাদের দাস নই, তাহারাই আমাদের দাস। তথাপি ইহা 'বেদান্তের স্পর্শশূন্য' নয়। ইহার আদিতেও যেমন, অন্তেও তেমনই, জীবনের অনুভূতি আছে—সেই জীবন মানবীয় জীবন;—মানুষের চরিত্র, মানুষের নিয়তিই সেই জীবনের মূল গ্রন্থি। তাই নাট্যকার যখন আমাদের সেই জীবনানুভূতিকে নাটকের সাহায্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন অপরোক্ষ করিয়া তোলেন, তখন তাঁহার মত কবি কে? মানুষের জীবনেই—তাহার দেহমন-প্রাণের বৃন্তটির উপরে সৃষ্টির শতদল পরাগ-মধুতে ভরিয়া উঠে; যে পদ্মের চারিপাশে অপর কবিগণ ভ্রমরের মত গীতিগুঞ্জন করিয়া থাকেন, সেই পদ্মই শ্রেষ্ঠ নাট্যকবির প্রতিভায় নাটকরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া মধু ও মধুপের, গীতি ও গুঞ্জনের—অচিন্ত্যভেদাভেদ একই কালে আমাদের চিত্তগোচর করে; কারণ, তখন আমরাই পদ্ম, আমরাই মধু, আমরাই আবার ভ্রমর হইয়া থাকি; অদ্বৈতের এই দ্বৈতবিলাসই শ্রেষ্ঠ কাব্যরস; একদা এই কথাটাই আমি নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে বলিতে চাহিয়াছিলাম—

মধু সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
 আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে—হ'ল বর, হ'ল বধূ।
একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আরখানি তার প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাপড়ি কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু কার মুখ!
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! সুধাপান—শুধু সুখ!
('আঁধারের লেখা'—স্বপন-পসারী

এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ, বৈষম্য ও নিষ্ফলতার উপরে মানুষের অন্তরে যে দিব্যদৃষ্টি জয়ী হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন আধুনিক ইংরাজ মনীষী বিলাতী নাটকের শ্রেষ্ঠ রসরূপ—'ট্রাজেডি' উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

Of all the arts tragedy is the proudest, the most triumphant; for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country....within its very wall the free life continues while the legions of death and pain and despair, and all the servile captains of tyrant fate afford the burghers of that dauntless city new spectacles of beauty. Happy those sacred ramparts, thrice happy the dwellers on that all-seeing eminence.

(৩)

নাটক সম্বন্ধে এই যাহা বলিলাম, ইহা নিতান্ত তত্ত্বকথার মত হইলেও অর্থাৎ নাটক-সৃষ্টি ও নাটক-উপভোগ—নাট্যকার ও দর্শক—এই দুয়ের যে সম্বন্ধ বা সহযোগ, সাক্ষাৎভাবে তাহার বিচার এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্ভব না হইলেও—আমি এই প্রসঙ্গের অবকাশে নাটকীয় তত্ত্বেরও একটু ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কারণ, ইহা হইতে নাটকের আদর্শ কি, তাহার প্রেরণা কত গভীর হইতে পারে, এবং তাহার সেই রস-প্রেরণা আমাদের চিত্তের কোন্ তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার একটু ধারণা করা সম্ভব হইবে; এবং সেই ধারণা হইতে নাটকের ন্যূনতম সাফল্য কিসের উপর কতটুকু নির্ভর করে তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে। আরও কারণ এই যে, আধুনিককালে নাটকের নানারূপ ও নানা আদর্শ দেখা দিয়াছে—কাব্যে, উপন্যাসে, চিত্রকলায় যেমন, তেমনই নাটকের রসসৃষ্টিতেও এখন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এজন্য নাটকের সংজ্ঞাও নানা প্রকার হইতে বাধ্য—নাটক নামটি সর্বনামের মত ব্যবহার করাও যেন আর চলে না। অতএব, আমি নাট্যরসের বিচারে একটা মূলতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি—যাহাতে রূপভেদ ও সংজ্ঞা-ভেদ সত্ত্বেও, সর্বত্র উৎকর্ষের আদি প্রমাণটি হারাইয়া না যায়। তত্ত্ব-আলোচনার আরও প্রয়োজন এই যে, আধুনিক মানুষের রুচি ও রসবোধ—জীবন সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে এমনই ভিন্নমুখী হইয়াছে যে, আমি নাটকের যে আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—তাহাকে অনেকেই হয়ত স্বীকার করিবেন না। তা' ছাড়া, আরও বিপদ আছে; একালের 'ইণ্টেলেক্টচুয়েল'গণ 'ডায়ালেকটিক'-বর্জিত কোন বিচারকে শ্রদ্ধা করেন না; কাব্য, নাটক, উপন্যাসের রসবিচারেও 'ডায়ালেকটিক' মান্য করা চাই—নতুবা, আদিম সংস্কার অথবা ফ্যাসি-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হইবে। তাঁহাদের মতে জড়-তত্ত্বই জগতের মূলতত্ত্ব, অধ্যাত্ম বা অধিভূত বলিয়া কিছু নাই; প্রাণ ও মন দুইই জড়তত্ত্বের অধীন; ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন কিছু নাই—বস্তুই প্রভু। এহেন দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের যে মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে নাট্যীকৃত করিলে নাটকের রূপ-রস অবশ্য বিপরীত হইতে বাধ্য। এইজন্য আমি একটা মূল তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি; তাহাতে আশা হয়, নাটকের রূপভেদ যেমনই হোক, তাহার কোন্ রূপটিতে মানবচিত্তের গভীরতম উৎকণ্ঠার তৃপ্তি-সম্ভাবনা আছে—যাহারা কেবলমাত্র মানুষ, কোনরূপ মতবাদের চিন্তা-যন্ত্র নয়, তাহারা আত্মচিত্ত-প্রমাণেই তাহা স্থির করিয়া লইবে।

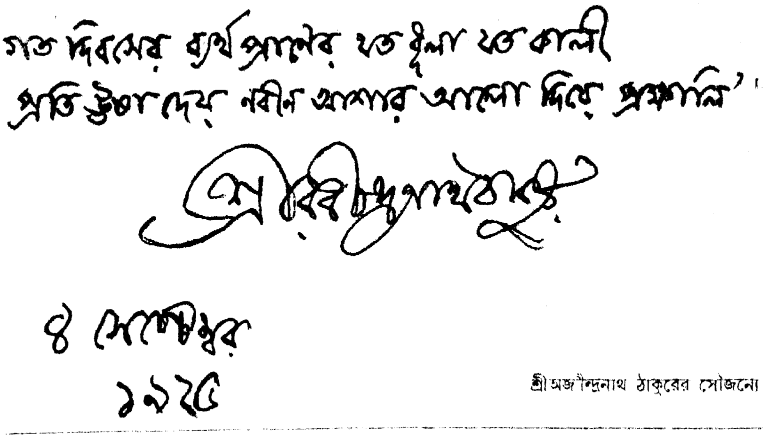
কিন্তু সে কথা এখন এই পর্যন্ত। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন ছিল—সার্থক-নাটক ভিতরে ও বাহিরে কোন্‌রূপ উপকরণের উপরে নির্ভর করে? ভিতরের কথা বলিতে গিয়া আমি তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার সকল জটিলতা ত্যাগ করিয়া শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মানুষের জীবনই হইবে নাটকের আশ্রয়-বস্তু, এবং জীবন বলিতে—মানুষের দেহমনঃ-

প্রাণের সকল আকুতি, উৎকণ্ঠা ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ কার্য-কারণ ঘটিত যে নিরন্তর উত্তেজনা ও তাহারই ঘাত প্রতিঘাতে কর্মরূপেই তাহার যে অভিব্যক্তি — তাহাই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ, সেই জীবন, যাহাতে তাহার চরিত্র ও ও সেই চরিত্রগত নিয়তিই মুখ্য। 'চরিত্র' কথাটি আমরা এক্ষণে যে অর্থে ব্যবহার করি তাহাতেও গোল আছে। খাঁটি হিন্দু দর্শনের ভাষায় 'চরিত্র'কে সেই মনোদেহ বা সূক্ষ্মশরীর বলা যাইতে পারে, যাহা জন্মান্তরীণ কর্মের দ্বারা গঠিত হইয়াছে—যাহা নিজেরই অনুরূপ একটা ভোগায়তন স্থূলদেহ ধারণ করে। এই চরিত্রই তাহার স্ব-প্রকৃতি যাহাকে সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"Character is Fate," বা

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

পাশ্চাত্য মনীষীও এই প্রকৃতিকেই মানুষের জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা বলিয়া, Reason বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার নিম্নে স্থান দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে 'চরিত্র' অর্থে শুধু এইটুকু মাত্র বুঝিলেই চলিবে যে, মানুষের সকল প্রবৃত্তির মিলিত একটি যে ব্যক্তি-সত্তা ভিতরে বিদ্যমান থাকিয়া বাহিরেও একটি অনিবার্য কর্মধারায় তাহার জীবনরূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই মানুষের চরিত্র। মানুষের এই চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্কজাত যাবতীয় বুজরুকী, তাহার আত্মগোপনের যত প্রকার সামাজিক পোষাক-পরিচ্ছদ, অথবা তাহার প্রাণশক্তিহীন মনোবিকারের যত লক্ষণ—সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। সে যাহা বলে তাহা নয়—যাহা করে তাহাই তাহার চরিত্রের পরিচয়। কারণ তাহাই তাহার সেই চারিত্রিক প্রবৃত্তি; এবং ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে—যে-চিন্তা, যে-নীতি, বা যে-মতবাদের দোহাই সে দেয়, তাহার মূলে কোন আত্মনিরপেক্ষ সত্যের উপাসনা নাই; নিজের প্রবৃত্তি অনুসারেই সে একটার পক্ষপাতী ও অপরটার বিরোধী হয়; অথবা সেই নীতি তাহার একটা মুখোস মাত্র। তাই নাটকে এইরূপ মতের মতহিসাবে কোন পৃথক মূল্য নাই; চরিত্রগত একটা লক্ষণ হিসাবেই তাহা মূল্যবান—সেও তাহার 'প্রকৃতিরই একটা 'চেষ্টা'।

অতএব নাটকের বিষয়ীভূত সেই যে জীবন, তাহার গতি-চক্রে এই চরিত্রই আবর্তিত হইয়া শিখায় ও স্ফুলিঙ্গমালায় মানুষের নিয়তিকে নিরতিশয় দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে! 'নিয়তি' অর্থে শুধুই ঘটনার শৃঙ্খল নয়; তাহারই মধ্যে যে অনিবার্য পরিণাম-মুখিতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং সর্বশেষে একটা কোনরূপ পরিণাম, অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার একটা অর্থ আমাদের চিত্তে প্রকাশ পায়—তাহাতেই মানবজীবনের অন্তরালে একটা অলক্ষ্য বা অদৃষ্ট শক্তির লীলা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। সে যে কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না; সে একটা অনুভূতি মাত্র; কিন্তু তাহাই আমাদিগকে আশ্বস্ত করে—তাই রসোদ্রেক হয়। নাটক-বিশেষের পরিণাম যেমনই হো'ক, হাস্যোদ্দীপক তুচ্ছতা বা শ্রদ্ধাজনক মহত্ত্ব, আশানুরূপ সফলতা বা হৃদয়বিদারক নিষ্ফলতা — পরিণাম যেমনই হোক, সকলের মধ্যেই সেই এক অনুভূতির বীজ বিদ্যমান—জীবনের গতি ও নিয়তির একটা রহস্য-বোধ। এই বোধটি জাগাইবার জন্যই নাটকের ঘটনাবলী একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সমান সুসম্বদ্ধ—আদ্যন্ত-যুক্ত অর্থাৎ সমাপ্তিসম্পন্ন হইবে; আরম্ভের মধ্যেই যাহার বীজ ছিল—যাহা ঘটনাপরম্পরারূপে অনিবার্যবেগে বিকাশ হইয়া চলিতেছিল, তাহার সেই বেগ, নিঃশেষ হইবার কালে, আরম্ভ ও পরিণতিকে যেন একটি মুহূর্তে মিলাইয়া এক করিয়া দিবে। এজন্য, কেবল কতকগুলি ঘটনার সমাবেশই নাটক নয়; তাহা আমাদের চিত্তে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সাড়া জাগায় মাত্র; তাহাতে জীবনের সেই অখণ্ড রহস্যের অনুভূতি নাই; তাহাতে জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিবিধানের যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না; যে-নিয়তি বা অদৃষ্ট নাটকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অদৃষ্টই থাকিয়া যায়। এই যে আদ্যন্তযুক্ত আরম্ভ-পরিণামী ঘটনার ধারা, ইহাই নাটকের ঘটনাবলীর সমষ্টিগত action; এই action-এর ছাঁচে ফেলিতে না পারিলে জীবনকে নাট্যীকৃত করা যায় না।



শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

(৪)

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারা গিয়াছে—জীবনকে কোন রূপে দেখানো নাটকেই সম্ভব, এবং দেখাইতে না পারিলে নাটক সার্থক হয় না। এই যে দেখানো—ইহারই বা অর্থ কি? যাহা দেখানো হইবে ও যে দেখিবে—দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই দুইয়ের, অর্থাৎ সাক্ষ্য ও সাক্ষীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার, তাহা যত অব্যবহিত হইবে, নাটক ততই জীবনায়িত হইয়া উঠিবে। যাহা দেখিতেছি, তাহা ভাবনা, চিন্তা নয়, তাহা একটা গতিমান বস্তু; যেন বস্তুও নয়—নিছক গতি; গতিমান বস্তুকে দূর হইতেও দেখা যায়, মনের দ্বারা তাহার একটা ধারণা করা যায়; কিন্তু যাহা গতিমাত্র—প্রাণবেগের গতি, তাহাকে দেখার অর্থ তাহার সহিত প্রাণে যুক্ত হওয়া—সেই গতিতে নিজেও যেন গতিশীল হওয়া। দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে এই যে ব্যবধানের লোপ, নাটকাভিনয়কালে ইহাই হওয়া চাই—নতুবা নাটকের নাট্যরূপ সার্থক হইবে না। নাট্যকার 'দেখাইবেন', দর্শক 'দেখিবে'—উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট সহযোগিতা রহিয়াছে। এযেন সেই—"একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিতে হবে দুইজনে।" কিন্তু তাই কি? অর্থাৎ নাটকের সেই সার্থক রসরূপের জন্য দুই পক্ষই কি সমান দায়ী? এই প্রশ্ন একটি বড় প্রশ্ন, ইহার ভালরূপ মীমাংসা আবশ্যক। পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে একটা কথা সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে কথা এই যে, নাট্যরস আস্বাদনের জন্য দর্শকের কোন বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা বা চিত্তপ্রকর্ষের প্রয়োজন নাই; তাহাতে যে বস্তুর সাড়া জাগে, তাহা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে মানুষমাত্রের অন্তঃকরণে নিহিত আছে—তাহা মানুষের স্বপ্রকৃতিগত। এজন্য নাটক কোন পণ্ডিত বা রসিক বা মার্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত দর্শকের জন্যই নয়—মানুষ-

মাত্রেরই উপভোগ্য; শুধু তাহাই নয়—পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই একত্রে একযোগে উপভোগ্য; নাটকের সেই দৃশ্যবস্তুকে দেখিবার জন্য কোন পুঁথিগত পাণ্ডিত্য অথবা বিশিষ্ট রুচি কিম্বা বিশেষ কোন ভাবুকতা-শক্তির প্রয়োজন হয় না—কোনও মতবাদ বা তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয় না। অতএব, সে পক্ষে নাট্যকার বা অভিনেতার কোন আশংকার কারণ নাই; সেই সাড়া জাগাইতে হইলে তাঁহার নিজেরই কৃতিত্ব চাই—যেখানে তাহা জাগে না, সেখানে দর্শকমণ্ডলী দায়ী নয়। কিন্তু মীমাংসা এত সহজ নয়; কারণ, দর্শকমণ্ডলীর চিত্তহরণ করিতে পারিলেই নাটক যে উৎকৃষ্ট নাটক না হইতেও পারে, তাহাও আমরা জানি; সেখানে নাট্যকার নয়, দর্শকমণ্ডলীর জীবনরসরসিকতার মাত্রাভেদ, অথবা একান্ত অভাবই তাহার কারণ। সেরূপ ক্ষেত্রে অভিনয়-সাফল্য সত্ত্বেও নাটকের উৎকর্ষ ঘটিল না; এবং যেহেতু সাক্ষাৎ রসগ্রাহিতার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে, অতএব তেমন সমাজে উৎকৃষ্ট নাটক জন্মিতে পারে না; সেজন্য নাট্যকারও দায়ী নহেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নাটকের সাফল্য যদিও নির্ভর করে শ্রোতৃমণ্ডলীর রসগ্রাহিতার উপরে, সেই রসগ্রাহিতাও নির্ভর করে সুস্থ ও প্রবল জীবনচেতনার উপরে। এই জীবনচেতনার মাত্রাভেদ আছে, জাতি ও সমাজবিশেষে ইহার প্রকৃতিভেদও আছে; যুগও অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অল্পসংখ্যক নাটকই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাটক-হিসাবে নাটকের একরূপ সাফল্য বা সার্থকতার কোন বাধা ঘটিবে না—যদি কোন-না-কোন কারণে তাহা দর্শকমণ্ডলীর সেই 'দেখা'র বস্তু হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ এখানেও সেই ষ্টাইলের কথা খাটে। নাটকের বস্তু যেমনই হোক, যদি তাহা 'দৃশ্য' হইয়া থাকে, তবে তাহা 'good style'-এর নাটক বটে—'great style'-এর উৎকৃষ্ট নাটক হয়ত নয়। এইখানেই নাটকের কাব্যগুণের প্রশ্ন উঠে; দর্শকের চিত্তে সাড়া জাগাইলেই হইবে না—তাহা না হইলে সে ত' নাটকই নয়, অর্থাৎ good styleও নয়; তাহারও উপরে যে গুণ না থাকিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট নাটক বলা যাইবে না—তাহা এই কাব্য-গুণ, অর্থাৎ জীবনের সমগ্র-গভীর মর্মান্ত অনুভূতি-উদ্রেকের গুণ। এই গুণের উপরেই নাটকের মহত্ত্ব নির্ভর করে—এই গুণেই তাহা সাহিত্যেও অমরত্ব লাভ করে।

তথাপি খাঁটি নাটক বলিতে কি বুঝিব—সে বিষয়ে কোন গোল থাকিলে চলিবে না। এতক্ষণ সে বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে খাঁটি নাটক সম্বন্ধে একটা ধারণা নিশ্চয় হইয়াছে, এবং তাহা এই যে, নাটকে জীবনকেই গতিমান রূপে দেখানো হয়—সে-রূপ 'ঘটনা'র রূপ; তাহাতে মানুষের 'চরিত্র' অর্থাৎ স্ব-স্ব সংস্কার ও কর্মপ্রবৃত্তি 'ক্রিয়মান' হইয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়া, জীবনের একটা বিশেষ অনুভূতির উদ্রেক করে। কারণ, সেখানে যাহা কিছু হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই ঘটনাত্মক; সে সকল ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও উদ্দীপনা, হর্ষের উল্লাস ও বিষাদের অবসাদ—ঘটনারই ঘাতপ্রতিঘাতমূলক; অন্তরের ধ্যান, চিন্তা বা কল্পনার বাঙ্ময় প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস নয়, বাদ-বিতর্ক নয়, বক্তৃতা বা কবিত্ব নয়। নাটকের সব কিছুই ঘটনামূলক—অর্থাৎ সেই 'ক্রিয়মান' প্রবৃত্তির তন্মুহূর্তগত অভিব্যক্তি। প্রবৃত্তির এই সাক্ষাৎ ক্রিয়মান অবস্থার বাহিরে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, ধ্যান করি বা কল্পনা করি, অর্থাৎ যাহা ভাবমাত্র,—জীবনের সেই গতির আবর্তের মধ্যে পড়িয়াই আমরা যাহা অনুভব করি না; একটু দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, যাহার কোন বিশেষ দেশ কাল নাই, অন্তরে উদ্রিক্ত হইলেও বাহিরের সহিত যাহার কোন নিয়তি-শাসিত কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই;—তাহার উপরে নাটকের প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, কেবল রসের আস্বাদনই নাটকের অভিপ্রায় নয়; সেইরূপ আস্বাদন জীবনকে বিস্মৃত হইবারই একটি উপায়; তাহাতে জীবনেরই কোন রূপ দেখিবার প্রয়োজন হয় না; হৃদয়ের কতকগুলি আবেগ ও ভাবকে (emotions) অনুভাবে (sentiments) পরিণত করিয়া বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য একটা মাধুর্যের অনুভূতি হইলেই হইল। ইহাকেই অতি সূক্ষ্ম কাব্যরস বলে—ইহা সত্যকার জীবনরসরসিকতার পরিপন্থী। নাটকেও যদি ইহার প্রাধান্য ঘটে, তবে তাহা খাঁটি নাটক নয়, তাহা কাব্যই বটে।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটক হইতে আধুনিক নাটক পর্যন্ত এই ভাবরসের উদ্দীপনাকেই মুখ্য করিয়াছে—য়ুরোপে এইরূপ নাটকের পৃথক জাতি ও পৃথক নাম নির্দিষ্ট আছে। আমাদের আধুনিক নাটকও মানব-চরিত্রের বা নিয়তি-নিয়মের গূঢ়তর রহস্যে অনুপ্রাণিত নয়। ইহাও এই দেশেরই জলবায়ুর গুণ; এখানে সকল চেতনাই যেন বাস্তববিমুখ—বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হইতেই পারে না, মধ্যপথেই ঘুরিয়া ভাবমার্গে প্রস্থান করে। যাহারা প্রকৃত বে-রসিক তাহারা যোগাসনে বসিয়া দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরাজ্ঞানের সাধনা করে; রসিক হইলে, ভক্তিমার্গের মিষ্টিক সাধনায় জীবনকে ফাঁকি দিবার উপায় করে। আমি ইহার কোনটাকেই নিন্দা করিতেছি না—বরং ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার এই স্বকীয়তাকে গভীর শ্রদ্ধাই করি। এখানে আমি এ জাতির পক্ষে নাটকসৃষ্টির যে বাধা আছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি; নাটকের নাটকত্ব বিচার করিতেছি; যাহাকে খাঁটি নাটক বলিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের জীবনে তাহার অত্যাবশ্যক উপাদান ও উপকরণের অভাবের কথা বলিতেছি।

এই যে ভাব-মাত্রের কথা আমি উত্থাপন করিয়াছি—ইহার সম্বন্ধেও যেন কোন ভুল ধারণা না ঘটে। আমি কোন ভাব বা emotionকে নাটক হইতে বহিষ্কার করিতেছি না। মূল কথা, সকলই চরিত্রের অর্থাৎ প্রকৃতি-জীবনের ঘটনাগত অভিব্যক্তি হওয়া চাই। একথা ত আমরা সকলেই মানি যে, নাটক দর্শনকালে আমরা অতি গভীর আবেগে অবশে অভিভূত হই। এই যে ভাবের আবেগ, ইহা মানসিক চিন্তাপ্রসূত নয়—ইহা জীবনচেতনার—দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনের—মন্থনজাত আবেগ; ইহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম পরিচয় লাভ করি। কিন্তু যে আবেগ সাক্ষাৎ জীবানুভূতির আবেগ নয়, যাহা ধ্যান-চিন্তা, ভাবনা-কল্পনা, অথবা কোন তত্ত্ব-বিচারের ভাবোদ্দীপনা মাত্র—বাস্তব প্রবৃত্তি বা সুখ-দুঃখের কর্মপ্রেরণার সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, বরং যাহা কর্মপ্রবৃত্তিকে স্তম্ভিত করিয়া অলস-উপভোগেই পর্যবসিত হয়, তাহার স্থান নাটকে নয়—কাব্যে। কিন্তু এই সকলই যদি সত্যকার জীবানুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠে—মানুষের চরিত্রকে তথা নিয়তিকেও আচ্ছন্ন করে, তবে ইহারাও খাঁটি নাটকেরই উপাদান; বরং সেই নাটকই উৎকৃষ্ট কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে।

আমাদের নাটকগুলির সম্বন্ধে এই শেষের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে নাটকে যে-বস্তুর অত্যধিক সদ্ভাব দেখা যায়, তাহা ঐরূপ ভাবমাত্রের উদ্দীপন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমাদের জীবন-সংস্কার বা জীবন-চেতনা খাঁটি নাটকের অনুকূল নয়। আমরা 'চরিত্র'বান নই, আমরা জীবনের সহিত খুব গভীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাধনের পক্ষপাতী নই—বাস্তবের আঘাতে আমাদের প্রবৃত্তি কঠিন হইয়া উঠে না; তার কারণ, আমরা বহুকাল হইতেই অহিফেন সেবন করিতেছি—হয়ত, হাওয়াতেও যেমন অহিফেন-বিষ আছে, তেমনই দেহের রক্তেও তাহা পূর্ব হইতেই ছিল, কিম্বা জল-মাটির গুণেই এমন হইয়াছে। আমরা মূলে বস্তুতান্ত্রিক নই—ভাবতান্ত্রিক; বস্তু আমাদের সহিত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিলেই, আমরা তাহাকে বাষ্পাকারে ভাবলোকে পাঠাইয়া সকল বিঘ্ন দূর করি; যত বড় আঘাত হউক, আমরা তাহা মনে মনে এড়াইবার উপায় করিয়াছি—বৈরাগ্য এবং ভক্তি—এই দুই-এর তত্ত্ব আমাদের একরূপ সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে; এজন্য কোন ধাক্কাই ভিতরে বেশী দূর পৌঁছিতে পারে না। আমাদের জীবন-চেতনায় 'চরিত্র'বোধ নাই—যে 'নিয়তি' সেই 'চরিত্রে'র পরিণামরূপে প্রকাশ পায়, তাহার ধারণাও নাই। অদৃষ্টরূপী 'দৈব' আছে, তাহারই মার খাইয়া মানুষ কাঁদে; এবং অতিশয় 'সাধু' 'ভালমানুষ'ও যখন

(৩০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


চাওয়া ও
পাওয়া
শ্রীঅমলা দেবী

সন্তান জাতির ভবিষ্যৎ



সন্তান-জনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য উন্নত মানুষ। মেণ্ডিলিয়ান আইন আবিষ্কারের পর জনন-শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন প্রমান করেছে যে, পিতামাতার দোষগুণ সন্তানে দেখা দেয়। মানুষের চরিত্র নির্ভর করে দুটো জিনিষের উপর: পারিপার্শ্বিক ও জন্মগত উত্তরাধিকার। জীবনের জন্যে উন্নত ব্যবস্থা করে উপস্থিত জনগণের স্বাস্থ্য ভালো করা যেতে পারে, শিক্ষার সুব্যবস্থা করে সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হবে শুধু উপস্থিত বংশের স্বাস্থ্য ভালো হলে। রক্তে যদি দোষ থাকে, তা'হলে শুধু পারিপার্শ্বিকের উন্নতি করে বিশেষ কিছু লাভ নেই। স্বাস্থ্যের অভাব শুধু বস্তিতে নয়, ধনীর ঘরেও রয়েছে। প্রত্যেক নগরবাসীর কর্তব্য হ'ল অসুস্থ, পঙ্গু, প্রাণশক্তি-হীন সন্তানের জন্ম না দেওয়া।

আপনার রক্ত পরীক্ষা করান সরাসরি ভি, ডি, ক্লিনিক্স-এ

অনুসন্ধানের জন্য:—চিঠিপত্র লিখুন—ডাইরেক্টর, হাইজিন ইন্‌ষ্টিটিউট, ১১০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ডাইরেক্টর, ভি ডি ক্লিনিক্‌স, ৮৮, কলেজ ষ্ট্রীট। ফোন করুন—বি, বি, ৫৯২১ অথবা পি, কে, ১২০। দেখা করুন। ডাইরেক্টর, মেডিকেল কলেজ হস্‌পিটাল।

বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসা করা হয়।

ANTI VENEREAL DISEASE VD DRIVE
SPONSORED BY GOVT. OF BENGAL

পুরুষদের চিকিৎসাকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ
ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল
চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল

মহিলাদের চিকিৎসাকেন্দ্র

লেডী ডাফরিণ হস্‌পিটাল
আলীপুর ভলান্‌টারী ভেনিরিয়েল হাসপাতাল

সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র সকালে ও বিকালে খোলে।

এখন আমার সরাসরি যাওয়া উচিত নয়। তবে কার্তিকবাবু যদি পরামর্শ করবার জন্যে নিজে আমাকে ডাকেন তো আমি যেতে পারি।" বিনয় কাঁচুমাচুমুখে কহিল, "বেশ! আমি তাই বলব।"

খুকী এক কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "কালও আসবেন কিন্তু।" পরেশ কহিল, "নিশ্চয়! এমন নগদ ফী পেলে আবার ডাক্তার না আসে?" বিনয় খুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ববি কি করছে রে? ডেকে দে তো। আর দেখ্, চায়ের জল কি শুধু এক কাপএর জন্যেই চড়িয়েছিলি? মানে—আমার জন্যে—মানে—" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আজ ঠাণ্ডাটা একটু বেশি পড়েছে না?" সুখদা কহিল, "আবার চা কেন? এই খেলে যে!" বিনয় কাঁচুমাচুমুখে কহিল, "তা খেলাম বটে, তবে—থাক।" খুকী কহিল, "গরম জল এখনও আছে বাবা, আমি চা ক'রে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনয় হাঁকিয়া কহিল, "আর তোর দিদিকেও ডেকে আনবি।"

কিছুক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা হস্তে ববির আবির্ভাব ঘটিল। ধীরপদে—নতমুখে বিনয়ের কাছে গিয়া তাহার হাতে পেয়ালাটা দিয়া তাহার অন্য পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ চা-পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখানে একবার এস দেখি, ওজনটা একবার নিয়ে নিই।" ববি আনতমুখে বাম পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়া মেঝেটা খুঁটিতে খুঁটিতে নিম্নকণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "কেমন ক'রে ওজন করতে হয় তুমি দেখে নাও বাবা! পরে তোমার কাছে ওজন হব।" বিনয় ববির দিকে তাকাইয়া সস্নেহে কহিল, "লজ্জা করছে? পরেশের কাছে লজ্জা কি মা! যা।" ববি আবদারের সুরে কহিল, "না বাবা!" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ওজন হবে নাকি? যাও না।" সুখদা বিনয়ের দিকে সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঐ রকমই বুদ্ধি কিনা!" তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "নিজে যাও না।" স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধের আভাস দেখিয়া বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "আমি যাব? কি বল হে পরেশ! আমিই যাই তা হ'লে।" পরেশ বিরসমুখে কহিল, "বেশ তো তাই আসুন।"

(৭)

ঘোষালপাড়া ও চক্রবর্তীপাড়ার মাঝখানে যে প'ড়ো জমিটা লইয়া দুই পাড়ার মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া মামলা-মকদ্দমা চলিয়াছিল, কার্তিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সেইখানেই। ঘোষাল ও চক্রবর্তী উভয় পক্ষই কার্তিক ডাক্তারকে এই জমিটা রীতিমত দানপত্র লিখিয়া দান করিয়াছে। কার্তিক ডাক্তারের বাড়ি এ গ্রামে নয়; দামোদরের তীরে কোন এক পল্লীগ্রামে। আর জি কর স্কুল হইতে পাস করিয়া সেইখানেই প্র্যাক্টিস শুরু করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার মাহাত্ম্যে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা জমিয়া উঠিল, রোগীর ভিড়ে ডাক্তারের নাওয়া-খাওয়ার সময় রহিল না; ডাক্তার দুই হাতে পয়সা কুড়াইতে লাগিলেন। পৈতৃক মেটে, খ'ড়ো বাড়ির জায়গায় একতলা পাকা বাড়ি উঠিল; জমি-জমা পুকুর-বাগান হইল; ডাক্তার গৃহিণীর অঙ্গে ও ক্যাসবাক্সে স্বর্ণালঙ্কার ধরিবার স্থান রহিল না; পাশাপাশি দশ বারোটা গ্রামের মধ্যে কার্তিক ডাক্তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন রহিল না। হঠাৎ দামোদরের গতি ও মতির পরিবর্তন হইল; এতদিন ধরিয়া ও-কূল ঘেঁষিয়া বহিতেছিল, ১৯১১ সালে এ-কূলের উপর অনুকূল হইয়া উঠিল। কূলবর্তী গ্রামের লোকেরা কোলাহলসহকারে প্রতিবাদ করিল এবং গ্রাম্য দেবতার দরবারে নজির ও নজরানাসহ আবেদন করিল। ফলে ১৯১২ সালে দামোদর পাঁচখানা গ্রামের পাঁচ শত বিঘা জমি উদরসাৎ করিল। শঙ্কাতুর গ্রামবাসীরা রুষ্ট দামোদরকে শান্ত করিবার জন্য পূজার ব্যবস্থা করিল এবং মেজাজ শান্ত হইলে পর বৎসর প্রচুর উপাচারসহ পূজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯১৩ সালের বন্যায় প্রায় দশখানা গ্রাম দামোদরের গর্ভে নিশ্চিহ্নভাবে অন্তর্ধান করিল। কার্তিক ডাক্তার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া এই গ্রামে পিসতুতো ভাই অনুকূল চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। গ্রামের সকলে তাহাকে আগ্রহ ও আপ্যায়ন সহকারে গ্রহণ করিল। এ গ্রামে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, অথচ ভাল ডাক্তার ছিল না। চার মাইল দূরে মনিয়াড়া গ্রামে সরকারী হাসপাতালে একজন ক্যাম্বেল স্কুলে পাস করা ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু তাহার হাকিমী মেজাজের জন্য লোকে তাহাকে পছন্দ করিত না। কাজেই সকলে কার্তিককে ধরাধরি করিয়া এই গ্রামেই বসাইয়া দিল। জমি দিল ও সেখানে সকলে চাঁদা করিয়া একটি ছোট মেটে বাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে কিছু ভূ-সম্পত্তি করিয়া দিবার ভরসা দিল। কার্তিক ডাক্তার নূতন করিয়া প্র্যাক্টিস শুরু করিলেন; কিছু টাকা ধার করিয়া অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় একটি ছোট ডিসপেন্সারি করিলেন। এখানেও নিজের কৃতিত্ব ও হাতযশ এবং গ্রামের লোকদের প্রাণপণ প্রচারকার্যের ফলে অল্পদিনেই তাহার বেশ পসার হইল। দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; ব্যবসাক্ষেত্র ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল; এবং বৎসর দুইয়ের মধ্যেই এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটি পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া রোগীদের সহিত হাসিয়া কথা বলিতে শুরু করিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কার্তিক ডাক্তারের অবস্থা প্রায় আগের মতই হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকদের তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ছোট মেটে বাড়িটি ভাঙিয়া টিনের চালওয়ালা পাকা কোঠা তুলিলেন; গ্রামের শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে জমিজমা পুকুর-বাগান কিনিলেন; ডিস্পেন্সারিটি অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানা হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন; ডিসপেন্সারির ঔষধপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইলেন; গ্রামের একজন বেকার যুবককে কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিলেন এবং "জ্বরবজ্র" নাম দিয়া একটি ম্যালেরিয়া রোগের অমোঘ অথচ অল্প-মূল্য ঔষধ বাহির করিয়া এ তল্লাটের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের অশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি অর্জন করিলেন।

পরেশ কার্তিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, সামনে টেবিলের উপর কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। কার্তিক ডাক্তারের পরিধানে লংক্লথের কামিজের উপর গলাবন্ধ গরম কোট, পাড়হীন ধুতি—কোঁচাটি পাট করিয়া পেটের উপরে গোঁজা, পায়ে অ্যালবার্ট স্লিপার, বুকের উপরে রূপার ঘড়ির চেনটি ঝুলিতেছে। কার্তিক ডাক্তারের লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বয়স পঞ্চাশের ওপরে; মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও পরিপুষ্ট গোঁফ; চুল ও দাড়ি দুইই পাকিয়া প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে; মাথার ঠিক মাঝখানে মেয়েদের সিঁথির মত তেড়ি, চোখে নিকেলের ফ্রেমওয়ালা চশমা। ডাক্তারের সামনে টেবিলের উপর স্টেথোস্কোপ, প্রেসক্রিপশান লিখিবার কাগজ, দোয়াত-কলম, একটি অতি পুরাতন ডাক্তারী জার্নাল, একটি বাংলা ডাক্তারী বই ইত্যাদি। কার্তিক ডাক্তারের পাশে চেয়ারে ঘনশ্যাম বসিয়া আছে, গায়ে ফ্লানেলের হাতকাটা ফতুয়ার উপরে পাঁশুটে রঙের গরম আলোয়ান, পায়ে তালতলার চটি। ঘরের অন্যদিকে কম্পাউণ্ডার জগদীশ চক্রবর্তী রোগীদের ঔষধ দিতে ব্যস্ত। ঔষধ তৈয়ারী করিতে হইতেছে না—আলমারির পাশে একটা প্রকাণ্ড জালায় সকাল হইতেই "জ্বরবজ্র" প্রস্তুত করা আছে। জগদীশ একটা অপরিচ্ছন্ন কলাইকরা মগ ডুবাইয়া ঔষধ বাহির করিয়া শিশি ভরিতেছে, জানালার সামনে দণ্ডায়মান খরিদ্দারের হাতে দিতেছে ও পয়সা গণিয়া লইতেছে।

পরেশকে দেখিয়া কার্তিক ডাক্তার মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "এস বাবাজী! তোমারই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। তা এত দেরি হল যে? বিনয়ের ওখানে গিছলে বুঝি?" পরেশ চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ঘনশ্যাম কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, "বিনয়ের মেয়ের অসুখ এখনও চলছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না। অসুখ সেরে গেছে। তবে টাইফয়েডের পর শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে আসতে অনেক দেরি হয় কিনা, তাই এখনও ওষুধ চলছে।" কার্তিক ডাক্তার তামাক খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তাই নাকি! তা হলে তো ভারী মুশকিল। বিনয়ের ভাগ্য ভাল—তুমি গাঁয়ে বসেছ—একেবারে বাড়ির ডাক্তার, হুঁ করতেই হাজির হও; কিন্তু তুমি না থাকলে কি হত বল দেখি?" পরেশ গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। কার্তিক ডাক্তার নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ফতুয়ার পকেট হইতে নস্যের ডিবা বাহির করিয়া একটিপ নস্য লইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "হাতে আরও রুগী আছে তো? মানে এই হল—কাজের বয়স। এক জায়গায় বসে সময় নষ্ট না করে হরদম ছুটোছুটি করতে হবে। আমাদের কার্তিক দাদা কি রকম খাটতেন চোখে দেখেছি তো! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চোখ পর্যন্ত বুজতে চাইতেন না।" পরেশ কহিল, "কাজ থাকলে ছুটোছুটি করতে পারি। কিন্তু কাজ না থাকলেও—" ঘনশ্যাম কথাটা লুফিয়া লইয়া কহিল, "ছুটোছুটি করতে হবে, আর তাতেই কাজ হবে। গয়লাবাঁধের শশী ডাক্তার সকালে বেশ করে এক পেট দুধ-চিঁড়ে খেয়ে, একটা লোকের মাথায় ডাক্তারী বাক্স চাপিয়ে, সারাদিন টো-টো করে বিশখানা গাঁ ঘুরে আসত। সেই শশী ডাক্তারের শেষে কি

পসার। বর্ধমানের কোন এক ডাক্তারের কাছ থেকে নাকি ফিভার-মিক্সচারের প্রেসক্রিপশানটি শিখে এসেছিল; তারই জোরে মরবার সময়ে রেখে গেল—মস্ত জমিদারি, বিস্তর টাকাকড়ি, রাজ অট্টালিকার মত পাকা বাড়ি। আরও কত কি।"

পরেশ মুচকি হাসিয়া ঘনশ্যামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কার্তিক ডাক্তার কথাবার্তার মোড় ঘুরাইবার জন্য কহিলেন, "তোমার সেই বড়জুড়ির কেসটার কি হ'ল?" পরেশ কহিল, "আজ সকালে একবার রেমিশান হয়েছিল। বিকালে ১০০° পর্যন্ত উঠেছে খবর পেলাম। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে উঠবে বোধ হয়।"

"কুইনিন দাও নি?"

"ম্যালেরিয়া নয় বলেই মনে হচ্ছে—পুরোপুরি প্যারা-টাইফয়েড।"

কার্তিক দুই চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না। এই যে জ্বরটুকু রয়েছে, ওটি কুইনিন না দিলে যাবে না। আজ দশ বছর ধরে এখানে প্র্যাকটিস্ করে এই আমি বুঝেছি যে, এখানে যে রোগই হোক না কেন, তার মূলে থাকে ম্যালেরিয়া। কাজেই যাই চিকিচ্ছে কর, ম্যালেরিয়ার চিকিচ্ছে না করলে রুগী সারবে না।"

পরেশ প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঘনশ্যাম কহিল, "উনি যখন বলছেন, তখন দাগ কয়েক কুইনিন খাইয়ে দিও বাবা! এ তল্লাটের লোকদের নাড়ী ওঁর হাতে বাঁধা কিনা, তাই কোথাও একটু খোঁচ-খাঁচ হ'লে উনি যতদূর বুঝবেন, তা তোমরা বুঝবে না।" কার্তিক ডাক্তার গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিলেন, পরেশ ডাক্তারী জার্নালটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিল। ঘনশ্যাম কহিল, "তা ছাড়া এতবড় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। কাজ না থাকলে, যেখানে-সেখানে বাজে গল্প না ক'রে, এখানে এসে ওঁর কাছে যদি বস, ও'র চিকিৎসা প্রণালী চোখে দেখ, ও'র কাছে দুটো উপদেশ শোন, তো আখেরে তোমার ভালই হবে। তোমরা পাসই করেছ, চিকিৎসা তো কিছুই শেখ নি।"

চাকর আসিয়া খবর দিল, "বাড়িতে ডাকছেন।" কার্তিক ডাক্তার কহিলেন, "যাচ্ছি, খবর দেগে। আর গড়গড়াটা নিয়ে যা।" চাকর গড়গড়াটি লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কার্তিক ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের উদ্দেশে কহিলেন, "সব রুগী বিদায় হ'ল হে জগদীশ?" জগদীশ টুলে বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া, হিসাব মিলাইতেছিল, মাথা না তুলিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ডাক্তার কহিলেন, "আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি হিসাব ঠিক ক'রে, দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে টাকা আর চাবি আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবে।" জগদীশ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এস বাবা পরেশ! এস হে ঘনশ্যাম।"

ডিস্পেন্সারির পিছনেই কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির সদর দরজা। ঢুকিতেই বিস্তৃত উঠান, উঠানে চার পাঁচটা ধানের মরাই। তাহাদের মাঝ দিয়া আসিয়া কতকটা আগাইলেই ডান দিকে তরিতরকারীর বাগান, বামদিকে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর, সামনে চওড়া বারান্দাবিশিষ্ট টিনের চালওয়ালা প্রকাণ্ড কোঠা ঘর। নীচে দুইটি কুঠুরী, উপরে দুইটি কুঠুরী, বারান্দার কোলে একটি পাকা তুলসীমঞ্চ, তাহাতে এক একটি সতেজ, সুপুষ্ট ও শাখা-প্রশাখা-পত্রবহুল তুলসী গাছ; বারান্দার এক পাশে একটি দড়ির খাটিয়া, তাহার উপরে একটি কালো কম্বল বিছানো; নীচের দুইটি কুঠুরীর মাঝখানে একটি দরজা, তাহা দিয়া দোতলায় যাওয়া যায়। দরজাটির এক পাশে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

বারান্দায় পা দিয়াই ডাক্তার হাঁকিলেন, "কোথায় গো?" রান্নাঘর হইতে গৃহিণীর সাড়া আসিল, "এই যে যাই।" কার্তিক ঘনশ্যাম ও পরেশকে কহিলেন, "তোমরা ব'স।" বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে খাটটাকে নির্দেশ করিলেন। ঘনশ্যাম—চটি, পরেশ—জুতা খুলিয়া খাটে বসিল। ইতিমধ্যে বারান্দায় ডাক্তার-গৃহিণীর আবির্ভাব ঘটিল—মোটাসোটা মেয়ে-মানুষ; মেটে গায়ের রঙ; মাথায় স্বল্প, অবগুণ্ঠন; হাতে একহাত সোনার চুড়ি, গলায় মোটা বিছা হার, নাকে নাকছাবি; পরিধানে আধ হাত চওড়া কালো পাড়ওয়ালা শাড়ি ও সেমিজ। কাছে আসিতেই ডাক্তার কহিলেন, "পরেশ বাবাজী এসেছেন। ঘনশ্যাম ভায়াকেও ধরে আনলাম। খেতে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।" ডাক্তার-গৃহিণী ঘোমটা একটু টানিয়া, পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি এস শিগ্‌গির, রান্না-বান্না হয়ে গেছে অনেকক্ষণ" বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার মাঝের দরজা দিয়া লণ্ঠন হাতে উপরে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার নামিয়া আসিলেন। কামিজ ও কোট খুলিয়া ফেলিয়াছেন, গায়ে শুধু একটি লংক্লথের ফতুয়া, পা খালি। রান্নাঘরের বারান্দার নীচে এক বালতি জল ছিল; সেখানে গিয়া ডাক্তার হাত পা ধুইলেন। ইতিমধ্যে চাকর একজোড়া খড়ম আনিয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল; খড়ম পায়ে দিয়া খট খট শব্দ করিতে করিতে বারান্দায় আসিয়া ডাক্তার হাঁকিলেন, "কই গো! হ'ল?" গৃহিণী জবাব দিলেন, "এস সবাইকে নিয়ে।" ডাক্তার কহিলেন, "এস বাবা পরেশ! এস হে ঘনশ্যাম।"

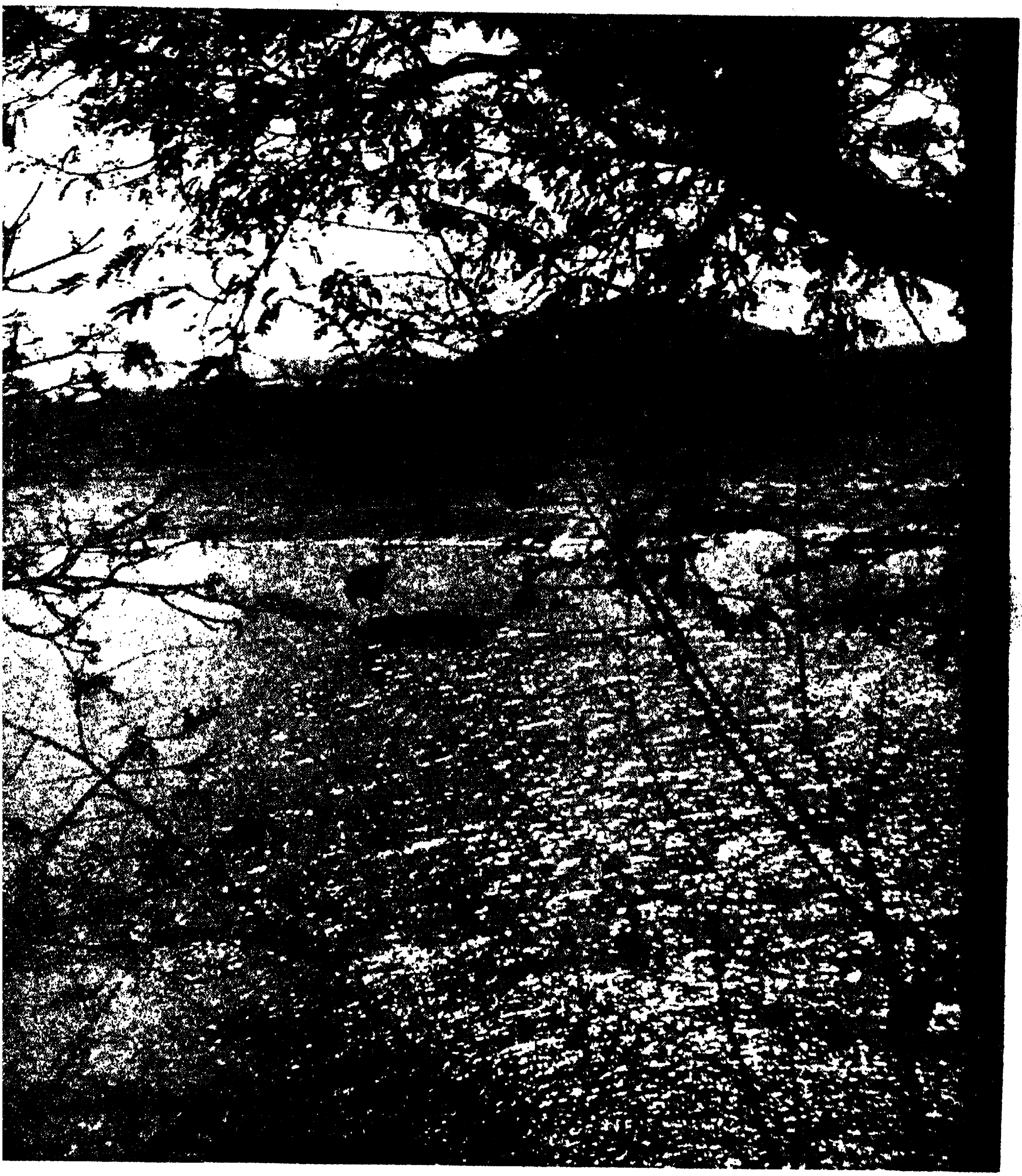
রান্নাঘরের বারান্দায় পাশাপাশি তিনটি পুরু গালিচার আসন পাতা—প্রত্যেকটির পাশে ঢাকনা দেওয়া রূপার গ্লাস। ডাক্তার একপাশের আসনে দাঁড়াইয়া পরেশকে মাঝের আসনে বসিতে আহ্বান করিলেন, ঘনশ্যামকে চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "বস হে।" পরেশ ও ঘনশ্যাম বসিতেই ডাক্তার নিজে বসিয়া হাঁকিলেন, "আন গো।" গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আদেশ দিলেন, "যা, দিয়ে আয়—একে একে।" অনতিবিলম্বে যে থালা হাতে বাহির হইয়া আসিল সে আর কেহ নহে—ডাক্তারের কনিষ্ঠা কন্যা কমলা, বয়স—পনেরো কি ষোলো, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রঙ, লম্বা ছিপছিপে গঠন, লম্বা ধরণের মুখ; চোখ, নাক, চিবুক ও অধরোষ্ঠের গঠন ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে হয়তো মুখের গঠন নিখুঁত নহে, কিন্তু সমগ্র মুখের মধ্যে এমন একটি নবপল্লবের মত পেলব ও চিক্কণ শ্রী আছে, যে একবার দেখিলে আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। কমলা বাহির হইয়া আসিতেই ঘনশ্যাম তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই যে মা কমলা স্বয়ং আজ পরিবেষণ করছেন।" পরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল; মেয়েটি লজ্জিতমুখে পরেশের দিকে চাহিতেই দুইজনে চোখো-চোখি হইল; পরেশ মুখ ফিরাইয়া লইল; কমলা মুখ নামাইয়া লইয়া কার্তিকের সামনে নত হইবার উপক্রম করিতেই কার্তিক কহিল, "এখানে নয় মা, ওখানে দে।" বলিয়া পরেশের সামনের জায়গাটি নির্দেশ করিলেন। মেয়েটির লজ্জা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; একেবারে থালার সহিত মুখ মিলাইয়া দিয়া, লজ্জা-জড়িত পদে, কম্পিত হস্তে, থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া, দ্রুতপদে রান্নাঘরে পলায়ন করিল।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে গৃহিণীর মৃদু তর্জন শোনা গেল, "যা, সব দিয়ে আয়।" কার্তিক-তনয়ার চাপা প্রতিবাদও শ্রুত হইল, "পারব না আমি, তুমি দিয়ে এস।" কার্তিক কহিলেন, "তুমিই দিয়ে যাও গো! কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে!" দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া কার্তিক গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন, এবং একে একে যথাস্থানে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "ভারী লাজুক! অথচ সব নিজে রান্না করেছে, আমাকে কিছুটি করতে দেয় নি।" ঘনশ্যাম দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "বলেন কি বউঠান! সব নিজে? মা তো তা হ'লে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেখছি!" গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "সব শিখেছে যে, আমাকেই হার মানিয়ে দেয় আজকাল। খেয়ে দেখনা কেমন হয়েছে!" ঘনশ্যাম মাংসের ঝোল মিশ্রিত এক মুঠা পোলাও মুখে তুলিয়া পরম আরামে দুই চোখ বুজিয়া কহিল, "চমৎকার! স্বয়ং জগন্নাথ দেবেরও কোনদিন এমন জোটে নি বোধ হয়। এ মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরে অগ্নিমান্দ্য কোনদিন পা দেবে না—জোর ক'রে বলতে পারি।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তো ভারী মুশকিলের কথা বললেন! আজকাল এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে রান্নার গুণে ঘরসুদ্ধ লোকের জঠরানল যদি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, তবে তো গৃহস্থকে পথে বসতে হবে।" কার্তিক-গৃহিণী এই বেফাঁস কথা বলার জন্য ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া বিরক্তিসূচক ভ্রূ-ভঙ্গী করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তেমন গৃহস্থের বাড়িতে পড়বে কেন বাবাজী! লক্ষ্মী মেয়ে লক্ষ্মীমন্ত ঘরেই পড়বে।" ভাবাকুল বদনে, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে, দুই কুৎকুতে চোখের দৃষ্টি ঘন করিয়া, কহিল, "আহা! মা আমার নামে কমলা, কাজেও কমলা। আমি ব'লে দিচ্ছি বউঠান! যে বাড়িতে এ মেয়ে যাবে, তার ঐশ্বর্য উথলে পড়বে।" কার্তিক ডাক্তার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "ওহে, বক্তৃতাই করছ যে! খাও—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!" ঘনশ্যাম দুই চক্ষের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যৎ হইতে এক মুহূর্তে নিজের থালার উপরে ফিরাইয়া আনিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বাকি বকেয়া উসুল করিতে শুরু করিল।

(৮)

পরদিন পূর্বাহ্ন—বেলা আটটা। পরেশ তাহার বৈঠকখানার দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল। বড়জুড়ির রোগিনীটির খবর লইয়া লোক আসিবার কথা আছে, তাহারই প্রতীক্ষায় বোধ হয়। সে আজ

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি—



ফোটো-শিল্পী—শ্রীনীরদ রায়

প্রায় সাত মাস এখানে আসিয়াছে, এখনও তাহার রোগীর সংখ্যা কুড়ির কোঠা অতিক্রম করে নাই। গ্রামের সকলেই কার্তিক ডাক্তারকে ডাকে। তবে রাত্রে কাহারও রোগের বৃদ্ধি হইলে তাহারই ডাক পড়ে। অবশ্য কি ধনী কি দরিদ্র, কেহই ফী দেয় না। যাহারা তাহার আত্মীয় তাহাদের কাছে সে ফী দাবী করে না, কিন্তু যাহারা অনাত্মীয়, পিতার মৃত্যুর পর হইতে যাহারা বরাবর তাহাদের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে, তাহারাও ফী চাহিলে আঁৎকাইয়া উঠে, দুই চোখ যতদূর সম্ভব চাড়াইয়া বলে, "সে কি বাবা! তোমাকে ফী দিতে হবে? আমাদের মহেশ দাদার ছেলে তুমি! ঘরের ছেলে যে বাবা!" কেহ মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, "ও কথা ব'লো না বাবা! চন্দ্র, সূর্য এখনও উঠছে, ধর্মে সইবে না। মহেশ দাদার অনেক করেছি আমি।" হঠাৎ ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহে, "কি লোক ছিলেন! তার ছেলে তুমি! আজ থাকলে কত আনন্দ করতেন।" কেহ কেহ রাগিয়া উঠিয়া কড়া গলায় শুনাইয়া দেয়, "তোমাকে আবার ফী দিতে হবে নাকি? তা' হলে তো হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকতে পারতাম।" কেহ বা শ্লেষের স্বরে কহে, "আগে চিকিচ্ছে শেখ, বাবা! তারপর ফীয়ের বায়না করবে। এই যে শেখবার সুযোগ পেয়েছ, তার জন্যে বরং কিছু দিয়ে যাও।"

গ্রামের বাহিরে দুইচারজন যাহারা তাহাকে ডাকিয়াছে, তাহারাই শুধু যথাসাধ্য ফী দিয়াছে, এবং রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর গ্রামের অধিকাংশ লোকের বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীদের মত, কার্তিক ডাক্তারকে দেখাইলে রোগী আরও সহজে ও সত্বর আরাম হইত বলিয়া বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নিন্দা করে নাই।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া পরেশ খাড়া হইয়া বসিল। লোকটা আসিতেছে বোধ হয়। টেবিলের উপর দোয়াত কলম ও কাগজ ছিল। কলমটা কালিতে ডুবাইয়া, একটা কাগজ টানিয়া লইয়া নতমস্তকে লিখিতে লাগিল। পদশব্দ স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেই পরেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—কেহ আসে নাই। কলমটা ফেলিয়া দিয়া, কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া, পরেশ পূর্ববৎ ঢিলা পোজে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—লোকটা আজ আর আসিবে না বোধ হয়। হয়, রোগী ভাল আছে, কিংবা প্রতিবেশীদের পরামর্শে রোগীর অভিভাবক কার্তিক ডাক্তারকে অথবা হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে। এখানের লোকদের ধরণই এই। একজনের বাড়িতে অসুখ হইলে গ্রামের সকলে গিয়া জড়ো হয়; কোন সাহায্য না করিলেও অযাচিত অজস্র উপদেশ দিয়া দিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। এমনকি ডাক্তারকেও চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তাহারা ইতস্তত করে না। ববির অসুখের সময়ে গ্রামের লোক বিনয় মাস্টারকে পরামর্শ দিতে কসুর করে নাই—"করছ কি! এতবড় শক্ত রোগী, ঐ আনাড়ী ডাক্তারের হাতে! এর চেয়ে কার্তিকের কম্পাউন্ডারকে ডাকলে ভাল চিকিচ্ছে হ'ত যে! কুলীন বামুনের মেয়ে ব'লেই পারছ, ছেলে হ'লে কি পারতে?" তাহাকেও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জন জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন মনে হচ্ছে?" দারুণ উৎকণ্ঠার ভঙ্গীতে বলিত, "আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। একবার কার্তিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলে হ'ত না?" বিনয় মাস্টার কাহারও পরামর্শ শুনে নাই, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছিল। ববিও তাই। ভগবানের উপরে ভক্তের, মায়ের উপরে শিশুর, রেলগাড়ির চালকের উপরে যাত্রীর অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস লইয়া সে নিজেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। কোনদিন দ্বিধা করে নাই; কোন দিন কোন কথার অবাধ্য হয় নাই; নিদারুণ রোগের যন্ত্রণাতেও কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। সারিয়া উঠিবার পরও তাই। সারাদিন বিছানায় শুইয়া বা বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া, ক্লান্ত চক্ষের করুণ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ ও চোখ পরম তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বৈঠকখানা ও অন্দরের মাঝখানের দরজা খুলিয়া একজন বিধবা মহিলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মহিলাটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—দেখিতে ফরসা ও কাহিল; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার উপরে স্বল্প অবগুণ্ঠন। পদশব্দ শুনিয়া পরেশ তাহার দিকে চাহিতেই বিধবা কহিলেন, "কিছু খাবি না?" পরেশ কহিল, "না। কাল রাতের খাওয়া এখনও হজম হয় নি।" একটা ঢেকুর তুলিয়া বিকৃতমুখে কহিল, "আজ দিনের বেলায় কিছু খাব কিনা ভাবছি।" বিধবা মৃদু হাসিয়া মিহি গলায় কহিলেন, "কি এমন খেয়েছিস কাল?" দুই চোখ বড় করিয়া পরেশ কহিল, "বিস্তর! ডাক্তার এমনই না পারুক, দিন কতক খাওয়ালেই গাঁ থেকে আমাকে পালাতে হবে।" বিধবা স্মিতমু[খে] কহিলেন, "তোর যেমন কথা! যা ভাল বুঝিস কর্।" বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

বিধবা পরেশের মাসীমা, — তাহার মায়ের ছোট বোন। সংসা[রে] তাঁহার একটিমাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিয়াছেন, জাম[াই] চাকুরী করে। কন্যার সংসারে শাশুড়ী, বিধবা ননদ বা এমনই ধরণের কে[হ] অভিভাবিকা না থাকায় জামাইয়ের অনুরোধে পুত্রটিকে লইয়া এতদিন কন্যা[র] কাছেই ছিলেন। পরেশ প্র্যাক্টিস করিবার জন্য গ্রামে আসিবার সময়ে তাঁহা[কে] জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

মাসীমা প্রস্থান করিতেই পরেশের মনে হইল, এমন করিয়া বসি[য়া] থাকিয়া লাভ নাই, একটু ঘুরিয়া আসিলেই হয়; বিনয় মাস্টার বোধ হ[য়] এখনও বৈঠকখানায় বসিয়া মেয়েদের পড়াইতেছে, ববিও হয়তো কা[ছে] বসিয়া পড়িতেছে; সেখানেই একটু আড্ডা দিয়া আসিলে মন্দ হয় না। বব[ির] কথা মনে হইতেই পরেশের দেহে ও মনে উৎসাহের জোয়ার আসিল, চেয়া[র] হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একলম্ফে দেওয়ালে টাঙানো কোটটা[র] কাছে আসিয়া, টান মারিয়া কোটটাকে হুক হইতে খুলিয়া লইয়া, গায়ে দিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ জুতা ও কাসির শব্দ শোনা গেল। পরেশ ভাবিল লোকটা আসিয়াছে বোধ হয়। অতএব এক মুহূর্তে স্থিরভাব ধারণ করিল তারপর ধীরেসুস্থে জামাটি গায়ে দিয়া, লোকটাকে ডাক্তারের সময়ে[র] মহার্ঘতা সমঝাইয়া দিবার জন্য মুখে কঠোর গাম্ভীর্যের অবতারণা করিয়[া] দরজার দিকে তাকাইতেই দেখিল—ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, "কি বাবা! কোথাও বেরোচ্ছ নাকি? কল-টল আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন।" ঘনশ্যাম মুচকি হাসিয়া কহিল, "বসতে তো বলছ, কোথায় বসি বলতে পার? আসবাবপত্র তো এখনও কিছু কর নি। বসবার ব্যবস্থা তো এই একটি ঠাণ্ডা টিনের চেয়ার, আর এই একটি ভাঙা টুল"—বলিয়া চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে চেয়ার ও টুলটি নির্দেশ করিল। পরেশ লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া কহিল, "এই চেয়ারটাতে বসুন আপনি।"—বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চেয়ারটা আগাইয়া দিল। ঘনশ্যাম দুই হাত বাড়াইয়া প্রসারিত করতল নাড়িয়া কহিল, "থাক, থাক। বসব না। সময় নেই, স্কুলের সময় হয়ে এল।"

ঘনশ্যাম কিন্তু নেহাৎ মিথ্যা কথা বলে নাই। ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশি কিছু ছিল না। ঘরের এক দিকে একটি টেবিল—তাহার এক পাশে একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার, আর এক পাশে একটি সবুজ রঙ-করা টিনের চেয়ার। কাঠের চেয়ারটিতে পরেশ স্বয়ং বসে এবং কেহ আসিলে টিনের চেয়ারটি বসিতে দেয়। ঘরের আর একদিকে আর একটি ছোট টেবিল—তাহার উপরে একটি ওজন করিবার নিক্তি, শাদা পাথরের হামাম-দিস্তা, ছুরি, মেজার গ্লাস ইত্যাদি, কতকগুলি ঔষধের শিশি ও একটি বড় বোতলে জল। টেবিলের সামনে একটি টুল। এই টুলটি কম্পাউন্ডারের বসিবার জন্য। অবশ্য পরেশের কম্পাউন্ডার রাখিবার অবস্থা এখনও হয় নাই। ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারের কাজ তাহাকে একলাই করিতে হয়।

পরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার কোন দরকার ছিল কি?" ঘনশ্যাম ঔষধের টেবিলটার দিকে তাকাইয়া কহিল, "ভেবেছিলাম একটু ওষুধ খাব—সকাল থেকে পেটটা খোঁচাচ্ছে, তা তোমার কি ওষুধপত্র কিছু আছে? টেবিলটাতে তো দেখছি মাত্র কয়েকটা শিশি।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বৈকি! বাড়ির ভিতরে আছে—আপনার ওষুধ দিচ্ছি তৈরি করে।" ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহাকে বসিবার জন্য আর অনুরোধ না করিয়া, ও-দিকের টেবিলটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে মেজারগ্লাসে ঔষধ তৈয়ারি করিয়া আনিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিয়া কহিল, "খেয়ে ফেলুন—।" ঘনশ্যাম গ্লাসটি লইয়া বারকয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, "হজমের ওষুধ দিয়েছ তো?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ঘনশ্যাম কহিল, "তবে খেয়ে ফেলি কি বল?" বলিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া ঔষধটা গিলিয়া ফেলিয়া ঔষধের ঝাঁজে চোখ-মুখ কুঁচকাইয়া কহিল, "ভারি ঝাঁজ।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "জল খাবেন নাকি?" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" জানাইতেই পরেশ টেবিল হইতে জলের বোতলটা আনিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিল। ঘনশ্যাম জল গিলিয়া কহিল, "আর একটু দাও বাবা! গ্লাসটা এঁটো হয়ে গেল, ধুয়ে দিই।" পরেশ কহিল, "থাক, আপনাকে ধুতে হবে না, দিন।"—বলিয়া গ্লাস লইয়া নিজেই ধুইয়া টেবিলে রাখিয়া দিল।

ঘনশ্যাম কহিল, "এখনই বেরোচ্ছ?" পরেশ কহিল, "না, একটু কাজ আছে,—আপনি এগোন।" ঘনশ্যাম কহিল, "খুব কি দেরি হবে? তাহ'লে

না হয় একটু অপেক্ষাই করি।" পরেশ যথাসম্ভব বিরক্তি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "না, বেশিক্ষণ দেরি হবে না। আপনি তাহ'লে দাঁড়িয়ে না থেকে চেয়ারটাতেই বসুন।" বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ কহিল, "চলুন।" ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "চল বাবা।" বারান্দার খুঁটিতে ঠেসানো সাইকেলটা হাতে লইয়া পরেশ কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?" ঘনশ্যাম ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "কোথায় আবার? বাড়ি যাব।" পরেশ কহিল, "তাহ'লে আপনি যান, আমাকে এই দিকে একটুখানি যেতে হবে।"—বলিয়া সাইকেলের মুখ ঘুরাইয়া চড়িতে উদ্যত হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, "বেশ তো! আমিও ঐ দিক দিয়েই যাব—একটু ঘোরটু হবে, তা হোক। কথা কইতে কইতে যাওয়া হবে তো।" ঘনশ্যামের ঘনায়মান ঘনিষ্ঠতায় ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, "তাহ'লে আপনার সঙ্গেই যাই—বড়জোড় যেতে হবে একবার—এদিকের কাজটা বিকালে সারব'খন।"

কতকটা দূরে গিয়া ঘনশ্যাম হঠাৎ পরেশের কাঁধে হাত দিয়া চাপ দিয়া কহিল, "দাঁড়াও একটু।" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কি হ'ল?" ঘনশ্যাম কহিল, "কিছু না, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।" ঘনশ্যামের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া পরেশ উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল। ঘনশ্যাম গলা ঝাড়িয়া কহিল, "কাল কি রকম দেখলে?" পরেশ বিস্মিত স্বরে কহিল, "কাকে?"

"কেন,—কার্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলাকে?" পরেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এ প্রশ্নের হেতু?" ঘনশ্যাম কহিল, "বলছি। আগে বল—কেমন দেখলে!" পরেশ একটু ভাবনার ভান করিয়া কহিল, "মন্দ কি!" ঘনশ্যাম মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "মন্দ নয়। বেশ! রঙটাই যা' একটু নীরেস, না হ'লে এমন মুখ-চোখ তুমি বিনয় মাস্টারের বাড়ি চ'ষে বেড়ালেও পাবে না।" বিরক্তির সহিত পরেশ কহিল, "তার মানে?" ঘনশ্যাম কহিল, "মানে—বিনয়ের বড় মেয়ের রঙটাই যা ফরসা—কমলার মত মুখ-চোখ নয়।" পরেশ কহিল, "ওঁদের কথা আপনি মিছেমিছি টানছেন কেন?" ঘনশ্যাম চোখ মটকাইয়া কহিল, "টানছি কি সাধে রে বাবা! সবাই মিলে তোমরা টানাচ্ছ যে! ঐ যে সারাদিন বিনয়ের বাড়িতে বসে আড্ডা দাও, বিনয় বা বিনয়ের স্ত্রী টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না, এর কি ভাবছ কোন উদ্দেশ্য নেই? পাড়াগাঁয়ের সমাজে বাস করে, পড়শীদের চোখের সামনে, একজন যোয়ান ছেলেকে নিজের ধাড়ি মেয়ের সঙ্গে রাতদিন লেপ্টে থাকতে শুধু শুধু কেউ দেয়?"

পরেশ তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আপনি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছেন।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যা-তা বলি নি বাবা। পাড়াগাঁয়ে অনেক দিন একটানা বাস কর নি কিনা, তাই এখানকার লোকের স্বভাব জান না। বাইরে মনে হয় বেশ সাদাসিধে, হাবাগোবা মানুষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেবারে জিলিপির প্যাঁচ। ঐ যে বিনয়, হেসে হেসে কথা কয়, সোজা লোক নাকি? বিশেষ ক'রে ওর স্ত্রীটি—একটু শহুরে গন্ধ আছে যে!" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও-কথা আমি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না—এতটুকু থেকে ওঁদের দেখে আসছি; বরাবর আমাকে ও'রা খুব স্নেহ করেন।"

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "স্নেহ! দু'খানা মণ্ডা, দু' কাপ চা খাইয়ে সবাই স্নেহ করতে পারে।" মুখের কাছে মুখ আনিয়া নাক উঁচাইয়া কহিল, "কিন্তু ও তো মুখের স্নেহ, আসল স্নেহ হ'ল ভিতরে।"—বলিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া কহিল, "বুকের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে থাকে, সহজে বোঝা যায় না। যেমন ধরো—আমার স্নেহ, কোন দিন বুঝতে পেরেছ? অথচ ভিতরে ফল্গুধারা ব'য়ে যাচ্ছে দিনরাত—রাতে শুয়েও তোমার কথা ভাবি। শুধু আমি নয়—তোমার খুড়িও।" পরেশ কহিল, "কিন্তু বিনয়কাকা আর কাকিমা মায়ের অসুখের সময়ে যা করেছিলেন, তা কোন দিন ভুলব না। তা ছাড়া মায়ের মৃত্যুর পর—"পরেশের মুখের কাছে ডানহাতটা আনিয়া ঘনঘন নাড়িয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ও কথা যেতে দাও। সব গাঁয়েই অমন দলাদলি থাকে; মানুষ মরলে সব গাঁয়েই অমন একটু চাপ দেয়; কিন্তু হাতে-পায়ে ধরলেই, সমাজের সম্মান করলেই সব মিটে যায়।"

উভয়ে চলিতে শুরু করিল এবং অচিরে বিনয়ের বৈঠকখানার সামনে আসিয়া হাজির হইল। প্রতিদিনের মত বৈঠকখানায় বসিয়া বিনয় মেয়েদের পড়াইতেছিল। ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "কি হে বিনয়বাবু, কি হচ্ছে?" বিনয় মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল—পরেশের কাছে নাকি? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ বুঝি?" বলিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশের নাম শুনিয়া বীথি মুখ তুলিয়া চাহিয়া পরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই মুখ নামাইয়া লইল। ঘনশ্যাম কহিল, "বাড়ির অসুখ নয়, নিজের পেটটা সকাল থেকে ভাল নেই! কাল কার্তিক ডাক্তারের বাড়িতে পরেশ বাবাজীর নেমন্তন্ন ছিল; ডাক্তার আমাকেও ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল। ওর বাড়ির খাওয়ার ব্যাপার জান তো, শেষকুত্তোর খরচ ট্যাঁকে গুঁজে খেতে বসতে হয়। যাকে-তাকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে না খাওয়ালে ডাক্তার-গিন্নীর তৃপ্তি হয় না, কাল তো বিশেষ ব্যাপার।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "চল, বাবা! তোমার আবার কোথায় ডাক আছে বলছিলে, মিথ্যে দেরি ক'রে লাভ নেই।" বিনয় মুচকি হাসিয়া কহিল, "আপনিও ওর সঙ্গে ডাকে চলেছেন নাকি?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাগল নাকি! স্কুল আছে না? এমনই কাকা-ভাইপো গল্প করতে করতে যাব আর কি।" বলিয়া চলিতে উদ্যত হইতেই বিনয় কহিল, "পরেশের চা খাওয়া হয়েছে?" ঘনশ্যাম মুখ ফিরাইয়া বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "না—এখনও বাকি আছে—নটা বাজছে কি না!" পরেশ বীথির দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিরুপায়মুখে কহিল, "হ্যাঁ, আচ্ছা, বসুন, আসি—" বলিয়া ঘনশ্যামের অনুগামী হইল। কিছুদূরে আসিয়া ঘনশ্যাম মুখ ভেংচাইয়া কহিল, "চা! এক কাপ ক'রে চা খাইয়েই ভাবছে মেয়েটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, মুরোদ তো কত! পঞ্চাশ টাকা মাইনে, জমি-জিরেৎ এক ছটাক নেই। তার ওপর দুটো মেয়ে।" চোখ দুইটি বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "তুমি কারও ধাপ্পায় ভুলো না বাবা! তোমার মাথার উপরে কেউ নেই। শুধু রূপ দেখলেই তোমার চলবে না; মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাবাটি দেখে তোমাকে বিয়ে করতে হবে।" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু ওঁরা তো আমার সঙ্গে বিয়ের কথা কোনদিন বলেন নি। বরং আমাকেই বীথির জন্য বর যোগাড় করতে বলেছেন।" "হেঃ হেঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ধাপ্পা! স্রেফ ধাপ্পা! বললাম যে, ওরা মুখে এক, মনে আর। মনে মনে তোমাকে গাঁথবার ইচ্ছে বরাবরই, শুধু টোপ গিলেছ কিনা দেখবার জন্যে, ঘাই মেরে দেখছে।" পরেশ কহিল, "মানে?" ঘনশ্যাম চোখ ঠারিয়া কহিল, "মানে পরে বুঝতে পারবে, বাবা! তবে সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষীর একটা কথা শোন—ওদের ফাঁদে আর পা দিও না, বড় সাংঘাতিক লোক ওরা।" পরেশ বিরসমুখে বিনা প্রতিবাদে চুপ করিয়া রহিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "মেয়ের শুধু রূপ থাকলেই হয় না, ভাগ্য থাকা চাই। কমলার কোষ্ঠিতে ভাগ্যস্থানে স্বয়ং বৃহস্পতি। না হ'লে অত বড়লোকের বাড়িতে জন্ম হয়?" দম লইয়া কহিল, "কার্তিক ডাক্তার নাকি জমি-জায়গা-টাকা-কড়ি সব ছোট মেয়েটিকেই দিয়ে যাবে।" পরেশ নীরব। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘনশ্যাম কহিল, "ও মেয়ের অবশ্য পাত্রের অভাব হবে না। 'বিয়ে দেব' বলতে না বলতে কত বড় বড় ঘর থেকে ভাল ভাল ছেলে এসে ওকে লুফে নিয়ে যাবে, তবে—" হঠাৎ থামিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া, কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কহিল, "কথাটা কি জান, ডাক্তার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোমাকে জামাই করতে। মনের মত ছেলেও বটে, তা ছাড়া মেয়েটি চোখের সামনে থাকবে, কোলের মেয়ে কিনা। ডাক্তার প্রথমে রাজী হয় নি—মস্ত বড় কুলীন কিনা—বরানগরের বাঁড়ুজ্জে—পাকা সোনাতেও খাদ আছে—ওদের কুল একেবারে নিখাদ।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "তবে গিন্নীর জিদে শেষে রাজী হয়েছে।" পরেশ গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুইজনে আবার চলিতে শুরু করিল এবং কিছুক্ষণ পরে যেখানে হাজির হইল, সেখান হইতে রাস্তাটা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা বাঁকিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে; আর একটি শাখা সোজাসুজি গিয়া সরকারী পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিয়াছে। ঘনশ্যাম থামিয়া কহিল, "এখানে বিয়ে করলে তোমার অনেক সুবিধে হবে বাবা! অতবড় একটা ডাক্তার মুরুব্বি হবে। এখন দিনান্তেও একটা রোগীর মুখ দেখতে পাচ্ছ না, কার্তিক ডাক্তার পিছনে থাকলে রোগীদের টানাটানিতে নিশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। ভেবে দেখো, যে যাই বলুক, আমরা সত্যই তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল। পরেশও সাইকেলে উঠিয়া সোজা রাস্তাটা ধরিয়া বিনা কাজেই ছুটিতে শুরু করিল।

(৯)

গ্রাম পার হইলে, দুই পাশে বিস্তৃত প্রান্তর; মাটির রঙ লাল; মাঝে মাঝে অ-গভীর খাদ; মাটি খুঁড়িয়া লইয়া গিয়া গ্রামের লোক গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দেওয়ালে লেপিয়া থাকে। ডান দিকে হরিরামপুর, নেহাৎ ছোট গ্রাম—শুধু গয়লাদের বাস। গ্রামের বাহিরে গরু ও মহিষের

পাহাড় দেখা যাইতেছে। রাস্তা ক্রমে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। একটু অগ্রসর হইলেই সামনে বেঁড়ে বন—ছোট বড় শাল ও পিয়াল গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল—গাছের কোলে কোলে হলদে ফুলওয়ালা কাঁটাগাছের ঘন সমাবেশ। পৌষ-মাঘ মাসে এই বনে এঁটেরীফুল ফোটে; গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠে; রাস্তা হইতে মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা যায়। সরস্বতী পূজার সময়ে কাছাকাছি গ্রামের ছেলেরা (অবশ্য যাহাদের মা সরস্বতীর সংগে সম্পর্ক আছে) এই বনে এঁটেরীফুল তুলিতে আসে। একদিনের জন্য নির্জন বনভূমি বালকদের তীক্ষ্ণ ও তরল কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, দিগন্তের কোলে বিরাট নীল হস্তীর মত শুশুনিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাস্তাটি সরকারী পাকা রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে জেলা শহর হইতে বাহির হইয়া, চব্বিশ পঁচিশ মাইল ধরিয়া, নানা গ্রাম, বন ও প্রান্তর পার হইয়া, উত্তর দিকে দামোদরের তীর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া পরেশ উত্তর দিকে চলিল। বাম পাশে রহিল বেঁড়ে বন। দেখিতে দেখিতে বনের সীমা পার হইল; তখন বাম দিকে রহিল—যতদূর দৃষ্টি যায় সদ্য-কর্তিত-শস্য মাঠের শ্রেণী; ডান দিকে বিস্তৃত মাঠের পারে ছোট ছোট গ্রাম। আরও কিছুদূর গেলে রাস্তা হইতে একটি ছোট কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া ডান দিকে বড়জুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। এইখানে আসিয়া পরেশ বাইক হইতে নামিল। বিনা আহ্বানে রোগীর বাড়ি যাওয়া উচিত হইবে কি? অবশ্য বলা চলে—এই দিকে কোন কাজে আসিয়াছিলাম, এমনই খবর লইতে আসিয়াছি। রোগীর প্রতি ডাক্তারের এই নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা দেখিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজন প্রশংসা করিবে কি? রোগীটি নেহাৎ বালিকা বা বৃদ্ধা হইলে কোন চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তরুণী যে! তাহা ছাড়া রোগীর অভিভাবক যদি আর কাহাকেও ডাকিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে? পরেশ বাইকের মুখটা ফিরাইয়া সোজা করিল ও বাইকে উঠিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মাইলখানেক পরে একটা পাকা পুল; রাস্তার দুই ধারে বাঁধানো মঞ্চ; পরেশ বাইকটা এক পাশের মঞ্চের গায়ে ঠেসাইয়া দিয়া, অন্য পাশের মঞ্চের উপরে বসিল।

পরেশের মনটা বিষণ্ণ। শেষ রোগীটিও বোধহয় হাতছাড়া হইয়া গেল। আশু ভবিষ্যতে আর কোন রোগী জুটিবে বলিয়া ভরসা নাই। জুটিলেও কার্তিক ডাক্তারের দালালদের কৃপায় বেশি দিন হাতে থাকিবে না। তারপর, স্রোতহীন, তরঙ্গহীন, বাহিরের বৃহৎ জীবনপ্রবাহের সঙ্গে লেশমাত্র সম্পর্কহীন, পল্লীজীবনের মধ্যে সে কর্মহীন সঙ্গীহীন দিনগুলি কেমন করিয়া কাটাইবে? যাহারা পল্লীগ্রামে আজন্ম বাস করিয়াছে, তাহারা খাইয়া, ঘুমাইয়া, দাবা-পাশা খেলিয়া, পরনিন্দা ও পরচর্চা করিয়া, একরকম করিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার মত যাহারা বাহিরের তরঙ্গোদ্বেল, কোলাহল-মুখর জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা এখানে বাঁচিবে কি লইয়া? ববির কথা মনে পড়িল। এই কমাসও তো কোন কাজ ছিল না, তবু এই সুশ্রী, শান্ত, নম্র, স্বল্পবাক্ মেয়েটির সাহচর্যে দিনগুলি যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, সে বুঝিতে পারে নাই। অবশ্য ববিকে সে একলা খুব কমদিনই পাইয়াছে। তবু সে বুঝিতে পারে, যতক্ষণ সে কাছে থাকে, যতক্ষণ কথা বলে, ববি সকলের পিছনে বসিয়া দুই চোখের দৃষ্টি একাগ্র করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, কদাচিৎ চোখোচোখি হইয়া গেলে মুখখানি নামাইয়া লয়। লূতাতন্তুর মত একটি সূক্ষ্ম, সুকুমার সূত্র ববির হৃদয়ের সহিত যেন তাহার হৃদয়কে যুক্ত করে; সেই যোগসূত্র দিয়া ববির হৃদয়-স্পন্দন তাহার হৃদয়ে বাহিত হয়, ববির মনের একান্ত কামনা তাহার মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কথা আর শেষ হইতে চাহে না; কত রকমের কথা, কত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙিন আভাস। এই গ্রামে চিরদিন এমনই অবজ্ঞাতভাবে সে পড়িয়া থাকিবে না, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষার মর্যাদা একদিন এ অঞ্চলের লোকদের দিতে হইবে। তখন কার্তিক ডাক্তার কোথায় যে কোণঠাসা হইয়া থাকিবে, তাহার পাত্তা পাওয়া যাইবে না। হাসপাতালের ডাক্তারও তাহার পরামর্শ লইবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। হয়তো ভবিষ্যতে এ গ্রাম ছাড়িয়া সে জেলা সহরে ব্যবসা শুরু করিবে; তখন সারা জেলার লোকের মুখে ডাক্তার বলিতে তাহার ছাড়া আর কাহারও নাম শুনা যাইবে না, ইত্যাদি—ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে ববির মুখ ও চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং এমনই আত্মহারা হইয়া যায় যে, চোখোচোখি হইলেও চোখ নামাইতে ভুলিয়া যায়। এই সকল বক্তৃতা যে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহারই উদ্দেশে কেমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া তাহার মনের মত হইবার জন্য তাহার কি প্রচেষ্টা? একদিন সে শিক্ষিতা মেয়েদের প্রশংসা করিয়াছিল; সেইদিন হইতে ববি লেখাপড়া শিখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং অল্প দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি করিয়াছে। ববি কি তাহাকে ভালবাসে? হয়তো তাই। না হইলে কাল, তাহার অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া সে কাঁদিয়াছিল কেন?

কিন্তু সে নিজে কি ববিকে ভালবাসে? ভাল লাগে—এ কথা সে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু ভালবাসে এ কথা বলিবে কি করিয়া? হিন্দু সমাজের ছেলে সে, বিশেষ করিয়া পাড়াগাঁয়ের ছেলে; চিরদিন মেয়েদের কাছ হইতে দূরে দূরে মানুষ হইয়াছে। কলেজে দুই-চারি জন মেয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় নাই। কাজেই ভালবাসার লক্ষণ সে জানিবে কি করিয়া? তবে যদি দেখিতে ভাল লাগা, কথা কহিতে ভাল লাগা, ভাবিতে ভাল লাগা, ভালবাসার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে হয়তো সেও ববিকে ভালবাসে।

কিন্তু, ববির সহিত বিচ্ছেদও তো আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের শকুনিদের শানিত দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে। ইহার সহিত সংযোগসূত্র বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাধা কম নহে। প্রথমতঃ সামাজিক বাধা; ববির মা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন কুলীন সন্তান ছাড়া কাহারও হাতে ববিকে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক বাধা, তাহার বর্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ববিকে বিবাহ করিয়া এই পল্লীগ্রামে বেকার জীবন যাপন করা উচিত হইবে কি? কার্তিক ডাক্তার বাঁচিয়া থাকিতে তাহার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরাস্ত করিয়া এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিন সম্ভব হইবে না। কাজেই ববিকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার আগে এখানে যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে সব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন ছোট সহরে নূতন করিয়া ব্যবসা শুরু করিতে হইবে। কিন্তু বিনয় ও তাহার স্ত্রী ববিকে কি ততদিন তাহার আশায় বসাইয়া রাখিবেন? বিনয় রাজী হইলেও তাহার স্ত্রী কিছুতেই রাজী হইবেন না।

অতএব ববির মঙ্গলের জন্যই ববির সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে হইবে। না করিলে, গ্রামের মক্ষিকাবৃন্দের মধ্যে যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হইয়াছে, তাহা ক্রমে কর্ণপটহভেদী হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হউক আর নাই হউক, ববির পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে—হয়তো তাহার সহজে বিবাহ দেওয়াই দুর্ঘট হইবে। তবু, ববির সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না, দিনান্তে তাহাকে একবার দেখিতে পাইবে না, তাহার প্রতীক্ষাব্যাকুল চোখের সঙ্গে একবার চোখ মিলাইতে পারিবে না এবং অদূরভবিষ্যতে কোন এক কুলীন-পুঙ্গব ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আসিয়া দুইটা মন্ত্র পড়িয়া জন্মের মত তাহাকে তাহার জীবন হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে—ভাবিতে তাহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল, সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠি-উঠি করিতে লাগিল, রৌদ্রের উত্তাপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, যে পাতলা কুহেলিকার আবরণ এতক্ষণ দূরের গ্রামগুলিকে দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল, শুধু উত্তর দিকে দিগন্তবর্তী তরুশ্রেণীর মাথার উপর বস্ত্রখণ্ডের মত বাঁকা কুহেলিরেখা অন্তরালবর্তী দামোদরের বঙ্কিম গতিপথকে নির্দেশ করিতে লাগিল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দূর বনরেখা, প্রসারিত মাঠ, মাঠের মধ্যে গোচারণ ভূমি, তালগাছঘেরা দীঘি, ঝোপ-ঝাপ ভরা গ্রাম, ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখিয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহাদের সহিত তাহার জীবনের যেন একটি যোগসূত্র আছে; ছাত্রজীবনে অলস মধ্যাহ্নে ও বিনিদ্র রজনীতে কল্পনার তুলি দিয়া যে বিচিত্র বর্ণের ভবিষ্যতের ছবি সে আঁকিত, ইহারা তাহার অজ্ঞাতসারে সেই ছবির পটভূমিকায় স্থান অধিকার করিত। অথচ বাস্তব জীবনে ইহাদের সহিত হয়তো তাহার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

বাইকে উঠিয়া পরেশ বাড়ির দিকে ছুটিতে শুরু করিল। রাস্তা ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে, কাজেই যতদূর সম্ভব জোরের সহিত চালাইতে হইল। রাস্তার ডান পাশে কতকগুলা শালিখ পাখী জড় হইয়া কলরব করিতেছিল। কলরবের কারণ দুইটি শালিখের কলহ; লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা পরস্পরকে নখ ও চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছিল; বাকি শালিখগুলা দুইদলে বিভক্ত হইয়া নিজের নিজের যোদ্ধাকে উৎসাহিত করিতেছিল। যুধ্যমান পাখী দুইটির সহিত নিজের ও কার্তিকের তুলনা করিয়া পরেশের ওষ্ঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এখানে জোর করিয়া থাকিতে হইলে কার্তিকের সহিত হয়তো একদিন এমনই হাতাহাতি করিতে হইবে; গ্রামের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুইজনের পিছনে দাঁড়াইয়া এমনই দূরো দিবে

ফোনঃ—ক্যাল ঃ ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ | গ্রামঃ—"এরিওপ্লাণ্টস্"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট্

লিমিটেড্

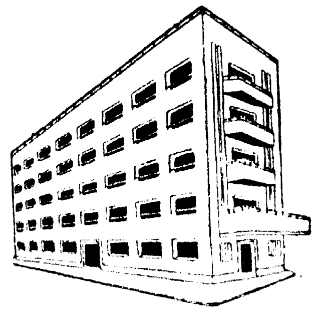
ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে

ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

শাখা ও এজেন্সী ঃ

এলাহাবাদ,
বম্বে, বেনারস,
ভাগলপুর, বাঁকুড়া,
দিল্লী, ঢাকা,

হেড অফিস



"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখা ও এজেন্সী ঃ

লক্ষ্ণৌ
মুঙ্গের, ময়মনসিংহ
পাটনা, রাঁচি।

মূলধন

অনুমোদিত	......	২৫,০০,০০০
বিক্রীত	......	১৮,০০,০০০
আদায়ীকৃত	......	১০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

*** আমরা সব রকম শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।**

*** টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।**

*** ভাল সুদে "স্থায়ী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি।**

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের **"মান্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট"** নিয়মিত পাঠ করুন।
বিনামূল্যে নমুনাসংখ্যা পাওয়া যায়।

থাকিবে। অথবা ঘনশ্যাম যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাই সেবন করিতে হইবে। ঔষধটির চেহারা মনে পড়িল—রঙ কালো হইলেও দেখিতে মন্দ নয় ; লজ্জার বাহুল্য আছে বটে, ঔৎসুক্যও কম নহে ; একটু সুযোগ পাইয়াই তাহার উপর একটি দৃষ্টিবাণ হানিয়াছিল, অবশ্য ধরা পড়িয়া লজ্জায় আরও জড়োসড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জীবন-সঙ্গিনীর প্রতিমূর্তি হিসাবে যে মানসপ্রতিমাকে সে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া রচনা করিয়াছে, তাহার সহিত রবির হয়তো কিছু মিল থাকিতে পারে, কিন্তু এই মেয়েটির কোন মিলই নাই। তবু চিকিৎসার অসাধ্য রোগী যেমন দৈবঔষধ সেবন করে, বিপন্ন ব্যক্তি যেমন সর্ব-বিপদ-নিবারণী কবচ ধারণ করে, তাহাকেও তেমনই (ঘনশ্যামের মতে) এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে হইবে। এবং বিবাহ করিলেই তাহার ভাগ্যাকাশে যে নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্তে মিলাইয়া গিয়া সাফল্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে। কার্তিকের কঠোর প্রতিরোধ স্নেহ-সরস শুভেচ্ছায় পরিণত হইবে, ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার অযোগ্যতার মিথ্যা কাহিনী প্রচার না করিয়া যোগ্যতার প্রচারক হইয়া উঠিবে এবং গ্রামের প্রতিবেশীরা যাহারা পুরুষানুক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়াছে, তাহারা রাতারাতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিবে। এবং কার্তিকের কীর্তিধ্বজা ঘাড়ে করিয়া একদা সে কার্তিকের মতই একহাতে চিকিৎসা আর একহাতে সুদী ও তেজারতী কারবার করিয়া ঐ তল্লাটে কীর্তিমান পুরুষ হইয়া উঠিবে।

চড়াইটা অতিক্রম করিতেই পরেশের চোখে পড়িল, একটা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি আসিতেছে—সামনের মুখটা কাপড় দিয়া ঢাকা। গরুর গাড়িটা পার হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, গরুর গাড়ির পিছন দিকে তাহার রোগিণীর অভিভাবক বসিয়া আছে। ব্রেক কষিয়া গাড়ি হইতে নামিতেই লোকটি লজ্জিতমুখে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং কাছে আসিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করিল। পরেশ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "কোথা গিছলেন?" লোকটি হাত কচলাইতে, কচলাইতে কহিল, "একবার কার্তিক ডাক্তারের কাছে গিছলাম।" পরেশ কঠিনমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও! আপনার মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গিছলেন বুঝি?" লোকটি বোকার মত হাসিয়া কহিল, "ঠিক বলেছেন আপনি—নিয়েই গিছলাম বটে; গাঁয়ের মুরুব্বিরা সব বললেন, একবার কার্তিক ডাক্তারকে দেখাতে।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের কি আবার জ্বরটা বেড়েছে?" লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে না, কাল আপনাকে যা ব'লে পাঠিয়েছিলাম তাই—জ্বরটা বিকেলে ১০০ হয়েছিল, রাতে আর বাড়ে নি, সকালে আবার মগ্ন হয়েছিল। তবে সবাই বললেন, এ তল্লাটের রোগ কার্তিক ডাক্তারকে না দেখালে যেতে চায় না, তাই একবার দেখিয়ে আনলাম। আপনি বরং কাল আবার যাবেন দেখে আসবেন।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার যাবার আর কি দরকার? কার্তিক ডাক্তারকে যখন দেখিয়েছেন, তখন জ্বর এবার পালাবে নিশ্চয়। আচ্ছা, আপনি আসুন।" বলিয়া বাইকে উঠিয়া দ্রুতবেগে চালাইয়া দিল।

কতকটা দূর গিয়া, পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—গরুর গাড়িটা গড়ানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! কি অন্ধ বিশ্বাস! স্বয়ং ধন্বন্তরি এলেও এদেশে প্র্যাক্টিস জমাতে পারবে না।"

বিনয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ প্রতিদিনের অভ্যাসমত ঘণ্টা বাজাইল। আজও বিনয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া খুকী পুতুল খেলিতেছিল এবং রবি পাশে বসিয়া খুকীর খুকীদের সজ্জা ও প্রসাধনে সাহায্য করিতেছিল। রবি বোধ হয় ঘণ্টার শব্দের জন্য এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিল, শব্দ শুনিতেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে খুকীকে কহিল, "পরেশদাদাকে আজ ডাকবি না?" খুকী অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না—আজ তো আমার খুকী ভাল আছে।" রবি কহিল, "কোথায় তোর খুকী ভাল আছে? ওই তো মুখ থম থম করছে, জ্বর আছে নিশ্চয়ই।" খুকী এবার উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "সত্যি জ্বর আছে? ওমা! আমি ভাবছি—ভাল হয়ে গেছে, খেলছে, দেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।" রবি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ভাল নেই। যা তুই পরেশ দাদাকে ডেকে নিয়ে আয়।" পরেশ সশব্দে গাড়ি থামাইতেই খুকী হাঁকিয়া কহিল, "পরেশদাদা!" পরেশ জবাব দিল, "এই যে।" রবি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "বাইরে যা।" খুকী কহিল, "তুমি যাওনা দিদি, দেখছ না খুকীটা বসতে চাচ্ছে না।" পরেশ কহিল, "কাউকে আসতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি"—বলিয়া অনতিবিলম্বে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রবি নতমুখে বসিয়া রহিল। খুকী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "পরেশদাদা! এসেছেন?" পরেশ কহিল, "হুঁ, এসেছিই তো! তোমার খুকী কেমন আছে বল দেখি?" রবি সন্ত্রস্তভাবে খুকীর দিকে তাকাইল। খুকী কহিল, "ভাল আছে ব'লে তো আমার মনে হচ্ছিল, দিদি বললে—এখনও জ্বর আছে—একবার দেখুন না।" পরেশ আগাইয়া আসিতেই রবি উঠিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ খুকীর পাশে উবু হইয়া বসিয়া রোগী দেখিয়া কহিল, "তোমার দিদি ঠিক বলেছে খুকী। জ্বর আছেই তো।" খুকী রবির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ দিদি। ভাগ্যে তুমি পরেশদাদাকে ডাকতে বললে!" পরেশ রবির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমিই তা হলে আমাকে ডাকতে পরামর্শ দিয়েছিলে?" রবি এতক্ষণ বিরক্তিসূচক ভ্রুভঙ্গী করিয়া খুকীর দিকে তাকাইয়াছিল, পরেশের কথা শুনিয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "আমি কেন পরামর্শ দিতে যাব?" খুকী কহিল, "তাহলে আজও ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিন।" পরেশ কহিল, "দেব—তুমি ক্ষীরের ব্যবস্থা কর, চা নয়—সরবত।"

খুকী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই পরেশ উঠিয়া, রবির সামনে দাঁড়াইয়া তাহার আনত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "রাগটা পড়েছে নিশ্চয়ই—না হ'লে কি আমার জন্যে দালালি করতে?" মুখ না তুলিয়াই রবি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "রাগও করি নি, দালালিও করি নি।" পরেশ কহিল, "রাগের কথা যাক, কিন্তু দালালি যে করেছ, তা তো আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" হাসির একটি ক্ষীণ আভা রবির ওষ্ঠাধরে ক্ষণেকের জন্য ঝিকমিক করিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, "এর জন্যে তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ, তুমি চেষ্টা না করলে এই শেষ রোগীটিও আমার হাতছাড়া হয়ে যেত।" রবি মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন, যাকে দেখে এলেন সে তো রয়েছে।" পরেশ দুই করতল চিত করিয়া সক্ষোভে কহিল, "হায়! হায়! সেও শেষ হয়ে গেছে।"

রবি সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি মারা গেছে?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "একরকম মারা যাওয়াই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।" রবি সঙ্কোচে কহিল, "সে আবার কি?" পরেশ জবাব দিল, "কার্তিকের করাল কবলে গেছে।" রবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ওঃ! তাই!" সহানুভূতির সুরে কহিল, "আপনার হাতে তো সেরে উঠেছিল, আবার হাত বদলাল কেন?" পরেশ কপালে করাঘাত করিয়া শোকাকুলতার ভঙ্গী করিয়া কহিল, "আমার অদেষ্ট।" তারপর সানুনয় কণ্ঠে কহিল, "রবি, একটা কাজ করতে পার?" রবি সোৎসুক কণ্ঠে কহিল, "কি?" পরেশ কহিল, "কোমর বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ব'লে আসতে পার—(দেবীর বরাভয়দান-ভঙ্গীতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বক্তৃতার সুরে) হে জ্বর-জর্জর গ্রামবাসিগণ! তোমরা কার্তিক ডাক্তারের 'জ্বর-বজ্র' খাইয়া নিজদিগকে জ্বরমুক্ত ভাবিতেছ—কিন্তু ভুল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তোমাদের কাহারও জ্বর ভাল হয় নাই। তোমরা পরেশ ডাক্তারের কাছে সত্বর আইস। নচেৎ জ্বরজীর্ণ হইয়া অচিরেই নির্জর লোকে প্রস্থান করিবে—"

রবি নির্বোধের মত তাকাইয়াছিল, বক্তৃতা শেষ হইতে কহিল, "সে আবার কি?"

হাত নাড়িয়া পরেশ কহিল, "প্রচার। প্রচার ছাড়া কোন কাজ জগতে হয় নি—হবে না। যদি হাতে একটা খবরের কাগজ থাকত, আর তুমি হতে তার এডিটার—" রবি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরেশ বলিতে লাগিল, "তা হ'লে দুদিনে কার্তিক ডাক্তারকে নেংটি পরিয়ে, লোটা-কম্বল ধরিয়ে দেশছাড়া করে দিতাম।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া রবি কহিল, "আচ্ছা জামাই তো আপনি! শ্বশুরকে দেশছাড়া করতে চান?" বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া পরেশ কহিল, "তার মানে?" রবি ম্লান হাসিয়া কহিল, "তার মানে আর কি! কমলার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।"

"কে বললে তোমাকে?"

"কে আবার বলবে? গাঁয়ের সবাই জানে।"

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এই দেখ—এও এক প্রচারের ফল; দশচক্রে ভগবান ভূত—"

পিছন হইতে ডাক আসিল, "এই যে বাবা পরেশ।" রবি ও পরেশ দুইজনেই তাকাইতেই দেখিল—সুখদা প্রবেশ করিতেছে—হাতে একটি কাঁসার গ্লাসে শরবত, সুখদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবির দিকে তাকাইয়া আদেশের সুরে কহিল, "খোকা একলা আছে, ঘরে যা।" রবি সলজ্জ-মুখে নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। সুখদা আগাইয়া আসিয়া পরেশের

হাতে গ্লাসটি দিয়া কহিল, "কখন এসেছ?" পরেশ কহিল, "এই মাত্র।" শরবত চুমুক দিয়া কহিল, "আপনি ঘুমোন নি আজ?" সুখদা গম্ভীর-মুখে কহিল, "না—যা শুনেছি—তারপর দিনে রাতে আমার ঘুম আর আসবে কি না, কে জানে।" পরেশ শরবতের গ্লাস হইতে মুখ তুলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "কি শুনেছেন?"

সুখদা কহিল, "তুমি শরবতটা খেয়ে নিয়ে ব'স—বলছি।" পরেশ শরবতটা ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া গিলিয়া গ্লাসটি সুখদার হাতে দিয়া খাটের উপর বসিয়া কহিল, "কি বলুন দেখি?"

সুখদা কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমাকে আমরা নিজের ছেলে ব'লেই মনে করি চিরদিন। আমাদের ছেলেমেয়েরাও তোমাকে নিজের বড়দাদার মত মনে করে।" পরেশ সায় দিয়া কহিল, "আমি তা জানি খুড়িমা!" সুখদা কহিতে লাগিল, "তুমি হামেশা আমাদের বাড়িতে আস, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব কর, আমোদ-আহ্লাদ কর; এতে আমরা কেউ কোনদিন কিছু মনে করি নি—মনে করবার কোন কারণ আছে বলেও ভাবতে পারি নি।" পরেশ গম্ভীরমুখে সুখদার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুখদা বলিতে লাগিল, "কিন্তু এই নিয়েই গাঁয়ে নানা কথা উঠেছে—আমরা নাকি তোমাকে ভুলিয়ে ববির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ববিও নাকি তোমাকে—থাক বাবা! মা হয়ে আর মুখ ফুটে বলতে পারছি না" বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মুখ লাল করিয়া সুখদা পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "কার কাছে শুনেছেন আপনি?" সুখদা ধারালো কণ্ঠে কহিল, "কার কাছে আবার? শ্রীমতী বামনী ওবেলা উনি স্কুলে যাবার পরেই এসেছিল। কখনও আসে না আমাদের বাড়িতে; বোধ হয় ঐ কথা শোনাবার জন্যেই এসেছিল।" পরেশ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি উঠছি খুড়িমা! এমনই যখন তখন আর আসব না; তবে দরকার হলে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুখদা অনুনয়ের সহিত কহিল, "আমাদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা! জান তো! পাড়াগাঁয়ের সমাজ—পান থেকে চুণটি খসলে সব হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে—ঘোঁট পাকাতে বসে।" পরেশ কহিল, "আচ্ছা—চলি আমি"—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ববিকে ওষুধটা খাওয়াচ্ছেন তো! ওটা নিয়মমত খাওয়াবেন আর ওজনও নেবেন। যদি উন্নতি না হয় তো একটা খবর দেবেন দয়া ক'রে"—বলিয়া বাহিরের দিকে চলিল। সুখদাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে কহিল, "আমাদের একেবারে ত্যাগ ক'রো না বাবা! মাঝে মাঝে খবর নিও।" পরেশ কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, "নিশ্চয়! নিশ্চয়!" সুখদা কহিল, "আর একটি কথা বাবা! তোমাকে যে চিঠি লিখতে বলেছিলাম—লিখেছ?" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি চিঠি?" তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "ওঃ!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না লিখি নি এখনও—লিখব আজ।" সুখদা কণ্ঠস্বরে খেদের খাদ মিশাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, "লিখো বাবা! জানতো ওঁকে, কোন চেষ্টা নাই। দিব্যি খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন! আমিও লিখেছি আমার বাপের বাড়িতে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো আসছে মাঘ মাসে মেয়েটাকে পার করতে পারব।" পরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা —আসি খুড়িমা!" সুখদা কহিল, "এস বাবা!" তারপর—পরেশ দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিতেই কহিল, "শুনে খুব সুখী হলাম বাবা! কমলা বেশ মেয়ে! শান্ত, শিষ্ট; রঙটাই যা একটুখানি খাটো, না হ'লে গড়ন-পিটন ভালই। তা ছাড়া অমন বাপ! ছোট মেয়েকেই নাকি সব লিখে দেবে—শ্রীমতী বলছিল।" পরেশ কিছুই জবাব না দিয়া বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

(১০)

ভাত খাইবার সময়ে ঝোলের বাটিতে প্রকাণ্ড মাছের মুড়ো এবং থালার পার্শ্বে রেকাবিতে ক্ষীর ও মিষ্টান্ন দেখিয়া পরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এসব আবার কোত্থেকে এল?" পরেশের মাসীমা পাখা হাতে সামনে বসিয়া মাছি তাড়াইতেছিলেন, মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "কার্তিক ডাক্তারের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ মনে মনে আত্মীয়তার এই আচম্বিত আক্রমণের হেতু বুঝিতে পারিল, তবু না বুঝিবার ভাণ করিয়া কহিল, "হঠাৎ এত ভালবাসা! কাল নেমন্তন্ন ক'রে পোলাও-কালিয়া খাওয়ানো, তা হজম হতে না হতেই মাছ-মিষ্টির সওগাত—ব্যাপারটা কি বল দেখি? এতদিন তো গাঁয়ের লোকের সঙ্গে জোট বেঁধে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল।" মাসীমা কহিলেন, "তোর যেমন কথা! ডাক্তার তাড়াবার চেষ্টা করবে কেন? পরের পিছনে লাগা পাড়াগাঁয়ের লোকের অভ্যাস। না হ'লে ডাক্তারগিন্নী যখনই দেখা হয়েছে, হেসে কথা বলেছে, তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছে।" গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "গিন্নীটি ভারী ভাল মানুষ; এত বড় লোকের স্ত্রী—অহংকারের নামমাত্র নেই।" "হুঁ" বলিয়া পরেশ খাইতে সুরু করিল। মনে মনে কার্তিকের কূট-কৌশলের তারিফ করিতে লাগিল। পুরোপুরি হিটলারী নীতি অবলম্বন করিয়াছে ডাক্তার—প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছে, ঘুষ খাওয়াইয়া পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে, ঘনশ্যামও খুব সম্ভব গ্রামের অন্যান্য পাণ্ডাদের সঙ্গে দল বাঁধিয়াছে, ইহার পর একদিন তড়িতাক্রমণ করিয়া তাহাকে লোপাট করিয়া দিবে বোধ হয়। মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী বামনী এসেছিল আজ।" মুখ তুলিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া পরেশ কহিল, "কখন?"

"তুই বেরিয়ে যাবার একটু পরেই। যে লোকটা মাছ-মিষ্টি নিয়ে এল, তার সঙ্গে।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "তারপর?" মাসীমা স্মিতমুখে কহিলেন, "বলছিল—ডাক্তার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোর সঙ্গে ওর ছোট মেয়েটির বিয়ে দেয়।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বুঝি শুনেবামাত্র লাফিয়ে উঠে বললে—বেশতো! যোগাড়-যন্ত্র ক'রে রাখগে—এলেই পাঠিয়ে দেব এখনই।" মাসীমা আবদারের স্বরে, কহিলেন, "তোর যেমন কথা! আমার কি ফ্যালনা ছেলে, নাকি! 'বিয়ে এখন করব না' বলছিলি তাই, না হ'লে 'হুঁ' করবামাত্র কত বড় বড় লোক দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়বে।" পরেশ দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "তাই নাকি মাসীমা! ভগবান রক্ষা করুন আমাকে—হঠাৎ যেন 'হুঁ' না ব'লে ফেলি। না হ'লে বাড়ির সামনে যত সব বড় বড় লোক—বড় বড় ভুঁড়ি নিয়ে দিবারাত্র কুস্তাকুস্তি ঠেলাঠেলি দেবে—সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।" মাসীমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "আমি তাই বলছি নাকি! তোর যেমন কথা! তবে একথা গরব ক'রে বলব—আমার ছেলের মত ছেলে এ তল্লাটে কম আছে।" বলিয়া স্নেহে ও গর্বে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করিলেন। পরেশ কহিল, "তা হ'লে তুমি শ্রীমতীকে কি জবাব দিলে?" মাসীমা কহিলেন, "আমি বললাম—ওঁদের ইচ্ছে হ'লেই তো হবে না, ছেলের ইচ্ছে অনিচ্ছে দেখতে হবে। আজকালকার ছেলে তো!" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি দর বাড়িয়েছ বল।" মাসীমা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "দর বাড়াবাড়ি আবার কি? আমার ছেলের যা আসল দাম, তা দেবার সাধ্যি এ গাঁয়ের কারও আছে নাকি?" পরেশ ভরাট মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

মাসীমা কহিলেন, "তবে গাঁয়ের লোক, মানুষের মত লোক, পিছনে দাঁড়ালে তোর অনেক সুবিধে হবে। তা ছাড়া মেয়েটিও ভাল, চোখ-মুখ-নাক চমৎকার। সেদিন ঘাটে নাইতে গিছল, দেখলাম—এক পিঠ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।"

পরেশ নতমুখে খাইতে লাগিল। মাসীমা বলিতে লাগিলেন, "এ ক'মাস তো দেখলাম—গাঁয়ের লোক কার্তিক ডাক্তারকে কি রকম খাতির করে। ও যদি তোর শ্বশুর হয়, তা হ'লে কেউ আর তোর পিছনে লাগতে সাহস করবে না।"

পরেশ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কার্তিক ডাক্তার বুঝি কুলীন নয়?" মাসীমা গালে হাত দিয়া চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, "ওমা! সে কি কথা! বাঁড়ুজ্জে কুলীন বইকি!" পরেশ কহিল, "তবে যে আমাদের মত নীচু ঘরে বিয়ে দিতে চাইছে?" মাসীমা মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা! ভাল ছেলে পেলে আজকাল এত কুল-কুলজি কেউ দেখে নাকি?" পরেশ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দেখে বইকি মাসীমা!" মাসীমা ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিলেন, "কই বাবা! আমি তো দেখি নি। আমাদের গাঁয়ের পরেশ চাটুজ্জে নৈকষ্য কুলীন—একমাত্র মেয়ের বে দিল এক ভঙ্গ কুলীনের ছেলের সঙ্গে।" পরেশ প্রশ্ন করিল, ছেলেটি বুঝি খুব ভাল?" মাসীমা মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "খুব। দারোগা! তা আমার ছেলেও কম কিসে? কলকাতায় সাহেবদের কলেজ থেকে পাসকরা ডাক্তার।" কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কহিলেন, "শ্রীমতী বলছিল—ডাক্তার-গিন্নী নাকি বলেছে—কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব। আটটা মেয়ের সাতটাকে পার ক'রে দিয়েছি; আর ছেলে-পিলে নেই যে বিয়ে দিতে দিতে হবে।" পরেশ হাস্যমুখে কহিল, "এখনও তো হতে পারে।" মাসীমা কহিলেন, "তোর যেমন কথা! এই বয়সে আবার ছেলে হয়? তা ছাড়া ঐ হাতীর মত শরীর, তোর কিছু চিন্তা নেই।" পরেশ চিন্তাকুলতার ভাণ করিয়া কহিল, "তুমি তো বলছ চিন্তা নেই; কিন্তু

কার্তিক ডাক্তার যদি আবার বিয়ে করে—কুলীন তো! বিশ্বাস নেই।"

মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা! কার্তিক ডাক্তারের সাধ্যি আছে আবার বিয়ে করবার। বাইরে তো অত বড় গণ্যি-মান্যি লোক, কিন্তু ভিতরে শুনেছি একেবারে কেঁচো—গিন্নী উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে। তা ছাড়া সব সম্পত্তি গিন্নীর নামে, টাকাকড়িও সব গিন্নীর হাতে; কি লোভে লোকে মেয়ে দেবে ঐ বুড়োকে?" পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া কহিল, "অত খবর যখন সংগ্রহ করেছ, তখন পাঁজিটা আনিয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক ক'রে ফেল। কার্তিক-কন্যাকে বিয়ে ক'রে তবে অন্য কাজ।" মাসীমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ঠাট্টা নয়, বাছা! শ্রীমতী আমাকে তোর মত জিজ্ঞাসা করতে বলেছে। মেয়ে তো নিজের চোখে দেখেছিস, মেয়ের বাপের অবস্থাও সব জানিস। এ গাঁয়ে বাস করতে হ'লে, ব্যবসা করতে হ'লে, একজন পিছনে মুরুব্বি না দাঁড়ালে তুই পেরে উঠবি না, তাও বুঝতে পেরেছিস বোধ হয়। তা হ'লে বল্ দেখি তোর ওখানে বিয়ে করা উচিত কি না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর বাছা, আমি ব'লে দিচ্ছি—আমার খুব মত আছে।"

মুখ ধুইতে ধুইতে পরেশ পরিহাসের স্বরে কহিল, "তোমার যখন মত আছে, তখন তো বিয়ে হয়েই গেছে ধর। আমি একটু ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নি, তুমি ইতিমধ্যে পাটের জোড়, টোপর আর মালাচন্দন ঠিক ক'রে রাখ; আর ডাক্তার-গিন্নীকেও খবর দাও—মেয়েকে যেন সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখে; আজ রাত্রেই তাকে বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে আসব।" কাছে আসিয়া, মাসীমার সামনে বসিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "কার্তিক ডাক্তারকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।" মাসীমা কৌতূহলের সহিত কহিলেন, "কি?" পরেশ কহিল, "সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হবে।" মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা! বনবাসী হবে কিসের দুঃখে? ঘর আলো করা উপযুক্ত জামাই হবে—বুকের বল দশগুণ বেড়ে যাবে বুড়োর; আরও দশটা হাত বার ক'রে পয়সা কুড়োবে।"

পরেশ আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "ওরে বাবা! তা হ'লেই তো হয়েছে!" সান্ত্বনা দিবার সুরে ও ভঙ্গীতে মাসীমা কহিলেন, "সে তো তোদের জন্যেই। সব দিয়ে যাবে তোদের দেখবি।" পরেশ করুণ স্বরে কহিল, "তা তো দেবে, কিন্তু আমার বেকারবৃত্তি তো কাটবে না।" মাসীমা গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "ঠাট্টা নয় বাছা! সত্যি বলছি, বড় ভাললোক ওরা। অনেক দিনের জানা ঘর। একবার বিয়ে ক'রেই দেখ—কত আদর-যত্ন করবে ওরা। অল্প বয়সে বাপ-মা গেছে।" মাসীমা কান্নার সুর ধরিয়া কহিলেন, "কোন সাধ মেটে নি তোর। বাপ-মার মতই ওরা তোর সব সাধ মেটাবে।"

পরেশ বুঝিতে পারিল, মাসীমা পুরাপুরিভাবে পঞ্চম বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "একটু ভেবে পরে তোমাকে মতামত জানাব।"

(১১)

স্কুল হইতে আসিয়া, হাত পা ধুইয়া বিনয় খাবার খাইতেছিল। রবি অদূরে ছোট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া ছিল। সুখদা রান্নাঘর হইতে আসিয়া বিনয়ের সমনে বসিয়া রবিকে কহিল, "খোকাকে আমার কোলে দিয়ে সন্ধ্যে দেখাগে যা।" রবি প্রস্থান করিতেই সুখদা কহিল, "আজ তুমি স্কুলে যাবার পরেই শ্রীমতী বামনী এসেছিল।" বিনয় ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "ও মাগী আমাদের বাড়িতে কেন? এমনই কখনও আসে না।" গম্ভীর হইয়া সুখদা কহিল, "কাজ ছিল তাই এসেছিল।"

"কি কাজ?"

"বলছিল, পরেশ রোজ আমাদের বাড়িতে আসে, গল্প করে বলে—গাঁয়ে কথা উঠেছে।" বিনয় প্রশ্ন করিল, "কি কথা?" সুখদা রাগত স্বরে কহিল, "বুঝতে পারছ না—কি কথা? বাড়িতে যদি ধাড়ি মেয়ে থাকে, আর একজন জোয়ান ছেলে দিনরাত আনাগোনা করে, তা হ'লে কি কথা উঠে? ন্যাকা!" বিনয় কড়া সুরে কহিল, "ও রকম কথা কেন উঠবে?" সুখদাও ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই ব'লে। গাঁয়ের লোকের ভাবছ চোখ নেই? বাড়াবাড়ি হ'চ্ছিল ব'লেই কথা উঠেছে।" বিনয় চড়া গলায় কহিল, "ঘরের ছেলে ঘরে আসে, তাতে বাড়াবাড়ি কিসের? ঐ মাগীরই যত বদমায়েসী—শাঁখচুন্নী মাগী!"

সুখদা ধমকের সুরে কহিল, "এত চেঁচাচ্ছ কেন? মেয়েরা শুনতে পাবে যে! ওরা কিছু জানে না।" বিনয় কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া কহিল, "ঐ মাগীই রটাচ্ছে—গাঁয়ের লোক কেউ কিছু বলে নি। কই, আমি তো কিছু শুনি নি।" সুখদা শ্লেষের সহিত উত্তর দিল, "তোমার কানের পর্দাটা একটু পুরু কিনা, তাই কানের কাছে ঢাক না পিটোলে মাথায় ঢোকে না।" বিনয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। সুখদা বলিতে লাগিল, "গাঁয়ের নানা লোক নানা কথা বলছে। আর অন্যায় তো কিছু বলে নি! অতবড় বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, তাকে বাইরের একটা ধেড়ে ছেলের সামনে বসিয়ে—" বিনয় প্রতিবাদ করিল, "বাইরের মানে? এতটুকু বেলা থেকে ঘরের ছেলের মত—" সুখদা বাধা দিয়া কহিল, "বাইরের বই কি! ওদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?" বিনয় কহিল, "সম্পর্ক করলেই পার। বলেছিলাম তো করতে—তোমার যে আবার যত বুজরুকি—" সুখদা সক্রোধে কহিল, "চুপ কর! যা তা ব'ল না বলছি। বুজরুকি! যে-সে ঘরে মেয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াব না কি? আর তোমার ছেলেমেয়ে নেই? বিয়ে-থৈতে আর দিতে হবে না তোমাকে?" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিল। সুখদা সক্ষোভে কহিল, "তা ছাড়া তুমি বললেই বুঝি ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করত!" বিনয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তা' বোধ হয় করত।" সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "না করত না। বাড়িতে ধাড়ী মেয়ে বসিয়ে রাখলে, বাইরের ছেলেরা সুবিধে পেয়ে—অমন ঘরের ছেলের মত ন্যাওটা হয়ে ঘুরঘুর করে। কিন্তু বিয়ে করতে বললেই স'রে পড়ে।" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া নিবেদন করিল, "পরেশ তেমন ছেলে নয়। এখনও বললে—ও বোধ হয় বিয়ে করবে।" বিদ্রুপের স্বরে সুখদা কহিল, "যাও না একবার জিজ্ঞাসা করতে, তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে কি না!" বিনয় সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, তা যেতে পারি, আর আজ রাত্রেই সম্বন্ধ পাকাপাকি ক'রে আসতে পারি।" সুখদা দুই ঠোঁট চাপিয়া বিনয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "কি যে মানুষ! গাঁয়ে কি কানে তুলো গুঁজে বাস কর কিছু শোন নি?" বিনয় জিজ্ঞাসুমুখে কহিল, "কি?"

"পরেশের যে সম্বন্ধ হয়ে গেছে।"

বিনয় সবিস্ময়ে কহিল—"কার সঙ্গে?"

"কার্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে, তত্ত্ব-তল্লাস যাচ্ছে—সব প্রায় ঠিক। অত পয়সা খরচ ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস ক'রে এসে কেউ পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে? তোমার মত লোকরাই তা বিশ্বেস করে।" বিনয় নীরবে চাহিয়া রহিল। সুখদা কহিল, "আজ দুপুরবেলা পরেশ এসেছিল। আমি একরকম ব'লেই দিলাম।" ত্রস্তভাবে বিনয় কহিল, "কি বললে?" চোখ দুইটা ছোট করিয়া, কপালটা কুঁচকাইয়া সুখদা কহিল, "বললাম বাবা! গাঁয়ে নানারকমের কথা উঠছে—তুমি আর হামেসা আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা ক'রো না।" গভীর লজ্জা ও পরিতাপের সহিত বিনয় কহিল, "ছিঃ ছিঃ।" ধারালো-কণ্ঠে সুখদা কহিল, "ছিঃ ছিঃ কিসের? আমার মেয়ে কি খেলনা? গরিবের মেয়ে বলে রক্ত-মাংস নেই তার শরীরে? ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প-সল্প করে, মিলে-মিশে যদি তার মন বিগড়ে যায়, তা হ'লে সামলাব কি ক'রে? আমি ঠিক কথাই বলেছি, পরে বুঝতে পারবে।" বিনয় বিহ্বল নয়নে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুখদা আদেশের স্বরে কহিল, খাওয়ার পর এখনই একবার বেরোও। ঐ ওষুধটা আর যন্ত্রটা পরেশকে দিয়ে এস। যখন-তখন আসবার আর যেন কোন ছুতো না থাকে।" বিনয় অনুযোগের স্বরে কহিল, "পাগল নাকি! ও আমি পারব না। দুদিন যাক, তারপর দিয়ে এলেই হবে।"

চোখ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুখদা কহিল, "তুমি পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম।" বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "পারব না কেন? মানে—আজ নাই বা হ'ল। গাঁয়ে বাস করতে হ'লে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তো একেবারে কাটালে চলবে না, ডাক্তার—" সুখদা কঠোরকণ্ঠে কহিল, "সম্পর্ক কাটাতে কে চাচ্ছে? গাঁয়ের ছেলে—গাঁয়ের ডাক্তার—আসবে, বৈঠকখানায় বসবে, চা খেতে চায় খাবে, আবার চ'লে যাবে। তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে বসিয়ে গল্প করতে না দিলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে না, তা নয়।"

বিনয় কহিল, "তা হ'লেও আজ দুপুরবেলায় ঐ কথার পরে, সন্ধ্যেবেলাতেই সব ফেরত দিতে গেলে কিছু মনে করবে না?"

ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া সুখদা কহিল, "মনে করবে কেন? বুঝিয়ে বলবে—মেয়ের এমনই শরীর সারবে, ওষুধ খাওবার দরকার নেই, ওজন নেবারও দরকার নেই—" বিনয় এবার বিরক্তির সহিত কহিল, "ও তো আর নিজে হতে দেয় নি—তুমিই চেয়েছিলে। এখন তাকে মিছেমিছি অপমান না করলে বুঝি—" বাধা দিয়া সুখদা কহিল, "অপমান কে

করছে?" বিনয় কহিল, "অপমান বই কি! একজন একটা জিনিস দিয়ে গেল, কি একটা শুধুই সেটা ফেরত দিলে অপমান করা হয় না?" সুখদা জবাব না দিয়া, কপাল কুঁচকাইয়া উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে চাপিয়া—কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "বেশ ওষুধ থাক, যন্ত্রটা দিয়ে এস। বলবে—ছেলেরা নষ্ট ক'রে দেবে—দামী জিনিষ দরকার হ'লে নিয়ে যাব এখন।"

(১২)

সারা বিকালটা পরেশের বড় অস্বস্তিতে কাটিল। কি করিবে—সে স্থির করিতে পারিল না। যদি 'হাঁ' বলে, কার্তিকের দল অমনই হৈ-হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কার্তিক-কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর, আর নড়িবার-চড়িবার উপায় থাকিবে না, কোন দিকে তাকাইবার উপায় থাকিবে না, বাড়ি হইতে কার্তিকের অন্দর-মহল পর্যন্ত বাঁধা-সড়ক ছাড়া কোথাও হাঁটা চলিবে না এবং মেয়ে যদি মায়ের মত পরাক্রমশালিনী হইয়া উঠে তো আমরণ কার্তিক-কন্যাগত প্রাণ হইয়া কাটাইতে হইবে। যদি 'না' বলে, তাহা হইলে এই গ্রাম হইতে বিদায় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। তাহা ছাড়া ববি। তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে চুকাইয়া দিতে হৃদয় অত্যন্ত নারাজ বলিয়া মনে হইতেছে। নেশার মত ববি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। একদিন দেখা না হইলে, কথা না বলিলে, মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। কোন কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, নেশাখোরের মত সারা অন্তর যেন ক্রমাগত গা-মোড়া ভাঙিতে ও হাই তুলিতে থাকে। তাহা ছাড়া ববির দিকটাও চিন্তা করিবার আছে। মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌দের মাপকাঠি অনুসারে ববির মানসিক অবস্থাটিকে ঠিক 'ভালবাসা' না বলা গেলেও, সে যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহাকে দেখিতে চায়, তাহার কথা শুনিতে চায়, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখে আনন্দের অরুণাভা ফুটিয়া উঠে। আজও তাহারই প্ররোচনায় খুকী তাহাকে ডাকিয়াছিল এবং ঘরে ঢুকিবামাত্র খুকীর অলক্ষিতে বিদ্যুৎ-চমকের মত সে একটি কটাক্ষ হানিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে নিজের যে দুর্নাম রটিয়াছে, হয়তো সে এখনও জানে না; জানিলে নিশ্চয় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত না। তবে তাহার সহিত কার্তিক-তনয়ার যে বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, সে শুনিয়াছে। ইহাতে তাহার মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা তাহার মলিন বিষণ্ণ মুখের ম্লান হাসিটুকুতে হয়তো ধরা পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে, শিক্ষার জৌলুস তাহার নাই, আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকাদের মত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিতে শিখে নাই; তাহার যে একটি পৃথক্ মন আছে, ইচ্ছা আছে, রুচি আছে, সে কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার মত হৃদয়ের শক্তি অর্জন করে নাই। কাজেই, যাহারই সহিত বিবাহ-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হউক বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে, আমরণ তাহারই পাছু পাছু চলিবে। তাহার অন্তরের মধ্যে অহরহঃ যে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিবে, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস তাহার আচার ও আচরণে, বাক্যে ও ব্যবহারে কোন দিন প্রকাশ পাইবে না। হয়তো ভাবীজীবনে স্বামী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসারে অপর্যাপ্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে স্বল্প অবসরে, কোন কোন দিন কৈশোরের এই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, হয়তো বা মুহূর্তের জন্য ক্ষীণ বিদ্যুৎ-চমকের মত ম্লানহাসি তাহার অধরোষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া যাইবে। আর সে নিজে? নিজের হৃদয়ের অবস্থা সে বুঝিতে পারিতেছে না। নারীসঙ্গের ক্ষুধা তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা যে শুধু ববিকে পাইলেই শান্ত হইবে, আর কাহাকেও পাইলে হইবে না, এতখানি সাংঘাতিক অবস্থা তাহার অদ্যাবধি হয় নাই। তবে ববিকে তাহার ভাল লাগে; ভাল লাগে তাহার সুকুমার তারুণ্য, ভাল লাগে তাহার শুভ্র কোমল দেহলাবণ্য, ভাল লাগে তাহার নম্র সরল সুন্দর ব্যবহার, ভাল লাগে তাহার নির্বিচার নির্ভরতা। যাহাকে সে বিবাহ করুক, ববিকে সে কোন দিন ভুলিবে না। আজ যদি ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি কার্পণ্য না করিতেন, ববিকে বিবাহ করিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। সামাজিক বাধা কার্তিক যদি অতিক্রম করিতে পারে, বিনয়ের পক্ষেও তাহা দুরতিক্রম্য হইত না। বিনয়ের স্ত্রী হয়তো স্ত্রী-সুলভ নির্বুদ্ধিতা ও গোঁড়ামির জন্য এবং মিথ্যা সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে প্রতিরোধ করিত, কিন্তু বিনয় রাজি হইলে এবং তালিম দিয়া তাহার মন ও মতকে একটুখানি শক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে সে প্রতিরোধও দূর হইত। কিন্তু ভাগ্য কি কোন দিন প্রসন্ন হইবে না? ইহার মধ্যেই এত নিরাশ হইবার সময় আসে নাই। পড়ার খরচ চালাইয়াও তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন ছোট শহরে ছোট ডিসপেন্সারি করিয়া নূতন করিয়া ব্যবসা শুরু করিবার মত মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে। তাহার উপরে ববি যদি গৃহলক্ষ্মীরূপে তাহার সুন্দর মুখের অম্লান হাসি, সুকোমল হস্তের সেবা এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মঙ্গলকামনা লইয়া তাহার পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে অচিরে হয়তো সে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতাও অর্জন করিতে পারিবে।

পরেশ শুইয়া ছিল, উৎসাহে উঠিয়া বসিল। স্থির করিল, মাসীমাকে কোন কথা দিবার পূর্বে সে আজই সন্ধ্যার পর একবার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিবে। লজ্জা ও সংকোচ বিসর্জন দিয়া সে স্পষ্টভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ববিকে তাহার হাতে দিতে তাহার মত আছে কি না। তাহার মত যদি হয়, তাহা হইলে সে বুঝাইয়া শুঝাইয়া বিনয়ের স্ত্রীকে রাজি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহা না পারিলে, বিনয়ের মত লইয়া সে যে কোন উপায়ে ববিকে বিবাহ করিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পরেশ বেড়াইতে বাহির হইল। সকালে যে দিকে গিয়াছিল, তাহার উল্টা দিকে চলিল। ব্রাহ্মণপাড়া পার হইয়া, তালপুকুরের পাশ দিয়া গাঙ্গুলীদের আমবাগানের ধারে গিয়া পৌঁছিল। বাগানের মধ্য দিয়া একটা পায়ে-চলা পথ। বাগানের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত গিয়া বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। পরেশ রাস্তা হইতে নামিয়া সেই পথ দিয়া বাগান পার হইল। তারপর মাঠের আইল ধরিয়া সামনের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়া ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল। কতকটা অগ্রসর হইতেই বামপাশে পড়িল একটা ছোট পুকুর—পাড় অত্যন্ত নীচু; চারিদিকের পাড়, জলের কিনারা পর্যন্ত চোরকাঁটার গাছে ভর্তি, লম্বা লম্বা ঘাস ও পানফলের পাতায় সমস্ত জল ঢাকিয়া গিয়াছে, শুধু মাঝখানে এক টুকরা কালো জল চক্‌চক্ করিতেছে। পুকুরের একটা কোণে মাঠ হইতে কিনারা পর্যন্ত চওড়া ও গভীর নালা কাটা; বর্ষার পর জলের অভাব হইলে ঐখানে দুনী বসাইয়া ক্ষেতের শস্যরক্ষার ব্যবস্থা হয়। পুকুরটার পাশ দিয়া আরও কতকটা আগাইয়া আবার ডানদিকে মুখ ফিরাইতেই গ্রামের স্কুল চোখে পড়িল। এই স্কুলটির অবস্থা আগে ভাল ছিল না। দুইখানা লম্বা টিনের চালওয়ালা ঘরে স্কুল বসিত; বিদেশী ছেলেদের থাকিবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন; তিনি স্কুলের পরিচালনা অপেক্ষা ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনায় এবং নিজের সংসার ও বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানে বেশি অবহিত ছিলেন। কাজেই, তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে স্কুলটি অচিরে আশ্রমে পরিণত হইল। আশ্রম-বালকগুলির অধিকাংশই সকাল সকাল ভাত খাইয়া আসিয়া, দশটা হইতে চারিটা পর্যন্ত স্কুলগৃহের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না থাকিয়া, চারিদিকের উন্মুক্ত মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া স্বয়ং প্রকৃতিদেবীর পর্যবেক্ষণাধীনে জ্ঞানলাভ করিত; মাস্টারগুলিও নিজ নিজ ছাত্র-বিরল ক্লাশরুমে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া স্বল্পাবশেষ গোপাল-মার্কা সুবোধ ছেলেগুলিকে মনে মনে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে আদেশ দিয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেন। একবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে পরাজিত হইয়া হেডমাস্টার মহাশয় দুঃখে হার্টফেল করিলেন। হেডমাস্টারের জন্য 'খোঁজ-খোঁজ' রব পড়িয়া গেল; এ তল্লাটের যতগুলি বেকার গ্র্যাজুয়েট নিজ নিজ গুণাবলীর ব্যাখ্যান করিয়া দরখাস্ত পাঠাইল, স্কুলের সেক্রেটারি পরাণ গাঙ্গুলীর বাড়িতে হাঁটাহাঁটি শুরু করিল, নিজ নিজ গৃহের প্রস্তুত ঘৃতের ভাণ্ড ও নিজ নিজ পুষ্করিণীতে সযত্নপালিত বৃহৎ রোহিত মৎস্য সহযোগে স্কুলের প্রেসিডেন্ট এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু কাহারও কিছুই হইল না। এস ডি ও সাহেব নিজের একজন বেকার ভাইকে আনিয়া হেডমাস্টারের তখ্‌তে বসাইয়া দিলেন। এ তল্লাটের সকলে মনে মনে গর্জাইতে লাগিল; কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটি করিল না। নূতন হেডমাস্টারটি বয়সে যুবক, দেখিতে সুশ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী। তাহা ছাড়া কলিকাতা অঞ্চলের লোক, কাজেই কথায়-বার্তায় অত্যন্ত ভদ্রলোক। ফলে, বৎসরখানেকের মধ্যেই সকলের মনোহরণ করিলেন। তাহা ছাড়া, হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকার জন্য তাঁহাদের সাহায্যে সরকার ও স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোকদের কাছ হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, একটি বৃহৎ একতলা স্কুলগৃহ নির্মিত হইল; বিদেশী ছাত্রদের জন্য টিনের চালওয়ালা প্রাক্তন ঘর দুইটি বোর্ডিং-গৃহে পরিণত হইল; ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থসাহায্যে স্কুলের সামনে একটি ছোট পুকুর ভরাট করিয়া ছাত্রদের খেলার মাঠ প্রস্তুত হইল, অর্থাৎ আশ্রমটি আবার স্কুলে পরিণত হইল। হেডমাস্টার মহাশয়ের সতর্ক ও কঠোর তত্ত্বাবধানে ছাত্রগুলিকে স্কুলঘরের বদ্ধবাতাসে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইতে লাগিল এবং মাস্টারগুলিকে দিবানিদ্রা বিসর্জন দিয়া খাড়া চেয়ারে বসিয়া অধ্যাপনা করিতে হইতে লাগিল।


DELICIOUS
Lily
BISCUITS
NICE
DIGESTIVE
SCHOOL
THE LILY BISCUIT Co
CALCUTTA
লিলি বিস্কুট
স্বাদে ও গুণে অপরাজেয়
তাজা, মুচমুচে, নোনতা
নবনীত, লোভনীয়
লিলি ব্রাণ্ড বার্লি
ভারতের শ্রেষ্ঠ পথ্য ও পানীয়
শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করিতে
অতুলনীয়
LILY BISCUIT Co
CALCUTTA
BOMBAY
MANUFACTURERS OF THE FAMOUS "LILY BRAND" BARLEY

স্কুলের কাছাকাছি আসিতেই পরেশ দেখিতে পাইল, খেলার মাঠে ছেলেরা খেলা করিতেছে ও জনকয়েক শিক্ষক খেলা দেখিতেছে। এই শিক্ষকদের সহিত পরেশের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বিদেশী লোক, বোর্ডিঙে থাকে। পরেশ আবার ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল এবং বোর্ডিঙের পিছন দিয়া কতকটা গিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমেই আগুরীপাড়া; রাস্তার দুই ধারে সারি সারি উঁচু দাওয়াওয়ালা খড়ের ঘর। পূর্বে আগুরীদের প্রায় প্রত্যেকেই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কূট বৈষয়িক বুদ্ধির সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছে। পাড়ার মধ্যে শুধু যুগল আগুরী কাহারও কাছে হার স্বীকার করে নাই; যতদিন বাঁচিয়া ছিল আঘাতের বদলে আঘাত করিয়া, প্যাঁচের বদলে প্যাঁচ কষিয়া, বিপক্ষ দলকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যুগলকাকাকে পরেশের মনে পড়িল; লম্বা-চওড়া দেহ, শক্তিমান, তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ। যুগলকাকা পিছনে না থাকিলে বাবার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের শুভাকাঙ্ক্ষার ধাক্কা সামলাইয়া তাহারা গ্রামে বাস করিতে পারিত না।

একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। পরেশকে দেখিয়া হুঁকোটা মুখ হইতে সরাইয়া দুই হাতে হুঁকার ডাবাটি ধরিয়া, নলচেটি মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, "পেন্নাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গেছলেন।" পরেশ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "এই দিকে একটু—" লোকটা প্রশ্ন করিল, "হেঁটে যে?" পরেশ চলিতে চলিতে জবাব দিল, "হ্যাঁ।" কতকগুলি মেয়ে কলস কাঁখে করিয়া জল আনিতেছিল—পরেশকে দেখিয়া, ঘোমটা টানিয়া সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল এবং সে পার হইয়া যাইতেই তাহাদের মধ্যে সহাস্য গুঞ্জন শোনা গেল। আরও কতকটা যাইয়া, ডানদিকে ফিরিয়া, ছোট গলি রাস্তা দিয়া গিয়া আর একটি রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় কতকটা যাইতেই শ্রীমতীর সহিত দেখা হইল; নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা দেখাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়াই আপ্যায়ন সহকারে কহিল, "এই যে ভাই! কোথায় গিছলে?" পরেশ হাসিয়া জবাব দিল, "এমনই একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

শ্রীমতীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ফরসা রঙ; এককালে যে চেহারা ভালই ছিল, বার্ধক্যের ধ্বংসস্তূপ দেখিয়াও তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায়। শ্রীমতী কুলীনের কন্যা; রূপ ও যৌবনের দড়াদড়ি দিয়াও স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। বিবাহের পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বামী আর একটি কুলীন-কন্যার স্বামিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীমতী তারপর আর স্বামীর ঘর করে নাই। বাপের একমাত্র কন্যা; জমি-জায়গা কিছু ছিল। কাজেই মা-বাবার মৃত্যুর পর, সাজা-খাজনা আদায় করিয়া, চরকায় সুতো কাটিয়া পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়া, তাহার একটি পেট অনায়াসে চালাইয়া দিত। স্বামী একবার আসিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে গালাগালি দিয়া, চেলাকাঠ হাতে তাড়া করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আর শ্রীমতীর জীবনে স্বামী-সম্ভাষণ ঘটে নাই। স্বামীর প্রতি নিষ্করুণা হইলেও শোনা যায়, শ্রীমতীর হৃদয়ে করুণা ছিল এবং তাহা সমসাময়িক দুই-চারিজন যুবকের (যাহারা এখন বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়া তিলক-ফোঁটা কাটিয়া ধর্মধ্বজী বনিয়াছে) প্রতি বিনামূল্যেই বিতরিত হইত।

শ্রীমতী কোঁচ-পড়া মুখে আরও কতকগুলো কোঁচ পড়াইয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "কারও সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি?"

পরেশ বক্তব্য না বুঝিয়া বোকার মত হাসিল। শ্রীমতী কহিল, "আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি কিন্তু।" পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কার সঙ্গে?" শ্রীমতী কহিল, "যার একটিবার দেখা পাবার জন্যে বেরিয়েছ, তার সঙ্গে—আমাদের কমলার সঙ্গে।" পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "থাক, দরকার নেই দিদিমা।" শ্রীমতী কহিল, "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন হে? মুখে বলছ না; কিন্তু তোমার ঠোঁটের হাসি আর চোখের চাহনি বলছে—হ্যাঁ।" হাসিয়া কহিল, "শ্রীরাধার সঙ্গে নাই বা দেখা করলে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেতে দোষ আছে নাকি?" পরেশ কহিল, "আমার একটু কাজ আছে দিদিমা, চলি।" শ্রীমতী অধরোষ্ঠসহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া কহিল, "কাজ! একদিন সব কাজ ছেড়ে এই দিদিমার ভাঙা ঘরে পড়ে থাকবে, আমি বামুনের মেয়ে হয়ে ভরসন্ধ্যায় ব'লে দিচ্ছি।" অনুনয় করিয়া কহিল, "চল না ভাই! মুখটি শুকিয়ে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে। একটা মণ্ডা দিয়ে একটু জল খেয়ে যাও, না হ'লে—" মুচকি হাসিয়া কহিল, "সারারাত শুকনো মুখ মনে ক'রে আমার রাত্রে ঘুম আসবে না।" বলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। পরেশ অগত্যা তাহার অনুসরণ করিল।

দরজায় ঢুকিতেই সামনে বিস্তৃত উঠান; ডান দিকে খড়ের চালওয়ালা মাটির কোঠা ঘর। পাশাপাশি দুইটি কুঠরী, সামনে প্রশস্ত দাওয়া; দাওয়া বেশ উঁচু; সিঁড়িটি সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। বাম দিকে একটি একতলা ছোট ও প্রাচীন ঠাকুর দালান; প্রবেশ দ্বারের খাড়া উপরে, সামনের দেওয়ালের মাথার ঠিক মাঝখানে একটি যুক্তহস্ত নাড়ুগোপালের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট গরুড়দেবের প্রতিমূর্তি। নাকটি ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখও বিধ্বস্তপ্রায়, মাথায় একটি হাত-দুই লম্বা লোহার শিক প্রোথিত। দেবায়তনটিকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়দেবের এই শাস্তি। এখন অবশ্য দেবমূর্তি নাই; বাবা-মার মৃত্যুর পর নিত্য-সেবা চালাইতে না পারিয়া শ্রীমতী শালগ্রাম শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে এবং দেব-গৃহটিকে ভাণ্ডার-গৃহে পরিবর্তিত করিয়াছে। তথাপি গরুড়দেবের শূলমুক্তি ঘটে নাই।

শ্রীমতী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় একটি মাদুর পাতিয়া সাদরে কহিল, "এস ভাই, বস।" তারপর প্রদীপ-হস্তে ঠাকুর দালানের ভিতরে গিয়া বেদীর সামনে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিল। এবং শূন্য সিংহাসনের সামনে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল। তারপর ঘরের এক কোণ হইতে একটি প্রাচীন লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া, এ ঘরে আনিয়া পরেশের পাশে রাখিয়া কহিল, "চারটি দুধ চিঁড়ে মেখে দেব?" পরেশ প্রবল আপত্তি সহকারে কহিল, "না, না; এক গেলাস জলই দিন না শুধু।" শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তা কি হয় ভাই! কত ভাগ্যে কুঞ্জে পদার্পণ করেছ—আগে হ'লে সারারাত্রি ধ'রে রাখতাম।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। শ্রীমতী ঠাকুর দালানে চলিয়া গেল।

পরেশ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বারান্দার এক পাশে একটি কম্বলের আসন পাতা—তাহার সামনে শ্রীমতীর চরকা, পেঁজা তুলা, লাটাই এবং অন্যান্য সুতো কাটিবার সরঞ্জাম। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উঠানের মাঝখানে একটি ইঁটে বাঁধানো তুলসী মঞ্চ, তাহাতে একটি তুলসীগাছ; উঠানের এক কোণে একটি শাখা-প্রশাখাবহুল কাগজীলেবুর গাছ। শ্রীমতী লেবু বিক্রয় করিয়াও দুই পয়সা রোজগার করে। উঠানের এক ধারে একটি খড়ের চালা, সেখানে একটি ঢেঁকি রহিয়াছে। শ্রীমতী নিজে ধান ভানে না, তবে ভানুনীদের ঢেঁকী ভাড়া দিয়া থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের "দিদিমা" ডাক শুনিয়া চমকিয়া সদর দরজার দিকে তাকাইতেই পরেশ দেখিতে পাইল, একটি পনেরো-ষোলো বৎসরের মেয়ে ঘরে ঢুকিতেছে, পরিধানে বাসন্তী রঙের শাড়ি, ব্লাউস কি রঙের ঠাহর হইল না, মাথা ও পা খালি, মেয়েটি কতকটা আগাইয়া আসিয়া লণ্ঠনের আলোকে পরেশকে দেখিতে পাইয়াই দুই পা পিছাইয়া লজ্জায় জিব কাটিল, তারপর দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলিয়া গেল।

পরেশ হাঁকিল, "দিদিমা!"

শ্রীমতী জবাব দিল, "কি ভাই! একলা ভয় করছে? এই সন্ধ্যেবেলায় ভয় কি হে!" পরেশ কহিল, "আপনাকে কে ডাকছে দেখুন।" শ্রীমতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল—হাতে একটি রেকাবি, তাহাতে মুড়কি ও মণ্ডা; কাছে আসিয়া কহিল, "কি বলছ?"

পরেশ কহিল, "কে ডাকছে আপনাকে।"

শ্রীমতী দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, "কই?" পরেশ মুখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "বোধ হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" শ্রীমতী রেকাবিটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি ভাই, আমার নাতনী।" বলিয়া ঘরের দিকে যাইতেই পরেশ কহিল, "উনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ডেকে আনুন।" শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে কহিল, "অত অস্থির হচ্ছ কেন ভাই, ডাকছি। আগে আমার হবু নাতজামাইকে সামলাই, তারপর নাতনীকে ডেকে আনব।" অনতিবিলম্বে এক গ্লাস জল আনিয়া পরেশের রেকাবির পাশে নামাইয়া দিয়া কহিল, "খাও। নাতনীকে ডেকে আনি—মিষ্টি খেতে খেতে নাতনীর মিষ্টি মুখখানি দেখবে, তাহ'লে চিরদিন ওকে মিষ্টি লাগবে।" বলিয়া বার্ধক্য-শিথিল দেহে যতখানি তরঙ্গ তোলা সম্ভব তুলিয়া দরজার দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে একজনের স-তর্জন অনুরোধ ও আর একজনের স-সংকোচ প্রতিরোধ পরেশের কর্ণগোচর হইল। পরেশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—মেয়েটিকে শ্রীমতী হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে। মেয়েটি কৃত্রিম

বিরক্তির সহিত আবদারের সুরে কহিতেছে, "আঃ, ছাড়ুন না!" শ্রীমতী কহিল, "ছাড়ব কেন লো ছুঁড়ী? এতদিন জড়িয়েছিলি, আজ এত ছাড়বার জন্যে ছটফটানি কেন?" মেয়েটি অনুনয়ের সুরে কহিল, "সত্যি, ছেড়ে দিন। বাড়ি যাই।" শ্রীমতী ধমকাইয়া কহিল, "নেকী! বাড়ি যাবার জন্যেই বুঝি এতক্ষণ সাড়া না পেয়েও দরজায় দাঁড়িয়েছিলি।" পরেশের সামনে টানিয়া কহিল, "ওহে নাগর! শুনছ! মণ্ডা খাওয়া ছেড়ে একবার মুখ তুলে তাকাও, মণ্ডার চেয়ে হাজার গুণ মিষ্টি জিনিস এনেছি।" পরেশ লজ্জায় আরও মুখ নত করিল। শ্রীমতী ধিক্কার দিয়া কহিল, "ছিঃ! মেয়েমানুষেরও অধম নাকি! নাকের সামনে একটা ডবকা ছুঁড়ীকে ধ'রে দিয়েছি, তাকিয়ে দেখতে পারছ না!" পরেশ মুখ তুলিল না। শ্রীমতী কহিল, "তাকাও, তাকাও বলছি। না তাকালে আমার মাথা খাও।" পরেশ হাস্যমুখে মুখ তুলিয়া কহিল, "কি বলছেন! এই নিন তাকাচ্ছি আপনার দিকে।" বলিয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু এই অবসরেই আড়চোখে লজ্জানতমুখী মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইল। শ্রীমতী কহিল, "আমার দিকে নয়।" মুখের ইঙ্গিতে কহিল, "এই দিকে—তাকাও বলছি। না হ'লে ঘাড়ে ধ'রে, চোখ খেড়ে তাকিয়ে দেব।" পরেশ এবার পুরোপুরিভাবে মেয়েটির দিকে তাকাইল। যে সুকোমল শ্যাম-শ্রী বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য, এ মেয়েটির দেহে তাহার জোয়ার আসিয়াছে। লজ্জা ও কৌতুকে মুখখানি ঝলমল করিতেছে; দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ দুইটি, দুইটি কৃষ্ণ বঙ্কিমরেখায় অর্ধনিমীলিত; পাতলা ভ্রূ দুইটি যেন চতুর্থীর কালো চাঁদ, ভ্রূ দুইটির মাঝখানে কাঁচপোকার টিপটি যেন ক্ষুদ্র সবুজ তারা, কানের লাল পাথরের দুল দুইটি যেন দুইটি গোলাপের কুঁড়ি।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "কেমন দেখছ হে? পছন্দ হয়?" পরেশ জবাব না দিয়া মৃদু হাসিল।

এই সময় মেয়েটি মুখ কিঞ্চিৎ তুলিয়া আড়চোখে পরেশকে দেখিবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রীমতী সতর্জনে কহিল, "তুই খবরদার তাকাস না পোড়ামুখী! শুভদৃষ্টির আগে বরের দিকে তাকাতে নেই জানিস না বুঝি?" মেয়েটি গভীরতর লজ্জায় মুখ একেবারে বুকের কাছে নামাইয়া ফেলিল।

শ্রীমতী কহিল, "চল্, বসবি চল্।" বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিল। মেয়েটি ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, "না, বাড়ি যাই আমি।" শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "বাড়ি যাওয়া কেন? ব'স। এখনই তুলে নিয়ে পালাবে ভাবছিস নাকি?" বলিয়া পরেশের কাছ হইতে কতকটা দূরে আসন পাতিয়া মেয়েটিকে বসাইল এবং ঘরের ভিতর হইতে পান সাজিবার সরঞ্জাম আনিয়া পরেশ ও মেয়েটির মাঝখানে বসিল।

পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "খুব খাইয়ে দিলেন দিদিমা।" শ্রীমতী কহিল, "তা ভাই, বুড়ী দিদিমার মণ্ডা-মুড়কি ছাড়া খাওয়াবার তো আর কিছুই নেই।" মুচকি হাসিয়া কহিল, "তবে ভাল জিনিস খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি—স্বর্গের সুধা তার কাছে হার মেনে যাবে।"—বলিয়া পর-পর পরেশ ও মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। তারপর পান সাজিয়া পরেশের হাতে দিয়া আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "এবার ভাই, সত্যি করে বল নাতনীকে আমার পছন্দ হয় কি না?" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিল, "ওহে শুধু সাদা রঙ দেখে ভুলো না। আমারও তো সাদা রঙ, কপাল তো দেখেছ—এ জন্মে সোয়ামীর ঘর করতে পেলাম না। রঙ হ'লেই চলবে না—কপাল চাই। দ্রৌপদীর রঙ তো কালো ছিল—কিন্তু কত ভাগ্যবতী ছিল বল দেখি? পাঁচজনে পায়ের কাছে প'ড়ে থেকেও মন পেত না। নাতনীর আমার তেমনই কপাল। ও জন্মাবার আগে তো কার্তিক ডাক্তার একরকম ফতুর হয়েই গিয়েছিল; যা কিছু টাকা-কড়ি ধন-দৌলত গয়না-গাঁটী ছিল, বেয়াই আর বানে মিলে লুটে নিয়েছিল। এখানে যখন এল তখন লক্ষ্মী পাতবার মত এক ছটাক ধান পর্যন্ত ছিল না। ও হবার পর থেকেই আবার শ্রী-বৃদ্ধি শুরু হ'ল, তাছাড়া নাতনী কি আমার কালো? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—কেমন রঙ, নবদূর্বাদলশ্যাম তো একেই বলে।" মুচকি হাসিয়া কহিল," গায়ের রঙ ফর্সা হ'লে গায়ের আর মেজাজের তাপে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। ঐ রকম শ্যামবর্ণ হ'লে মেজাজ হবে মিষ্টি, আর গা হবে শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা।" সুর করিয়া কহিল, "আরামে রজনী যাপিবে হে গুণমণি।" পরেশ স্মিতমুখে শুনিতেছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "উঠি দিদিমা।" খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া শ্রীমতী কহিল, "বা রে! পালাচ্ছ যে! কথা দিয়ে যাও।" মেয়েটির দিকে তাকাইতেই চোখে চোখ মিলিয়া পরেশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, শিথিলকণ্ঠে কহিল, "মাসীমার কাছে শুনবেন।" শ্রীমতী কহিল, "খারাপ খবর শুনব না তো?" মেয়েটির লজ্জারক্ত ঔৎসুক্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "খুব সম্ভব না।" শ্রীমতী হাত ছাড়িয়া দিল।

পথে নামিয়া পরেশের মনে হইল, কাজটা ভাল হইল কি? সে তো একরকম মত দিয়াই আসিল। মেয়েটির সাক্ষাতে 'না' বলিয়া তাহাকে অপমান করিতে তাহার ভদ্রতাজ্ঞানে বাধিল বোধ হয়। কিন্তু শুধু ভদ্রতার অনুরোধেই নয়; মনের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিল, সেই গভীর তলদেশে একটি নবজাত শৈবাল-শিশুর মত অতি ক্ষীণ অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম-লাভ করিয়াছে, এখনও বর্ধিত হয় নাই, এখনও দলের পর দল মেলিয়া সারা মনকে ছাইয়া ফেলে নাই। সে আকাঙ্ক্ষা—নবোদ্গতযৌবনা তন্বী, শ্যামলী মেয়েটির সঙ্গলাভের, যে চোখের চাহনি বুকের মধ্যে কাঁপন জাগাইয়াছে, সেই চোখের 'পরে চোখ রাখিয়া তাহার মনের কথা জানিবার। পরেশ ভাবিল, কি হইবে এই গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া? কি হইবে কোন এক অপরিচিত স্থানে গিয়া নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করিয়া? ঐ সুশ্রী মেয়েটিকে গ্রহণ করিলেই তো সব আপনা আপনি ধরা দিবে। ধরা দিবে অর্থ ও প্রতিপত্তি সম্মান ও সম্পত্তি, ধরা দিবে প্রতিবেশীদের স্নেহ সহায়তা সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। কিন্তু রবি? তাহাকেও যে মন পাইতে চায়? কিন্তু আজ পর্যন্ত মন যাহা চাহিয়াছে, তাহা কি সব পাইয়াছে? এবং তাহা না পাইয়াও যদি তাহার চলিয়া থাকে, রবিকে না পাইলেও তাহার চলিবে বোধ হয়। হয়তো প্রথম-প্রথম মনটা খুঁতখুঁত করিবে, অভিমানে গুম হইয়া থাকিবে, তারপর ঐ মেয়েটির সুন্দর সাহচর্যে প্রবোধ মানিবে।

রবিদের বাড়ির সামনে পৌঁছিতেই পরেশ দেখিল, বৈঠকখানা অন্ধকার। ভাবিল, পূর্বসংকল্পমত বিনয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করে। তারপরই ভাবিল, থাক, কি হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া? বিনয়ের মত যে আছে, তাহা সে জানে; কিন্তু তাহার স্ত্রীর কিছুতেই মত হইবে না। তাহার মত করাইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ, অনুনয়-বিনয় করিবার আগ্রহ মন হইতে ইহার মধ্যেই বেমালুম অন্তর্ধান করিয়াছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই পরেশ দেখিতে পাইল, বিনয় টিনের চেয়ারটিতে বসিয়া আছে। সামনে টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন, খুব সম্ভব বিনয়ই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পরেশ কহিল, "কাকাবাবু আপনি? কোন দরকার আছে নাকি?" বিনয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসি হাসিয়া কহিল, "এস বাবা পরেশ! ব'স। দরকার এমন কিছু নেই। কোথায় গিয়েছিলে?" পরেশ বসিতে গিয়া টেবিলের উপর ওজন করিবার যন্ত্রটা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "এটা এখানে? নিয়ে এলেন বুঝি?" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে ঢোক গিলিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা! তোমার কাকীমা বললে, ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কে কখন নষ্ট ক'রে দেবে। দামী জিনিস—" পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "দামী জিনিস বটে, তবে কে নষ্ট করবে? তা বেশ! রবিকে ওষুধটাই দিন কয়েক খাওয়ান। তারপর একদিন বলবেন, ওজনটা নিয়ে আসব এখন।" বিনয় সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়, ওষুধ আমি নিজে নিয়মমত খাওয়াব। এর মধ্যে দাগ দুই খাওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়। তা কোথায় গিয়েছিলে বাবা?" পরেশ কহিল, "একটু বেড়িয়ে এলাম। হাতে কাজ-কর্ম কিছু নেই, একেবারে বেকার, তাই, ভাবলাম একটু ঘুরে আসি।"

বিনয় সাহস দিয়া কহিল, "এখনই এত হতাশ হ'য়ো না বাবা! যাই হোক, ব্যবসা তো! একবারে জ'মে উঠবে না; ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধবে। দেশের লোক এখন কার্তিককেই জানে, ভাবে কলির ধন্বন্তরি। ক্রমে ক্রমে, দু-একটা কেসে দুজনে যখন ঠোকাঠুকি হবে, তখন লোকে বুঝবে, কার কতটা বিদ্যে। তা সে তো সময় লাগবে বাবা! কার্তিকের কতদিনের কারবার এখানে; তাকে কোণঠাসা করতে হ'লে তোমাকে একটু ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া কার্তিক ডাক্তার যদি—"

পরেশ এতক্ষণ একদৃষ্টে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, কাকাবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, তবু উপায় নেই। আশা করি আমাকে নির্লজ্জ ভাববেন না—" বিনয় বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কি বলবে?" পরেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "রবিকে আমার হাতে দিতে আপনার আপত্তি আছে?" বিনয় ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার মত গরিব মাস্টারের তোমার মত ছেলের হাতে মেয়ে দিতে আপত্তি!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল,

"আমার কোন আপত্তি নেই, বাবা!" পরেশ কহিল, "কিন্তু কাকীমার?" বিনয় কুণ্ঠার সহিত কহিল, "হ্যাঁ, ওদের হয়তো আপত্তি আছে। কিন্তু বাবা! ওরা তো আমাদের পাড়াগেঁয়ে হিন্দু সংসারের মেয়েমানুষ—লেখাপড়া শেখেনি, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ কোন দিন পায় নি। সারা পৃথিবী জুড়ে কি যে ভাঙ্গা-গড়া চলছে, তার কোন খবর ওরা রাখে না। নিজেদের ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার, তার চেয়ে কিছু বড় নিজেদের ছোট সমাজ—এই সংকীর্ণ বেড়ের মধ্যে ওরা জন্মায়, বড় হয়, সারা জীবন কাটিয়ে দিয়ে মরে। বেড়ার বাইরে কি আছে, কি ঘটছে কোন দিন জানতে পারে না, জানতে চায়ও না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে, নিজের নিজের সংসারটিকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারাতেই ওদের সুখ ও শান্তি—"

পরেশ চুপ করিয়া এতক্ষণ বিনয়ের বক্তৃতা শুনিতেছিল—হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "অর্থাৎ কাকীমা সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন না।" বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু কার্তিক ডাক্তারের স্ত্রী খুব সম্ভব মেয়েমানুষই।" বিনয় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "মেয়েমানুষ বইকি বাবা।" পরেশ কহিল, "আর পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েমানুষ, কিন্তু তার তো কোন আপত্তি নেই।" বিনয় গম্ভীর হইয়া কহিল, "কি জান বাবা পরেশ! ওরা বড়লোক, গাঁয়ের লোক সব ওদের হাত-ধরা; ওরা যা করতে চাইবে, তাতেই সমাজের সম্মতি হ'বে। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। পয়সা নেই, প্রতিপত্তি নেই, আমাদের সামান্য একটু বেচাল দেখলেই সারা সমাজে হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকবে না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে কার্তিক ডাক্তারের মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে—গাঁয়ের লোকও এই বিয়ে দেবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এ অবস্থায় ববিকে তুমি বিয়ে করলে, আমার আর এ গাঁয়ে বাস করা চলবে না।"

পরেশ কহিল, "যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।" বিনয় মৃদু কণ্ঠে কহিল, "বল।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ববির যদি আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, মানে যদি—" বিনয় হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর উচ্ছ্বাসটা সামলাইয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল, "এত হাসছেন কেন?" বিনয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে হাসি সামলাইয়া কহিল, "হাসি পাচ্ছে বাবা! হিন্দুঘরের কুমারী মেয়ের ইচ্ছে? বিশেষ ক'রে আমার মত গরিবের মেয়ের? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই;—ধর তোমার কাকীমা—দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না, বাবার অবস্থাও নেহাৎ হীন ছিল না, ছোট-খাটো সহরেও জন্মেছিলেন, এবং সেখানে মনের মত ভাল ছেলের অভাব ছিল না। হয় তো, মনে মনে তাদের কাউকে পছন্দও করেছিলেন। অথচ পড়লেন তো আমার মত হতভাগা গরিব মাস্টারের হাতে। কিন্তু তখনও তাঁকে কোন আপত্তি করতে শুনিনি, পরেও কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখিনি। কি জান, বাবা! স্বামীকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, হিন্দুঘরের মেয়েদের আজন্মের সংস্কার, সে স্বামী যেই হোক, যেমনই হোক। না হ'লে—ওদেশে শুনি কথায়-বার্তায় একটু মান্যাদোষ ঘটলেই নাকি স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু এদেশে স্ত্রীরা আমাদের কত ত্রুটি, কত অপরাধ নীরবে সহ্য করে বল দেখি?" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিতে লাগিল, "ববির জন্যে তুমি ভেবনা বাবা! তুমি তাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, সেইজন্যে সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, বড়দাদার মত ভক্তি করে। কিন্তু তোমার স্ত্রী হ'তে—এ দুরাকাঙ্ক্ষা সে কোন দিন করে নি—এ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি কার্তিক ডাক্তারের মেয়েকেই বিয়ে কর বাবা! এতে তোমার ভাল হবে। আমি আর তোমার কাকীমা এতে বিন্দুমাত্র দুঃখ করব না।" পরেশ বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, "আমার সম্পর্কে গাঁয়ের লোক ববিকে নিয়ে যে নানা কথা—" কথা শেষ করিতে না করিতে বিনয় কহিল, "শুনেছি বাবা, কিন্তু ও তো মিথ্যে—গাঁয়ের লোক ঈর্ষা ক'রে যা-তা রটাচ্ছে।" পরেশ কহিল, "কিন্তু এর জন্যে যদি ববির বিয়ে না হয়!" বিনয় চোখ দুইটা কুঁচকাইয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "না, তার জন্যে চিন্তা নেই! কার্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই গাঁয়ের লোক চুপ ক'রে যাবে।" মৃদু ও ম্লান হাসিয়া কহিল, "তখন দেখবে, এখন যারা নিন্দে রটাচ্ছে, তারাই হয়তো নিজের নিজের বেকার ও বখাটে আত্মীয়দের সঙ্গে ববির বিয়ে দিতে চাইবে।"

(১৩)

দিন কয়েক পরে; বেলা প্রায় দুইটা। ববি বৈঠকখানার জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল। খুকী মেঝেতে বসিয়া পুতুল খেলিতেছিল ও নিজের মনে বকিতেছিল। মাঝে মাঝে ববির উদ্দেশে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেছিল। ববি কখনও দুই এক কথায় প্রশ্নের জবাব দিতেছিল; কখনও বা চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব এড়াইয়া যাইতেছিল। খুকী একবার প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দিদি, খুকী তো আমার সেরে উঠেছে, এর পর তো বিয়ে দেওয়া উচিত, না?" ববি শুধু জবাব দিল, "হুঁ।" কিছুক্ষণ পরে খুকী কহিল, "নান্তিদিদির (পাশের বাড়ির মেয়ে) বরের বড় বড় গোঁফ, সেদিন দুধ খাচ্ছিল, এমন দেখাচ্ছিল! হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদার গোঁফ নেই কেন?" ববি নিরুত্তর রহিল। খুকী কহিল, "পরেশদাদা গোঁফ রাখতে চাইলে মানা ক'রে দিও। গুঁফো লোকগুলোকে আমার ভারি ঘেন্না করে।" ববি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, "পরেশদাদার গোঁফের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?" খুকী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "বা রে! সম্পর্ক নেই! আমাদের পরেশ দাদা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুকী আবার কহিল, হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদা কদিন আসেন নি কেন?" ববি ম্লান কণ্ঠে জবাব দিল, "জানি নে।" আরও কিছুক্ষণ পরে খুকী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রশ্ন করিল, "দিদি! তুমি মেম সাহেব দেখেছ?" ববি জবাব দিল, "না।"

খুকী কহিল, "মেম সাহেবদের মোম বাতির মত সাদা রঙ, রাতদিন জুতো প'রে থাকে—খুব নরম পা কিনা।"

ববি জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে আর এক প্রকারের প্রশ্ন হইল, "ও পাড়ার কমলার পরেশ দাদার সঙ্গে বিয়ে হবে, দিদি, তুমি বিয়ে দেখতে যাবে না?" ববি জবাব দিল না। খুকী কহিল, "কমলীর ভারী মজা কিন্তু, যখন তখন বাপের বাড়ি পালিয়ে যাবে।" ববি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "পরেশ দাদা যেতে দেবেন কেন?" খুকী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কেন দেবেন না? লোকে গাঁয়ে বিয়ে দেয় কিসের জন্যে, শুনি? আমি যে পান্তির খোকার সঙ্গে আমার খুকীর বে দেব, যখন ইচ্ছে আনব, দেখব ব'লেই তো।"

ববি প্রতিবাদ না করিয়া জানালার ভিতর দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ তিনদিন তাহার পরেশ দাদা আসেন নাই, এ রাস্তা দিয়া পর্যন্ত যাওয়া আসা করেন নাই। কমলাকে বিবাহ করিলে তাহাদের বাড়ি আসা বন্ধ করুন, এ রাস্তা দিয়া হাঁটা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিবেন নাকি? পরেশকে একদিন না দেখিলে, একদিন তাহার কথা না শুনিলে ববির মনের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হয়, কি যেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় নাই। রাত্রে বিছানায় শোয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ একটি ব্যাকুল প্রত্যাশা তাহার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া পরেশের পদধ্বনি, পরেশের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য উদগ্র হইয়া থাকে। বিছানায় শোয়ার পর ঘুম আসিতে চাহে না; সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়ে, সে জাগিয়া জাগিয়া পরেশের কথাই ভাবে—কবে সে কেমন করিয়া হাসিয়াছিল, কোন্ কথা কেমন করিয়া বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল, একে একে মনে পড়ে। এই সব স্মৃতির টুকরাগুলিকে সে ইচ্ছা করিয়া, যত্ন করিয়া কোথাও সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই; তাহারা নিজেরাই তাহার অজ্ঞাতে তাহার মনের কোণে আশ্রয় লইয়াছিল; স্তব্ধ, স্বল্পান্ধকারে তাহার নিদ্রাহীন চক্ষের সম্মুখে একে একে রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহারা পার হইয়া যায়। একটি চাপা অভিমান মনের ভিতর গুমরাইতে থাকে, যেন পরেশ তাহাকে কোন ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই দেনা-পাওনার সম্পর্ক যে কোন একটি বিশেষ ক্ষণে, কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শুরু হইয়াছে তাহা নহে, তবে এই সাত মাস ধরিয়া দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার হৃদয় বুঝিয়া লইয়াছে, পরেশ তাহার একান্ত আপনার জন। কোন দিন তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, কোন দিন এমন অবস্থা হইবে তাঁহার সহিত দেখা হওয়া চলিবে না, কথা বলা চলিবে না, পরম নিরাশার মুহূর্তেও ইহা সে কোনদিন ভাবে নাই।


মহোৎসবের দিনে
দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।
ভারতীয় চা
উৎসবে অতুলনীয়

অথচ তাহাই ঘটিয়া গেল। সেদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পরেশদাদা তাহার ছাড়া কাহারও হইবেন না। তিনি অবশ্য মুখে কিছু বলেন নাই, তবু তাঁহার কথাবার্তা, হাসি ও চাহনি, গভীর স্নেহ ও অকৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে জানিত, তাহার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, পরেশদার মত শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ছেলের ন্যায্য দাম দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে নিজেও শিক্ষায় দীক্ষায়, রূপে ও গুণে পরেশের যোগ্য নহে, তবু পরেশদা তাহার অন্তরের অকুল-আকাঙ্ক্ষার জালে ধরা দিয়াছেন। এই আত্মসমর্পণ যে করুণার বশে নয়, ইহার পশ্চাতে ভালবাসা আছে, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। তাই সেদিন পরেশের সহিত কমলার বিবাহের কথা শুনিয়া, ইহার অসম্ভাব্যতার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে হাসিয়াছিল। এমন কি এই বিবাহের কথা লইয়া সে সেদিন দুপুরবেলা পরেশকে সহজেই ঠাট্টা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বারান্তরাল হইতে যখন শুনিতে পাইল—পরেশদাদার আসা-যাওয়ার জন্য তাহার নামে গ্রামে দুর্নাম রটিয়াছে এবং সেইজন্যই মা তাঁহাকে বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়া অপমান করিলেন এবং তারপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই জন্য পাত্র সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন ব্যথায়, লজ্জায়, ঘৃণায় ও অনুশোচনায় সে পুনঃ পুনঃ নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, তাহারই জন্য পরেশদাদার এই অপমান? কি অপরাধ তাঁহার? অপরাধ তিনি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া, সেবা করিয়া মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন; অপরাধ—পরম আত্মীয়াধিক স্নেহ করিয়াছেন এবং হয়তো তাহার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে ভালবাসিয়াছেন। কি অকৃতজ্ঞতা! রোগের সময় সারারাত্রি বিছানার পাশে বসিয়া সেবা করিতেন, তখন তো তাঁহার হাতে সম্পূর্ণরূপে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে; আজ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অপমান করিলে? পরেশদাদা কি ভাবিতেছেন? হয়তো ভাবিতেছেন—কলিকাতার কত সুন্দরী শিক্ষিত মেয়ের মায়া-পাশ কাটাইয়া পাড়াগাঁয়ের একটা অশিক্ষিত, অমার্জিত, সামান্য মেয়ের কাছে ধরা দেওয়ার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। হয়তো মনে মনে নিজেকে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিতেছেন এবং রাগ ও অভিমানের আগুনে জ্বালাইয়া তাহার জন্য হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ ও ভালবাসা ছিল, সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন। সেইদিন সেই নিদারুণ ক্ষণে তাহার সাত মাস ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া ঘনীভূত বিশ্বাস দুর্বৎসরের মেঘের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া উবিয়া গেল।

সেইদিন সারা বিকাল ও রাত্রি তাহার যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা সে জানে, আর তাহার অন্তরাত্মা জানেন। তাহার পরদিনও তেমনই কাটিল। তার পরের দিন সে ঠিক করিল, পরেশদাদা যখন এই রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইবেন, তখন খুকীকে দিয়া ডাক দেওয়াইবে। পরেশদাদা অভ্যাসমত থামিবেন নিশ্চয়, না আসুন দাঁড়াইয়া খুকীর সহিত হাস্য-পরিহাস করিবেন, সে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইবে। সম্মুখে সে কিছুতেই যাইবে না। তাহাকে দেখিয়া পরেশদাদা যদি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সেদিন বেলা তিনটা পর্যন্ত জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াও সে পরেশের দেখা পাইল না। যে পুকুরে তাহারা বিকালে গা ধোয়, কাপড় কাচে, পরেশদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া একটুখানি ঘুর-পথ হইলেও যাওয়া যায়। সে খুকীকে সঙ্গে লইয়া এই পথ দিয়া পুকুরে গেল, আশা—যদি একবার দেখা হইয়া যায়। ডিসপেন্সারির সামনে গিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ; ফিরিবার সময়ও তাই। সেইদিন রাত্রে শুইবার পর যখন সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়িল, সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পাশে খুকী ঘুমাইতেছিল, তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল। খুকীর উপর তাহার হিংসা হইতেছিল; পরেশদাদাকে সেও তো ভালবাসে, অথচ পরেশদাদাকে না দেখিয়া বেশ আছে, সারাক্ষণ একবারও নাম করে না, ঘুমেরও একটু বিঘ্ন হয় নাই তাহার। বিনয়ও সারাদিন পরেশদাদার একবার নামও করেন নাই। কেবল সে-ই একা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও না দেখিলে যে বুকের ভিতরটা এমন পাকা ফোঁড়ার মত সারাক্ষণ টন টন করিতে থাকে, তাহা সে ইহার পূর্বে কোনদিন জানিত না। বিনয়ও কতবার কার্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছে, মা-ও একবার তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া এক মাস বাপের বাড়িতে ছিলেন, মন কেমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন করিয়া দিন-রাত সে ছটফট করিত না। এ তাহার কি হইয়াছে? এমন করিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া? দুইদিন পরে কমলার সহিত হয়তো পরেশের বিবাহ হইবে, তখন তাঁহার কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখা না-রাখা, কথা কওয়া না-কওয়া, কোথাও আসা না-আসা—সব কমলার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে। আর সে নিজেও তো একদিন চিরজীবনের মত এ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোথায় চলিয়া যাইবে। তখন? তীব্র বেদনাবোধের সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল, দাদা মা-ভাই বোন, সকল প্রিয়জনকে অতিক্রম করিয়া পরেশ কখন কেমন করিয়া তাহার প্রিয়তমের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদিগকে ছাড়িলে সে ব্যথা পাইবে বটে, কিন্তু জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে না। কিন্তু পরেশকে ঘিরিয়া তাহার মন তাহার অজ্ঞাতে এমনইভাবে পাকে-পাকে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে ছাড়ানো যাইবে না, ছাড়াইলেও সে বাঁচিবে না। নিজের এই নিদারুণ অবস্থা ভাবিয়া সে ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। ভাবিল, কেন মনের এই নির্বিচার নির্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষা? যাহা পাইবার আর আশা নাই, তাহার জন্য কেন এই লোভ? ইহার পর সারাজীবন কান্না ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। এই অবোধ, অশান্ত মন লইয়া কেমন করিয়া সে যে আর একজনের স্ত্রী হইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, তাহার সংসার করিবে, ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া গেল।

শেষ রাত্রে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিল মায়ের ডাকে—"বীবি! ওলো বীবি!" সে সাড়া দিল, "কি, মা?"

"কাঁদছিস কেন?"

সে চোখে হাত দিয়া দেখিল—জল, জল মুছিয়া উত্তর দিল, "কই, না!" মা কহিলেন, "না আবার কি? কাঁদছিলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?" সে জবাব দিল, "কি জানি মা, মনে পড়ছে না।" মা কহিলেন, "ওখানে শুতে হবে না, আমার কাছে আয়।" সে মায়ের কোলের কাছে শুইল। মেয়ের গায়ে হাত দিয়া মা কহিলেন, "ঘুমো দেখি।" তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে তাহার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে যেন পরেশের সঙ্গে এক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অপ্রশস্ত সুঁড়ি-পথ—পথের দুই পাশে কাঁটা গাছের ভিড়। দুই হাতে গাছের ডাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ চলিতে হইতেছে; গায়ে ও পায়ে কাঁটা বিঁধিতেছে, পা দুইটা ক্লান্তিতে পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তবু পথ চলার শেষ নাই। হঠাৎ বন শেষ হইয়া তাহারা এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দূরে দেখিতে পাইল—একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার মামার বাড়ি সে শহরে, সেখানে সে যেমন একটি বায়োস্কোপের বাড়ি দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই দেখিতে। পরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া সেখানে লইয়া গেল। দরজা খোলা, প্রহরী নাই। ভিতরে ঢুকিতেই দেখিল, একটা নাটমন্দির—মোটা মোটা বড় বড় থাম। চাতালে কমলা বসিয়া আছে আর তাহার পাশে বসিয়া শ্রীমতী বামনী চরকা কাটিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কমলা চোখ-মুখ কঠিন করিয়া শ্রীমতীকে কি বলিতেই, শ্রীমতী তাহাকে মারিবার জন্য নাটাইটা তাহার দিকে ছুঁড়িল। কপালে আঘাত পাইয়া সে 'উঃ' করিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ মেলিতেই দেখিল, পরেশ কমলাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। সে পরেশকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পরেশ তাহার কথা কানে না তুলিয়া কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। রাগে-অভিমানে সে কাঁদিয়া উঠিতেই শ্রীমতী আসিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই বীবির মন পরেশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। পরেশ আর আসিবে না, দেখা দিবে না, এ জন্মের মত তাহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়া গিয়াছে—মনে মনে বুঝিলেও চুম্বক-শলাকার মত তাহার মন পরেশের দিকে একাগ্র হইয়া রহিল। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সুখদা তাহাকে কহিল, "কাল সারারাত্রি তো ঘুমোস নি, চল্, আমার সঙ্গে শুবি চল্।" বীবি সানুনয়ে কহিল, "না মা, দিনের বেলায় আমার ঘুম আসবে না; আমি বরং সন্ধ্যের পরেই ঘুমোতে যাব।" সুখদা সংশয়ের স্বরে কহিল, "ঘুম আসবে না কেন? চোখ বুজে প'ড়ে থাকলেই ঘুম আসবে, চল্।" বীবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, "রাত জেগে মুখের কি রকম ছিরি হয়েছে, আয়নাতে দেখ্‌গে দেখি।" আপন মনে কহিল, "সারারাত না ঘুমিয়ে যা-তা স্বপ্ন দেখা মেয়েমানুষের ভাল নয়।" হাসিবার চেষ্টা করিয়া বীবি কহিল, মা বেশ! না ঘুমোলে আবার স্বপ্ন দেখা যায়?" সুখদা ধমকের সুরে



ফটো শিল্পী—শ্রীঅনিল ঘোষ

কহিল, "ওকে আবার ঘুম বলে নাকি? যদি যা-তা দেখতে লাগলাম, কাঁদলাম-কাটলাম, তা হ'লে ঘুমোবার দরকার ক? আমার কেমন ঘুম বল্ দেখি—এক ঘুমে রাত কাবার। কাল থেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে সংসারের কাজ-কর্ম করবি, তা হ'লে কেমন ঘুম হবে দেখবি।"

সুখদা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিজের পাশে শোয়াইল। রবি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, মা ঘুমাইয়া পড়িতেই উঠিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে বসিয়া খুকী পুতুল খেলিতে খেলিতে আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল, কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল; রবি অন্যমনস্কভাবে কখনও দুই-এক কথায় জবাব দিল, কখনও বা দিল না। আজ কয়দিন ধরিয়া যাহা সে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছে, এখনও তাহাই সে ভাবিতে লাগিল এবং পথের দিকে দুই চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল—পরেশদাদা যেন আজ একবার এই পথ দিয়া যান।

হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল, "কি লো রবি? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার ধেয়ান করছিস লো?" রবি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, শ্রীমতী বামনী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে; হাতে একটা প্রকাণ্ড থালায় মেঠাই। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার সাগরেদ—গুণী বামনী—বাল-বিধবা, বয়স ত্রিশের ওপারে; তাহার গালে পান; পানের রসে রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, কুঁচকাইয়া পিচ ফেলিয়া কহিল, "বরের জন্য শোধ হয়।" শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "তা এত ভাবনা কিসের লো! ফুল যখন ফুটবে, তখন বর আপনি এসে হাজির হবে। তা তোর মা কোথায় বল্ দেখি?" বলিতে বলিতে শ্রীমতী স-শিষ্যা বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রবি থতমত খাইয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "মেঠাই কিসের দিদিমা?" শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তোরা জানিস্ না নাকি? আমাদের কমলীর যে তোদের পরেশের সঙ্গে বিয়ে হবে?" কাল ছেলের আশীর্বাদ হয়ে গেছে, আজ মেয়ের আশীর্বাদ হ'ল। তাই গাঁয়ের লোককে মিষ্টি বিলুনো হচ্ছে। তা তোর মা কি করছে?" রবির বুকের ভিতরে দাপাদাপি শুরু হইয়াছিল, তবু মুখে হাসি টানিয়া যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, "মা ঘুমোচ্ছে, আসুন।" রবির পাছু পাছু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শ্রীমতী কহিতে লাগিল, "আসছে মাঘের প্রথমেই বিয়ে; কত ধুম-ধাম হবে, দেখবি। ডাক্তার বলেছে, তিনদিন হাঁড়ি চড়তে দেবে না গাঁয়ে।" রবিকে শোবার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিল, "তোর মাকে আর উঠিয়ে কাজ নেই; এমনই দেরি হয়ে গেছে; এখনও সারা গাঁ ঘুরতে হবে আমাদিকে। একটা বাটি-টাটি নিয়ে আয় দেখি।" বাটি আনিতেই গুণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ লা, তোর মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল্ দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?" শ্রীমতী বাটিতে মিষ্টি দিতে দিতে গুণীর দিকে তাকাইয়া চোখ মটকাইল। রবি মৃদু ও শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল, "মাথা ধরেছে সকাল থেকে।" গুণী কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "মাথা ধরেছে? আহা! তোর পরেশদাকে ডেকে ওষুধ খাস নি?" শ্রীমতী কহিল, "মাথা ধরার আবার ওষুধ খেতে হয় নাকি? কাউকে দিয়ে হাত বুলো গে যা।" গুণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "মাথায় হাত বুলোবার লোক কোথায় পাবে? যে ছিল—" বলিতে বলিতে শ্রীমতীর সতর্কতা-সূচক ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া থামিয়া গেল। শ্রীমতী সান্ত্বনার সুরে কহিল, "মাথায় হাত বুলোবার লোক হবে লো! এত রূপ কি বৃথায় যাবে ভাবছিস।" আত্মীয়তার সুরে কহিল, "তবে ভাই, আমরা আসি। সারা গাঁ ঘুরতে হবে এখনও। তোর মাকে বলবি—আর একদিন এসে সব পরিচয় দিয়ে যাব এখন।"—বলিয়া চলিয়া গেল। চোখের আড়াল হইতেই গুণীর কল-হাস্য ও শ্রীমতীর কৃত্রিম তর্জন-গর্জন কাণে আসিল। রবি বিহ্বল, বেদনার্ত চক্ষু মেলিয়া প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পরক্ষণেই ক্ষতমুখে আয়োডিনের মত লজ্জা ও অপমান তাহার সারা মনে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। ইহারা মনে করিতেছে কি? পরেশ-দাদাকে সে ফাঁদ পাতিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কোনমতে ফাঁদ কাটিয়া পরেশদাদা উড়িয়া পলাইয়া কমলার কোটরে ঢুকিয়াছেন? কিন্তু সত্য কি তাই? তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। পরেশদাদা নিজে হইতে ধরা দিয়াছিলেন এবং মা অপমান করিয়া বিদায়

[illegible] না। হঠাৎ তাহার দুই চোখ [illegible] করিয়া উঠিল; ভাবিল, কমলা [illegible] পাওয়া তাহার কোনদিন ঘটিয়া [illegible] মাথা খাইয়া, কাহারও মুখের দিকে [illegible] নিজেকে সঁপিয়া দেয় তো কমলার [illegible] মুখের হাসি এক মুহূর্তে উবিয়া যাইবে।

[illegible] হইতে উঠিয়া সুখদা শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়া [illegible] চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার দিকে [illegible] সুখদা শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কহিল, "ঘুমোস নি?" রবি জবাব দিল না। কণ্ঠস্বর চড়াইয়া সুখদা কহিল, "এই? শুনতে পাচ্ছিস না?" রবি চমকাইয়া উঠিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি মা?"

"ঘুমোস নি?"

রবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

"ঘুমোলি না কেন?"

"ঘুম এল না কিছুতেই।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া সুখদা কহিল, "তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?" রবি জবাব দিল, "কই? কিছু না তো।" সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "কিছু না? আমি তোর মা, আমাকে তুই ঠকাবি? তোদের মুখ দেখলে আমি তোদের মনের কথা টের পাই।" ধমকের সুরে কহিল, "বল্ বলছি ঠিক ক'রে।" রবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "কিছু হয় নি বলছি, তবু মিছেমিছি ধমক—আমাকে একটুও দেখতে পার না তুমি" সুখদা ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "কি বললাম তোকে?" রবি জবাব না দিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। সুখদা কিছুক্ষণ বিস্মিত চক্ষে মেয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি জানি, বাছা! তোর কি হয়েছে? এত কাঁদিবার মত কিছু বলি নি আমি।" বলিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রবি চুপ করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখ এখনও থমথম করিতেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে মিষ্টি দিয়েছে বল্ দেখি?" রবি অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে কহিল, "শ্রীমতী দিদিমা।" সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "শ্রীমতী মিষ্টি দিয়ে গেল কেন?" রবি যথাসম্ভব ঔদাসীন্যের সহিত কহিল, "কার্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলার আজ আশীর্বাদ হয়েছে, তাই।" সুখদা মুখে শুধু কহিল, "তাই নাকি?" কিন্তু মেয়ের মানসিক দুর্যোগের আসল কারণ তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না এবং বুঝিয়া তাহার চিন্তারও সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোর বাবার আসবার সময় হ'ল; খাবার করা হয় নি, চল্ দুজনে মিলে ক'রে ফেলিগে।" রবি তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য মায়ের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল মা।"

(১৪)

বিনয় বাড়ি ফিরিতেই সুখদা কহিল, "আমি তোর বাবার মুখ-হাত ধোবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিগে, তুই এই ক'খানা রুটি সেঁকে নে।" বলিয়া রান্নাঘর হইতে চলিয়া আসিল।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া সুখদা দেখিল, বিনয় স্কুলের কাপড়-জামা ছাড়িয়া ঘরে পরিবার কাপড় ও ফতুয়া পরিয়াছে। ছাড়া কাপড়খানা ধুলোয় লুটাইতেছে, জামাটি আলনায় কোণে আটকাইয়া গিয়া ঝুলিতেছে; টানাটানিতে আলনায় ঝুলানো অন্যান্য কাপড়-চোপড়গুলির অবস্থা অত্যন্ত বিপর্যস্ত। সুখদা ঘরে ঢুকিয়া কাপড়খানা তুলিয়া কোঁচাইতে কোঁচাইতে অনুযোগের স্বরে কহিল, "এমন ক'রে ধুলোয় লোটালে কাপড় আর ক'দিন ফর্সা থাকে বল? মাসে মাসে তোমার জন্যেই ধোপাকে এত পয়সা দিতে হচ্ছে।" বিনয় বেপরোয়াভাবে কহিল, "তাই নাকি?" সুখদা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "তা নয় তো কি? আমার আর কখনো কাপড় ধোপার বাড়ি যায়?" তারপর আলনার দিকে চাহিয়া ধমকের সুরে কহিল, "অমন লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিলে কেন? এই এমন ক'রে গুছিয়ে দিয়ে গেলাম।" বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "ফতুয়া খুঁজছিলাম যে!" ঝংকার তুলিয়া সুখদা কহিল, "ফতুয়া কি ওখানে থাকে যে খুঁজছিলে?" বিনয় কাচুমাচু মুখে কহিল, "ছিল না তো—"

"থাকে না, তা তো জান।"

মাথা চুলকাইয়া বিনয় কহিল, "ভুলে গিয়েছিলাম।" বিনয়ের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সুখদা কহিল, "ভুলে গিয়েছিলাম!" বলিয়া বিশৃঙ্খল কাপড়-চোপড়গুলি গুছাইতে শুরু করিল।

নিজের পরিচ্ছদের প্রতি বার-কয়েক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় কহিল, "কাপড়টা ভারী ময়লা হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার কাপড় নেই?" সুখদা কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, "কোথায় কোন্ রাজ-দরবারে যাবে, শুনি?" বিনয় কহিল, "যাব না তো কোথাও, তবে হেডমাস্টার মশায়ের [illegible] বেড়াতে আসবেন বলেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।" সুখদা চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "তাই নাকি! সেই মাস্টারণী—বি-এ পাস?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। সুখদা কহিল, "তা আমাদের স[illegible] আলাপ করতে আসা কেন? মুখ্যু মেয়েমানুষ আমরা।" বিনয় কহিল, "কি জানি? ঢোক গিলিয়া কহিল, "বোধ হয় শিগ্‌গির চ'লে যা[illegible] যাবার আগে সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।" ভুরু কুঁচকাইয়া সু[illegible] কহিল, "তা তোমার সাজগোজ করতে হবে কেন? তোমার গলায় আর মালা দিতে আসছে না।" বিনয় কহিল, "তাই বলছি নাকি? [illegible] শিক্ষিত মেয়ে, তাদের সামনে এমন ময়লা কাপড় প'রে—" বাধা [illegible] সুখদা ধমকের সুরে কহিল, "তোমার কাপড় আবার ময়লা কিসের? [illegible] আমারটাই ময়লা। বদলাতে হ'লে আমাকেই হবে। কখন আ[illegible] বলেছে?"

"সন্ধ্যের পরে।"

"তবে আর দেরি ক'রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না[illegible] ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা[illegible] টিছানাগুলোও একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখতে হবে।" বিনয় কহিল, "তু[illegible] আলাপ করতে পারবে তো?"

সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "পারব না কেন"

"মানে—শিক্ষিত মেয়ে—বি-এ পাস।"

"হ'লই বা—মেয়েমানুষ তো? সে তোমাকে মাথা ঘামাতে হ[illegible] না—আমি দেখে নেব। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও দেখি—আমি খা[illegible] আনছি।"

রান্নাঘরে আসিয়া সুখদা দেখিল, রবি বিনয়ের খাবার সাজাইতেছে। সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, "রুটিগুলো সেঁকেছিস?" রবি ঘাড় নাড়ি[illegible] 'হাঁ' জানাইল। সুখদা কহিল, "হেডমাস্টারের বাড়ি থেকে বেড়াতে আস[illegible] এখনই—আমি তোর বাবাকে খাইয়ে সব একটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি[illegible] তুই ভাতটা চড়িয়ে দে।"

বিনয় খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টি কোথায় পেলে[illegible]" সুখদা গম্ভীরমুখে কহিল, "ডাক্তারদের বাড়ি থেকে বিলিয়ে গেছে[illegible]" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ওঃ" বলিয়া আবার খাইতে লাগিল। সুখ[illegible] কহিল, "পরেশরা আশীর্বাদ ক'রে এল—তোমাকে একটা খবর দিলে না[illegible]" বিনয় ঘাড় নাড়িল।

"এ পক্ষের হয়ে আশীর্বাদ করলে কে? পরেশের মাসী?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, ঘনশ্যাম।" সুখদা সবিস্ম[illegible] কহিল, "বল কি? এত শত্রুতা করেছে এতদিন!" বিনয় কহিল, "এখ[illegible] ভাব হয়ে গেছে। ঘনশ্যাম এখন কনেঘরের পিসে আর বরঘরের মেসো।" সুখদা ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল, "পরেশও একটা কথা বলে নি তোমাকে?" বিনয় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুখদা ক্ষোভের সহিত কহিল, "এর মধ্যে এ[illegible] পর হয়ে গেলাম আমরা যে, এত বড় একটা সামাজিক ব্যাপারে একা[illegible] নেমতন্ন পর্যন্ত করলে না?" বিনয় কহিল, "পরেশ ছেলেমানুষ তো[illegible] যা করবার ঘনশ্যাম করেছে।" সুখদা কহিল, "তা নয়। পরেশ আমাদে[illegible] ওপরে রাগ করেছে।" বিনয় মাথা নাড়িয়া কহিল, "পাগল নাকি! [illegible] আবার করতে পারে? বুদ্ধিমান ছেলে! সেদিন দুপুরবেলা ও-কথ[illegible] শোনবার পরও রাত্রে নিজে থেকেই রবির সঙ্গে নিজের বিয়ের কথ[illegible] পেড়েছিল।" গভীর বিস্ময়ের সহিত সুখদা কহিল, "তাই নাকি! কই[illegible] আমাকে তো কিছু বল নি!" বিনয় জবাব দিল না। পরম ঔৎসুক্যে[illegible] সহিত সুখদা কহিল, "তুমি কি জবাব দিলে?" বিনয় কহিল, "আমি নিষেধ করলাম। বললাম—ও-সব কাজ নেই, তাতে আমাদের কারও ভা[illegible] হবে না। তা ছাড়া এ বিয়ে হলে আমরা সুখী হব জানিয়ে দিলাম।" ধারালো স্বরে সুখদা কহিল, "তুমি অত কথা বলতে গেলে কেন?" এবা[illegible] বিনয়ের বিস্মিত হওয়ার পালা। সে দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "তা[illegible] মানে? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, ও[illegible] সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না; তারপর আমার কি বলা উচিত ছি[illegible] শুনি?" বলিয়া সুখদার মুখের দিকে তাকাইল। সুখদা বিরক্ত গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া অদূরে ক্রীড়ারতা খুকীকে কহিল, "তোর দিদি[illegible] কাছে যা।" খুকী চলিয়া গেলে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "কাল থেকে[illegible]

[illegible] মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, [illegible]য়াছে। তাচ্ছিল্যের স্বরে সুখদা কহিল, "ছাই দেখেছ!" বলিয়া [illegible] কুঁচকাইল। তারপর কহিল, "তোমার দেখা তো! কাল থেকে মেয়ের [illegible] যেন বাদলার মেঘের মত থমথম করছে; ডাকলে সাড়া মেলে না—[illegible]ই ভাবনা! আজ বিকেলে এমনই কি-না-কি বলতেই কেঁদে ভাসিয়ে [illegible]।" বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "তাই নাকি! কেন বল দেখি?" [illegible]ন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সুখদা কহিল, "তোমার জন্যে! এত বড় [illegible]কে একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে মিশতে দিয়েছ—এখন মেয়ে [illegible]ছে।" বিনয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তার মানে?" সুখদা জবাব দিল, [illegible]র মানে—তাকে ভালবেসেছে" বিনয় শুষ্কমুখে ঢোক গিলিয়া কহিল [illegible]ই নাকি! তা হ'লে কি হবে?" সুখদা কহিল, "কি আর হবে? [illegible]তাতাড়ি মেয়ের বে দাও। রোগের সূত্রপাতেই ওষুধ পড়লে বেশি [illegible]তে হবে না।"

হঠাৎ ববির আর্তনাদ শুনিয়া বিনয় ও সুখদা দুইজনেই চমকিয়া [illegible]ঠিয়া কহিল, "কি হ'ল!" সুখদা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া [illegible]ানে গিয়া দাঁড়াইল, বিনয়ও খাওয়া বন্ধ করিয়া প্লাসের জলে হাত ধুইয়া [illegible]হার অনুসরণ করিল। খুকীর চীৎকার শোনা গেল—"ওমা! দিদির [illegible]য়ে ভাতের ফ্যান প'ড়ে গেছে—"

"ওমা! কি হবে!" বলিয়া সুখদা রান্নাঘরে ছুটিল; বিনয়ও [illegible]হার পাছু পাছু রান্নাঘরে আসিল। দেখিল, ববি উবু হইয়া বসিয়া [illegible]ই পায়ের পাতায় দুই হাত চাপিয়া যন্ত্রণাকুঞ্চিত মুখে বসিয়া আছে; [illegible]মনে ভাতের হাঁড়িটা কাত হইয়া পড়িয়াছে; কতকগুলো ভাত ছড়াইয়া [illegible]ড়য়াছে ও হাঁড়ির মুখ হইতে ফ্যান গড়াইয়া পড়িয়া মেঝের উপর বহিয়া [illegible]ইতেছে। সুখদা কহিল, "কি হ'ল?" ববি ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিল, [illegible]ঠাৎ হাত থেকে ফস্কে হাঁড়িটা উল্টে গেল।" সুখদা উদ্বেগের স্বরে [illegible]হল, "খুব পুড়েছে তো?" সামনে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, "হাত [illegible]ড়ো দেখি, কতটা পুড়েছে।" ক্ষোভের স্বরে কহিল, "একটা কাজ করতে [illegible]লে এই করিস— কি যে করবি এর পরে!" বিনয় কহিল, "থাক, এখন [illegible]ার বকতে হবে না।" ববিকে কহিল, "দাঁড়া দেখি, চলতে পারবি?" [illegible]বি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

"থাক, আর চ'লে কাজ নেই এখন।"—বলিয়া বিনয় ববিকে পাঁজা-[illegible]কোলা করিয়া এধারের বারান্দায় আনিয়া বসাইয়া দিল। তারপর পায়ের [illegible]বস্থা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, "এঃ! পুড়ে একেবারে ঝলসে [illegible]গেছে!" সুখদাকে ডাকিয়া কহিল, "শুনছ! একটু নারকেল তেল আর [illegible]ুনের জল মিশিয়ে লাগিয়ে দাও—আমি একবার পরেশকে ডেকে আনি।" —বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরেশের বাড়ির সামনে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেই পরেশের মাসী [illegible]খিল খুলিয়া দরজা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া মিহিগলায় কহিলেন, "কে?" [illegible]বনয় জবাব দিল, "আমি বিনয়—পরেশ কি বাড়িতে আছে?" মাসীমা [illegible]জবাব দিলেন, "না।"

"সে কি কোন ডাকে বেরিয়ে গেছে?"

"না—ওপাড়ায় একবার দেখুন দেখি।"

বিনয় "আচ্ছা, দেখছি" বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতেই [illegible]মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়িতে কি কোন অসুখ হয়েছে?"

বিনয় জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমার বড় মেয়েটা ভাতের ফ্যান গালতে [illegible]গালতে পা পুড়িয়েছে।"

মাসীমা ভীতিসূচক ধ্বনি করিয়া কহিলেন, "ওমা, কি হবে! আপনি ডাক্তারদের ওখানে দেখুন গিয়ে। এর মধ্যে যদি আসে তো পাঠিয়ে দেব।" বিনয় কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির দিকে ছুটিল।

(১৫)

ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে ছোট-খাটো মজলিস বসিয়াছিল। কার্তিক-ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন, তাহার সামনে ও পাশে গ্রামের চার-পাঁচজন মুরুব্বী-গোছের লোক—কেহ চেয়ারে কেহ বেঞ্চিতে, বসিয়া ছিলেন। কার্তিক ডাক্তারের ঠিক ডান পাশে একটা টুলে ঘনশ্যাম আলোয়ান মুড়ি দিয়া বসিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছিল। আগামী বিবাহ-উৎসবের আয়োজন ও আয়তনের সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতেছিল।

ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল, "সাতদিন আগে থেকে নহবৎ বসাতে হবে। বড়জুড়ির রমেশ ডোমকে আমি ব'লে পাঠিয়েছি বায়না নিতে আসতে।" হারু গাঙ্গুলী ডাক্তারের অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি—কহিল, "দূর তোমার রমেশ ডোম! মুখেই কেবল [illegible] [illegible] দশ বছর ধ'রে শুনেছি সেই এক গৎ। [illegible] নতুন [illegible] গান বেরিয়েছে আজকাল—একটাও—" চোখ ঘুরাইয়া, "[illegible] কহিল, "বাজাতে জানে না। শহরে সেদিন শুনে এলাম—" [illegible] ভেংচাইয়া কহিল, "শহরেও রমেশের বায়না আসে—[illegible] এল সেদিন—" পরেশ চক্রবর্তী দুই হাত তুলিয়া কহিল, "[illegible] থাম!—রমেশও আসুক, শহর থেকে বরং একদল ইংরিজী বাজনার ব্যবস্থা কর। গাঁয়ের লোক কখনও শোনে নি—শুনে তাক্ লেগে যাবে একদম!" কার্তিক-ডাক্তার কাসিতেই সকলে চুপ করিল। পরাণ গাঙ্গুলীর হাতে সটকাটা তুলিয়া দিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমি ভাবছি—ও-সব বাজে খরচ না ক'রে গাঁয়ের বামুনদের ঘর-ঘর এক-একটা ক'রে পেতলের গামলা দেব।" পরাণ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "সাধু যুক্তি!" বলিয়া কাসিতে লাগিল।

ঘনশ্যাম মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সে আপনি যা ইচ্ছে করবেন, কিন্তু কমলা-মায়ের বিয়েতে বাজনা-বাদ্যি হবে না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। আপনি খরচ না দেন, আমি নিজে খরচ দেব।"

হারু হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেই সকলে একযোগে চমকিয়া উঠিয়া তাহার দিকে তাকাইল। হাসি সামলাইয়া ঘনশ্যামের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া হারু ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "কার্তিক-ডাক্তার কি দেউলে হয়েছে নাকি যে, তোমার খরচে মেয়ের বিয়ের বাজনা করতে হবে?" বুক চাপড়াইয়া কহিল, "হারু বেঁচে থাকতে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা ক'রে দেব আমি। তোমাদের ঘর-ঘর এক-একটা গামলা হবে, এক-একখানা গামছা হবে, নহবৎ, রসুনচৌকী, ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ সব হবে।"

এমন সময়ে ডিস্পেন্সারির সামনে আসিয়া বিনয় হাঁক দিল, "পরেশ রয়েছ?" হারু হাঁক দিয়া কহিল, "কে হে? বিনয় নাকি? এস, এস।" বিনয় কহিল, "না ভাই যাব না। পরেশ রয়েছে নাকি? থাকে তো পাঠিয়ে দাও একবার।"

হারু উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি ব্যাপার! হঠাৎ পরেশের জন্যে ছুটোছুটি? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ নাকি হে?" বিনয় কহিল, "আমার বড় মেয়েটা ফ্যান গালতে গালতে পা পুড়িয়ে বসেছে।" ঘনশ্যাম ঘরের ভিতর হইতে টিপ্পনী কাটিল, "সামান্য পা পুড়েছে, তো পরেশের কি দরকার? একেবারে বাঁধা মাইনের চাকর নাকি?" তাহার কথায় কান না দিয়া বিনয় হারুকে কহিল, "পরেশ নেই বুঝি? কোথায় আছে বলতে পার?" হারু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "জানি না তো।" বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই ঘনশ্যাম হাঁক দিয়া কহিল, "তাকে এখন পাবে না হে—এখান থেকেই বরং একটু ওষুধ নিয়ে গিয়ে লাগাও গে, যাও।"

কোন জবাব না দিয়া বিনয় দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

হারু আসিয়া বসিয়া ঘনশ্যামকে কহিল, "পরেশ কোথায় আছে জান নাকি?" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "জানি বইকি! বাবাজী তো এ পাড়া ছাড়া আর কোথায়ও থাকেন না আজকাল।" পরাণ সটকাটা কার্তিকের হাতে দিয়া কহিল, "তোমাদের শ্রীমতী মালিনী মাসী থাকতে, থাকবার জো কি? তবে দুহাত এক না হওয়া পর্যন্ত ওগুলো ভাল নয়। কথায় বলে—ভাল কাজে বিঘ্ন অনেক।" ঘনশ্যাম কহিল, "দুহাত এক হয়েই গেছে ধরুন। আশীর্বাদ হয়ে গেছে—তত্ত্ব-তল্লাস হয়ে গেছে, আর বাকি কি? এখন দুটো মন্ত্র পড়িয়ে হাতে তুলে দিলেই হ'ল—তা পৌষ মাসটা না গেলে তো কিছু হবার জো নেই। ততদিন শ্রীমতীর ওখানেই আসর বসুক।" কার্তিক মৃদুহাস্যসহকারে কহিলেন, "কি হয় ওখানে?" ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "কি আর হবে? শালী-শালাজ-দিদিমা-ঠাকুমা সম্পর্কের মেয়েরা ওকে নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করে আর কি! অবশ্য বিয়ের পরেই ও-সব করার রীতি। তবে পরেশ তো গাঁয়ের ছেলে, ঘরের ছেলে, তাছাড়া সৎ-শিক্ষিত ছেলে।"

পরেশ চক্রবর্তী কহিল, "তা বিনয় ছোকরা ছুটল কোথায়, পরামর্শটা পছন্দ হ'ল না বুঝি?" ঘনশ্যাম ভুরু নাচাইয়া কহিল, "দিগ্‌বিদিকে। কথায় বলে—মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—বিনয়ের তাই হয়েছে কিনা! ভেবেছিল—দুটো বাবা-বাছা ব'লে, পিঠে হাত বুলিয়ে বিনা পয়সায় মেয়েটিকে গছিয়ে দেবে। পাড়ার পাঁচজনের পরামর্শে তা' ভেস্তে গেল। এখন তাই—"

হারু কহিল, "কি তাই—"

—"আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখছে—"

পরেশ কহিল, "পোড়া-পুড়ি তা'হলে মিথ্যে?" মাথার ঝাঁকানি

[illegible] কহিলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, [illegible]!" একটুখানি চুপ করিয়া [illegible] কহিল, "অন্তত যতটা যাড়লাড়ি করছে, ততটা নয়। রান্নাবান্না [illegible] হোলে মেয়েদের অমন একটু-আধটু পুড়েই থাকে—আর তার জন্যে [illegible] পাস ডাক্তার ডাকবার দরকার হয় না।" চোখ দুইটা বুজিয়া, মাথাটা উপরে-নীচে নাড়িয়া কহিল, "শহুরে মেয়ের বুদ্ধি—বাবা! থই পেতে দেরি হবে।"

(১৬)

শ্রীমতীর বাড়ির কাছাকাছি বিনয় পরেশের দেখা পাইল। দূরে হইতেই চীৎকার করিয়া হাঁকিল, "পরেশ নাকি হে?" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, "কে? কাকাবাবু!" বিনয় কাছে আসিয়া কহিল, "তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা! ভারী বিপদ!" পরেশ উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, "কি হয়েছে?" বিনয় কহিল, "বাবির পা পুড়ে গেছে।" পরেশ ভীতকণ্ঠে কহিল, "সে কি! কি ক'রে পুড়ল? কতটা পুড়েছে? চলুন।" বিনয় চলিতে চলিতে কহিল, "ভাতের ফ্যান গালতে গালতে হাত ফস্কে হাঁড়িটা প'ড়ে যায়—পায়ের পাতা দুটো খুব পুড়েছে। তোমার কাকীমাকে নারকেল তেল আর চুনের জল মিশিয়ে লাগাতে ব'লে এসেছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "শ্রীমতী দিদিমার বাড়িতে, জল খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন।" বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, "এ এক বেশ মুশকিল হয়েছে! রোজ দুবেলা নেমন্তন্ন।"

শ্রীমতী কিন্তু পরেশকে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করে নাই। পরেশই যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিল। কাল বিকালে শ্রীমতী যখন পরেশদের বাড়িতে গিয়াছিল— পরেশ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "ভাল ক'রে দিনে একদিনও দেখা হয় নি দিদিমা! একদিন কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে।" শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "শুধু তোমারই এই দশা, তা নয়—আমাদের রাধা তো বলছিল—দেখে সাধ মেটে নি দিদিমা! বেশ তো! আজই ওবেলা আমার ওখানে যেও—মুখোমুখী ব'সে যত পার প্রাণভরে দেখো দুজন-দুজনকে।"

দেখা আজ হইয়াছিল। দুইজনকে বসাইয়া শ্রীমতী বলিয়াছিল, 'তোমরা দুজনে ব'সে ব'সে গল্প কর ভাই! আমি এক কলসী জল ভরিয়ে নিয়ে আসি চট্ ক'রে।" তারপর মুচকি হাসিয়া চোখের সতর্কতা-সূচক ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছিল, "কিন্তু বিশ্বাস ক'রে দিয়ে যাচ্ছি ভাই। এখনও মন্ত্র-পড়া হয় নি—মনে থাকে যেন। আমি বাইরে শেকল-তালা দিয়ে চললাম—কেউ ডাকলে সাড়া দিয়ে ব'সো না যেন।"—বলিয়া কলস লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার পাশেই কমলা নতমুখে বসিয়া ছিল—মুখে লজ্জা, হর্ষ, বোধ হয়, ভয়ও। তাহার মুখের দিকে পরেশ একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল; বুকের ভিতরটা তাহার কাঁপিতেছিল—সারা দেহের উপর দিয়া একটি কামনার তরঙ্গ গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক মাসের মাত্র ব্যবধান—তারপর গুটিকয়েক মন্ত্র পড়িলেই ঐ দেহের উপর তাহার একচ্ছত্র অধিকার। এখন পাশাপাশি বসিয়াও স্পর্শ করিবার জো নাই, তখন উহার মা-ই হয়তো মেয়েকে নিজহস্তে সজ্জিত করিয়া নিজে বেগ করিয়া তাহার শয়নকক্ষের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। পরেশ কহিল, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "আপনি জানেন না নাকি?" পরেশ কহিল, "জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করছে।" মেয়েটি কহিল, "কমলা।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে পছন্দ হয় তোমার?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইয়া শাড়ির অঞ্চলপ্রান্ত আঙুলে জড়াইতে লাগিল। পরেশ কহিল, "বল না?" মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। পরেশ কহিল, "বেশ! ঘাড় নেড়ে জানাও।" মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ—" পরেশ প্রশ্ন করিল, "আমাকে দেখতে চেয়েছিলে তুমি? দিদিমা বলছিল।" মেয়েটি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, "জবাব দাও না! লজ্জা কিসের? দুদিন পরে তো কথার খই ফুটবে তোমার?" মেয়েটি মুখ লাল করিয়া কহিল, "আপনিও তো চেয়েছিলেন।" পরেশ কহিল, "তুমি চাও নি?" মেয়েটি নীরব। পরেশ কহিল, "আমি সৎ ব্রাহ্মণ, ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি—আমার কাছে কোন কথা লুকোলে পাপ হবে তোমার—আর পাপ হ'লে তোমার বরের অমঙ্গল হবে।" মেয়েটি আড়চোখে চাহিয়া, চোখ ফিরাইয়াই হাসিয়া ফেলিয়াছিল। পরেশ খেদের সহিত কহিল, "চাও নি তো? বেশ!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেই মেয়েটি কহিল, "চেয়েছিলাম, কাউকে বলবেন না কিন্তু।" পরেশ কহিল, "আমাকে ভাল লাগছে তোমার?" মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "জানি না, যান্।" পরেশ মেয়েটিকে স্পর্শ করিবার লোভ সামলাই পারিল না। কহিল, "তোমার হাতটা দেখি।" মেয়েটি বিস্ময়ের স্ব কহিল, "কেন?" পরেশ কহিল, "তুমি জান না বোধ হয়—আমি হা দেখতে জানি, হাত দেখে তোমার বরের খবর ব'লে দেব।" মেয়েটি হা দুইটি কোলের মধ্যে লুকাইল। পরেশ কহিল, "আ রে! হাত লুকো কেন? ওই যে বেলুট থেকে মোটা-মোটা পৈতের গোছা প'রে, পাঁজি-পু বগলে ক'রে গণৎকাররা আসে—তাদের কোনদিন হাত দেখাও নি তুমি আমাকে তাই ভাব না।"

মেয়েটি মুচকি হাসিল। পরেশ কহিল, "দেরি ক'রো না লক্ষ্মী এখনই দিদিমা এসে পড়বে। আমারও তো জানা দরকার, যার স আমার বিয়ে হবে, সে ভাগ্যবতী কিনা।" মেয়েটি ডান হাতটি বাড়াই পরেশ দুই হাতে করতল চাপিয়া ধরিয়া, প্রসারিত করিয়া, করতলের রে গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, কোমল-কর-স্পর্শ সমস্ত অ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে কহিল, "কি দেখছেন?" পরেশ যেন স পাইয়া কহিল, "ভাল! খুব ভাগ্যবতী তুমি।" হাতটি টিপিয়া কহি "কিন্তু তোমার হাতটি তো ভারী নরম, কমলা!" কমলা হাতটি ছাড় লইয়া কহিল, "বাবির চেয়েও?" পরেশ কহিল, "বাবির হাত তো কোন দেখি নি, জানব কি ক'রে?" কমলা কহিল, "এতদিন চিকিচ্ছে করে হাত দেখেন নি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "চিকিৎসকের মত দেখেছি—গণৎকারের মত তো দেখি নি।" মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইতেই পরেশ কহি "ও কি হচ্ছে?" মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমি সব জানি

পরেশ সাগ্রহে কহিল, "কি জান?"

মেয়েটি মুখ নামাইয়া কহিল, "পরে বলব।" পরেশ অনুনয় ক কহিল, "এখনই বল না।"—বলিয়া খপ্ করিয়া কমলার বাহুমূল চা ধরিল। কমলা চক্ষের কোণ হইতে বিদ্যুৎ হানিয়া, মৃদু তর্জনের স কহিল, "ও কি হচ্ছে? ছাড়ুন।"—বলিয়া সরিয়া বসিয়া কহিল, "ত কিছু জানি না।"

এই চকিত চাহনি, তীব্র-জড়িত-কণ্ঠস্বর, সভয়ে সরিয়া বসা, পরে মনে খোঁচা দিয়া তাহার মুখ-চোরা, ভীতু পৌরুষকে বেপরোয়া ক তুলিল; বুকের মধ্যে হৃৎযন্ত্রটা লাফালাফি শুরু করিয়া দিল, স্নায়ু শিরার মধ্যে উত্তপ্ত রক্তস্রোত উন্মত্তবেগে বহিতে লাগিল, মাথার ভিত ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল, এককথায় সমস্ত দেহ চীৎকার করিয়া নি অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে, রহস্যময় স্বরে সে ক "ভয় কিসের তোমার?" মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ত যাই।" পরেশ কহিল, "দুদিন পরে একই বিছানায় আমার কাছে শুতে লজ্জা করবে না তোমার—আজ এত লজ্জা!" মেয়েটি মুখ করিয়া উঠানে নামিয়া গেল।

দরজা খোলার শব্দ হইতেই মেয়েটি লেবুগাছের কাছে গিয়া দাঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া ক "কিলো ও কি করছিস? ভাব হয়ে গেছে বুঝি? এরপর শরবত খাওয়া যোগাড় করছিস?" মেয়েটি ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "যা

"আচ্ছা, আসি, দাঁড়া—" বলিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বাঁকাইয়া চাহিয়া শ্রীমতী কহিল, "বেড়ালকে বিশ্বাস ক'রে মাছ গিয়েছিলাম, দাঁতটাঁত বসাও নি তো, হে?" পরেশ হাসিতে লাগিল।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই কমলা হঠাৎ কাছে আসিয়া পরেশের তাকাইয়া শ্রীমতীর উদ্দেশে কহিল, "চললাম দিদিমা।" শ্রীমতী কহি "সে কি লো" কি কথাবার্তা হল আগে বল্ শুনি।" মেয়েটি কহিল, চললাম।"—বলিয়া মন্থরগতিতে বাহির হইয়া গেল।

পরেশ চিন্তাবিষ্টভাবে চলিতেছিল, হঠাৎ বিনয় কহিল, "বাব কি বাড়ি হয়ে যাবে?" পরেশ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি রাস্ত সংযোগ স্থলে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে—সোজা রাস্তা দিয়া বাবিদের ব যাওয়া যায়, ডানদিকের রাস্তাটা তাহাদের বাড়ির সামনে দিয়া গিয়া পরেশ কহিল, "হ্যাঁ, আপনি চলুন। আমি ওষুধ-পত্তর নিয়ে এখ যাচ্ছি।"

(১৭)

বিনয়ের বাড়িতে আসিয়া পরেশ ডাক দিল, "কাকাবাবু!" বি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "এস, বাবাজী।" ফিসফি করিয়া কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের শালী বেড়াতে এসেছেন।" পা

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই নাকি! কোথায় রয়েছেন?" বিনয় জবাব দিল, "ববির কাছে।" পরেশ কহিল, "তা হ'লে সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে?" বিনয় সাহস দিয়া কহিল, "তাতে কি? শিক্ষিতা মেয়ে সকলের সামনেই বেরোন, এস।"

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, ববি খাটের উপর শুইয়া আছে। মাথার দিকে খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া আছে একজন মহিলা, বয়স বাইশ কি তেইশ—রং ফর্সা—পান-পাতার ধরণের মুখের ডোল; চোখ দুইটি বড় না হইলেও বুদ্ধি ও চাতুর্যে উজ্জ্বল; ভ্রূ দুইটি সূক্ষ্ম ও কেশবিরল; নাকটি টিকলো না হইলেও সুগঠিত ও সুন্দর; পাতলা রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট (লিপস্টিক লাগাইয়াছে কিনা কে জানে); ঠোঁট ও চিবুকের মাঝখানে একটি বাঁকা খাঁজ, মাথায় এলোখোঁপা; কাণ দুইটি চুলে ঢাকা, কানের পাতায় হীরা বসানো (নকল নিশ্চয়ই) সোণার ফুল; পরিধানে কালোপাড়ওয়ালা শাদা শাড়ি, লম্বা হাতা কামিজের মত কলার-ওয়ালা বেগুণী রঙের সার্জের ব্লাউস; হাতে চারগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। মহিলাটি চেয়ারে বাম পায়ের উপর ডান পা চাপাইয়া জানুর উপর খাড়াভাবে স্থাপিত হাতের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া গম্ভীর বদনে ববির বিছানায় উপবিষ্টা সুখদার কথা শুনিতেছে।

পরেশ ঢুকিতেই সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া কহিল, "এস, বাবা!" মেয়েটিও পোজ বদলাইয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিনয় বিনীত হাস্যে মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ইনিই আমাদের—বুঝেছ বাবা!" পরেশ যুক্তহস্তে মহিলাটিকে নমস্কার করিতেই মহিলাটি প্রতিনমস্কার করিল। বিনয় কহিল, "দাঁড়াও বাবা! আর একটা বসবার কিছু আনি।" বলিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এইটাতে বসুন না।" পরেশ কহিল, "আপনি বসুন, আমি বসছি এখানে।" বলিয়া ববির বিছানায় তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

ববি চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল; পরেশ বসিতেই একটু সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরেশ কহিল, "থাক্ যেমন শুয়েছিলে তেমনই থাক। দেখি পাটা!" বিনয় লণ্ঠন লইয়া কাছে আসিল। পায়ের অবস্থা দেখিয়া পরেশ কহিল, "ফোস্কা হয়ে গেছে দেখছি। তবে পোড়াটা বিশেষ গভীর নয়—ভয়ের কারণ নেই—" ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "জ্বালা করছে নাকি?" ববি পরেশের দিকে তাকাইয়াছিল—চোখে চোখ মিলিতেও চোখ না ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "করছে"। পরেশ বিনয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, বার কয়েক লাগালেই জ্বালাটা কমে আসবে"—বলিয়া আবার ববির দিকে তাকাইতেই আবার চোখে চোখ মিলিল। ববির দৃষ্টি সন্ধ্যাকাশে শুকতারার মত, স্থির, উজ্জ্বল ও করুণ। সেই দৃষ্টির স্নিগ্ধ ধারায় পরেশের সারা দেহে যে কামনার অগ্নিশিখা এখনও জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া গেল, অশান্ত মন শান্ত হইল। ববির বিষণ্ণ, সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশের মনে হইল, এই মেয়েটি তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপের প্রভায় তাহার হৃদয়কে আলোকিতই করে আন্দোলিত করে না।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ মহিলাটির দিকে তাকাইল দেখিল, সে সুখদার সহিত কথা বলিতেছে; আবার মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "একটা কিছু পাত্র নিয়ে আসুন দেখি।" বলিয়া পকেট হইতে ওষুধ ও তুলার প্যাকেট বাহির করিল। সুখদা তাড়াতাড়ি একটা প্লেট আনিয়া হাজির করিল। তাহাতে ঔষধ ঢালিয়া তুলা ভিজাইয়া পরেশ ববির পায়ে লাগাইয়া দিবার উপক্রম করিতেই ববি কহিল, "আপনি পায়ে হাত দেবেন না। মাকে ডাকুন।" পরেশ আদেশের সুরে কহিল, "পা নেড়োনা ফোস্কা গ'লে গেলে ঘা হয়ে যাবে।" কোমল সুরে কহিল, "অসুখে দোষ নেই, এরপর না হয় একটা প্রণাম ক'রে নিও।" বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই মহিলাটির সহিত দৃষ্টিসংযোগ ঘটিল। মহিলাটি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ আর উঠে প্রণাম ক'রে কাজ নেই। মনে মনেই প্রণাম কর।" পায়ে ওষুধ লাগাইতে লাগাইতে পরেশ কহিল, "ঠিক বলেছেন—আজ আর ওঠা চলবে না; একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি—খেয়ে নাও এখনই।" বলিয়া সুখদাকে কহিল, "এক গ্লাস জল আনুন দেখি কাকীমা।"

সুখদা জল আনিতে গেল। পরেশ বাম হাতে পকেট হইতে একটি ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিল। মহিলাটি কহিল, "ফোস্কাটা গেলে দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিন না। রাত্রে যদি গ'লে যায় তো, যা-তা লেগে বিষিয়ে উঠতে পারে।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "না গালাই ভাল, যদি গ'লে যায় তো তাই করতে হবে। তবে খুব সাবধানী মেয়ে, যা বলবেন তা ঠিক ঠিক ক'রে যাবে; সেবার অসুখের সময়ে দেখেছি তো।" ববির উদ্দেশে কহিল, "বেশি পা-টা [illegible] ফোস্কাটা গ'লে গেলে ঘা হয়ে যাবে, অনেক দিন ভুগতে হবে তা হ'লে।" ববি ঘাড় নাড়িয়া আদেশ পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু হয়তো মনে মনে বলিল, "ভুগিতে হইলেই তো ভাল—ততদিন আপনার দেখা পাওয়া যাইবে। সারিয়া উঠিলে আপনিও তো সরিয়া যাইবেন, আর মাথা ঠুকিলেও দেখা দিবেন না।"

সুখদা এক গ্লাস জল আনিয়া ঔষধ খাওয়াইতে আসিতেই পরেশ একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, "খাইয়ে দিন।" সুখদা কাছে যাইতেই ববি উঠিয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, "পরেশদাদাকে প্রণাম করব, পায়ে হাত দিয়েছেন।" সুখদা মৃদুস্বরে, অবশ্য সকলকে শুনাইয়া কহিল, "খেয়ে নাও, তারপর করবে।" পরেশ কহিল, "বললাম যে কাল করবে, আজ নড়া-চড়া না করাই ভাল।" সুখদা কহিল, "সেই ভাল—কালই ক'রো মা!" ববি মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

ববি শুইয়া পড়িলে বিনয় সুখদাকে কহিল, "তুমিই বরং ওষুধটা লাগিয়ে দাও। পরেশ বাবাজী মিস্ মিত্রের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করুক।" পরেশকে কহিল, "তুমি উঠে এস বাবা!" ইতিমধ্যে খুকী একটা চেয়ার আনিয়াছিল, পরেশ আসিয়া তাহাতে বসিল; বিনয়ও লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া তাহার কাছে আসিবার উপক্রম করিতেই সুখদা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমিই লাগিয়ে দাও, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে।"

সুখদা ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি কহিল, "আমার জন্যে হাঙ্গামা করবেন না কিন্তু।" পরেশ কহিল, "আমার জন্যে একটু করুন শুধু একটু চা।" বিনয় কহিল, "হাঙ্গামা আবার কিসের! দয়া ক'রে একদিন বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন।" মহিলাটি হাসিয়া কহিল, "পা-না দিতে দিতেই এই বিপত্তি—আর কোথাও যাব না ভাবছি; যা পয়মন্ত মেয়ে আমি।" বিনয় অপ্রতিভভাবে কহিল, "সে কি কথা! কত সৌভাগ্য আমাদের!" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়াছিল, হাসি চাপিয়া কহিল, "সত্যি।" মহিলাটিও হাসি চাপিয়া বিনয়ের উদ্দেশে কহিল, "আপনাদের ডাক্তারবাবু কিন্তু আপনার কথা সমর্থন করেন না।" বিনয় প্রতিবাদ করিল, "না না, তা আবার হয়! ভারী ভাল ছেলে আমাদের পরেশ।" পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "আপনার দর্শন পাওয়া সত্যই আমাদের সৌভাগ্য।" মহিলাটি ভ্রূ দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, দৃষ্টি ঈষৎ তির্যক করিয়া কহিল, "সত্য নাকি!" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। পরেশ লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "ওর দোষ নেই—মানে কার্তিকবাবু আপনাকে দেখছেন কিনা।" সুখদা আসিয়া কহিল, "আপনাকে একবার একটু উঠতে হবে।" পরেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমাকেও বাবা!" মহিলাটি কহিল, "আমাকে বাদ দিন, আমার তো শরীর এমনই ভাল নয়।" সুখদা কহিল, "এমন কিছু নয়, একটু চা আর—"। মহিলাটি কহিল, "আর-আর না, শুধু চা একটু—এইখানেই দিন দয়া ক'রে।" বিনয় বলিয়া উঠিল, "সেই ভাল। ঐখানে একটা টুলের ওপর—"। সুখদা স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া ধারালো স্বরে কহিল, "হাত ধোবেন না!—" মহিলাটিকে সবিনয়ে কহিল, "তা কি হয়! আপনি একটু উঠে আসুন দয়া ক'রে।" পরেশকে কহিল, "তুমিও হাতটা ধুয়ে ফেল বাবা!" পরেশ হাত ধুইতে গেল; মহিলাটিও অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, চলুন। কিন্তু ভারী লজ্জিত হচ্ছি আমি। বাড়িতে এই বিপদ, তার ওপর এসে আপনাদের ব্যস্ত করলাম।" সুখদা কহিল, "ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন! উনি তো পালিয়ে গিয়ে দায়ে খালাস হলেন। একা আমি যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আসতে তবু সাহস পেলাম।"

বাহিরে বারান্দায় আসন পাতিয়া খাবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরেশ ঘরের ভিতরে আসিয়া কহিল, "আমারটা এখানে আনুন কাকীমা!" সুখদা কহিল, "তা কি হয় বাবা! উনি একা একা খাবেন।" পরেশ কহিল, "বা রে! উনি হচ্ছেন আপনাদের মান্য অতিথি—ও'র সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিচ্ছেন কেন? তা ছাড়া আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ—সভ্য-ভব্য হয়ে খাওয়া আমাদের পোষায় না।"

খাওয়ার পরে মেয়েটি ঘরে আসিয়া বসিল। পরেশ চা খাইতেছিল। সুখদা আসিয়া সাক্ষাতে কহিল, "কিছু খেলেন না, সব প'ড়ে রইল।" মেয়েটি কহিল, "রাত্রে কিছু খাই নে আমি। আপনি নেহাৎ অনুরোধ করলেন তাই।" পরেশ কহিল, "আমার দিকে তাকিয়ে মনোবেদনা দূর করুন।" কৃত্রিম দুঃখের সহিত কহিল, "শুধু প্লেটটা আর পেরে উঠি নি।"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনার স্বাস্থ্য ভাল, প্লেট খেলেও হয়তো হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো তা নয়।"

বিনয় কহিল, "আপনার স্বাস্থ্যের কিছুই উন্নতি হয়নি এখানে?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না। ভাল লাগছে না আর, চ'লে যাব শিগ্‌গির।"

বিনয় কহিল, "আরও দিন কয়েক দেখুন না, জল-হাওয়ার ফল ফলতেও সময় লাগে, তা ছাড়া—"

"তা-ছাড়া কি?—"

"ডাক্তার বদলাতে হবে। আমি তো বলেছি মাস্টার মশায়কে—"

"আর ভাল ডাক্তার কই এখানে?"

বিনয় পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কেন? আমাদের পরেশ?"

মেয়েটি আড়চোখে পরেশকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, "তা' উনি তো যাবেন না।" বলিয়া ঠোঁটের দুই প্রান্ত একটু কুঁচকাইল।

বিনয় কহিল, "শুনছ বাবা পরেশ, কি বলছেন!" পরেশ চা খাইতে খাইতে কিসের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়—বিনয়ের ডাক শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কি বলছেন?" বিনয় কহিল, "তুমি ও'কে দেখতে যাও নি ব'লে উনি রাগ করেছেন।"

পরেশ কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার আমেজ লাগাইয়া কহিল, "দেখুন—আমি সত্যি ভারী লজ্জিত। কিন্তু যেখানে একজন ডাক্তার দেখছেন, সেখানে তাঁর অনুরোধ ছাড়া আর কারও ডাকে আমাদের যাওয়া চলে না।" মেয়েটি কহিল, "সে ডাক্তার যদি আপনাকে ডাকতে না চান, আর, অন্য কারও ডাকে যদি আপনি যেতে না চান, তা হ'লে রোগী কি করে বলুন তো?" বলিয়া দুই উজ্জ্বল চোখ মেলিয়া পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ চোখে চোখ মিলিতেই মুখ নামাইয়া লইল। মেয়েটি কহিল, "জবাব দিন।" বিনয় কহিল, "তুমি কেন ইতস্ততঃ করছ বাবা! একদিন গিয়ে দেখে এস না। এখন তো কার্তিক ডাক্তার কিছু মনে করবে না—নিজের শ্বশুর যখন—"

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "মানে?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "মানে খুব সোজা—কার্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিয়ে হবে আসছে মাঘ মাসে—সব ঠিক হয়ে গেছে।" মেয়েটি মুচকি হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তাই নাকি!" পরেশ গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিল।

সুখদা আসিয়া কহিল, "আপনাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।" মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তা হ'লে আমি আসি।" বিনয়কে কহিল, "আপনার মেয়ের জন্যে ভারী চিন্তিত থাকব—কাল দয়া ক'রে খবর দেবেন।" বিনয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "নিশ্চয়! খবর দেব বই কি!" সুখদা স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ও'র তো সবই মনে থাকবে! নিজের চোখেই তো দেখলেন কেমন মানুষ! আমিই ঝিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব কাল।" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "মনে থাকবে বইকি! পরেশ বাবাজী তো বাড়িতে ছিল না—খুঁজে নিয়ে আসতে হ'ল, না হ'লে—।" মেয়েটি ঔৎসুক্যের স্বরে কহিল, "কোথায় ছিলেন—শ্বশুর-বাড়িতে বুঝি?" বিনয় কহিল, "ঠিক শ্বশুরবাড়িতে নয়, ধারে-পাশেই।" মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল; পরেশ লজ্জিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, "আচ্ছা, নমস্কার।" সুখদাকে কহিল, "নমস্কার দিদি। বিপদের দিনে এসে বিরক্ত করে গেলাম।" সুখদা কহিল, "ছি ছি, সে কি কথা!" মেয়েটি কহিল, "চলি তবে, কাল একটা খবর দেবেন।"—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বিনয় পরেশকে কহিল, "তোমারও তো এক রাস্তা—ওঁর সঙ্গেই চ'লে যাও।" মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই নাকি! আসুন না।" পরেশ কহিল, "আচ্ছা, চলুন।" বিনয়কে কহিল, "ববি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওষুধের শিশিটা খুব সাবধানে রাখবেন—বিষ; আর ওই প্লেটটাও ভাল ক'রে ধোবার ব্যবস্থা করবেন। কাল সকালে এসে দেখে যাব।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছনে তাকাইয়া মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি এত পিছিয়ে পড়ছেন কেন? আসুন না। এখনই ধ'রে নিয়ে যাব না—ভয় নেই।" পরেশ কাছে আসিয়া লজ্জিতমুখে কহিল, "ধ'রে নিয়ে যেতে হবে কেন? আদেশ করেন তো কালই যাব।" মেয়েটি ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া কহিল, "আদেশ! আমার আদেশ করবার অধিকার কি পরেশবাবু? কিছু মনে করবেন না—নাম ধ'রেই ডাকলাম। আমার নাম আরতি, ইচ্ছে হ'লে আপনিও ওই নামে আমাকে ডাকতে পারেন।" দুই-জনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি ভাবছেন বলুন তো?" পরেশ কহিল, "কিছু না।" আরতি কহিল, "আমি লোকের মনের কথা ব'লে দিতে পারি,—বলব—কি ভাবছেন?" পরেশ কিছু না বলিয়া শুধু হাসিল। আরতি কহিল, "আপনি বিনয়বাবুর মেয়েকে মনে মনে গালাগালি দিচ্ছেন।" পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "হেতু?" মেয়েটি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিল, "আপনি হয়তো খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, মেয়েটা হঠাৎ একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে তাতে বাদ সাধল।"

স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটির এই গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতায় পরেশের মনটা সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল; নীরসকণ্ঠে কহিল, "কি এমন ব্যাপার! তা ছাড়া বাবুকে আমি নিজের ছোটবোনের মত স্নেহ করি।" আরতি অপ্রতিভমুখে কহিল, "সত্যি! নিজের চোখেই তো দেখলুম।" গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?" পরেশ কহিল, "রাগ কিসের?" আরতি কহিল, "ভাবলেন, আচ্ছা অভদ্র মেয়ে তো! এক ঘণ্টার আলাপেই লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনধিকারচর্চা শুরু ক'রে দিয়েছে।"

পরেশ অবশ্য ইহাই ভাবিতেছিল ও মনে মনে বিরক্তিবোধ করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না না, তা ভাবব কেন?" আরতি কহিল, "আমার এই রকমই স্বভাব। সবাই কত বকাঝকা করে, শোধ্‌রাতে পারি না কিছুতেই।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি বলিতে লাগিল, "দু'মিনিটের আলাপেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসি—মনেই হয় না নতুন আলাপ; যদিও বুঝতে পারি সবাই পছন্দ করে না।" পরেশ কহিল, "আমাকে দয়া ক'রে 'সবাই'এর দলে ফেলবেন না। আপনার বন্ধুত্ব পেলে নিজেকে ধন্যই মনে করব।" আরতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "সত্যি?" পরেশ কহিল, "সত্যি তো!" আরতি চোখ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "বেশ! কাল তা হ'লে বন্ধুর বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন—ঠিক বেলা চারটার সময়ে গিয়ে হাজির হবেন।" পরেশ কহিল, "যাব, নিশ্চয়।"

বাড়ির সামনে আসিয়া থামিতেই মেয়েটিও থামিয়া কহিল, "থামলেন যে!" পরেশ কহিল, "এই আমাদের বাড়ি।" মেয়েটি কহিল, "তাই নাকি! একদিন আসব আপনাদের বাড়ি। আপনি তো আর নেমন্তন্ন করবেন না, নিজে হতেই আসব।" পরেশ কহিল, "নেমন্তন্ন করব না জানলেন কি ক'রে?" মুখ টিপিয়া হাসিয়া মেয়েটি কহিল, "জানি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "জামাইবাবু এতবার ক'রে যেতে বললেন—একদিনও গেলেন না।"—বলিয়া মুখটি ম্লান করিয়া তুলিল।

পরেশ কহিল, "দেখুন, ও-কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না। আপনাকে বললাম যে, অন্য ডাক্তারের রোগীকে তাঁর বিনা অনুরোধে দেখতে যেতে আমাদের ডাক্তারি এটিকেটে বাধে।" মেয়েটি কহিল, "বেশ কাল যাবেন তো?"

"নিশ্চয়! কাল তো আর ডাক্তার হিসেবে যাব না, বন্ধু হিসেবে যাব।" চোখ দুইটি বড় করিয়া মাথাটি হেলাইয়া মেয়েটি কহিল, "কিন্তু আপনার ভাবী শ্রীমতী আমাদের বন্ধুত্ব পছন্দ করবেন তো?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি ক'রে জানব?"

"কাল সকালে বরং একবার জিজ্ঞেসা করবেন।"

"দেখা না হ'লে জিজ্ঞেসা করব কি ক'রে?"

"দেখা হয় না? একবারও না?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া জানাইল, 'না'। মাথায় ঝাঁকানি দিয়া মেয়েটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "এক গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে, দেখা হয় না, বিশ্বাস করব না।"

পরেশ আরতির দিকে তাকাইয়া রহিল। উহার সহজ, সরল ও সংকোচহীন ব্যবহার তাহাকে মুগ্ধ করিল। যে নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষটি হাতে লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, সে অদূরে হাঁ করিয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কহিল, "মাসীমা! রাত হ'য়ে যাচ্ছে।" আরতি একমুহূর্তে গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "সত্যি! নমস্কার! চললুম। কাল যাবেন কিন্তু, অপেক্ষা ক'রে থাকব।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

পরেশও নমস্কার করিয়া অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৮)

পরদিন সকাল আটটার সময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া হাজির হইল। গায়ে ফ্লানেলের ফতুয়া ও পশমী আলোয়ান, পায়ে চটি জুতা। বিনয় বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া পরেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রে ফোস্কা গলিয়া গিয়াছে। সকালেই বিনয় পরেশকে খবর দিতে গিয়াছিল। পরেশ এখনই আসিবে বলিয়াছে।

ঘনশ্যাম আসিয়া বারকয়েক কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "কি হে, কেমন আছে তোমার মেয়ে? পরেশকে পেয়েছিলে কাল?" বিনয় কহিল, "পেয়েছিলাম। বসবেন, আসুন।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আর বসব না। কাল রাত্রে যে রকম ছুটোছুটি করছিলে দেখেছিলাম—তাতে কালই খবর নিয়ে যাব ভেবেছিলাম; কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেল—তা কেমন আছে মেয়ে?" বিনয় বিষণ্ণমুখে কহিল, "কাল তো পরেশ বাবাজী লাগাবার ও খাবার দুই ওষুধই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিল; রাত্রে ঘুমিয়েওছিল। সকালে দেখছি, ফোস্কা গ'লে গেছে, তা ছাড়া জ্বরও হয়েছে মনে হচ্ছে।" ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "ওতে ভয়ের কোন কারণ নেই। তাড়সে একটু জ্বর হয়েছে। কাল অত ছুটোছুটি না ক'রে, সংগে সংগে একটু পোড়া তেল লাগিয়ে দিতে তো কিছু হ'ত না;—তোমার আবার সবই বাড়াবাড়ি কিনা!" বিনয় কহিল, "ওষুধ তো লাগানো হয়েছিল—নারকেল তেল আর চুণের জল, কিন্তু—" ধমকাইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "আরে, রেখে দাও তোমার নারকেল তেল আর চুণের জল!" প্রসারিত করতল তির্যক্‌ভাবে নাড়িয়া কহিল, "স্রেফ্ পোড়া তেল! এমন ওষুধ আর নেই।" ভ্রূভংগী করিয়া কহিল, "এখনও তাই করগে যাও,—ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হবে না।"—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বিনয় কহিল, "কোথায় চলেছেন?" ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, "বেয়ানের কাছে।" বিনয় ঔৎসুক্যের স্বরে কহিল, "আপনার আবার বেয়ান কে?" ঘনশ্যাম ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, "কেন? আমাদের পরেশের মাসী হে! আমাদের সব বেয়ান হচ্ছে না? নতুন বেয়ান—।" বিনয় কহিল, "সকালবেলায়?"

"জরুরী দরকার—বিয়ের সব ফর্দ হচ্ছে কিনা? কাল এদিকের সব হয়ে গেছে। এখন গয়নার আর বরাভরণের ফর্দটি তো ওদের মত নিয়ে করতে হবে? সময় তো আর নেই—মাঝে একটি মাস; তা পৌষ মাসে তো ও শুভকর্মের কিছু করা চলবে না। যা করতে হবে এই মাসেই।" বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই আবার থামিয়া কহিল, "তা ডাক্তার যা খরচ করব বলছে, তাতে বিয়ের মত একটা বিয়ে হবে বটে! বামুনদের ঘর-ঘর এক-একটা ক'রে গামলা আর একখানা ক'রে গামছা, গাঁ সুদ্ধ লোকের তিনদিন ভোজ, শহর থেকে ইংরেজি বাজনা। মেয়ে-জামাইকেও দেবে খুব—মেয়ের গা-ভর্তি গয়না, বেনারসীর জোড়, জামাইকে হীরের আংটি, রূপোর দান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। তা ছাড়া, যা সব দেবার—" চক্ষে ইংগিতময় ভংগী করিয়া কহিল, "তা তো দেবেই, অবশ্য দুদিন পরে। আচ্ছা, চলি। সময় বড় সংক্ষেপ। অথচ অত বড় একটা ব্যাপারের ভার আমাদের ক'জনের ঘাড়ে।" পা কয়েক গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম আত্মীয়তার সুরে কহিল, "তোমার মেয়ে যে আবার এ সময় ফ্যাসাদ ক'রে বসল, না হ'লে এই লগ্নেই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেই হ'ত। বয়স হয়েছে ঢের, আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।" বিনয় কহিল, "পাত্র কই?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাত্রের অভাব কি? বেশী ঘাড় না উঁচিয়ে সমান-সমান ঘরে খুঁজে দেখ, পাবে। আচ্ছা, চলি।" বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল।

বিনয় ঘরে ফিরিতেই সুখদা কহিল, "কি বলছিল?" বিনয় কহিল, "পরেশের বিয়ের নাকি ফর্দ হচ্ছে, খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে হবে—অনেক টাকা খরচ করবে ডাক্তার।" সুখদা নীরসকণ্ঠে কহিল, "আছে তাই খরচ করবে, আমাদের মত তো নয়।" বিনয় কহিল, "তা' পরেশের মত ছেলে, খরচ না করলে চলবে কেন? পাড়াগাঁয়ের ছেলে তাই, না হ'লে শহরে ও ছেলের দাম দশ হাজার টাকা।" সুখদা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "কে 'না' বলছে।" ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "পাত্রের কথা কি বলছিল না?" বিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "হ্যাঁ। বলছিল বাবির জন্যে পাত্র খুঁজতে বেরুতে।" সুখদা দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "খুব অন্যায় কথা বলছিল কি?" বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সুখদা কহিল, "সত্যি। বেরোও এবার, এই তো এক বিপদ হয়েছে; পায়ে পোড়া দাগ হয়ে যাবে, এর জন্যে যে কত ভোগান্তি হবে তার ঠিক নেই।" বিনয় কহিল, "এমন কি পুড়েছে যে দাগ হয়ে যাবে? হ'লেও ওষুধের গুণে দাগ মিলিয়ে যাবে।" সুখদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মিলিয়ে গেলেই ভাল।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "পরেশ তো এখনও এল না।" অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "সত্যি গিছলে তো?" বিনয় জোরের সহিত কহিল, "বা রে! গিছলাম বই কি! পরেশ বললে এখনই যাচ্ছি। বোধ হয় ঘনশ্যাম আটকে দিয়েছে।"

"ও বুঝি পরেশের কাছেই গেল?"

"ঠিক পরেশের কাছে নয়, ওর মাসীর কাছে; গয়নার ফর্দ করতে; খুব ফপরদালালি করছে ঘনশ্যাম, যেন ওরই মেয়ের বিয়ে।"

পরেশের ডাক শোনা গেল, "কাকাবাবু!" বিনয় সাগ্রহে সাড়া দিল, "এস বাবাজী!" বৈঠকখানায় পা দিতেই পরেশের আবির্ভাব ঘটিল—মালকোচা মারিয়া কাপড় পরা, গায়ে শার্ট ও কোট, পায়ে জুতা; কহিল, "চলুন, দেখিগে। বাবি কোথায়?"

পরেশ মুখের ইংগিতে জানাইল, "ওই যে ওখানে ব'সে আছে।"

উঠানের মাঝখানে বেশ রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল; সেখানে মাদুর পাতিয়া খুকী পড়িতেছিল; বাবি তাহার পাশে শুষ্কমুখে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

জুতার শব্দ শুনিয়া বাবি মুখ নামাইল; খুকী বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "এই যে পরেশদাদা এসেছেন।" পরেশ কাছে আসিয়া বাবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?" বাবি জবাব দিল না। সুখদা একটা মোড়া আনিয়া দিতেই পরেশ বসিয়া কহিল, "গরম জল কতকটা করুন দেখি; আর পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় থাকে তো বার করুন; তুলোর প্যাকেটটা কাল রেখে গেছি, সেটাও আনুন।" সুখদা ও বিনয় দুইজনেই চলিয়া গেল।

উঠানের এক পাশে কতকটা জমি বেড়া দিয়া ঘেরিয়া সব্জীর বাগান করা হইয়াছে। লাউগাছগুলি লতাইয়া লতাইয়া মাচায় উঠিয়াছে—মাচা হইতে দুই-চারিটা বড় বড় লাউ ঝুলিতেছে। বেগুনগাছগুলিতে ফুল আসিয়াছে—কচি কচি বেগুনও ধরিয়াছে। শাকের ক্ষেত ভরিয়া অজস্র সবুজ ও সতেজ পুনকো শাকের চারা। বেড়ার ধারে ধারে সারিবদ্ধ চন্দ্রমল্লিকা ও গাঁদা গাছগুলিতে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "ওঃ, খুব ফুল ফুটেছে তো!" খুকীকে কহিল, "খুকী! তুমি আমাকে একটা গাঁদা ফুলের মালা ক'রে দাও দেখি।" খুকী বাবির দিকে তাকাইয়া কহিল, "যাব দিদি?" পরেশ কহিল, "আবার অনুমতি চাই নাকি?" খুকী কহিল, "বা রে! দিদির গাছ, কাউকে ফুল তুলতে দেয় না—" পরেশ কৃত্রিম অভিমানের সহিত কহিল, "থাকগে খুকী, কাজ নেই।" বাবি খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুই পারবি না, আমি মালা গেঁথে দেব এখন।"

বিনয় তুলার প্যাকেট লইয়া আসিল। পরেশ কহিল, "ফোস্কাটা যে রকম গলেছে ওটাকে ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।" বাবির দিকে চাহিয়া কহিল, "কাল এত ক'রে ব'লে গেলাম একটু সাবধান হতে—" বাবি লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "তা ও কি করবে? ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলে, খুব ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে কি কিছু খেয়াল থাকে?"

সুখদা গরম জল লইয়া আসিয়া বিনয়কে কহিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে পেলে আর কিছু খেয়াল থাকে না, একটা ধোয়া পুরোনো কাপড় আনতে হবে না?" বিনয় কহিল, "কি ক'রে আনব! তোমার কাছেই তো চাবি।" ঝঙ্কার দিয়া সুখদা কহিল, "আমি কি চাবি নিয়ে দেশান্তরি হয়েছি নাকি! চেয়ে নিতে পার না?" চাবি লইয়া বিনয় কাপড় আনিতে গেল।

পায়ের ব্যবস্থা করিতে বসিয়া পরেশ খুকীকে কহিল, "তুমি মিছেমিছি দাঁড়িয়ে না থেকে আমার জন্যে এক কাপ চা ক'রে আন দেখি।" সুখদা কহিল, "ও থাক্ বাবা! আমিই যাচ্ছি। কাল একজন এক কাণ্ড করেছেন, আজ আবার উনি কি ক'রে বসবেন। যতদিন বাঁচব সব নিজেই করব, কারও কিছু ক'রে কাজ নেই।" রান্নাঘরে যাইতে যাইতে কহিল, "কেমন অদেষ্ট! যেমন স্বামী, তেমনই ছেলে-মেয়ে, ম'লেই হাড় জুড়োয় আমার।"

কাঁচি দিয়া ফোস্কার নরম চামড়া কাটিতে কাটিতে পরেশ খুকীকে কহিল, "তা হ'লে তুমি নেহাৎ বেকার দাঁড়িয়ে থাকবে খুকী! বেশ, চা না করতে পার, পান সাজতে পারতো, তাই সেজে রাখগে দুটো আমার জন্যে। কাকীমা কি রকম রেগে গেছেন, দেখছ তো! কাজকর্ম করগে যাও।" খুকী চলিয়া যাইতেই পরেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হাত ফস্‌কে হাঁড়ি প'ড়ে গেল—কি ভাবছিলে?" বাবি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, "কি, বল না?" বাবি মৃদু বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "কি আবার ভাবব?" পরেশ ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া বাবির মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, "এমনই কি কারও হাত ফস্‌কায়? নিশ্চয় কিছু ভাবছিলে?" তারপর আবার মুখ নীচু করিয়া নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবছিলে, নয়? কত আলো হবে। কত বাজনা বাজবে। পাল্‌কী চ'ড়ে 'হিস্কোর-হিস্কোর' শব্দ করতে করতে বর এসে হাজির হবে—ইয়া লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় গোঁফ। কোলে ক'রে নামাবে কে?

নয়কাকা তো ভয়ে এতটুকু! তখন কনের পরেশদাদা [illegible] কোলে করে সরে নিয়ে আসবেন।" সহসা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল ববির দুই চোখ হইতে অশ্রুধারা নামিয়াছে। বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "ওকি! কাঁদছ কেন? লাগছে নাকি?" ববি নতমুখে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "তবে?"

বিনয় আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "হ্যাঁ মা, লাগছে?" ববি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বিনয় কহিল, "হয়ে গেছে, মা! আর দেরি নেই, এখনই ভাল হয়ে যাবে।"

পরেশ নীরবে ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল—"বউ রয়েছিস নাকি গো?" বিনয় পিছন ফিরিয়া তাকাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "কে?" বিনয় কহিল, "শ্রীমতী বামনী।" পরেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল, "তাই নাকি?" শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই বিনয় কহিল, "এস পিসী।" শ্রীমতী কাছে আসিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া ভীতস্বরে কহিল, "হয়েছে কি?" বিনয় কহিল, "এই দেখ না পিসী শুকনো বিপদ—কাল রাত্রে ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে পা পুড়িয়েছে।" সুখদাও আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী কহিল, "এত বড় মেয়ে—ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারে না! মেয়েকে কিছু শেখাস নি নাকি বউ। দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে।" সুখদা কহিল, "সবই করতে পারে তো, কাল কি রকম হয়ে গেছে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিপদ যখন আসে, পিসীমা, তখন কি আনাড়ী-নুড়ো বাছে।" শ্রীমতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা বটে।" একটুখানি [illegible] হাসি হাসিয়া [illegible] দিয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, "তবে কি জানিস বউ, কাল যখন বিকেলে এলাম, তখন দেখি তোর মেয়ে ধ্যানে ব'সে আছে, সাতবার ডাক দিয়েও সাড়া দিলে না। আমাদের [illegible] সঙ্গে ছিল, জিজ্ঞাসা করে দেখিস ওকে, আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো—" মাথা নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "এই বয়স, এমন সব সময় মনের স্ফূর্তিতে থাকবে। তা না থেকে, এত [illegible] ভাবনাটা কিসের ওর বল্ দেখি? কিছু মনে করিস না এই তোদের ভালর জন্যে বলছি।" সুখদা মুখ কালি করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আমি তেমন তো কিছু দেখি নি, পিসীমা! তবে কি জানেন, [illegible] ওর অভ্যাস—বই-টই পড়ে কিনা একটু, সময় পেলেই পড়ার কথা ভাবে।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "পড়াশুনা করে যদি পড়ে মরতে হয় তো সে সব পড়া বন্ধ কর্ বউ! আমাদের গরিব গেরস্থের মেয়ে অত সব দরকার কি?" বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আজকাল যে দরকার হচ্ছে পিসি! পড়াশুনা জানা মেয়ে না হ'লে ছেলেরা বিয়ে করতে চাচ্ছে না।" অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া শ্রীমতী কহিল, "পছন্দ করছে না! এই যে আমাদের কমলা, কটা পাস করেছে শুনি? পেরথম ভাগও সবটা পড়ে নি বোধ হয়।" চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "তা তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করনা তোমাদের ওই ডাক্তারবাবুটিকে।"

পরেশের কাজ সারা হইয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সাবান আর জল আনুন কাকিমা, হাতটা ধুতে হবে।" পরেশ শ্রীমতীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি খবর দিদিমা! আজ সকালবেলাতেই এ পাড়ায় শুভাগমন!" শ্রীমতী মুচকি হাসিয়া কহিল, "শুভাগমন কি সাধে হয় ভাই! গরজ বড় বালাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" পরেশ কহিল, "একটু দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিই।" শ্রীমতী গম্ভীর হইয়া কহিল, "না ভাই, এত দেরি করা চলবে না। তোমার বোধ হয় দেরি হবে। একটা কথা—একবার এদিকে এসে শুনে যাও।" পরেশ শ্রীমতীর পাছু পাছু বাড়ির বাহিরে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। শ্রীমতী কহিল, "পরের মেয়ের পদসেবা করছ—ও-দিকে আমাদের রাধা যে ছটফট্ করছে।" পরেশ কহিল, "মানে?" শ্রীমতী কহিল, "মানে আর কি? কাল তুমি চ'লে আসবার পরই ও আবার ফিরে এল। জিজ্ঞেসা করলাম—কি লো, আবার এলি যে! তখন গরব ক'রে চ'লে গেলি! শ্যাম আমাদের রাগ ক'রে চ'লে গেল, আর আসবে না বলেছে। তা শুনে কি ভয়, ভাই! মুখখানি শুকিয়ে গেল। তা ভাই আজ যেয়ো, মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে যাচ্ছি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আর দেখ, মেয়েদের পা টিপতে যদি ভালই লাগে, তো পরের মেয়ের পা টেপবার দরকার নেই। এক বাটি তেল গরম ক'রে রাখব, যতক্ষণ প্রাণ চায় আমাদের কমলার পা টিপো ব'সে ব'সে।" যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "যেয়ো কিন্তু, না গেলে আর কথা কব না এ জীবনে।"

ফিরিয়া আসিতেই বিনয় কহিল, "কি বলছিল শ্রীমতী?" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "এমনই একটা কথা।" বিনয় চোখ পাকাইয়া কহিল, "ভারি শয়তান মাগী! পরের ছিদ্র খোঁজাই কাজ ওর।" হাত ধুইয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, "আজ আর ববিকে ভাত খেতে দেবেন না। একটু জ্বর হয়েছে—মনে হচ্ছে।" সুখদা শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। কিছুক্ষণ পরে সুখদা কহিল, "কি সব যা-তা ব'লে গেল বাবা! আমায় ভয় হচ্ছে—এর পর বোধ হয় সারা গাঁয়ে মেয়ের কুৎসা রটাবে। যা ভয় করি তাই হয় বুঝি-বা; মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হবে আমার।" বলিতে বলিতে সুখদার কণ্ঠস্বর অশ্রুঘন হইয়া আসিল। বিনয় সাহস দিয়া কহিল, "এত ভয় কিসের? মিথ্যে কুৎসা রটালেই সবাই ওর কথা বিশ্বাস করবে কিনা।" সুখদা খনখনে গলায় কহিল, "করবে না কেন শুনি? কেউ তোমাকে তোয়াক্কা করে? তুমি হালকা লোক ব'লেই তো সবাই যা-তা বলতে সাহস করে তোমার মেয়ের নামে। কই, আর কারও মেয়ের নামে বলুক দেখি? এই যে এত কথা মুখের সামনে ব'লে গেল, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে তুমি?" পরেশ নীরবে চা খাইতে লাগিল; ববি নতমুখে বসিয়া মাদুরের উপর আঙুল ঘষিতে লাগিল।

ববির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সুখদা কহিল, "ওই মেয়ের জন্যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে বোধ হয়।" ববির উদ্দেশে কহিল, "কাল কি অত তুই ভাবছিলি লা? কিসের তোর ভাবনা?" পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আপনার অন্যায়, কাকিমা! কে কি ব'লে গেল, আর তা বিশ্বাস ক'রে আপনি ওকে ধমকাতে শুরু ক'রে দিলেন!" সুখদা কহিল, "না বাবা পরেশ! এই স্বামী আর মেয়েদের নিয়ে আর আমি পারছি না। এদের কারও বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, নিজেদের ওজন বুঝে চলা নেই। একা আমি কত সামলাই বল তো? তার উপর, এই রকম গাঁয়ের লোক,—একটা ভাল কথা বললে যদি উপকার হয়, মরে গেলেও কেউ তা বলবে না; কিন্তু নিন্দের একটি [illegible] পেলে বাতাস দিয়ে দিয়ে অগ্নিকাণ্ড ক'রে তুলবে। এত বড় মেয়ের যদি দুর্নাম রটে তো ওর কি বিয়ে হবে ভেবেছ? দুর্নামের ভয়ে তোমার মত ছেলেকে পর্যন্ত যখন-তখন বাড়িতে আসতে মানা করেছিলাম, তুমি তো জানো বাবা!" পরেশ নীরবে বসিয়া রহিল। বিনয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুখদা বিনয়কে কহিল, "শুনছ! কালই আমি মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাই। পৌষ পড়লে আর যাওয়া হবে না—মেয়ের বিয়ে দিতে পারি তো গাঁয়ে ফিরব, না হ'লে আর ফিরবই না।"

(১৯)

সেদিন সারাদিন ধরিয়া দুইটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরেশের মনকে দুই দিক হইতে টানিতে লাগিল। একদিকে কমলার যৌবনমুকুলিত কোমল মসৃণ দেহের কবোষ্ণ স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা, আর একদিকে এক সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিকভাবাপন্ন তরুণীর সাহচর্যলাভের আকাঙ্ক্ষা। দুই দিকেই টান সমান; কেহ কাহারও চেয়ে একটু কম নয়। একবার মনে হইল, কমলার কাছে যাওয়াই ভাল। শ্রীমতী সকালে কথায়-বার্তায়, হাসিতে ও চাহনিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কমলা হয়তো আজ ধরা দিবে; শ্রীমতী হয়তো আজও অবাধ সুযোগ দিবার জন্য জল আনিবার ছলে বাহির হইয়া যাইবে, তখন সেই নির্জন ঘরে আত্মরক্ষার সকল অস্ত্র সংবরণ করিয়া কমলা হয়তো তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে। বিবাহের পূর্বে ভাবী বধূর সহিত এই নিবিড় সহযোগলাভ পাড়াগেঁয়ে হিন্দুছেলের পক্ষে এমন একটি অভূতপূর্ব সৌভাগ্যলাভ যে, ভাবিতেও পরেশের সারাদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে লাগিল ও বুকের রক্ত মদের মত ফেনিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল কাজ নাই। কমলার সহিত তো এক মাস পরেই বিবাহ হইবে, তখন তো তাহাকে পরিপূর্ণভাবেই পাওয়া যাইবে। এত তাড়াতাড়ি তাহার কুমারী-সুলভ তিক্ত-মধুর প্রতিরোধ-প্রবণতাটিকে নিরস্ত করিয়া লাভ কি? সম্প্রতি বিদেশিনী, নব-পরিচিতা, সুশ্রী মেয়েটির সঙ্গচর্চা করাই যুক্তিসংগত। মেয়েটি দুই দিন পরেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে বলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত আর হয়তো কখনও দেখা হইবে না। অথচ মেয়েটির কথায় বার্তায় বুঝা গিয়াছে যে, সে তাহার বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেছে; [illegible]

নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া কাল স্বল্প-পরিচয়ের মধ্যেই মেয়েটির আলাপ ও আলোচনায় এমন একটি সরস অন্তরঙ্গতা ও তাহার আহ্বানের মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গলাভের জন্য মন ভিতরে-ভিতরে লোভাতুরও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, তাহার কর্তব্য-বুদ্ধি তাহাকে তাগিদ দিতে লাগিল। সে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ; কেহ যদি কার্তিকের পুরাতন, মরিচাধরা চিকিৎসা-প্রণালীতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে অস্বীকার করিবে কেন? অবশ্য গ্রাম ও গ্রামান্তরের অনেক লোক এই কারণেই তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে), কিন্তু তাহাতে সে পুলকিত হইয়া উঠে না। কিন্তু এই সুন্দরী মেয়েটি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাহার সারা অন্তর শুধু যে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, বরং তাহার মনে হইতেছে, যদি সে তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা এই মেয়েটির উপর প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে বিদ্যা নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আজ সকালে ববির অশ্রুসিক্ত মুখখানি দেখিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এ কয়দিন সাংসারিক সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া সে তাহার মনকে বুঝাইয়া জোর করিয়া কমলার দিকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে তাহারই জন্য ববির হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতে তাহার মন লাভ ও ক্ষতির নূতন করিয়া হিসাব করিতে শুরু করিয়াছে। কাজেই যাহাদের লইয়া তাহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহাদের সাহচর্য অপেক্ষা যে নারীর দ্বারা তাহার জীবনে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার সাহচর্যই স্পৃহনীয় মনে হইল।

চারিটা বাজিতে না বাজিতে পরেশ দাড়ি কামাইতে বসিল। কাল কামাইয়াছে, আজ কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গালে হাত দিয়াই মনটা খুঁতখুঁত করিয়া উঠিল। ববি বা কমলা জীবনে কেবল তাহারই সঙ্গে ...ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে; তাহা ছাড়া তাহারা পল্লীগ্রামের অন্যান্য যুবক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহার শিক্ষা ও দীক্ষায় এমনই মুগ্ধ যে, তাহার চেহারা বা পোশাকের ত্রুটী তাহাদের লক্ষ্যই হয় না। কিন্তু এ মেয়েটি আজন্ম শহরে বাস করিয়াছে, শিক্ষালাভ করিয়াছে, কত শিক্ষিত শৌখিন ও সুশ্রী যুবকের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই তাহার নাসিকা-কুঞ্চন এড়াইতে হইলে ফিটফাট হইয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে।

দাড়ি কামাইয়া, সাবান দিয়া হাতমুখ ধুইয়া, ধোপদস্ত কাপড় ও ...জের পাঞ্জাবি পরিয়া শাল গায়ে দিয়া সে যখন বাহির হইতে উদ্যত, এমন সময়ে মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী কিজন্যে ডেকে গেছে। তাছাড়া ...ও ডাক্তারের বাড়িতে নেমতন্ন ক'রে গেছে।" অন্যমনস্কভাবে পরেশ কহিল, "আচ্ছা।" মাসীমা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "কোথায় চলেছিস এখন?" পরেশ কহিল, "একটু কাজ আছে।" মাসীমা কহিলেন, "যাবি ঠিক মনে ক'রে, ভুলিস না।" পরেশ জবাব না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে পাকা রাস্তাটি পূর্বদিকে বরাবর চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া স্কুল পার হইয়াও মাইলখানেক গেলে, রাস্তার ...দিকে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ির সদর-দরজা রাস্তার উপর নহে। পাকা রাস্তা হইতে একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া বাড়িটার দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে ; এই রাস্তা দিয়া কয়েক ... গেলেই প্রথমে পড়ে বাড়িটার সদর-দরজা, তারপর আরও কতকটা গেলেই ... বাড়িটার গায়েই একটি ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ি দুইটির ভূতপূর্ব মালিক—এ তল্লাটের একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বৎসর পনেরো পূর্বে তিনি গতাসু হইয়াছেন। তাঁহার সন্তান বলিতে মাত্র একটি কন্যা ছিল; তাহার কলিকাতায় কোন এক ধনী পরিবারে বিবাহ হইয়াছে। স্বামী ও ছেলেমেয়েরা পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করা পছন্দ করে না বলিয়া মেয়েটি এখানে আসিতে পারে না। স্থানীয় একজন লোকের উপরে বাড়ি ও জমিদারির ... দেওয়া আছে। একতলা বাড়িতে হেডমাস্টার মহাশয় নামমাত্র ভাড়া দিয়া বাস করেন। বাড়িটির সম্মুখে বিস্তৃত ধানের জমি, পিছন দিকে ...ক ঘর চাষী কৈবর্ত ও বাউরী-বাগদীর বাস। ইহারা সকলেই এই জমিদারের প্রজা।

পরেশ বাইকে চড়িয়া অচিরে হেডমাস্টারের বাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারকয়েক ঘণ্টা বাজাইতেই একটি বৎসর ছয়ের ...ট ছেলে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাবা বাড়িতে আছেন, খোকা?" ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িল। পরেশ মুশকিলে পড়িল। "মা আছেন" বা "মাসী আছেন?"—প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না ভাবিতে লাগিল। ছেলেটি কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে আপনার গাড়িতে একবার চড়িয়ে দিন না।" পরেশ কহিল, "উঁহু—গাড়ি চড়ানো চলবে না—তোমার মাসীমা বকবেন।" ছেলেটি চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "মাসীমা জানবেন কি ক'রে? তিনি তো বাড়ির ভিতরে।" পরেশ কহিল, "জানতে পারলে বকবেন; তুমি তাঁর মত জিজ্ঞেস ক'রে এস।" ছেলেটি কহিল, "কি বলব?"

"বলবে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে চড়ব?" ছেলেটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "আপনি কিসের ডাক্তারবাবু—আপনার দাড়ি নেই।" পরেশ কহিল, "আছে লুকিয়ে রেখেছি। পরে পরব, দেখবে। তুমি যাও না।" ছেলেটি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মাসী বাহির হইয়া আসিল। পরেশকে দেখিবামাত্র তাহার চোখ ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; নমস্কার করিয়া কহিল, "এসেছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারি নি আসবেন ব'লে। আসুন আসুন।" সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল, "আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আসব না? আমাকে ভাবেন কি?" মৃদু হাসিয়া আরতি কহিল, "কি ভাবি, পরে বলব।" বৈঠকখানায় পরেশকে বসাইয়া আরতি কহিল, "বসুন, আসছি।"

আরতি আজ আসমানী রঙের ঢাকাই শাড়ি পরিয়াছে; রূপালি সুতা দিয়া আধ-ফোটা পদ্ম ফুল তোলা পাড়; গায়ে ফিকে নীল রঙের ব্লাউস; পায়ে চটি; মাথায় লম্বা বেণী দুলিতেছে। কাল লণ্ঠনের আলোতে বেশ ঠাহর হয় নাই, আজ দেখিল, বেশ ফর্সা রং, নেহাৎ ছিপছিপে নয়—বেশ কোমল, (অবশ্য আন্দাজে) মাংসল দেহ।

কিছুক্ষণ পরে আরতি ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে আর একটি মহিলা—ফর্সা রং, ছিপছিপে গঠন, মুখের চেহারা মাঝামাঝি, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তাহাদের আসিতে দেখিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আরতি কহিল, "আমার দিদি—শ্রীমতী সুনীতি দেবী।" পরেশ নমস্কার করিল। মহিলাটিও নমস্কার করিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।" পরেশ বসিতেই সুনীতি ও আরতি বসিল। সুনীতি আরতিকে কহিল, "তোর জামাইবাবুকে ডাকতে পাঠিয়ে দে।" আরতি চলিয়া গেলে সুনীতি কহিল, "উনি ক'দিন থেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ভাবছেন, সময় করতে পারেন নি। কাল খুব ভাগ্যে আরতির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেছে।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি কহিতে লাগিল, "আরতি কমাস ধ'রেই ভুগছে, যেখানে ছিল সেখানের ডাক্তারদের দেখিয়েছিল—কোন ফল হয় নি। তাই এখানে চ'লে আসে। এখানে কার্তিক ডাক্তার এতদিন দেখছিলেন; বিশেষ কিছু ফল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। বিনয়বাবুর কাছে আপনার প্রশংসা শুনে আরতির খুব ইচ্ছে আপনাকে দিয়ে চিকিৎসে করাতে। তাছাড়া কাল আপনাকে দেখে ওর নাকি বিশ্বাস হয়েছে আপনার হাতে ও সেরে উঠবে। আপনি যদি দয়া ক'রে—" পরেশ প্রশ্ন করিল, "কি হয় ও'র?"

সুনীতি জবাব দিল, "বুক ধড়ফড় করে, মনের মধ্যে কি রকম যে হয় বুঝতে পারে না, কখনও চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে—কোন কোন দিন সারাদিন গুম্ হয়ে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, সেইদিন মূর্চ্ছা হয়।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "আমি সব হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারলুম না, আপনি একবার নিজে জিজ্ঞাসা করবেন।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "জীবনে কি কোন আঘাত পেয়েছেন?" সুনীতি কহিল, "আঘাত," ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তা অবশ্য পেয়েছে। অতি অল্প বয়সে মা মারা যান। ওর বাবা আবার বিয়ে করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়পক্ষের দরুণ সংসার নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়েন যে, ওর খোঁজ-খবর করতে অবসর পাননি। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ও ওর মাসীমা অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে মানুষ হতে থাকে, লেখাপড়া শেখে। ও যে বৎসর বি-এ পাস করে, সে বৎসর আমার মা মারা যান, তাতে আমাদের চেয়েও ও বেশি আঘাত পায়। কিন্তু ভারী শক্ত মেয়ে ও; কোন আঘাতই বেশি দিন ওকে কাবু ক'রে রাখতে পারে না। ও বি-টি পড়তে সুরু ক'রে দেয় এবং পাস ক'রে এক মফঃস্বল শহরের স্কুলে চাকুরী পেয়ে কলকাতা থেকে চ'লে আসে। ও যে স্কুলে চাকরি করে, সেটি নতুন স্কুল, মেয়েদের বোর্ডিং নেই। স্কুলের কাছে একটা বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীরা এক সঙ্গে থাকে। ওর সঙ্গে একঘরে আর একটি মেয়ে থাকত, ওরই নীচে কাজ করত। এক-দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও দেখে মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা

করেছে। সেই দেখেই ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তারপর থেকেই এই রোগের সূত্রপাত।”

আরতি আসিয়া কহিল, “পাঠিয়ে দিলাম দুধের মাকে।”

“[illegible] বস্, আমি আসি একটু” বলিয়া সুনীতি উঠিয়া চলিয়া গেল।

দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকা আসিয়া কহিল, “[illegible] কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, “[illegible], সম্প্রতি আমার কোলে চড় দেখি।” বলিয়া তাহাকে কোলের উপর তুলিয়া লইল। আরতি গম্ভীর মুখে কহিল, “[illegible] নষ্ট হয়ে যাবে।” পরেশ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, তবু মুখে বলিল “থাক না।” আরতি খোকার দিকে [illegible] কহিল, “নামো খোকা।” খোকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামিল, আরতি কহিল, “যাও, বাড়ির ভিতরে।” খোকা ভয়ে ভয়ে কহিল, “আমাকে চড়াবেন তো পরে?” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ নিশ্চয়।” খোকা চলিয়া গেলে পরেশ কহিল, “বেশ শান্ত ছেলেটি তো?” আরতি হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ বেশ শান্ত ছেলেটি!” চোখ ও মুখের অপরূপ সুন্দর ভঙ্গী করিয়া কহিল, “ভারী দুষ্টু। জামাইবাবুকে পর্যন্ত ভয় করে না, শুধু আমাকে ভয় করে।” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “তাই তো দেখলাম—এটা কিন্তু একটুখানি ব্যতিক্রম।” ভুরু কুঁচকাইয়া আরতি কহিল, “কেন?” পরেশ কহিল, “ছেলেরা সাধারণতঃ মায়ের চেয়ে মাসীর কাছে বেশি আদর পায়; জানেন না, কথায় আছে—মায়ের কাছে কিলচড়—মাসীর কাছে খালি আদর।”

ক্ষীণ ক্ষুব্ধতার সহিত আরতি কহিল, “তাই নাকি! জানতুম না।” অপ্রতিভতার হাসি হাসিয়া কহিল, “ছেলেমেয়েরা আমাকে একটু ভয় করে—মাস্টারি কাজ কি না?” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আপনি বুঝি আপনার মাকে খুব ভয় করেন।” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “আমার তো মা নেই—”

“বাবা?”

“তিনি তো মার আগেই মারা গেছেন।”

আরতি মৃদু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, “আমারও মা মারা গেছেন, বাবা থেকেও নেই, মাসীমার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম আমি মাসীমাও বৎসর দুই হ'ল চলে গেছেন।” কথাবার্তার বিষয়বস্তু বদলাইয়া দিবার জন্য পরেশ কহিল, “কতদিন চাকরি করছেন?” আরতি জবাব দিল, “এক বৎসরের চেয়ে কিছু বেশি।”

“ছুটি নিয়েছেন বুঝি?”

“হ্যাঁ, শরীরটা খুব খারাপ হতে লাগল। সেক্রেটারী মশায় বললেন—ছুটি নিয়ে শরীর সেরে আসুন। কোথায় আর যাব? মাসীমা নেই—মেশোমশাইয়ের বাড়িতে তো এখন বউদিদিদের রাজত্ব—কাজেই দিদির কাছে এলুম।”

এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া পরম আপ্যায়নের সহিত কহিলেন, “এই যে ডাক্তার আচার্য। এসেছেন দয়া ক'রে! নমস্কার।”

পরেশও নমস্কার করিল। আরতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “তুমি উঠলে কেন? বস, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।” অত্যন্ত বিনীতভাবে পরেশকে কহিলেন, “একটুখানি আসছি।”

আরতি কহিল, “আমিও আসছি একটু ডাক্তার আচার্য।” বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হেডমাস্টার মহাশয় আসিলেন; বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম, দীর্ঘ দোহারা গঠন; মাথার মাঝখানে টাক পড়িতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সামনের চুল পিছন দিকে উল্টাইয়া দিয়া টাক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরিধানে ধুতি, ফ্লানেলের সার্ট, পায়ে চটি। মুখের চেহারা ভারিক্কি ধরণের, কিন্তু প্রয়োজনমত গুরু গাম্ভীর্য বা হালকা হাসি দুই ফুটাইতে পারেন। বসিয়া কহিলেন, “প্রায়ই ভাবি আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসব, কিন্তু এমনই কাজের ভিড় যে, সময় ক'রে উঠতে পারি না। কাল আরতি এসে বললে—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে বিনয়বাবুর বাড়িতে। আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে। বিনয়বাবুর মেয়েটি কেমন আছে?” পরেশ কহিল “ভালই।”

“বিনয়বাবুও তাই বলছিলেন—খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার।” পরেশ কহিল, “আমাকে বরাবরই খুব স্নেহ করেন।”

“শুধু স্নেহ নয়—শ্রদ্ধাও, মহাভক্ত একজন আপনার। মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে যায়।” বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। পরেশও মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আরতির কাছে ওর রোগের কথা শুনেছেন?” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “মিসেস বোস বলছিলেন।” হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, “একটা কি শক পেয়ে ওর ওই রোগ আরম্ভ হয়েছে। চিকিৎসেও অনেক হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠছে না। ওর ইচ্ছে আপনার ট্রিট্‌মেণ্ট দিন কয়েক থাকে—”

আরতি দুই হাতে দুই খাবারের থালা লইয়া হাজির হইল। একটি বাচ্চা চাকর আনিল দুইটা কাচের গ্লাসে করিয়া জল। টেবিলে নামাইতেই পরেশ কহিল, “ওরে বাবা। এ কি কাণ্ড করেছেন!” আরতি আড়চোখে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, “এমন কিছু সাংঘাতিক নয়—কাল তো পেলট না খেতে পেরে দুঃখ করছিলেন।” পরেশ হাসিতে লাগিল। চাকর হাত ধুইবার জল আনিয়া হাজির হইল। আরতি কহিল, “উঠুন হাত ধুয়ে আসুন। জামাইবাবুর ক্ষিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে—লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।” পরেশ চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি? ভারী দুঃখিত।” বলিয়া হাত ধুইতে গেল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আপনি ব্যস্ত হবেন না। ধীরেসুস্থে হাত ধোন” আরতি হাস্যমুখে কহিল, “বারে! আপনার ক্ষিদে পায়নি? তবে ঘনঘন ঢোক গিলছেন যে!” হেডমাস্টার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, “ক্ষিদেও পেয়েছে, ঢোকও গিলছি, তবে সেটা দৈহিক নয়—মানসিক—সামনের খাদ্য খুব লোভনীয় কি না!” বলিয়া অর্থসূচক চক্ষের ইঙ্গিত করিতেই লজ্জিত মুখে তর্জন করিয়া আরতি কহিল, “ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি! দেব দিদিকে ব'লে—”

তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আড়চোখে ইহাদের দিকে তাকাইয়া পরেশের মন হেডমাস্টারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

পরেশ আসিয়া বসিতেই আরতি কহিল, “এবার খেতে আরম্ভ করুন। হেডমাস্টার মশায় কহিলেন, “আর আমি?”

“বারে আপনাকে আবার বলতে হবে নাকি?” অত্যন্ত করুণচক্ষে তাকাইয়া হেডমাস্টার মশায় কহিলেন, “বলতে হবে না? পুরোনো বলে এমনই ফ্যালনা হয়ে গেছি? বেশ, নিজে হতেই খাচ্ছি।” বলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে সুরু করিলেন। আরতি একটা চেয়ারে বসিল। সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই পেয়ালা চা। পেয়ালা দুইটা টেবিলে নামাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “ওকি হচ্ছে! একেবারে ঘাড় গুঁজে খেয়ে চলেছ যে! পরেশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কও।” আরতি হাসিয়া কহিল, “রাগ হয়েছে।” সুনীতি ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, “কেন?”

“আমি ওঁকে খেতে বলি নি, অথচ পরেশবাবুকে বলেছি।” সুনীতি কহিল, “ওঃ! তাই! ওই হচ্ছে আর কি বুড়োবয়সে।” হেডমাস্টার ঝটিতি ঘাড় তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, “কে বুড়ো!” সুনীতি কহিল, “তুমি, আবার কে?” বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “বুড়ো বই কি! পরেশবাবুকে জিজ্ঞেসা কর দেখি, আমাকে বুড়ো বলেন কি না!” পরেশের উদ্দেশে কহিলেন, “হ্যাঁ মশায়, বলুন না।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'না'। হেডমাস্টার চোখ ঠারিয়া কহিলেন, “দেখছ।” বলিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া এক দৃষ্টে পত্নীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আরতি কহিল, “আপনার সাক্ষীকে আপনি ঘুস দিয়েছেন। আমি বলছি—আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনার চুলের শতকরা পঞ্চাশটিতে পাক ধরেছে—আমিই তো কাল আপনাকে দেখিয়ে দিলাম।” হেডমাস্টার মশায় বেপরোয়াভাবে কহিলেন, “ধরুক, চুলে পাক ধরলেই বয়স হয় না—আমার মন একেবারে কাঁচা টসটসে—”

খাওয়া শেষ হইতেই আরতি কহিল, “হাত ধোবেন নাকি?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

“চলুন”—বলিয়া সঙ্গে গিয়া আরতি পরেশের হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

আরতির মুখ পরেশের মুখের পাশেই। তাহার চুল হইতে একটি মৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাহার চিক্কণ ও মসৃণ গাল, ঘাড়ের পাশটা ও ব্লাউসের সীমারেখার উপরে বুকের কতকটা বক্রদৃষ্টিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পূর্ণবিকশিত নারীদেহের মদিরতাময় সান্নিধ্য পরেশের মনের মধ্যে একটি ফিকা নেশার সঞ্চার করিতে লাগিল।

হাত ধোয়া হইলে আরতি তাহার বামবাহু হইতে ঝুলানো তোয়ালেটি

আগাইয়া দিল। পরেশ সন্তর্পণে তোয়ালেটা তুলিয়া লইল; তারপর মুখ মুছিয়া তোয়ালেটা ফিরাইয়া দিবার সময় আরতির হাতে তাহার হাত ঠেকিল এবং সেই মুহূর্তেই আরতির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সহিত তাহার চোখ মিলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ সুনীতিকে কহিল, "আমাদের তো খুব খাওয়ালেন; নিজেরা তো কিছু খেলেন না!" সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমরা খাব এখন।"

হেডমাস্টার মশায় আহার সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার হাতে জল ঢেলে দেবে না?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, আপনি নিজে ধোন গিয়ে।" স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া হেডমাস্টার কহিলেন, "দেখ গো! কি রকম একচোখোমি, এতে রাগ হয় না! তুমিই বল না!" সুনীতি কহিল, "নিজেই ধোও না বাপু!" হেডমাস্টার কহিলেন, "বেশ। নিজেই ধুচ্ছি। কিন্তু হাত থেকে ঘটি প'ড়ে গিয়ে যদি পা ছেঁচে যায় তো, চুন-হলুদ লাগিয়ে দিতে হবে আরতিকে।" আরতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দায় পড়েছে!" জলতরঙ্গ বাজনার মত কলকণ্ঠের হাসি শুনিয়া পরেশের বুকটা শিরশির করিয়া উঠিল।

সুনীতি স্বামীকে কহিল, "তোমার চা রইল—আমি আসছি।" আরতিও যাইবার উপক্রম করিতেই হেডমাস্টার কহিলেন, "চ'লে যাচ্ছ যে!" আরতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ-ভঙ্গী সহকারে কহিল, "কি করতে হবে?" হেডমাস্টার কহিলেন, "কিছু না, চা খাব, ব'সে ব'সে একটু দেখবে না!"

"দায় পড়েছে" বলিয়া মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া আরতি চলিয়া গেল।

হেডমাস্টার মহাশয় চা খাইতে খাইতে কহিলেন, "ছেলেমানুষি দেখে কিছু মনে করবেন না। এরকম করলে ওর মনটা ভাল থাকে। না হ'লে গুম হ'য়ে ব'সে ব'সে কি ভাবে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আজ যেন অনেকটা হাল্কা ভাব দেখছি।"

পরেশ কহিল, "বেড়াতে নিয়ে যান না কেন?"

"আমার তো সময় হয় না, আমার স্ত্রীরও তাই। তবে খোকাকে নিয়ে ও কাছাকাছি মাঠে একটু ঘোরাফেরা করে।"

"আমার মনে হয় বেড়ালে হয়তো উপকার হতে পারে।"

হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, "দেখি, কাজের ভিড়টা কেটে যাক—বড়দিনের ছুটিতে নিজেই চেষ্টা করব।"

খোকা আসিয়া হাজির হইল। বাবার কানে কানে বলিল (অবশ্য পরেশও শুনিতে পাইল), "মা বললেন, বেড়াতে যাবেন।" খোকার বাবা কহিলেন, "ডাক্তারবাবু রয়েছেন, ওঁকে ফেলে?" পরেশ কহিল, "তাতে কি আর হয়েছে। আমার মিস মিত্রর সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার জেনে নিয়েছি—একটু ভেবে-চিন্তে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দেব। কাজেই আমি এখন বাড়ি চলি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মশায় কহিলেন, "আপনার কি বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে?" পরেশ আমতা-আমতা করিয়া কহিল, "না, কাজ আর কি—"

"তা হ'লে চলুন না—একটু ঘুরে আসা যাক।"

"বেশ, চলুন।" বলিয়া পরেশ বসিল।

হেডমাস্টার মহাশয় খোকাকে কহিলেন, "যাও, বাড়িতে বলগে—ডাক্তারবাবুও যাবেন।"

আরতি ও সুনীতি বাহির হইয়া আসিল—কেশ-বেশ প্রায় পূর্ববৎ; বাড়তি—গায়ে রঙিন স্কার্ফ ও পায়ে হিল-তোলা জুতা, সকলে বাড়ির বাহির হইল—খোকাকে লইয়া মেয়েরা আগে, পরেশ ও হেডমাস্টার পিছনে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া সোজা চলিল। কিছুদূরে গিয়া রাস্তা আরও অপরিসর হইয়া আসিল, ডানদিকে সারি-সারি বাঁশের ঝাড়, বামদিকে গভীর ক্ষেত। আরও কিছুদূরে গিয়া তাহারা মাঠের মধ্যে পড়িল; সরু আইলের পথে দুইজন পাশাপাশি যাওয়া যায় না। তাহারা লম্বা সারি বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের ডান ও বাম দুইদিকেই যব, গম ও সরিষার বিস্তৃত ক্ষেত—যব ও গমের গাছে শিষ আসিয়াছে, সরিষার ক্ষেতে অজস্র সরিষা-ফুল ফুটিয়াছে; এক-একটা সরিষার ক্ষেত যেন এক-একটা হরিদ্রাবর্ণের বিস্তৃত কার্পেট। মাঠ পার হইয়া তাহারা একটা আম-কাঁঠালের বাগানে গিয়া পৌঁছিল; গাছে-গাছে কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের কলরবে সারা বাগান মুখরিত। বাগানের একধারে একটা পুকুর, চারি পাড়ে বাবলা গাছের জঙ্গল। পুকুরটার পাশেই একটা চালাঘর; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে যখন আম-কাঁঠালের গাছে ফল ধরে, মালী মাস তিন-চার ধরিয়া ঐ ঘরটিতে বাস করে।

বাগানের মাঝ দিয়া একটি সরু পায়ে-চলা পথ বাগান পার হইয়া ওপারের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। সেই পথ ধরিয়া সকলে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সঙ্গী বদল হইয়াছিল—হেডমাস্টারকে খোকা টানিয়া লইয়া গিয়া মায়ের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিল, আরতি পিছনে পড়িয়া পরেশের পার্শ্ববর্তিনী হইয়াছিল।

আরতি বোধ হয় পাড়াগাঁ অনেকদিন দেখে নাই; আবদারের সুরে হরেক রকমের প্রশ্ন করিতেছিল,—ও গাছটা কি? ও ফুলটা ভারী সুন্দর তো! কি ওর নাম? কেমন চমৎকার একটা পাখী উড়ে গেল দেখলেন! কি নাম বলুন দেখি ওর? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরেশ যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। এই সুন্দরী মেয়েটির সাহচর্য বিন্দু বিন্দু রসক্ষরণ করিয়া তাহার হৃদয়-পাত্র ভরিয়া দিতেছিল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাইতেছে; সারা আকাশটা আবীরের মত রাঙা; পূর্ব দিগন্ত ঘন কুহেলিকায় অস্পষ্ট; ভিজা মাটির সংস্পর্শে হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। আরতি সবুজ রঙের স্কার্ফটি ঘনতর করিয়া জড়াইয়া কহিল, "শীত করছে।" হেডমাস্টার ও সুনীতি অনেকটা দূরে আগাইয়া গিয়াছিল। আরতি পরেশকে কহিল, "জামাইবাবুকে ডাকুন না।" পরেশ কহিল, "ওঁর পুরো নাম তো জানি না।" বিস্ময়ে দুই চোখ বড় করিয়া আরতি কহিল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি! এতক্ষণ আলাপ করলেন, ভাল ক'রে নাম জিজ্ঞাসা করেন নি?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"এর আগে বুঝি আলাপ ছিল না?"

পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল—'না'—

"কিন্তু উনি তো আপনার সব জানেন।"

"তাই তো দেখছি।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "ওঁর পুরো নাম কি?" আরতি গম্ভীরমুখে কহিল, "হাবলচন্দ্র বোস—ডাকুন ওই নাম ধ'রে।" পরেশ হাঁকিল—"হাবলবাবু!" হেডমাস্টার মহাশয় সাড়া দিলেন না। পরেশ কহিল, "সাড়া দিচ্ছেন না তো?" আরতি ভ্রূ দুটি কিঞ্চিৎ তুলিয়া কহিল, "আপনি ডাকতে পারছেন না—বেশ ফীলিং দিয়ে ডাকুন দেখি।" পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "সে আবার কি!" আরতি হাসি চাপিয়া কহিল, "জানেন না—ডাকার মত ডাকলে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সাড়া দেন—আমাদের হাবলবাবু তো সামান্য মানুষ। আর একবার ডাকুন দেখি বেশ ক'রে।" পরেশ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, "হাবলবাবু-উ-উ—" কোন সাড়া মিলিল না। আরতি ডাকিল, "দিদি!" সুনীতি 'কি' বলিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল—হেডমাস্টারও দাঁড়াইলেন। আরতি কহিল, "পরেশবাবু যে জামাইবাবুকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?" দুইজনে ফিরিল। কাছে আসিতেই আরতি কহিল, "কর্তা-গিন্নীর কি এমন আলাপ হচ্ছিল শুনি, যে একজন ভদ্রলোক ডাক দিলেও শুনতে পান না!"

হেডমাস্টার মশায় লজ্জিতমুখে পরেশকে কহিলেন, "ডাকছিলেন নাকি! শুনতে পাই নি—মাপ করবেন।"

পরেশ কহিল, "তাতে আর কি। চলুন এর পর ফেরা যাক।" আরতি কহিল, "না না, এখনই না—চলুন ওই পুকুরটা দেখিগে।" হেডমাস্টার কহিলেন, "না না, এখন আর পুকুর দেখতে হবে না—অন্ধকার হচ্ছে—বাড়ি চল।" আরতি ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "বেশ চলুন।" পরেশ কহিল, "তাই একবার চলুন না, হাবলবাবু! যখন দেখতেই চাচ্ছেন।" হেডমাস্টার বিনীত হাস্যে কহিলেন, "দেখুন আমার নাম হাবলবাবু নয়, অবশ্য আপনার যদি ওই নামেই আমাকে ডাকতে ভাল লাগে তো ডাকতে পারেন।" ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, "তাই নাকি! তবে যে উনি বললেন—" হেডমাস্টার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "ও ঠিকই বলেছে; ওর নিজের নাম 'হাবলী' কিনা—সে দিক দিয়ে আমাকে হাবল ব'লে ডাকাই উচিত, তবে আমার পিতৃদত্ত নাম—সত্যেন্দ্র, পদবী বোস।" আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "বা রে! আমার সঙ্গে কি? আমি তো ওঁকে ঠিক নামই বলেছিলাম। উনি বললেন, ওঁর চেহারা দেখে অত কড়া নাম ব'লে মনে হচ্ছে না—ওঁর নাম নিশ্চয় হাবলবাবু।"

পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কই, আমি তো তা বলি নি।" সুনীতি কহিল, "ওর কথা ছেড়ে দিন পরেশবাবু! ও ওই রকম।" আরতি অভিমানের সুরে কহিল, "বেশ! আমারই সব দোষ।" বলিয়া গট গট করিয়া পুকুরটার দিকে চলিল। সুনীতি কহিল, "কোথায় যাচ্ছিস?" আরতি নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, "দেখতেই তো পাচ্ছ পুকুরে।" সুনীতি কহিল, "না না, আজ আর না।" আরতি চলিতে লাগিল, বাধ্য হইয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিল। সত্যেনবাবু কহিলেন, "রোহিণীর মত জলেই ডুববে নাকি? অবশ্য গোবিন্দলাল কাছেই হাজির—ফার্স্ট এডের


শারদীয় উৎসবে
রূপ-সাধনার
প্রধান অর্ঘ্য
J. SAHA.
শ্রীকল্যান
মহাসুগন্ধি কেশ তৈল
জেম কেমিক্যাল : কলিকাতা

কোন ত্রুটি হবে না।” থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “কি বললেন?” ডাক্তারী বিদ্যার সহিত ডাক্তারকে যুক্ত করিয়া আরতি বক্তব্যের অন্য রকম অর্থ করিয়াছে বুঝিয়া সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিলেন, “বলছি রোহিণীর চেতনা সঞ্চারের জন্যে গোবিন্দলাল যা যা প্রক্রিয়া করেছিল—সব ঠিক ঠিক করবার জন্যে আমি প্রস্তুত।” আরতি মুখ ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চলিল।

কৃষ্ণাভ নীল আকাশ হইতে তরল অন্ধকার ঝরিয়া ঝরিয়া পৃথিবীর বুকে জমিতে শুরু করিয়াছে। দূরে মাঠের মধ্যে কতকগুলো শৃগাল ডাকিয়া উঠিল, পুকুর হইতে কয়েকটা বক সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া আসিয়া একটা গাছের ডালে বসিল; ঝিঁঝি পোকার একটানা ঐক্যতান কানের মধ্যে সূচের মত বিঁধিতে লাগিল।

বাড়ির সামনে আসিয়া পরেশ কহিল, “আমি এবার চলি, নমস্কার।”

সত্যেন্দ্র কহিলেন, “তা কি হয়! এক কাপ চা খেয়ে যান।”

পরেশ কহিল, “থাকগে।” আরতি কহিল, “আসুন না।” পরেশ কহিল, “অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম আপনাদের।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “চলুন চলুন, কোন দরকারী কাজ নেই তো?”

চা খাইয়া আরতির গান শুনিয়া পরেশ যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য উঠিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কহিলেন, “মাঝে মাঝে আসবেন দয়া ক’রে।” সুনীতি কহিল, “মাঝে মাঝে নয়—কাল নিশ্চয় আসবেন।” পরেশ সাগ্রহে কহিল, “নিশ্চয় আসব—বলতে হবে না।”

আরতি মুখে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার আয়ত চোখের ইঙ্গিতময় দৃষ্টি নীরব আমন্ত্রণ জানাইল।

(২০)

পরেশ বাইকে উঠিল; পরিচিত পথিক-বিরল পথে আলোর প্রয়োজন হইল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু অজস্র তারা জ্বল জ্বল করিতেছে, তাহাদের সমবেত ক্ষীণ আলোতে কালো ঘন অন্ধকার একটু ফিকা ও তরল হইয়া উঠিয়াছে। বাম দিকে দিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানের মাঠ; মাঠের উপর পাতলা ধোঁয়ার মত কুয়াসা জমিয়া উঠিয়া দৃষ্টি-পথকে রোধ করিতেছে। বাতাসে তীক্ষ্ম শীতলতা। দূরে মাঠের মধ্যে আলেয়া জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। পিছন দিকে বাউরীপাড়া হইতে একটা কুকুর অবিরাম চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধারেই একটা শুষ্কপ্রায় ছোট পুকুর হইতে পচা ঘাস ও পাতার ঝাঁঝালো গন্ধ অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসকে ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

পরেশের বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে কিন্তু বোধশক্তির যোগাযোগ সম্প্রতি রহিত হইয়াছিল। কারণ তাহার মন একান্তভাবে আরতির চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সে হাসিয়াছিল, কেমন করিয়া কথা বলিয়াছিল, কেমন করিয়া ছল করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কেমন করিয়া সুনীতি ও সত্যেনকে এড়াইয়া তাহাকেই সঙ্গদান করিয়াছিল, ইত্যাদি আরতির ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করিয়া সে তাহাদের তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সহিত আরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, তবু ইহার মধ্যেই আরতির ব্যবহারে প্রিয়-বান্ধবীর সুর লাগিয়াছে। আরতি শিখিয়াছে, দেখা হইবামাত্র যাহার-তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করা যাহার স্বভাব এবং সেই বন্ধুত্ব যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এতখানি রসিয়া উঠে, তাহা হইলে আরতির বন্ধুর অন্ততঃ পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা গণনা করিবার জন্য রীতিমত ‘আদমশুমার’এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য তাহার সহিত আরতির ব্যবহার তাহার পাইকারী ব্যবহার হইতে পৃথক হওয়াই সম্ভব। কারণ আরতি তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিতে চায় এবং চিকিৎসকের প্রতি রোগিনীদের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব থাকেই। নিজের দেহকে নিরাবরণ করিয়া যাহার চক্ষের সামনে ধরিয়া দিতে হয়, তাহার সহিত ব্যবহারে চুল-চেরা কায়দা-কানুন বজায় রাখা নেহাৎ গুমট প্রকৃতির মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আরতির মত খোলা মেজাজের মেয়ের ত কথাই নাই।

অবশ্য আরতির এখনও সে চিকিৎসা করে নাই। তবু ইহার মধ্যেই তাহার আচার ও আচরণে যে মাধুর্যের আমেজ দেখা দিয়াছে, রীতিমত চিকিৎসা করার পর তাহা যে কত গাঢ় হইয়া উঠিবে ভাবিয়া পরেশের মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ ‘ঝড়াং’ করিয়া শব্দ হইল, মুহূর্তের জন্য পরেশ সম্বিৎ হারাইল। চেতনা পাইয়া বুঝিল যে ভূমিশয্যায় শায়িত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে কতকটা অগ্রসর হইতেই দেখিল, দুইটা বাইক জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে এবং ঠিক ওপাশেই আর এক ব্যক্তি তাহারই মত গায়ের ধুলো ঝাড়িতেছে। পরেশ কহিল, “মশায়ের কি খুব লেগেছে?”

উত্তর হইল, “আজ্ঞে না। আপনার?”

“আমারও না। মশায়ের নাম?” লোকটি দুই হাত কচলাইয়া কহিল, “আমি জগদীশ—কার্তিক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।” পরেশ মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, “ওঃ এত অন্ধকার রাত্রে একটা আলো আন নি কেন?” সাইকেল দুইটার হাতল ছাড়াইতে ছাড়াইতে জগদীশ কহিল, “আপনিও তো নেন নি।” পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, “তা বটে। তবে আমি বিকেলে বেরিয়েছিলাম কিনা, এত রাত্রি হবে জানতাম না।” নিজের গাড়ীটি তুলিয়া লইয়া পরেশ কহিল, “কোথায় চলেছ?” জগদীশ কহিল, “আপনার কাছেই। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা ক’রে ব’সে আছেন।” পরেশ লজ্জিতভাবে কহিল, “এই দেখ, একেবারে ভুলে গেছি। আজ তোমাদের ওখানে নেমন্তন্ন ছিল, না?” জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুও তাই বলছিলেন—বোধ হয় ভুলে গেছে। তা’ এত রাত্রি পর্যন্ত ওখানে?” পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, “এমনই। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম—আগে তো আলাপ ছিল না, আজই হ’ল। বেশ লোক—।” জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা বটে। গিন্নীমা কিন্তু সেই সন্ধ্যে থেকে ছটফট করছেন—কতবার যে লোক পাঠালেন আপনাদের ওখানে। আজ ও’র মা এসেছেন কিনা—আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন। আপনি যে কোথায় গেছেন, তা তো আপনার মাসীমা বলতে পারেন নি। বললেন শুধু, সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেছে। শেষে আমাদের কাল ঘনু বললে যে, আপনি হয়তো হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে গেছেন। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, জগদীশ! দেখতো বাবা, একবার। আমিও বলবামাত্র এক লাফে—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “তোমারও নেমন্তন্ন আছে বুঝি?” জগদীশ কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িতে খাওয়ানো-দাওয়ানো হ’লে আমার একপাত বাঁধা—”

“তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?”

জগদীশ দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, অন্ধকারের একটানা কালো পর্দার উপর যেন একটি হ্রস্ব-শ্বেত-বিদারণরেখা দেখা গেল। কহিল, “যা বলেছেন। কোন্ দুপুরবেলা খেয়েছি। তারপর বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া তো আর কিছু পেটস্থ হয় নি।”

সান্ত্বনার সুরে পরেশ কহিল, “তোমাকে মিছেমিছি কষ্ট দিলাম। পাড়াগাঁয়েতে তো কথা বলবার মত লোক পাওয়া যায় না। একজন মনের মত লোক পেলাম, গল্প করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল।” জগদীশ কহিল, “তা হোক, তা হোক। আমাদের ডাক্তারদের কি এত খাই-খাই করলে চলে? কত দিন যে খাড়া উপোস করে কাটাতে হয়। এই দেখুন না সেদিন—”

পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “আমি যে হেডমাস্টারের কাছে গিয়েছিলাম—ঘনশ্যাম কাকা জানলেন কি করে?” জগদীশ কহিল, “ও সব জানতে পারে। ওই যে দেখেন ঘাড়টি বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চলে, ওর পেটে অনেক বিদ্যে।”

ডাক্তারের বাড়ির সামনে হাজির হইতেই জগদীশ কহিল, “আপনি ডিসপেন্সারিতে যান, আমি বাড়িতে খবর দিইগে।”

ডিসপেন্সারিতে কার্তিক ও ঘনশ্যাম বসিয়াছিল। পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, “এই যে বাবাজি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জগদীশের সঙ্গে দেখা হল?” পরেশ বসিতে বসিতে কহিল, “দেখা হয়েছে।” ঘনশ্যাম ভুরু নাচাইয়া কহিল, “কোথায় ছিলে বল দেখি?” পরেশ কহিল, “হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে।” ঘনশ্যাম আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, “এ্যাঁ!” বলিয়া মিনিট কয়েক চোখ দুইটা স্থির করিয়া দিয়া মুখটা আধ-হাঁ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, “ওঁর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “আগে ছিল না, আজ হ’ল।”

“কি ক’রে?”

“উনি নেমন্তন্ন করেছিলেন।”

বিস্ময়সূচককণ্ঠে ঘনশ্যাম কহিল, “নেমন্তন্ন! কেন?” পরেশ জবাব এড়াইয়া যাইবার ভঙ্গীতে কহিল, “কি জানি।” ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ঘনশ্যাম উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “শ্যালীকে দেখাল নাকি?”

“তার মানে?”



জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স
ফোন–সাউথ ২৬৩৯
প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় যেখানে
নূতন নূতন ধরনের জিনিষ
তৈয়ারী হইতেছে
আপনার মনের মত জিনিষ
পাইতে হইলে আজই সেখানে
খোজ করুণ
২০নং কালীঘাট রোড ভবানীপুর
ন্যাশনাল জুয়েলারি ওয়ার্কস
শোরুম :- ১৬৯ নং রসা রোড

"মানে—ওঁর শালীর কি যে আজগুবী রোগ হয়েছে শুনি।" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "না।"

চাকর হরি আসিয়া খবর দিল, জামাইবাবুকে বাড়িতে ডাকছেন। ঘনশ্যাম কহিল, "যাও, বাবা, যাও।" চাকরের পিছনে পিছনে পরেশ বাড়ির ভিতরে আসিয়া হাজির হইল।

বারান্দায় বসিয়াছিলেন একজন বিধবা; কার্তিক ডাক্তারের শাশুড়ী; বয়স ষাটের উপর, রং ফর্সা, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছেন; হাতে হরিনামের ঝুলি, ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে। তাঁহার সামনে খুঁটি ঠেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী। কমলাও বসিয়াছিল, পরেশকে দেখিবামাত্র দুড়্দুড়্ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরেশকে দেখিয়া শ্রীমতী গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "ধন্যি ছেলে তুমি ভাই! কোথায় গিছ্লে বল দেখি বৃন্দাবন আঁধার করে? আমাদের রাই-ধনী যে ভেবে ভেবে সারা হ'ল।" পরেশ লজ্জিত মুখে হাসিতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, "জুতো খুলে প্রণাম কর ওঁকে—তোমার দিদিমা।" পরেশ জুতা খুলিয়া প্রণাম করিতেই বৃদ্ধা হরিনামের ঝুলিটী তাঁহার মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক ভাই! আমাদের কমলীকে নিয়ে জন্ম জন্ম রাজত্ব কর—ব'স ভাই।" পরেশ অদূরে খাটের উপর বসিতে যাইতেই শ্রীমতী কহিল, "না হে, কাছেই ব'স। দুজনে আলাপ হোক।" হাঁকিল, "এই কমলি! একটা মাদুর পেতে দিয়ে যা না তোর বরকে।" কমলা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল—মৃদু তর্জনের সহিত কহিল, "পারব না।" পরক্ষণেই মাদুর হাতে নতমুখে আসিয়া নতমুখেই মাদুর পাতিয়া দিয়া নতমুখেই চলিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কমলা আজ নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়াছে—রূপালী পাড়, লণ্ঠনের আলোকে ঝল্মল্ করিতেছে। কালো চুলে পরিপাটি করিয়া কবরী রচনা করিয়াছে। কপালে কাঁচপোকার টিপ পরিয়াছে। কাছে আসিতেই কাণের নীচ ও ঘাড়ের পাশটা দেখা গেল; চুল হইতে একটি মিষ্টগন্ধ নাকে আসিল। আরতির কথা মনে পড়িল পরেশের।

শ্রীমতী গম্যমান কমলার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পরেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "অভিমান হয়েছে।" পরেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাই নাকি?" শ্রীমতী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হাঁ হে, তাই। বলেছে—কালো রূপ আর দেখব না, কালো বসন পরব না, কালিন্দীর কালো জলে আর নাইব না—" দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, "নাতজামাই কি আমার কালো, যে ও কথা বলেছে? সোনার গৌরাঙ্গের মত রূপ—ওর কোলে কমলী—যেন চাঁদে কলঙ্ক।" শ্রীমতী পরেশের পানে কটাক্ষ হানিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "আর ব'লো না দিদি! এমনই মন পাওয়া যায় না, ওই সব কথা শুনলে তো অহঙ্কারে আর পা পড়বে না।" পরেশ কহিল, "সে কি দিদিমা!" শ্রীমতী ধারালো স্বরে কহিল, "হাঁ ভাই, সত্যি কথা! তোমার মত লোকের মন পাওয়া আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ের কর্ম নয়। যারা ন্যাকাপড়া জানে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে, নাচ গান জানে, মালা গেঁথে 'বঁধু, প্রাণেশ্বর' ব'লে গলায় পরিয়ে দিতে পারে, তাদেরই তোমাদের ভাল লাগে।" পরেশ সন্দেহের স্বরে কহিল, "কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, "সে অনেক কথা, ভাই! তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কোথায় গিছ্লে বল দেখি?" পরেশ কহিল, "একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম—"

"কোথায়?"

পরেশ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "স্কুলের দিকে, হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল, উনি টেনে বাড়ি নিয়ে গেলেন।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "টেনে নিয়ে গেলেন বলে কি রাত দশটা পর্যন্ত টেনে রাখলেন?" পরেশ জবাব দিল না। শ্রীমতী কহিল, "হেডমাস্টারের শুনেছি একটা ছুঁড়ি শালী আছে, তার সঙ্গে দেখা হ'ল নাকি?" পরেশ নীরসকণ্ঠে কহিল, "হ'ল বই কি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "খুব ভাল লাগল বুঝি?" দিদিমা কহিলেন, "তুই ঝগড়া করছিস কেন ভাই? দু দিন পরে যার হবে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দে। ওলো, ও কমলী, আর না এখনে; এখন থেকে অত লজ্জা করতে হবে না।"

ডাক্তারগৃহিণী আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "এই যে বাবা! এসেছ? এত রাত হ'ল? তোমাকে দেখবার জন্যে মা কতক্ষণ থেকে ছট্ফট্ করছেন। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

পরেশ কহিল, "হেড মাষ্টার মশায়ের ওখানে।"

ডাক্তারগৃহিণী ভ্রূ দুইটি কুঁচকাইয়া কহিলেন, "ওঃ!" শ্রীমতীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মাসী! কমলী কোথায় গেল?" শ্রীমতী মুখ ও চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "ওই যে ওখানে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাওনি, ঢং-ঢাংও শেখাওনি যে, দেখবামাত্র পুরুষের গায়ে ঢলে পড়বে। দেখ গিয়ে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

মাসী-বোনঝিতে চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইল। বোনঝি হাঁকিল, "ও কমলী! এদিকে আয় দেখি, খাবার সাজাগে যা, আমি কিছু করতে পারব না ব'লেদিচ্ছি।" চাকরের উদ্দেশে কহিলেন, "ওরে, কোথায় গেলি? এখনও এলোনা না যে! ডেকে নিয়ে আয় গে।" শ্রীমতী কহিল, "মা বেটীতে কি হ'ল আজ?" কার্তিকগৃহিণী কহিলেন, "আমাকে আজ কিছু করতে দেবে না বলেছে, রান্না-বান্না, খাওয়ানো-দাওয়ানো সব নিজে করবে। একটু দেখিয়ে দিতে গেলাম তো বললে, না মা, তুমি কিছুটি বলতে পাবে না। সব নিজে রেঁধেছে আজ, তা পরিবেষণও নিজেই করুক—আমি কেন করতে যাব?"

কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা কহিলেন, "তোকে কেন করতে হবে? ওই করুক—আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম করুক।" ঝুলি নাচাইয়া কহিলেন, "মেয়েমানুষের তো ওই হ'ল আসল কাজ—স্বামী-পুত্রকে, আত্মীয়স্বজনকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানো—নেকাপড়া শিখে শামলা পরে কাছারি যাওয়া তো নয়? আমাদের সময়ে ওসব কোন দিন শুনিনি, আজকালই হয়েছে—"

শ্রীমতী কহিল, "শুধু লেখাপড়া নয়, পাশ করছে, চাকরী করছে। আমাদের গাঁয়ের হেডমাস্টারের একটা শালী এসেছে—ছুঁড়ি নাকি বি এ পাশ, জুতো পরে গট্গট্ ক'রে হাঁটে, ফর্ফর্ ক'রে ইংরিজি বলে, আর পুরুষ দেখলে জোঁকের মত কামড়ে ধরে।" পরেশের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু আজকালকার ছেলেদের ওই রকমই পছন্দ! শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েকে মনে ধরে না তাদের।" কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, "কত লোকের মাথা খেয়ে যে জিবে ওদের চড়া পড়ে গেছে খবর নিলেই চিত্ত চমৎকার হয়ে যাবে! তখন বুঝবে মজাটা!" বলিয়া চোখের কোণে বিদ্যুৎ হানিয়া সবেগে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শ্রীমতী পরেশকে কহিল, "আমাকে ফেলে যেও না হে! সঙ্গে করে নিয়ে যেও, বুঝলে?"

ঘনশ্যাম ও জগদীশ চলিয়া গেল। পরেশ কার্তিক-ডাক্তারের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

কার্তিক কহিলেন, "হেড মাষ্টার মশায় শালীর সম্বন্ধে কিছু বললেন নাকি?"

পরেশ কহিল, "অসুখের কথা বলছিলেন।"

"পরীক্ষা করে দেখলে নাকি?"

"না।"

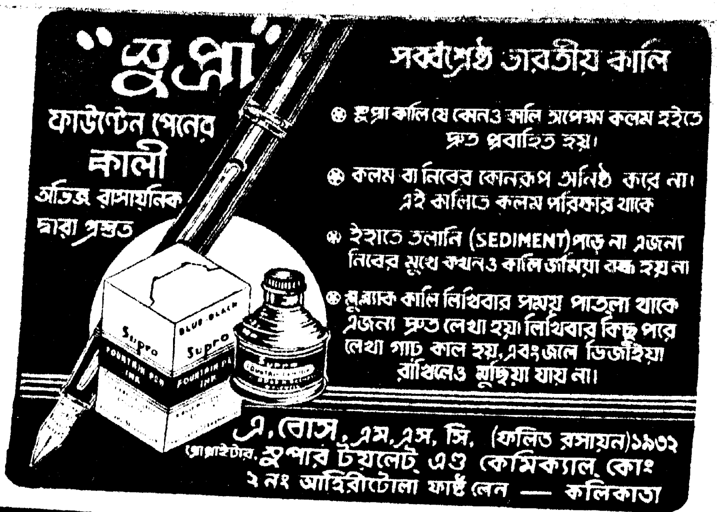
কার্তিক কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমার মনে হয়, শরীরের চেয়ে ও মেয়েটির মনের রোগই বেশি। এত বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হয়নি, দেহের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা ওর মিটছে না, তারই এটা স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া।"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, "আমাদের সময়ে ব্রাহ্ম খৃষ্টানদের মেয়েরা অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করত, হিন্দুদের মধ্যে এ রেওয়াজ ছিল না। আজকাল শুনছি, হিন্দু মেয়েরাও অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করছে।" পরেশ কহিল, "বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা, শিক্ষার দিক দিয়ে ওরা খুব উন্নতি করেছে। শুধু বি এ, এম এ পাশ ক'রে মাস্টারি আর প্রফেসারি করছে না—অনেকে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হচ্ছে। আমাদের সঙ্গেই একটি মেয়ে পাশ করেছিল—সে এখন কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে বড় চাকরি করছে।"

"বিয়ে হয়েছে মেয়েটির?"

"জানি না।"


"সুপ্রা"
ফাউণ্টেন পেনের
কালী
অভিজ্ঞ রাসায়নিক
দ্বারা প্রস্তুত
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কালি
সুপ্রা কালি যে কোনও কালি অপেক্ষা কলম হইতে দ্রুত প্রবাহিত হয়।
কলম বা নিবের কোনরূপ অনিষ্ট করে না। এই কালিতে কলম পরিষ্কার থাকে
ইহাতে তলানি (SEDIMENT) পড়ে না এজন্য নিবের মুখে কখনও কালি জমিয়া বন্ধ হয় না
ব্লু-ব্ল্যাক কালি লিখিবার সময় পাতলা থাকে এজন্য দ্রুত লেখা হয়। লিখিবার কিছু পরে লেখা গাঢ় কাল হয়, এবং জলে ভিজাইয়া রাখিলেও মুছিয়া যায় না।
Supro
BLUE-BLACK
FOUNTAIN PEN INK
এ, বোস, এম, এস, সি, (ফলিত রসায়ন) ১৯৩২
প্রোপ্রাইটার, সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরীটোলা ফার্ষ্ট লেন — কলিকাতা


সুপ্রা প্রসাধন নিয়মিত ব্যবহারে আপনার রূপ ও লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দও অনেক বাড়িয়ে দেবে। আধুনিক উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত এবং সম্পূর্ন নির্ভর যোগ্য!
SUPRA Perfumed COCOANUT OIL
সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২নং আহিরী টোলা ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা
প্রোঃ- এ, বোস, এম, এস, সি, (ফলিত রসায়ন) ১৯৩২

কার্তিক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এটা কি ভাল হচ্ছে? কে জানে?" আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি জান বাবা! আমরা পুরনো আমলের লোক, দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সেকেলে; মেয়েরা পুরুষদের কাঁধে ভর ক'রে চলবে, আজন্ম দেখে আসছি—দেখতে ভালও লাগে। মেয়েদের গট্‌গট্‌ করে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটা আমরা বরদাস্ত করতে পারিনে। তবে যুগ তো বদলাচ্ছে! নতুন নতুন রীতিনীতি কায়দা-কানুনের আমদানী হবেই, আমাদের ভাল-লাগা না-লাগার উপর কিছু নির্ভর করবে না।" দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তবে এ তুমি ঠিক জেনো—মেয়েরা যত লেখাপড়া শিখবে, আর বেশী বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থাকবে, তত দেখবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েমানুষ আর মন্দা মেয়েমানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যাচ্ছে। আর খুব সম্ভব তাতে কি সংসার, কি সমাজ—কারও পক্ষে মঙ্গল হবে না।"

শ্রীমতী আসিয়া কহিল, "চল হে।" "চলুন" বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির দরজার কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠের 'দিদিমা' ডাক শুনিয়া পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—একটা মরাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া কমলা—হাতে দুইটি পান। তাহার সহিত চোখা-চোখি হইতেই কমলা মুখ নামাইল। অভিমানের কালো ছায়া মুখ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় নাই। ক্ষান্ত বর্ষণ মেঘের মত টুকরা টুকরাভাবে দুই চোখের কালো তারায়, কুঞ্চিত ভ্রূ দুইটিতে, ঈষৎ স্ফুরিত অধরে লাগিয়া আছে।

শ্রীমতী কমলাকে কহিল, "নিজে দে না তোর বরকে।" পরেশকে কহিল, "নাও না হে।" পরেশ হাত বাড়াইল। তাহার হাতে পান দিয়াই পিছন ফিরিয়া কমলা পলাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী কহিল, "ওলো, চুন দিলি না?" কমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চাপা তর্জন করিল, "যা-তা বলছে।" শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "ভুল ক'রে ব'লে ফেলেছি লো! চুণ দে, চুম তো বিয়ের পর নিজেই দিবি, তখন কি আমার বলবার অপেক্ষা রাখবি?" কমলা আসিয়া ডান হাতের তর্জনীটি বাড়াইয়া দিল। তর্জনীর মাথায় চুণ লাগানো ছিল, পরেশ নিজের তর্জনী দিয়া ধীরে-সুস্থে চুণ লইতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, "ভাল ক'রে হাতটা জাপটে ধর না, লজ্জা কিসের?" কমলা হাতটা সরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে মরাইয়ের আড়ালে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীমতী কহিল, "আজ তোমার উপর আমরা ভারী রাগ করেছি।"

পরেশ কহিল, "আমরা—কে কে?"

"আমি আর কমলা। আজ এলে না কেন?"

"আসছিলাম। বেরিয়েছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশায়ের নিমন্ত্রণ চিঠি পেলাম।"

শ্রীমতী কহিল, "নেমন্তন্ন তো আমিও ক'রে এসেছিলাম হে। নিজে গিয়ে হাতে ধ'রে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে এসেছিলাম।"

"তা এসেছিলেন—কিন্তু ভদ্রলোক—"

ব্যঙ্গের সুরে শ্রীমতী কহিল, "ওঃ! আমরা বুঝি অভদ্র?" পরেশ কহিল, "তা কি আমি বলছি। আপনারা আপনার লোক—আপনাদের কাছে ত্রুটি হ'লেও আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু উনি হলেন অপরিচিত—পর।" শ্রীমতী কহিল, "তা হ'লেও তোমার একবার দেখা ক'রে যাওয়া উচিত ছিল। একটু দেরি হ'লে হেডমাস্টারের শালী উড়ে পালিয়ে যেত না।"

পরেশ কহিল, "ও'র শালীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

"ওই তো গুড়ের গাছ হে! ওর লোভেই তো গিছলে? মুখ্যু হ'লেও সব বুঝি।" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কমলা আজ কেঁদেছে জান?"

পরেশ কহিল, "কান্না কেন?"

শ্রীমতী থন্‌ থন্‌ করিয়া কহিল, "কাঁদবে না? একজনকে মনপ্রাণ সঁপে বসেছে, আর সে যদি অন্যের জন্যে ছুটোছুটি করে, তাকে যদি অন্য মেয়ে মালা গেঁথে পাঠিয়ে দেয়—" পরেশ সন্দেহের সুরে কহিল, "মালা আবার কে পাঠিয়েছে? শ্রীমতী কহিল, "কেন তোমার বিবি? গুণী ধরেছে।" বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "মানে?"

"মানে—আজ বিকেল বেলায় তোমাকে ডেকে আনবার জন্যে গুণীকে পাঠিয়েছিলাম। গুণী রাস্তায় যেতে যেতে দেখে—বিনয়ের ছোট মেয়ে খুকী তোমাদের বাড়ি যাচ্ছে—হাতে একটা গাঁদা ফুলের মালা—জিজ্ঞাসা করতেই খুকী বললে—পরেশ দাদার জন্যে দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। গুণী এসে আমাকে বলল ওই কথা। কমলা ব'সেছিল কাছে, সেও শুনল। গুণী যতক্ষণ ছিল কিছু বলল না, ও যেতেই আমার কোলে মাথা দিয়ে কি কান্না!"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতীর বাড়ির কাছে আসিতেই, শ্রীমতী খপ্‌ করিয়া পরেশের হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, তোমাকে হাতে ধ'রে মিনতি ক'রে বলছি—এখানে সেখানে আনাগোনা ছাড়। কমলি তোমাকে মনেপ্রাণে স্বামী ব'লে জেনেছে—এর পর যদি ও তোমাকে না পায় তো প্রাণে বাঁচবে না।"

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ দেখিল, শয়নকক্ষে টেবিলের উপর একটি গাঁদা ফুলের মালা। মালাটি প্রসারিত দুই করতলে তুলিয়া লইয়া সে তাহার উপরে মুখ রাখিল। মাল্যের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ, মৃদু সুগন্ধ মাল্য-রচয়িত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ টেবিলের একধারে রঙিন কাগজের বাক্সে মোড়া ঔষধের শিশির দিকে নজর পড়িল, যে ঔষধের শিশিটি সে বিবির ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। শিশিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল—মোড়ক খোলা পর্যন্ত হয় নাই। হাঁকিয়া মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ওষুধের শিশিটা কে দিয়ে গেল?"

মাসীমা কহিলেন, "বিনয় মাস্টার—"

"কখন?"

"সন্ধ্যের পর।"

"কিছু বলেন নি?"

"বললেন—কাল নাকি ও'র স্ত্রী বাপের বাড়ি যাবেন—উনি পেঁাছে দিতে যাবেন—ওষুধটার আর দরকার হবে না।"

পরেশ শিশিটা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ শিশিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের আকাশে একটি ক্ষুদ্র তারকার উদয় হইয়াছিল; স্বল্প-কালের জন্য স্নিগ্ধ দীপ্তি বিকিরণ করিয়া ধীরে ধীরে বোধ করি চির-দিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল।

(২১)

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুখদা রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল। শোবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিবি খুকীর জন্য "তুষি" পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল। একটা মাটির ঢেউ তোলা কানাওয়ালা খোলা তুষ দিয়া কানায় কানায় ভর্তি করিয়া তাহার উপরে গাঁদা ফুল থরে থরে সাজাইতে-ছিল। খুকী উবু হইয়া বসিয়া উৎসুক ও উজ্জ্বল চোখে দিদির সাজানো দেখিতেছিল। খুকী কহিল, "দিদি, আরও ফুল আনব?" বিবি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, এতেই হবে।" খুকী কহিল, "মিন্তা দিদি পরেশদাদার নামে একটা গান বেঁধেছে, দিদি।" বিবি খুকীর মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "কি গান?" খুকী সুর করিয়া কহিল, "কিবা বেগুন গাছে গাছে, পরেশ ডাক্তার বিয়ে করছে—তিড়িং তিড়িং নাচে। তিড়িং তিড়িং নাচুক, আমরা তাকেও বরং পারি—ঐ যে অহঙ্কারে পা পড়েনা—ঐ জ্বালাতেই মরি—বল ভাই হরি ভাড়ুরী—" বিবি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "তুইও ওই গান গাইবি? পরেশদাদা তোর দাদা হন না?" খুকী কহিল, "গাইব না কেন? পরেশ দাদার নামে তো আর গান নয়—ও'র বউয়ের নামে।"

শ্রীমতী বাড়ি ঢুকিয়া হাঁক দিল, "বউ রইছিস নাকি গো?" সুখদা কহিল, "আছি, আসুন।" শ্রীমতী বিবি ও খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি লো তেদের কি হচ্ছে?" থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিবি বুঝি খেলা করছিস? তোর পা কেমন আছে?" বিবি কহি "ভাল আছে।" শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ভাল থাকবে বই কি? ডাক্তারের চিকিচ্ছে।" বলিয়া মুচকি হাসিয়া রান্নাঘরে চলিল।

রান্নাঘরে ঢুকিতেই সুখদা কহিল, "বসুন ওই আসন" শ্রীমতী গম্ভীর মুখে কহিল, "বসবনা—তোকে একটা কথা বল তোদের ভালবাসি, তাই গোপনে ব'লে যাচ্ছি। আর চার কা সুখদা বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "কি"—শ্রীমতী আর কেও জানে না—শুধু আমি আর গুণী—তা আমাদে গেলেও কথা বেরুবে না, তুইও কাউকে বলিস না।" বন্ধ করিয়া কহিল, "বলব না, আপনি বলুন।" শ্রীমতী কহিল, "বলছি—কিন্তু বলবার আগে তোকে একটা কথা বিনয় না হয় কাছাখোলা মানুষ, কিন্তু তুইও কি দিয়ে ঘুমোস—মেয়ে কি করে, কোন খোঁজখবর রাখিস



"কপোত-কপোতী যথা—"　　ফোটোশিল্পী—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

...র ঘরে, তার তো এমন অসাবধান হওয়া ভাল নয় বউ।" সুখদা দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "বাবির কথা বলছেন? কি করেছে সে?" শ্রীমতী ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিল, "কি করেছে শুনবি? বিদ্যেসুন্দরের বিদ্যাকেও হার মানিয়েছে তোর মেয়ে—নিজে হাতে মালা গেঁথে পরেশকে পাঠিয়েছে।" ভয়ে সুখদার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "সত্যি!" শ্রীমতী কহিল, "মিথ্যে না সত্যি, তোর খুকীকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ্—ওর হাতেই পাঠিয়েছে।" সুখদা ডাকিল, "খুকী!" খুকী সাড়া দিল, "কি মা!"

"এখানে শুনে যা তো।" খুকী আসিতেই সুখদা চাপা স্বরে প্রশ্ন করিল, "পরেশকে মালা দিয়ে এসেছিস?" খুকী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এসেছি তো!"

"কে দিল দিতে—?"

"কেন, দিদি। পরেশদাদা সকালে চেয়েছিলেন—" সুখদা শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এই শুনুন পিসিমা! পরেশ নিজে থেকে চেয়েছিল; দাদার মত ভালবাসে, চাইলে—" শ্রীমতী বাধা দিয়া ধারালো কণ্ঠে কহিল, "যা-তা বোঝাস নে বউ! একজন সোমত্ত বয়সের ছেলে মালা চাইলেই এত বড় ধাড়ী মেয়ে তাকে মালা গেঁথে পাঠাবে? তোদের শহরের নিয়ম-কানুন জানিনে, বউ, কিন্তু আমাদের পাড়াগেঁয়ে এসব অনৈরন চলে না। তোদের ভালর জন্যেই বলছি বউ, এখনও মেয়েকে সামলা, না হ'লে পরে পস্তাবি।" সুখদা মুখ কালো করিয়া কহিল, "সত্যি!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন পিসীমা—আপনার চোখের সামনে ওই মেয়েকে কি শাস্তি দি, দেখুন।" বলিয়া একটা চেলাকাঠ হাতে করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "পাগল হয়েছিস নাকি বউ? অত বড় মেয়েকে মারধর করে? শেষে কি ফ্যাসাদ করবি? আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই, বিষ-টিষ খেয়ে বসবে, তার চেয়ে এক কাজ করিস তো সবচেয়ে ভাল হয়। মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে চলে যা। তাকে দিয়ে একটি পাত্র খুঁজিয়ে মেয়ের বিয়ে দিগে যা। বিনয়ের উপর ভর ক'রে থাকলে মেয়ের তোর বিয়ে হবে না।" সুখদা কাঠটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তাই করব পিসীমা।" শ্রীমতী কহিল, "আচ্ছা চলি বউ! কিছু মনে করিস না। তোদের ভালবাসি, তাই তোদের খারাপ কিছু শুনলে মনটা করকর করে—তোদের না জানিয়ে থাকতে পারি নে—তোদের পর ব'লে ভাবলে কি আর আসতাম? গাঁয়ের লোকের মত চুপ ক'রে ব'সে ব'সে মজা দেখতাম।" শ্রীমতী চলিয়া গেল। সুখদা প্রস্তরমূর্তির মত উনানের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় আসিতেই সুখদা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "শোন।" বিনয় কাছে আসিতেই সুখদা জলদগম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার মেয়ে আজ কি করেছে জান?" বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "কি?"

"পরেশকে মালা গেঁথে পাঠিয়েছে?"

বিনয় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কেন?" সুখদা কহিল, "পরেশ নাকি সকালে চেয়েছিল।" বিনয় নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, "ওঃ! তাই! তাতে আর দোষ কি হয়েছে।" স্বামীর মুখের পানে জ্বলন্ত-চক্ষে চাহিয়া সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "দোষ হয় নি? কে কোথায় মালা চাইল ব'লে—অত বড় মেয়ে দিন-দুপুরে মালা গেঁথে পাঠাবে? পরেশ বাড়িতে এসে দিতে পারত।" বিনয় কহিল, "তা বটে।" সুখদা কহিল, "আমি কিছু জানতাম না, শ্রীমতী এসে ব'লে গেল।" ক্ষোভের সহিত কহিল, "মেয়ে তোমার বড় হয়েছে কিনা—আজকাল আমার কাছে সব গোপন করে।" বিনয় কহিল, "শ্রীমতী জানল কি ক'রে?" সুখদা কহিল, "খুকী নিয়ে যাচ্ছিল—গুণী বামনী দেখেছে—ও গিয়ে আবার শ্রীমতীকে বলেছে—শ্রীমতী বলল বটে—কেউ আর জানে না, আর কাউকে ওরা বলবে না। কিন্তু ও মিছে কথা—ওরা এতক্ষণ সারা গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছে বোধ হয়, কাল থেকে আর গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না। আর তোমার ওই মেয়ে থুবড়ো থাকবে, কেউ ওকে নেবে না—" বিনয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুখদা

কহিল, “আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাদার কাছে যাব—তুমি দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “পারিবে।” সুখদা কহিল, “বেশ, খেয়ে-দেয়ে এখনই সেক্রেটারীর কাছে যাও। ছুটির ব্যবস্থা ক'রে এস গিয়ে। কালই আমি যাব।” বিনয় কহিল, “এত তাড়াতাড়ি—” সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ, কাল আর আমি গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব না—আমি ব'লে দিচ্ছি তোমাকে—”

(২২)

পরের দিন দশ-বারো মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে পরেশের ডাক আসিয়াছিল। বেলা দশটার সময়ে স্নানাহার করিয়া পরেশ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয়ের ঝি—দুখের মা—একটা চিঠি আনিয়া হাতে দিল। হেডমাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—“ডাক্তারবাবু—আজ দয়া ক'রে একবার এসে আরতিকে দেখে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাবেন।” পরেশ দুখের মাকে কহিল, “আচ্ছা, তুমি যাও। ওই রাস্তা দিয়েই এখনই আমাকে যেতে হবে, যাবার সময় দেখা ক'রে যাব।”

রাস্তায় হেডমাস্টারের সহিত দেখা হইল—ধড়া-চূড়া আঁটিয়া স্কুলে যাইতেছেন। পরেশকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া কহিলেন, “চলেছেন! আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না, স্কুলের সময় হয়ে গেছে, আপনি যান তা হলে—”

বাড়ির দরজায় পৌঁছিয়া ঘণ্টা বাজাইতেই খোকা ছুটিয়া আসিল। পিছনে-পিছনে আসিল আরতি। খোকা আসিয়া একেবারে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া কহিল, “চড়িয়ে দিন না একবার।” পরেশ তাহাকে সিটে চড়াইয়া দিল। খোকা আদেশ দিল, “চালান এবার।” আরতি আসিয়া কড়া গলায় কহিল, “খোকা নামো।” খোকা মাসীর কথায় কান না দিয়া কহিল, “চালিয়ে দিন না।” পরেশ চালাইতে শুরু করিল। আরতি কহিল, “ওকে আদর দেবেন না—ভারী দুষ্টু ছেলে, মাথায় চ'ড়ে বসবে।” পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি, খোকা! এর পর মাথায় চড়বে? তা হলে তো মুশকিল।” খোকা সাহস দিয়া কহিল, “কখনও না, আপনি চালিয়ে দেখুন।” পরেশ কহিল, “বেশ তোমার কথাই বিশ্বাস করা যাক—” বলিয়া এক পাক ঘুরাইয়া আনিয়া কহিল, “এর পর নামো দেখি।” খোকা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, আর একবার।” আরতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, “দেখলেন তো—আমার কথা বিশ্বাস না করার ফল। এর পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরান ওকে এই রোদে, ও কি সহজে নামবে ভেবেছেন!” পরেশ কহিল, “খোকা, তোমার মাসীমা কি বলছেন শুনছ?” খোকা কথায় কান না দিয়া বাইকের ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আরতি কহিল, “দেখছেন মজা! কে যেন কাকে বলছে! জোর ক'রে নামিয়ে দিন ওকে।” খোকার উদ্দেশে কহিল, “খোকা, নামো বলছি, নামবে না তো! ডাক্তারবাবু! আপনার সেই ছুরিটা দিয়ে হাত দুটো ওর কেটে দিন তো।” খোকা ভয়ে চোখ বড় করিয়া কহিল, “আমাকে নামিয়ে দিন—” বলিয়াই নামিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল। পরেশ তাহাকে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আরতি কহিল, “একেবারে নেয়ে-খেয়ে এসেছেন দেখছি।”

পরেশ কহিল, “একটা কলে যাচ্ছি—এখান থেকে দশ-বারো মাইল রাস্তা, কখন ফিরব তার ঠিক নেই।” চোখে ও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী করিয়া আরতি কহিল, “এই রোদে এতখানি রাস্তা যাবেন?”

পরেশ কহিল, “শীতকালের রোদ তো, কিছু কষ্ট হবে না। তা ছাড়া ডাক্তারদের কি অত রোদ-জল বাছতে গেলে চলে? যখনই রোগী ডাকবে, তখনই যেতে হবে।” আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, “সব রোগীর বেলা নয়, আমরা তো কাল রাত্রেই ডেকে রেখেছিলাম। সকালে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন, চিঠি লিখে মনে না করিয়ে দিলে বোধ হয় আসতেন না।” পরেশ কহিল, “নিশ্চয় আসতাম।” দুই চোখ পরেশের মুখের উপর স্থির করিয়া দিয়া আরতি কহিল, “সত্যি!” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ।”

বৈঠকখানায় বসিয়া পরেশ কহিল, “আপনাকে দেখবার কিছু নেই।” আরতি হাসিয়া কহিল, “একদিন দেখাতেই ফুরিয়ে গেলুম, বলেন কি?” অপ্রতিভভাবে পরেশ কহিল, “না, তা বলি নি। বলছি, আপনার অর্গানিক মানে—যান্ত্রিক কোন রোগ আছে ব'লে মনে হয় না।” আরতি কহিল, “বলেন কি? বুকের অবস্থা তো ভাল নয়।” পরেশ কহিল, “সে আমি পরে দেখব। তবে মিসেস বোসের কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় ভয়ের কারণ কিছু নেই, দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য এখনই আপনাকে কোন ওষুধ খেতে দেব না—আগে দুদিন আপনাকে ওয়াচ করব, মানে—দেখব।”

“বেশ তো দেখুন না যত ইচ্ছে।” আরতি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিতেই পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল, “আমি তাই বলছি নাকি! আমি বলছি, মানে—” আরতি কহিল, “বুঝেছি কি বলছেন—” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পরেশ কহিল, “কোথায় যাচ্ছেন?” আরতি কহিল, “বোধ হয় তেষ্টা পেয়েছে আপনার, জল নিয়ে আসি।” বলিয়া মরালীর মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। ফিরিল একটা কাচের গ্লাসে জল লইয়া। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, “খান।” ঢকঢক করিয়া সব জলটা গিলিয়া পরেশ কহিল, “সত্যি, ভারী তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে জানলেন আপনি?” আরতি কহিল, “আপনার মুখ দেখে।” গ্লাসটা নামাইতে যাইতেই আরতি হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইল। পরেশ সঙ্কোচের সহিত কহিল, “আমার খাওয়া গ্লাসটা—”

আরতি কহিল, “তাও ছোঁবার যোগ্য নই নাকি!” পরেশ কহিল, “আপনি সব কথা ভারী বাঁকাভাবে দেখেন।” আরতি কহিল, “আমার বাঁকা চোখ যে, সোজা দেখব কি করে?” পরেশ কহিল, “এই দেখুন রাগ করলেন আবার।” আরতি চোখ ডাগর করিয়া কহিল, “রাগ? আপনার ওপর? দয়া করে দেখতে এসেছেন—এই কত ভাগ্য আমার।” সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, হাতে প্লেটে করিয়া পান। প্লেটটা পরেশের সামনে নামাইয়া আরতিকে কহিল, “সব বলেছিস্ ওঁকে?” আরতি কহিল, “উনি তো আমাকে দেখতে আসেন নি, কোথায় কলে যাচ্ছেন, এমনই—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “মিথ্যে কথা।” দুই চোখে ঝিলিক হানিয়া আরতি কহিল, “মিথ্যে কথা?” পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “না না, তা নয়, মানে—কলে অবশ্য যাচ্ছি, তবে দেখতেও এসেছি।” সুনীতি কহিল, “কি ব্যবস্থা করছেন?” পরেশ কহিল, “এখন কিছু করব না। ফিরতি পথে দেখা করে সব বলে দিয়ে যাব।” সুনীতি কহিল, “কখন ফিরবেন?” পরেশ কহিল, “খুব সম্ভব সন্ধ্যার আগে।”

পরেশ যখন ফিরিল, তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে; পশ্চিম আকাশে নির্বাপিতপ্রায় আগুনের আভার মত ক্ষীণ গোলাপী আভা লাগিয়া আছে। পূর্বাকাশে গাঢ় বেগুনী রঙের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। রাস্তার ধারে গাছগুলিতে নীড়-প্রত্যাগত পাখীদের কলরব সুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রামের কাছে আসিতেই পরেশ দূর হইতে দেখিতে পাইল, আরতি খোকার হাত ধরিয়া রাস্তার ধারে ধারে ধীরে ধীরে আসিতেছে। খোকার সহিত আলাপে সে এমনই মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, পরেশ কাছে আসিতেও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। পরেশ ঘণ্টা বাজাইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল, ফলে আরতি খোকাকে লইয়া রাস্তার ধারের দিকে আরও একটু সরিয়া গেল; কিন্তু আলাপের সূত্র অক্ষুণ্ণ রহিল। শুধু তাহার ওষ্ঠে একটি অতি মৃদু হাসি যেন ফুটিয়া উঠিল। সামনে আসিয়া সশব্দে নামিয়া পরেশ কহিল, “কোথায় চলেছেন?” আরতি চমকিয়া চাহিয়া কহিল, “ওঃ! আপনি! আমি বলি—কে?” হাসি চাপিয়া কহিল, “আপনি যে এ-রাস্তায় গেছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।” পরেশ আহত কণ্ঠে কহিল, “আমার কথা মনে রাখবেন—এমন সৌভাগ্য আমার নয়, তবু সে কথা নাই বা জানালেন।” আরতি হাসিয়া কহিল, “রোগীদের সব সময় আপনাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে নাকি?” পরেশও হাসিয়া কহিল, “রোগীদের নয়—রোগিনীদের।” আরতি মুখ লাল করিয়া চোখের কোণে বিদ্যুৎ হানিয়া কহিল, “তাই নাকি!”

তিনজনে গ্রামের দিকে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ একেবারে রাস্তার ডান পাশ ঘেঁসিয়া—তাহার ডান হাতে সাইকেল; আরতি ও খোকা রাস্তার মাঝে। আরতি কহিল, “রাস্তার অত ধারে যাচ্ছেন কেন? যে বড় বড় ঘাস—সাপ থাকতে পারে।” পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, “শীত-কালে সাপ কোথায়?” আরতি কহিল, “আপনি তো সবই জানেন! সেদিন দেখেছি একটা সাপ এই রাস্তাতেই—রাস্তার এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিল।” আদেশের সুরে কহিল, “আপনি এদিকে সরে আসুন।” পরেশ আদেশ পালন করিল।

আরতি কহিল, “যাকে দেখতে গিয়েছিলেন, পুরুষ, না মেয়ে?”

“পুরুষ।”

“কি হয়েছে?”

“টাইফয়েড।”

আরতি সভয়ে কহিল, “ওরে বাবা! পাড়াগাঁয়েও ওসব রোগ আছে নাকি?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আছে বই কি! না হ'লে আমাদের চলবে কেন?” আরতি কহিল, “আপনার মত ডাক্তারের কিন্তু পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়। কি আর হবে এখানে, লোকে তো

ৎতেই পার না শুনি, টাকা দেবে কে? শহরের যে কোন ডাক্তার হাজার কা রোজগার করে—" পরেশ কহিল, "সবাই করে না, দু'চারজন করে।" ারতি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "আপনি যে সেই দু চারজনের একজন :কন না, তা কে বলবে? বিদ্যে-বুদ্ধি-জ্ঞান আপনার তাদের চেয়ে এক চল কম নয়।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিতে লাগিল, পাড়াগাঁয়ে প্র্যাক্টিসের কত অসুবিধে দেখুন; ইচ্ছা ও সংগতি থাকলেও াটর কিনতে পারেন না। একটা দূরের 'কল' থাকলে সারা দিনটাই ট। তা ছাড়া ভবিষ্যৎও একেবারে সীমাবদ্ধ; নতুন নতুন লোকের াসা-যাওয়া নেই, লোকের আর্থিক উন্নতিরও কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই কই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একই অবস্থায় আপনাকে চিরদিন কাটিয়ে তে হবে।" পরেশ কহিল, "সত্যি।"

ইতিমধ্যে খোকা পিছনে পড়িয়াছিল, আরতি আরও কাছে ঘেঁসিয়া াসিয়াছিল, পরেশ সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া আরতির সান্নিধ্য অনুভব করিতেছিল, রতির সৎপরামর্শে তাহার তত মন ছিল না। হঠাৎ আরতির হাতে হার হাত লাগিতেই পরেশ যেন বিদ্যুতের শক্ খাইয়া সরিয়া গেল, রতিও থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "খোকা কোথায় গেলে?" খোকা টিয়া আসিয়া সঙ্গ লইল।

হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ কহিল, "আজ হয়ে গেল, বাড়ি যাই। কাল এসে আপনার ব্যবস্থা করে দেব।" কিয়া দাঁড়াইয়া আরতি পরেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে াইয়া রহিল; তারপর ভ্রূ দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এইজন্যে ঝ এতটা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে এলুম।" পরেশ হাসিয়া লয়া কহিল, "তবে যে তখন বললেন, আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।" টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে আরতি কহিল, "গিছলুমই । কিন্তু দিদি ভোলেনি। সারা বিকাল বসে আপনাকে রাত্রে াবার আয়োজন করছে।" পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "তাই ক?" ভারী অন্যায়! মিছেমিছি আমার জন্যে—" আরতি কহিল, আমাকে বলে কি হবে? আমি কিছু জানি না। যা যা বলবার কে গিয়ে বলবেন।" পরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আরতি লে, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন—কতটা রাস্তা হাঁটলুম বলুন আপনার জন্যে?" পরেশ কহিল, "সত্যি!" ঝঙ্কার দিয়া আরতি ল, "সত্যি তো দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?"

এই তরল অন্ধকারে আরতির দেহের অতি সন্নিকটে তাহার সহিত মুখী দাঁড়াইয়া থাকিতে পরেশের ভাল লাগিতেছিল; এত শীঘ্র ভাল-লাগা ভাবটিকে হারাইতে তাহার মন চাহিতেছিল না। আরতি মান-ঘন স্বরে কহিল, "যাবেন না তো!" পরেশ কহিল, "চলুন"— যা আরতির সঙ্গে চলিল।

সেদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে পরেশ বাড়ি ফিরিল। মাসীমা ইয়া পড়িয়াছিলেন; হাঁক-ডাক করিয়া তাঁহাকে তুলিতে হইল। মা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত হ'ল?" পরেশ ল, "রোগের ভারী বাড়াবাড়ি হয়েছিল—রোগী টাল না সামলানো ত ছাড়তে চাইল না তারা—"

(২৩)

কয়েক দিন পরে। পরেশ সকালে ডিসপেন্সারিতে বসিয়াছিল। কাজ- হাতে কিছু ছিল না। কমলা ও আরতির কথা ভাবিতেছিল। এ নের মধ্যে কমলার সহিত কয়েকবারই দেখা হইয়াছে, শ্রীমতীর ৎতায় কথাবার্তাও হইয়াছে। কিন্তু কমলার উপর ইহার মধ্যেই নি স্বত্ববোধ জন্মিয়াছে যে, তাহাকে দেখিবার, তাহাকে জানিবার ও ঔৎসুক্য অনেকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই মন কমলার আরতির চিন্তায় বেশি ব্যাপৃত থাকিতেছে। এ কয়দিন সে নিয়মিত- সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আরতিদের ওখানে কাটাইয়াছে; তদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে; আরতির গান শুনিয়াছে; আরতির সহিত করিয়াছে ও নানা বিষয়ে আলাপ করিয়াছে। তাহার কাছে এই জীবনের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বাহিরের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে করিয়া কর্মজীবন শুরু করিবার প্রেরণা পাইয়াছে, তাহার শিক্ষিত মার্জিত মনের সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়াছে। সে তে পারিতেছে, তাহার হৃদয় আরতির প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব তেছে। সে আকর্ষণ প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ইহা যে অন্যায়, তাহা সে বুঝে। প্রতিদিন সংকল্প করে—চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া আর কোন কারণে আরতিদের বাড়ি যাইবে না। তবু সন্ধ্যা হইলেই পূর্ব রাত্রে বিদায় মুহূর্তে আরতির মুখ ও চোখের আমন্ত্রণ মনে পড়ে—'কাল আসবেন তো!' আর স্থির থাকা যায় না—যথাসময়ে গিয়া হাজির হয়। এ কয়দিনে আরতি আরও নিকট- বর্তিনী হইয়াছে। তাহার ব্যবহারে সৌজন্যের চেয়ে সৌহার্দ্যের মাত্রা বাড়িয়াছে। প্রিয়বান্ধবীর সুরে প্রিয় আত্মীয়ার সুর মিশিয়াছে। কাল রাত্রির কথা মনে পড়িল—বাড়ি আসিবার সময়ে আরতি ও সত্যেনবাবু তাহার সঙ্গে কতকটা রাস্তা আসিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল— তাহার গায়ে চাদর ছিল না। আরতি তাহার নিজের গায়ের শাল তাহাকে দিয়াছিল। সে লইতে চাহে নাই—আরতি জোর করিয়া তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়াছিল। সেই শাল গায়ে জড়াইয়া আরতির দেহের উষ্ণতা ও সুরভি সর্বাঙ্গ দিয়া পান করিয়া পরেশের যেন নেশা লাগিয়া গিয়াছিল।

জগদীশ কম্পাউণ্ডার আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু ডাকছেন আপনাকে।" পরেশ কহিল, "কেন হে?" জগদীশ কহিল, "জানি না। আপনি আসুন।" পরেশ কহিল, "চল, যাচ্ছি এখনই।"

ডিস্পেন্সারিতে গিয়া পরেশ দেখিল, কার্তিক ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্ত। চারিদিকে ভীড় করিয়া রোগী ও রোগীদের আত্মীয়স্বজনের দল — কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বেঞ্চিতে বা মাটিতে বসিয়া। পরেশ গিয়া বসিতেই কার্তিক মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন, "এসেছ? ব'স।" কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "সেদিনকার সেই রোগীর বাড়িতে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে সে?" কার্তিক কহিলেন, "ভালই আছে; তবু আর একবার দেখাতে চায়।"

একজন ভিন্ন গ্রামের লোক—বয়সে প্রৌঢ়, অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রশ্ন করিল, "ইনি কে?" জবাব দিল আর একজন লোক—ঢ্যাংগা, কাহিল—কার্তিক-ডাক্তারের একজন দালাল, "আমাদের জামাইবাবু হচ্ছেন ইনি, আসছে মাসে বিয়ে হবে—মেডিকেল কলেজের পাশকরা ডাক্তার।"

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূতপ্রায় হইয়া কহিল, "সত্যি! তা হলে তো আর আমাদের সহরে যেতে হবে না।" চোখ দুইটা বুজিয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া দালাল কহিল, "না, তাদের চেয়ে কিসে কম আমাদের জামাইবাবাজী! একই কলেজে একই মাস্টারের কাছে একই বেঞ্চিতে বসে পড়া একই বিদ্যে—এই তো সেদিন শালডাঙ্গায় টাইফয়েড্ রোগী দেখে এলেন, ছোঁয়া মাত্র রোগী আদ্ধেক আরাম হয়ে গেছে ব'লে গেল এইমাত্র।"

পরেশ জানে, এই লোকটাই এতদিন তাহার বিরুদ্ধে যা-তা কথা বলিয়া গ্রামে গ্রামে নিন্দা প্রচার করিয়া তাহার অনেক রোগী ভাঙাইয়াছে। কার্তিক-ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা হওয়া মাত্র ইহাকেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিল। কে একজন লোক কহিল, "জামাইবাবুকে একটা হাওয়াগাড়ি কিনে দেন ডাক্তারবাবু! আর কোট প্যান্ট করিয়ে দেন, তা হ'লেই তো সহরের ডাক্তার।" দালাল কহিল, "হবে হে, হবে। সব হবে, তোমরা তোমাদের গাঁয়ের রাস্তাগুলো বাগাও গে দেখি—একেবারে ঘর্ ঘর্ ক'রে ঘরের দরজা পর্যন্ত গাড়ি চ'লে যাবে।"

কার্তিক কহিলেন, "এখনই যেতে হবে। পারবে তো?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ, যাচ্ছি, এখনই" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়া একটা সরু গলি আছে, এই গলি দিয়া গেলে নতুন পুকুরের পাশ দিয়া পরেশদের বাড়ি অল্প সময়েই যাওয়া যায়। এই নতুন পুকুরে এ-পাড়ার মেয়েরা স্নান করে। তাহা হইলেও পরেশ এই রাস্তা দিয়া চলিল। মন চিন্তিত—আরতিদের ওখানে শালটি ফিরাইয়া দিবার জন্য যাইতে হইবে; কখন যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এখন গেলে বেশীক্ষণ বসা যাইবে না। তা ছাড়া সত্যেনবাবু থাকিবেন, সময়ের অধিকাংশ তিনিই দখল করিবেন। তাহার চেয়ে ফিরিবার সময়ে যাওয়াই ভাল। সুনীতির বিবেচনা আছে, আরতি আলাপ করিতে আসিলে তিনি ভাগ বসান না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের শব্দ কানে আসিতেই পরেশ দেখিল, "কমলা অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে—মুখ লজ্জায় আরক্তিম। কাছে যাইতেই কমলা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—ভিজা চুলের রাশি পিঠের উপর লুটাইতেছে, আঁকাবাঁকা চুলের গুচ্ছ গাঢ় কৃষ্ণ সর্পশিশুর মত কান ও গালের উপর লতাইয়া রহিয়াছে, নাসিকা ও চিবুকপ্রান্তে জলবিন্দু টলটল করিতেছে, ভিজা কাপড় দেহে আঁটিয়া বসিয়া পরিপূর্ণ যৌবনকে প্রতিভাত


SWASTI & CO.
PHONE CAL. 1035.
ENGINEERS &
SPRING Manufacturers
SPECIALISTS IN
MANUFACTURING: SPRINGS
& SPRING WASHERS
OF EVERY VARIETY
38, STRAND ROAD :: CALCUTTA


SWASTI & CO.
SWASTI THE BEST
SPRING MANUFACTURERS.
38, STRAND ROAD CAL.

করিতেছে। পরেশ কহিল, "আর একটু সরে দাঁড়াও, না হ'লে গায়ে ঠেকাঠেকি হয়ে গেলে আবার স্নান করতে হবে।" কমলা আরও একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখটি আরও নামাইল। পরেশ দেখিতে পাইল—বুকের বসন দুলিতেছে, নাকের ডগা ও চোখের সিক্ত পাতা দুইটি কাঁপিতেছে, অধরের প্রান্ত দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। পরেশ কহিল, "ভয় কিসের? গায়ে হাত দেব না, পেরিয়ে যাও।" কমলা মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আপনি যান, শ্রীমতী দিদিমা ঘাটে রয়েছে। এখনি এসে পড়বে, দেখলে কত ঠাট্টা করবে এখন।"

"তাই নাকি! আজ যাব শ্রীমতী দিদির বাড়ি বিকেলে। যেও। যাবে তো?" কমলা ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল। পরেশ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। কিছু দূরে আসিয়া পরেশ মুখ ফিরাইল—দেখিল, কমলাও মুখ ফিরাইয়াছে—ধরা পড়িয়া ঝটিতি মুখ ফিরাইয়া কমলা দ্রুতপদে গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

নতুন পুকুরের ঘাটের সামনেই শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হইল। হাসিয়া কহিল, "দেখা হ'ল নাকি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "হ'ল।"

"কথাবার্তা হ'ল নাকি?"

পরেশ কহিল, "না, যা লাজুক আপনার নাতনীটি। দেখবামাত্র দেওয়ালের সঙ্গে লেপ্টে গেল।"

শ্রীমতী কহিল, "এ কি তোমাদের লেখাপড়া জানা সহুরে মেয়ে ভাই যে, দেখবামাত্র গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে আমাদের, আদর করে আশ্বাস দিয়ে ভয় ভাঙাতে হবে।" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আজকাল নাকি রাত দুপুরের আগে বাড়ি ফের না—কোথায় থাক বল দেখি?"

পরেশ কহিল, "কে বলছিল আপনাকে?"

"তোমার মাসীমা।"

পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি যাই। বন্ধুর মত ভালবাসেন আমাকে।" মুচকি হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "আর কেউ ভালবাসছে না তো?" পরেশ না বোঝার ভান করিয়া কহিল, "কে আর ভালবাসবে?"

"কেন, হেডমাস্টারের শালী!" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "সহরের শিক্ষিত মেয়েরা এত সস্তা ভেবেছেন নাকি?" শ্রীমতী জবাব না দিয়া কহিল, "আচ্ছা চলি ভাই, রান্নাবান্না করতে হবে।" যাইতে যাইতে আবার থামিয়া কহিল, "আজ বিকেলে যেও না — অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

(২৪)

পরেশ যখন গ্রামে ফিরিল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হেডমাস্টারের বাড়ির কাছে নামিয়া এরূপ অসময়ে বাড়িতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিল এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বেপরোয়াভাবে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়া বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "খোকা!" কোন সাড়া মিলিল না, কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া ডাকিল, "খোকা।" মেয়েলি কণ্ঠের সাড়া আসিল, "কে?" আরও কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানার জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া আরতি কহিল, "ওমা! আপনি! দাঁড়ান দরজা খুলে দি।" দরজা খুলিয়া আরতি কহিল, "এত বেলায়? কোথাও কাজ ছিল নাকি?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ।" গা হইতে শালটা খুলিয়া কহিল, "আপনার শালটা।" আরতি শালটা লইয়া ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "অনবরত হুল ফোটাচ্ছিল বুঝি! তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।" পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল, "না, না, সে কি, মানে—এই রাস্তা দিয়ে যখন যেতেই হ'ল, ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।" নমস্কার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, আসি তা হলে।" আরতি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "সে কি! এই রোদে রোদে এলেন, এখনই রোদে রোদে ফিরে যাবেন!" পরেশ কহিল, "তা হোক, রোদে আমাদের কষ্ট হয় না।" বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যাবেন না, বসুন।" পরেশ সবিনয়ে কহিল, "দেখুন, এখন যাই, পরে আসব এখন। আপনাদের এখনও খাওয়া হয়নি বোধ হয়, এমনই দেরি করিয়ে দিলাম—"

আরতি কহিল, "তা হোক। আপনি বসুন। আপনারও তো এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি।" চেয়ারে বসিয়া পরেশ কহিল, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ—এত সকাল খাওয়া অভ্যাস নেই। আচ্ছা, আমি বসছি—আপনি খেয়ে নিনগে।"

"বেশ! পালিয়ে যাবেন না যেন।" বলিয়া ভ্রূর ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া দিয়া আরতি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিল—হাতে একটা থালায় খানকয়েক লুচি ও তরকারি, বাম হাতে জলের গ্লাস। দেখিবামাত্র পরেশ কহিল, "এসব কি করেছেন! নিজে না খেয়ে—" আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "এমন কিছু করিনি—সব তৈরি ছিল, গুছিয়ে নিয়ে এলুম মাত্র।" থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া আরতি কহিল, "এই দেখুন! হাত ধোবার জল আনলুম না—আপনি গ্লাসের জলেই হাত ধুয়ে আসুন।" পরেশ হাত ধুইয়া আসিয়া বসিল। আরতি কহিল, "খান, আমি জল নিয়ে আসি।" কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জলের গ্লাসটি পরেশের টেবিলে রাখিয়া কহিল, "তরকারিটা খেতে কেমন লাগল? আমি নিজের হাতে রান্না করেছি।" পরেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "সত্যি!" উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "চমৎকার হয়েছে!" আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, মন রেখে বলছেন।" প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, কিছুতেই না—সত্যি বলছি, খুব ভাল হয়েছে। নেহাৎ আপনাদের কম প'ড়ে যাবে, না হ'লে আরও একটু—" আরতি কহিল, "সত্যি নেবেন?" পরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল, "থাকগে।" আরতি কহিল, "থাকগে কেন, নিয়ে আসছি।" বলিয়া পরেশকে আর আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটা প্লেটে করিয়া কতকটা তরকারি লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরেশ কহিল, "একটুখানি দিন।"

খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, "দেখুন আপনার ভাগ সাবাড় ক'রে দিলাম না তো?" আরতি কহিল, "না, আর দিলেও মেয়েরা তাতে ভয় করে নাকি? নিজেরা না খেয়ে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতেই তো তাদের আনন্দ।"

ইহাদের মধ্যে নিজে কোন দলে পড়িল তাহা ঠিক করিবার জন্য আরতির মুখের পানে তাকাইতেই পরেশ দেখিল, আরতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেখিয়া পরেশ পুলকিত হইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পরেশ কহিল, "আপনি সরস্বতী দেবীকেও হার মানিয়েছেন। সরস্বতী লেখাপড়া গানবাজনায় ওস্তাদ ছিলেন শুনি —কিন্তু রান্না-বান্না জানতেন কিনা শাস্ত্রে তার কোন উল্লেখ নেই; কিন্তু আপনি সব বিদ্যাতেই সমান নিপুণ।" আরতি আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিল, "নুন খেয়েই গুণ গাইতে শুরু করলেন যে! কিন্তু নুন তো আমার নয়, যার নুন—" পরেশ কহিল, "সত্যি! মিসেস ঘোষকে দেখছি না!" আরতি গম্ভীর হইয়া কহিল, "সকাল থেকেই দিদির শরীরটা খারাপ হয়েছে, শুয়ে আছে—" উৎকণ্ঠার সহিত পরেশ কহিল, "তাই নাকি? কি হয়েছে?" আরতি কহিল, "কি হয়েছে কি ক'রে বলব বলুন! আসছে এখনই, জিজ্ঞাসা করবেন।"

সুনীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখখানি শুষ্ক, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, কুচা চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। নমস্কার করিয়া বসিয়া ডান হাতে কপালের চুলগুলি সরাইতে লাগিল। আরতি পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ কহিল, "কি হয়েছে আপনার?" সুনীতি ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "ভারী মাথা ধরেছে—গা-হাত-পায়ে বেদনা।" পরেশ কহিল, "জিবটা বার করুন দেখি।" আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ক'রো না দিদি! বলবামাত্র মা কালীর মত জিব বের করতে হবে—ডাক্তারদের যত সব জুলুম!" পরেশ কহিল, "আপনার উপর তো কোন জুলুম করিনি!" আরতি কহিল, "করেননি আবার কি! বিশ্রী ওষুধ দিয়েছেন, গিলতে হচ্ছে তো আমাকে।" সুনীতি ইতিমধ্যে জিব বাহির করিয়াছিল; দেখিয়া পরেশ কহিল, "একটা পারগেটিভ নেওয়া দরকার; তৈরি ক'রে রেখে দেব; ঝিকে পাঠিয়ে দেবেন, নিয়ে আসবে।" আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আপনি তো সন্ধ্যের সময় আসবেন—তখন নিয়ে আসবেন।" পরেশ তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দুইজনে চোখাচোখি হইল—আরতি মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কহিল, "তার আগেই খাওয়া দরকার।"

সুনীতি কহিল, "উনি আজ বলছিলেন—পরেশবাবু এতদিন ধ'রে আরতিকে দেখছেন—ওঁর ফীটা দেওয়া হয় নি। আপনার—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "ফী তো দিয়েছেন।" সুনীতি আরতির দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "তুই কি দিয়েছিস নাকি?" আরতি লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "দিদির যেমন কথা! আমি দিলে তোমরা জানবে না?"

পরেশ স্মিতমুখে দুই বোনের দিকে তাকাইয়া ছিল, কহিল, "আপনারা সবাই মিলেই দিয়েছেন, স্নেহ—শ্রদ্ধা" সুনীতি কহিল, "ওঃ! এই! কিন্তু শুধু স্নেহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে তো ডাক্তারি করা চলে না পরেশবাবু, তা ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন, তার দাম তো নিতে হবে।" পরেশ কহিল, "না না, ও কথা বলবেন না। আমার নিজের লোকদের অসুখ হ'লে কি আমি ফী নিই, না ওষুধের দাম নিই—আপনাদের আমি তাইই ভাবি।"

আরতি পরেশের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, পরেশ তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই মুখ নামাইয়া লইল।

(২৫)

সেদিন বিকালে পরেশ শ্রীমতীর বাড়িতে গিয়াছিল। শ্রীমতী বসিয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বলিয়াছিল, "কিহে! গন্ধ পেয়েছিলে নাকি?" পরেশ ভাল মানুষির ভান করিয়া কহিল, "কার?" শ্রীমতী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "ন্যাকামি ক'রো না। কেন, কমলীর।" পরেশ নিরীহের মত কহিল, "এসেছে নাকি?" হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "না হে! মিছে ক'রে বলছিলাম। তা কি জন্যে এসেছ বল দেখি?" পরেশ ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "সে কি দিদিমা—আসতে বলেছিলেন যে!" কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত শ্রীমতী কহিল, "বলেছিলাম নাকি! ভুলে গেছি, তা ব'স ভাই!" বলিয়া চরকা ঘুরাইতে লাগিল। পরেশ কহিল, "থাকগে আর বসব না। আপনি কাজ করছেন, চলি তা হলে।" বলিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেই শ্রীমতী কহিল, "চ'লে যাচ্ছ কেন হে! ব'স না—কমলী নাই বা থাকল, আমার সঙ্গেই না হয় একটু গল্প কর। চরকা আমি বন্ধ করছি।" পরেশ কহিল, "না থাক।" বলিয়া কতকটা চলিয়া আসিতেই শ্রীমতী কহিল, "যাও তো মাথা খাও আমার, শুনে যাও, কথা আছে।" পরেশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি কথা?" শ্রীমতী কহিল, "ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে কি কথা বলা যায়? ব'স স্থির হয়ে।" পরেশ একটা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িল। শ্রীমতী চরকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "কমলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?" পরেশ জবাব না দিয়া মুচকি হাসিল। শ্রীমতী কহিল, "আমি এখনই ডেকে এনে দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি কুলীন বামুনের মেয়ে—আজন্ম ব্রহ্মচারিণী (পরেশ মনে মনে হাসিল), তা ছাড়া তোমার গুরুজন, আমার পা ছুঁয়ে তোমাকে বলতে হবে যে, এক মাসের মধ্যে তুমি কমলা ছাড়া আর কোন ছুঁড়ীর সঙ্গে মিশবে না।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হলে তো মাসখানেক আমাকে ডাক্তারি বন্ধ ক'রে বাড়িতে ব'সে থাকতে হবে।" শ্রীমতী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "কেন! ছুঁড়ীদের চিকিচ্ছে না করলে বুঝি ডাক্তারি করা যায় না?" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "ডাক্তারি করতে গেলে অত বুড়ী ছুঁড়ী বাছলে চলে না। যে ডাকবে তারই কাছে যেতে হবে।" শ্রীমতী কহিল, "বেশ, তা যেও। কিন্তু রাত দুপুর পর্যন্ত আড্ডা দিও না।" পরেশ বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "রাত দুপুর পর্যন্ত কার কাছে আড্ডা দিই আমি? শ্রীমতী কহিল, "কেন, ঐ শহুরে ছুঁড়ীটার কাছে, দাও না?" পরেশ কহিল, "কে বললে আপনাকে?"

"দুখের মা। তোমাদের বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিল সেদিন—ওকে জিজ্ঞেসা করতেই সব ব'লে গেল।"

"তা ভদ্রলোক নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালে তো না গিয়ে পারি না।" ভু নাচাইয়া শ্রীমতী কহিল, "কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটার চাল-চলন ভাল নয়, শুনেছি—হয়তো এমন গুণ করবে যে, শেষে বামুনের কুকুর হয়ে কায়েতের হাঁড়ীতে মুখ দিয়ে বসবে।" পরেশ ধারালো স্বরে কহিল, "পাগল হয়েছেন নাকি?" উপরে ও নীচে মাথা নাড়িয়া শ্রীমতী কহিল, "হ্যাঁ! পাগলই তো।" বলিয়া দুই ঠোঁট চাপিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ 'খুক্' করিয়া কাসির শব্দ হইতেই পরেশ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, শ্রীমতী রাগত স্বরে কহিল, "ছুঁড়ীর আর তর সইছে না।" আগ্রহের স্বরে পরেশ কহিল, "কমলা রয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ হে আছে। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই গেল না। ... যে করেছ ওকে!" হাঁকিয়া ডাকিল, "ওলো কমলী, এখানে আয় দেখি, ... বলবার আছে বল্।" কমলা আসিল না। শ্রীমতী কহিল, "না হয় ...মিই চলহে। এস দেখি।" বলিয়া পরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া ...ইয়া গেল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁসিয়া কমলা দাঁড়াইয়া ছিল—পরিধানে কালাপাড় শান্তিপুরী শাড়ি ও সেমিজ, মাথায় এলো খোঁপা, নতমস্তকে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। তাহার সামনে পরেশকে দাঁড় করাইয়া দিয়া শ্রীমতী কহিল, "আমার গা ছুঁতে তো ই'চ্ছে হ'ল না। বেশ, কমলীর গা ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা কর।" পরেশ খপ করিয়া কমলার বাম বাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি বলতে হবে বলুন।" শ্রীমতী কহিল, "বল তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না, যদি বাসি, যাকে বাসব তার মাথা খাব।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বলছি—তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না, হ'লতো?" শ্রীমতী কহিল, "বাকীটুকু বল।" কমলা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, এই শীতের দিনেও তাহার কপালে মুক্তোবিন্দুর মত স্বেদ বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। পরেশ কোমল নারী দেহে চাপ দিয়া কহিল, "বাকিটুকু মুখে আসবে না—মনে মনে বলছি।" শ্রীমতী কমলাকে কহিল, "ওলো, তোর কি বলবার আছে বল্ দেখি।" কমলা শ্রীমতীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মুখ নামাইল। শ্রীমতী কহিল, "বেশ! লজ্জা করিস তো আমি না হয় চ'লে যাচ্ছি।" বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া কহিল, "তোমরা বোঝাপড়া কর ভাই, আমি একটু আসছি।"

পরেশ প্রতিজ্ঞা-ভাষণ শেষ হইলেও কমলার হাত ছাড়ে নাই। কমলা ফিস ফিস করিয়া কহিল, "হাতটা ছাড়ুন।" পরেশ কহিল, "আর কি কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে ব'লে ফেল—একেবারে সেরে নিই।" জোর করিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কমলা কহিল, "কিছু প্রতিজ্ঞা করতে হবে না আপনাকে।" ঢোক গিলিয়া গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ভাল লাগে না আপনার—" পরেশ কহিল, "ভাল লাগবে না কেন?"

"আমি কালো, মুখ্যু, তাই—"

পরেশ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কমলা ধরা গলায় কহিল, "আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, বাবাকে ব'লে দিন না কেন! মিথ্যে কেন আশা দিচ্ছেন?" বলিয়া পরেশের মুখের দিকে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল। পরেশ কহিল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে না—তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই—এ সব কথা জানলে কি ক'রে?" কমলা জবাব না দিয়া পরেশের দিকে পিছন ফিরিয়া দেওয়ালে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। পরেশ কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, "কি এমন করেছি আমি যে, দিদিমা যা-তা বললেন, তুমি রাগ করেছ?" কমলা অশ্রু ঘন কণ্ঠে কহিল, "পাড়াগেঁয়ে কালো কুৎসিত মেয়ের আবার রাগ-অভিমান করতে আছে নাকি? আর করলেও কার কি আসে যায়!" এই কিশোরী মেয়েটির অভিমান কাঁচা-মিঠে আমের মত পরেশের ভাল লাগিতেছিল, ইহাকে চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিবার জন্য পরেশ কহিল, "তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের আসে যায় বই কি?" কমলা কহিল, "তা হয়তো যায়, কিন্তু আপনার?"

"আমারও আসে যায়, তোমার সঙ্গে যখন দুদিন পরে বিয়ে হবে আমার।" তীব্র চাপা স্বরে কমলা কহিল, "আর বিয়ে হয়ে কাজ নেই, যাকে ভাল লাগে না, তাকে বিয়ে করে সারা জীবন নিজে জ্বলবেন, আর তাকেও জ্বালাবেন।"

পরেশ কহিল, "বেশ, আমি তা হ'লে যাই।" মেয়েটি চকিতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিল, "চলে গেলেই তো বাঁচেন আপনি।" পরেশ কহিল, "তা কি করব? তুমি মিছেমিছি রাগ করছ, যা তা বলছ।" কমলা কহিল, "কি যা তা বললাম আমি?" পরেশ আহত স্বরে কহিল, "যা তা বলনি? আমাকে যে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, সে আমাকে বলে লাভ কি? তোমার মা বাবাকে বলো কিংবা শ্রীমতী দিদিমাকে দিয়ে বলিও।" কমলা মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কখন আমি ও-কথা বললাম?"

"তা বললে বইকি! আমাকে বিয়ে ক'রে সারা জীবন জ্বলবে—বল নি তুমি?" কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া পরেশ কহিল, "বেশ, আমি চিঠি লিখে তোমার বাবাকে সব জানিয়ে বিয়ে ভেঙে দিতে বলব।" বলিয়া দরজার দিকে চলিল। কমলা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "দেখুন, মিথ্যে যা তা লিখবেন না। আমি যে আপনাকে একথা বলতে পারি, বাবা বিশ্বাস করবেন না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার এমনই দেখা হয়, মা ছাড়া আর কেউ জানে না।"

পরেশ কহিল, "শ্রীমতী দিদিমাকে সাক্ষী মানব।" কমলা কহিল, "শ্রীমতী দিদিমা সাক্ষী দেবেন না।"

"বেশ বাঁ হাতে তোমার নাম দিয়ে চিঠি লিখব।" কমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি তো চিঠি লিখতে জানি না!" পরেশ

কহিল, "মা-ই বা জানলে, পাড়ার কোন মেয়েকে দিয়েও তো লেখাতে পার!"

কমলা কহিল, "আমাদের বাড়ির বা পাড়ার কোন মেয়ে লিখতে জানে না।" অসহায়ভাবে পরেশ কহিল, "তা হ'লে কি করব, বল? আমাকে বিয়েও করবে না, অথচ এমনই করে ধমকাবে!"

কমলা কহিল, "আপনাকে ধমকালাম নাকি?"

"ধমকালেই তো! একটিবার ছুঁয়েছিলাম তো এমনই জোরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে যে হাত এখনও ব্যথা করছে।" বলিয়া বাম হাতটি ডান হাতে বুলাইতে লাগিল। কমলা কাছে আসিয়া কহিল, "কই, দেখি আপনার হাত — আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া হাত বাড়াইতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল, "থাক, থাক, আমাকে ছুঁলে তোমার জাত যাবে, আমি হাড়ি—ডোম—" কমলা হাসিয়া ফেলিয়া খপ্ করিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এই দেখুন ছুঁয়েছি—হ'ল তো! দেব বুলিয়ে হাত?"

পরেশ গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "দাও, কিন্তু আরও একটু কাছে সরে এস না।" ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে কমলা কহিল, "না—পরক্ষণেই কহিল, কেন?" পরেশ ঝটু করিয়া হাত বাড়াইয়া কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে সজোরে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইল। কমলা দুই হাত পরেশের বুকে দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ত্রস্তস্বরে কহিল, "এখন না, বিয়ের পরে। তখন কিছু মানা করব না।" তাহার ভীতা হরিণীর মত ভয়ার্ত দৃষ্টি, মুখের বিবর্ণ ব্যাকুলতা, কণ্ঠের করুণ কাকুতি পরেশের মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিকে তীব্র কশাঘাতে নিরস্ত করিল। ছাড়িয়া দিয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "কিছু মনে করো না কমলা, মাপ কর আমাকে।" বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইতে উদ্যত হইতেই কমলা সানুনয় কণ্ঠে কহিল, "আপনিও কিছু মনে করবেন না—বিয়ের আগে ও-সব ভাল নয়, ওতে অমঙ্গল হয়।" পরেশ বাহিরে পা দিতেই কমলা কহিল, "কোথায় যাচ্ছেন? পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "বাড়ি যাচ্ছি।" কমলা কহিল, "বসুন না—দিদিমাকে ডেকে আনি, গল্প করুন।"

"আর তুমি?"

"আমি একধারে বসে বসে শুনব।"

"তাতে তোমার লাভ?"

"আমার ভাল লাগে আপনার কথা শুনতে—" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ করেন নি তো?" পরেশ কহিল, "তুমিও করো না?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে পরেশ আজ বিকালের ঘটনা মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিল। আজ সে শ্রীমতীর বাড়ি গিয়াছিল, শুধু কমলার দর্শনলাভের জন্য নহে। সে আশা করিয়াছিল, কমলা হয়তো আজ কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া উঠিবে এবং ভাবী বিবাহ বন্ধনের হুণ্ডির বদলে তাহার কাছ হইতে পরিপূর্ণ মূল্য না হোক, বাটা বাদ দিয়া আংশিক মূল্য আদায় হইবে। নির্জন কক্ষে শ্রীমতী যখন তাহাকে কমলার সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং অশ্রুমুখী কমলা অভিমান বাক্যের দ্বারা তাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তাহার মনের মধ্যে ক্ষুধাতুর কামনা নিশ্চিত খাদ্যের আশায় লোভাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর কমলা যখন স্বেচ্ছায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রশ্রয় দিল, চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের আভাস ফুটাইয়া তুলিল, তখন দুরন্ত কামনা দুর্নিবার লোভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যদি কমলা তাহাকে বাধা না দিত, যদি তাহার ভদ্রতা, শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া নিজেকে ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সে কি করিয়া বসিত বলা যায় না। নিজ হৃদয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, তখনও পর্যন্ত সেখানে তাহার ক্ষুধার্ত কামনা পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ লইয়া লালাসিক্ত জিহ্বা বাহির করিয়া লোভে ও লালসায় এ কোণ—ও কোণ করিতেছে।

(২৬)

পরদিন দুই-তিনটা দূরে গ্রামের ডাক ছিল। কাজকর্ম সারিয়া বাড়ি ফিরিতে পরেশের তিনটা বাজিয়া গেল। স্নানাহার সারিয়া একটু-খানি বিশ্রাম করিতে যাইতেছে — এমন সময়ে স্কুলের চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিল। হেডমাস্টার চিঠি লিখিয়াছেন—"বাড়ি হইতে খবর পাইলাম, আমার স্ত্রীর জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। স্কুলে নানা কাজে এমনই ব্যস্ত আছি যে, বাড়ি যাইয়া খবর লইতে পারি নাই এবং রাত্রি আটটার আগে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আপনি দয়া করিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পরেশ হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে হাজির হইল এবং সটান বৈঠকখানার মধ্যে গিয়া বসিয়া হাঁকিল, "খোকা!" আরতি আসিল ও মুখখানি চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়া কহিল, "দিদির জ্বরটা বেশি হয়েছে এবেলা।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "টেম্পারেচার কত?"

"১০২'র উপর।"

"চলুন দেখি।" বলিয়া আরতির পিছনে পিছনে সুনীতির শয়নকক্ষে হাজির হইল। একটা বিস্তৃত খাটে সুনীতি শুইয়াছিল—আপাদ-কণ্ঠ লেপে ঢাকা। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?" সুনীতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ভাল না। ভাগ্যে আরতি এসেছিল, না হ'লে কী যে হ'ত!" পরেশ কহিল, "কিছু ভয় নেই—ম্যালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়।"

রোগী দেখিয়া পরেশ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি চলি, ওষুধটা তৈরি করে রাখিগে, আপনাদের ঝিকে এখনই পাঠিয়ে দিন ওষুধটা আনতে।" আরতি অনুনয়ের সুরে কহিল, "জামাইবাবু যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ থাকুন আপনি—আমার ভয় করছে। ঝি বরং প্রেস্‌ক্রিপশনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে ওষুধ আনুক।" পরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বেশ, আমি বসছি। ওকে কার্তিক ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা আনতে বলে দিন।" আরতি প্রেসক্রিপশনটা লইয়া চলিয়া গেল। ফিরিল মিনিট কুড়ি পরে—ডান হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা। পরেশ অন্যমনস্ক-ভাবে নতমুখে বসিয়াছিল, আরতি কাছে আসিতেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "ও আবার কি?" আরতি কহিল, "কিছু না, এক কাপ চা শুধু।"

চা খাইতে খাইতে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ঝিকে পাঠিয়ে দিলেন?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। পরেশ কহিল, "আজই অন্ততঃ দু ডোজ খাইয়ে দেবেন।" আরতি ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। তারপর—দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরেশ চা খাইতে লাগিল, আরতি বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ আরতি প্রশ্ন করিল, "কার্তিক-ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেই আপনার বে হবে, না?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কে বললে আপনাকে?"

"ঝি বলছিল—আসছে মাসে বিয়ে হবে।"

পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "তাই তো শুনছি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া আরতি কহিল, "নিজে বুঝি জানেন না! এদিকে মনে মনে দিন গুনছেন সারাক্ষণ।" পরেশ জবাব দিল না।

চা খাওয়া শেষ হইলে আরতি কাপ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, হাতে প্লেটে করিয়া পান।

পরেশ কহিল, "আপনি দেখছি আতিথেয়তায় ত্রুটী রাখবেন না। নিজে সাজলেন নাকি?"

আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "সাজতে জানি নে নাকি ভাবছেন? ও-বেলা কার হাতের পান খেয়েছিলেন?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া অর্ধনিমীলিত চক্ষে স্বগত কহিল, "ও! তাই!" আরতি ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "কি?" ও-বেলা পান খাইয়া পরেশের জিব পুড়িয়াছিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিবটা নাড়িতে পারে নাই—দিনের বেলায় খাওয়ার সময়ে পর্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল; কহিল, "তাই এত ভাল লেগেছিল—গ্র্যাজুয়েটের হাতের পান।" আরতি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "ঠাট্টা করছেন বুঝি?" পরেশ কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, প্রশংসা করছি। আপনি আমাকে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছেন। কলেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন।" প্রসন্ন হাসি হাসিয়া আরতি কহিল—"কি ধারণা ছিল আপনার?" পরেশ কহিল, "ধারণা ছিল, কলেজে পড়া মেয়েরা সেক্সপীয়র—রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে বুঝতে পারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে শক্ত শক্ত প্রবন্ধ লিখতে পারে, সভা-সমিতিতে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারে, কম্যুনিজম বুলি আওড়াতে পারে; কমরেডদের মক্ষিরাণী হয়ে দেশোদ্ধারের প্রেরণা ও উন্মাদনা জোগাতে পারে; কিন্তু তারা যে আবার উবু হয়ে বসে ভাত-ডাল সেদ্ধ করতে পারে, লুচি বেলতে পারে, পা মেলে ব'সে পান সাজতে পারে—" আরতি বাধা দিয়া কহিল, "বুঝেছি আপনার ধারণা কলেজে-পড়া মেয়েরা কিম্ভূতকিমাকার জীব, তাদের নিয়ে সংসার করা চলে না।" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। আরতি ক্ষুরধার হাসি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু জানেন পরেশবাবু তারা বিয়েও করে এবং আপনাদের পাড়াগাঁয়ের অবলা-সরলাদের চেয়েও স্বামীদের সুখী করে। রঙিন পাখা মেলে তারা উড়তেও জানে, আবার পাখা গুটিয়ে বাসাতে ব'সে সংসারধর্ম পালন



পূজার অর্ঘ্য
সুরভিত ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত
হেমকান্তি
কেশ তৈল

করতেও জানে।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিল, "আপনার হবু গিন্নিটি লেখাপড়া জানেন?" পরেশ কহিল, "কিছু জানেন ব'লেই ধারণা ছিল এতদিন, কাল শুনলাম—অক্ষর-পরিচয়ও নেই।"

"গান-বাজনা?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"রান্নাবান্না জানেন নিশ্চয়।"

পরেশ জবাব দিল, "তা জানেন।"

"পান-দোক্তা খান?"

পরেশ কহিল, "খান।" আরতি হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তো আপনার আদর্শ গৃহিণী; ভাগ্যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন, না হ'লে এতদিনে কেউ ঘাড়ে চেপে বসলে এমন রত্নলাভ আর হয়ে উঠত না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বসুন একটু, দিদিকে একবার দেখে আসি।"

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে।" পরেশ কহিল, "ওঁর ঘরে কেউ আছে তো?" আরতি কহিল, "আছে বই কি! খোকা খুদের সংগে খেলা করছে।"

চেয়ারে বসিয়া আরতি কহিল, "দিদির জ্বরটা কি সত্যই ম্যালেরিয়া?" পরেশ কহিল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আরতি কহিল, "শীতকালেও ম্যালেরিয়া হয় নাকি?" পরেশ কহিল, "নতুন ক'রে না হতে পারে, কিন্তু উনি তো বরাবরই এখানে থাকেন।" আরতি কহিল, "আমারও হবে নাকি?" পরেশ কহিল, "না হতেও পারে।" পরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আরতি কহিল, "অর্থাৎ হতেও পারে। তা হ'লে ভারী মুশকিল হবে কিন্তু, আমার এমনই ছুটি ফুরিয়ে এসেছে।"

পরেশ উদ্বেগ যথাসাধ্য চাপা দিয়া কহিল, "আর কতদিন বাকি আছে ছুটির?" ঘাড় নাড়িয়া আরতি কহিল, "বেশিদিন না।" মুখখানি ম্লান করিয়া তুলিয়া কহিল, "অথচ সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারলুম না। আপনি দেখলেন না প্রথম থেকে, ভেবেছিলেন, লেখাপড়া জানা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ একটা ম'লেই মঙ্গল।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ছিঃ! ওকথা বলবেন না।" তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরতি কহিল, "কেন বলব না? আপনার তো আমাদের মত মেয়েদের ওপর এই ধরণেরই মনোভাব।" পরেশ কহিল, "আমি তো বললাম আপনাকে, আগে ছিল, আপনি বদলে দিয়েছেন।" আরতি কহিল, "আমাকে আপনি 'আপনি' করেন কেন? 'তুমি' বলতে পারেন না?" পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "মানে আপনার সংগে বেশি দিনের আলাপ নয় তো, মানে—" আরতি কহিল, "নেই বা হ'ল। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা কি পরিচয়ের দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে? এক মুহূর্তের পরিচয়ে একজন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, আবার সারাজীবন পাশাপাশি থেকেও একজন অন্তরের অন্তরালেই থেকে যায়।" বলিয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি ঘন করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইল। সেই চোখের সহিত চোখ মিলিতেই পরেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "সত্যেনবাবু এখনও এলেন না!" আরতি কহিল, "আসতে দেরি হবে, স্কুল কমিটির মিটিং আছে।" মুচকি হাসিয়া কহিল, "আপনি এত ছটফট করছেন কেন? শ্বশুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "না।" মুখ গম্ভীর করিয়া আরতি কহিল, "তা হ'লে আমার সঙ্গ বুঝি আপনার ভাল লাগছে না? বেশ, আমি না হয় চ'লেই যাচ্ছি।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই পরেশ সাবেগে কহিল, "পাগল হলেন নাকি! উঠবেন না, বসুন।" সক্ষোভে কহিল, "আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে না—এই বুঝি এতদিন পরে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হ'ল! আপনাকে যদি—" আরতি বসিয়া বাধা দিয়া কহিল, আবার 'আপনাকে'? পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমাকে বলতে বাধ-বাধ ঠেকছে।"

আরতি কহিল, "বাধা রেখেছেন ব'লেই বাধ-বাধ ঠেকছে, আপনার ব'লে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। কিন্তু আমি আপনাকে অতি সহজেই 'তুমি' বলতে পারি।" পরেশ কহিল, "তাই বলুন আগে, তা হ'লে সাহস হবে আমার।"

আরতি মুচকি হাসিয়া শাণিত ইস্পাতের মত চকচকে চোখে চাহিয়া কহিল, "শুনলে আপনার হবু গিন্নী কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবেন। ভাববেন, কোথাকার কে তাঁর জিনিসে ভাগ বসাতে এসেছে।" পরেশ কহিল, "মানুষ কি কারও একলার জিনিস হতে পারে? সারাজীবন ধ'রে যত লোকের সংস্পর্শে আসে, সকলের মধ্যে নিজেকে তিল তিল ক'রে ভাগ ক'রে দেয়।" আরতি কহিল, "বিলিয়ে দেয় তার ব্যক্তিত্বকে; কিন্তু ব্যক্তিত্ব নিয়ে তো স্ত্রীর কোন প্রয়োজন নেই। সে চায় ব্যক্তিটিকে এবং পুরোপুরিভাবে, তাতে কাউকে কণামাত্র ভাগ বসাতে দিতে চায় না" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, "অন্তত আমার মত মেয়ে হ'লে—" পরেশ কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিল, "আপনিও ওই দলের নাকি?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়! কিন্তু আপনি আবার 'আপনি' বলছেন?" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, তুমি।" বিমল হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া আরতি কহিল, "গুড বয়। কথা শুনলে এত ভাল লাগে। আমার যে ছাত্রীরা আমার খুব কথা শোনে, তাদের আমি খুব ভালবাসি।" বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি পরেশের মুখের উপর ন্যস্ত করিল। পরেশ সাহসী হইয়া উঠিয়া কহিল, "সত্যি নাকি! আমিও তো তোমার অত্যন্ত আজ্ঞাবহ হয়ে উঠেছি।" মুখ লাল করিয়া আরতি কহিল, "যান—আপনি ভারী দুষ্টু!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চটুল কণ্ঠে কহিল, "আপনারও ভালবাসা চাই নাকি?"

বৌদিকে পরেশের মনে পড়িল—শান্ত, নম্র, ধীর, শ্রী ও হ্রী-মতী মেয়েটি, ভালবাসার ফল্গুধারা বুকে লইয়া তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কমলার মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা মনে পড়িল, 'বসুন না, গল্প করুন, কথা শুনতে ভাল লাগে আপনার—' কমলাও ভালবাসে তাহাকে।

পরেশ কহিল, "চাই বই কি! বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, আমার সংগে যে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলে ভুলে গেছ নাকি?" আরতির মুখে রক্তাভা মুহূর্তে মধ্যে মিলাইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "ভুলি নি।" আবার দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি মৃদু বিরস কণ্ঠে কহিল, "সারাদিন আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না—হাতটা একবার দেখুন না দয়া ক'রে।" পরেশ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার ক'রে 'দেখুন' 'দয়া করে' এই সব কথা?"

আরতি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "কি বলতে হবে?"

পরেশ কহিল, "বন্ধু যা বন্ধুকে বলে।"

আরতি কহিল, "পরে বলব" বলিয়া ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল। পরেশ ডান হাত দিয়া আরতির মনিবন্ধটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে 'পরে বলব?'"

আরতির নবনীত কোমল শুভ্র সুগঠিত বাহুটির দিকে তাকাইয়া এই বাহুমাল্য একদা যে ভাগ্যবানের কণ্ঠে বিলম্বিত হইবে, তাহার প্রতি পরেশ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নাড়ী দেখিয়া পরেশ কহিল, "কিছু হয়নি তোমার।"

অভিমানের সুরে আরতি কহিল, "আপনার তো ওই কথা কিছু হয়নি।" বলিয়া ঠোঁট ফুলাইল। পরেশ হাসিয়া কহিল, "কিছু না হ'লেও হয়েছে বলতে হবে?"

পরেশের মুখের পানে একবার বিষণ্ণ নয়নে তাকাইয়া মুখ নত করিয়া আরতি কহিল, "আমার ভাল লাগছে না এখানে, দিদি একটু সেরে উঠলেই চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

তীক্ষ্নস্বরে আরতি কহিল, "কোন চুলো আমার আছে বলুন যে, যাব সেখানে। ফিরে যাব আমার স্কুলের চাকরিতে।" বলিয়া ডান হাতের তর্জনী দিয়া টেবিলের উপর কি লিখিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "আমার ওষুধটা আরও দিন কতক ট্রায়াল দেওয়া উচিত।"

আরতি কহিল, "থাকগে, কি হবে ভাল হয়ে পরেশবাবু! এই তো জীবন! মা নেই, বাবা থেকেও নেই, সত্যিকার আপনার জন বলতে কেউ নেই। শেওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াই, এ ঘাটে ও ঘাটে, দাসীবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করি পরের মন জুগিয়ে। জীবনে সুখ নেই, আনন্দ নেই, কারও কাছে কোন মূল্য নেই।" বলিয়া উঠিয়া বাহিরে অন্ধকার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। পরেশও পিছনে পিছনে গিয়া কাছে দাঁড়াইল। আরতি ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এখন যাবেন না।" পরেশ সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি কাঁদছ নাকি?" ধরা গলায় আরতি কহিল, "না।"

পরেশের কি জানি কেন মতিভ্রম ঘটিল—চট্ করিয়া আরতির গালে হাত দিয়া কহিল, "এই যে কাঁদছ!" সরিয়া দাঁড়াইয়া আরতি কহিল, "কান্না পেলে কাঁদব না? এও কি আপনার ডাক্তারী শাস্ত্রে নিষেধ নাকি?"

পরেশ নিজের হঠকারিতার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, কমলার মতই আরতি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিবে, দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া, তীব্রকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আছে বইকি! কাঁদলে শরীর আরও খারাপ হবে।" সামনে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আরতি কহিল, "হোক খারাপ, আমার মরণই ভাল।"

"ছিঃ!, ওকথা ব'লো না।"

"আমার মরণ হ'লেও রোগীর অভাব আপনার হবে না।"

"আমি কি তোমাকে রোগীর মত দেখি?"

"তা ছাড়া আবার কি?"

"কেন! বন্ধুর মত—"

ঝঙ্কার দিয়া আরতি কহিল, "চাইনে আপনার বন্ধুত্ব!" পরম বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "তবে কি চাই?" আরতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "তা আপনার জেনে কি হবে? সে জিনিস দেবার সাধ্য আপনার নেই।" বলিয়া নীলাভ কৃষ্ণ আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আরতির অন্তরের এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তীব্র বিদ্যুৎ বিকাশের মত তাহার হৃদয় ও মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। বিহ্বলের মত সে আরতির মূর্তির মত স্থির দেহের পানে তাকাইয়া রহিল।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরতি কহিল, "জামাইবাবু আসা না পর্যন্ত দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি দিদির কাছে যাচ্ছি।" বলিয়া ধীরপদে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে পরেশ সুনীতিকে দেখিতে গেল। সতোনবাবু চিন্তিত মুখে বসিয়া ছিলেন। পরেশকে দেখিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আসুন।" কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার কালো মেঘ সে হাসিটুকু গ্রাস করিয়া লইল। পরেশ কহিল, "কেমন আছেন?" সতোন কহিল, "ভাল নয়, সকালেই টেম্পারেচার ১০২০।" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "রক্তটা পরীক্ষা করতে পারলে হ'ত, কিন্তু এখানে কোন উপায় নেই, তা হ'লেও আমি একবার কুইনিন দিয়ে দেখব, যদি রেস্‌পনড করে ভাল, না হয় তো অন্যভাবে চিকিৎসা করতে হবে।" সতোনবাবু শুষ্কমুখে কহিলেন, "তা হ'লে তো টাইফয়েড—"

সাহস দিয়া পরেশ কহিল, "পুরোপুরি টাইফয়েড নাও হতে পারে, প্যারা টাইফয়েড—"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সতোনবাবু কহিলেন, "সে তো একই।"

সুনীতির শয্যাপার্শ্বে আরতির দেখা মিলিল, বাসি পদ্মফুলের মত ম্লান বিষণ্ণ মুখ। আরতি সুনীতির শিয়রে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বিছানা হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব মাথার বেদনা নাকি?" আরতি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

"কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

সতোনবাবু জবাব দিলেন, "ভাল হয় নি।"

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আরতি পাশ দিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, পরেশ তাহাকে কহিল, "একটু হাত ধুতে জল দিতে পার?"

আরতি গম্ভীর বদনে কহিল, "দিচ্ছি পাঠিয়ে।"

বৈঠকখানায় আসিয়া প্রেসক্রিপশান করিয়া দিয়া পরেশ কহিল, "আপনি ওষুধটা কার্তিক-ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নেবেন। আমি এখন আসি। ওবেলা এসে দেখে যাব।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সতোন কহিলেন, "বসুন একটু, আরতি বোধ হয় চা করতে গেছে।" পরেশ বসিয়া কহিল, "আবার ওসব হাঙ্গামা কেন? একে বাড়িতে অসুখ, তার ওপর ও'র একলার উপরেই তো সব ঝক্কি!" সতোন কহিলেন, "হ্যাঁ, ভাগ্যে ও এসেছিল, না হ'লে উপোস দিতে হ'ত আমাদের। আমি তো ওসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ী কিনা!" পরেশ হাসিয়া কহিল, "আমিও তাই! মাসীমা দয়া ক'রে না এলে ভারী বিপদে পড়তে হ'ত। কিন্তু এতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। ইংরেজরা যেমন আমাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আমাদের রণ-বিমুখ ক'রে রেখেছে, মেয়েরাও তেমনই আমাদের হাতা-বেড়ী কেড়ে নিয়ে রান্না-বিমুখ ক'রে রেখেছে। হাতিয়ার আর হাতা হাতে পেলে—" সতোন শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, পরেশবাবু, যদি টাইফয়েড ব'লেই সাব্যস্ত হয়, তা হ'লে এখানে রাখা ঠিক হবে তো?" পরেশ বুঝিল তাহার বক্তৃতা মাঠে মারা গিয়াছে; কহিল, "কেন?"

"ওষুধপত্র পথ্য এখানে পাওয়া যাবে তো?"

"যাবে না কেন? এদেশে কি কারও টাইফয়েড হয় না? না, টাইফয়েড হ'লে সারে না?" সতোনবাবু চিন্তাকুলমুখে কহিলেন, "তা বটে! তবে এখানে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, আমি তো স্কুলের কাজেই সারাদিন ব্যস্ত, আরতির শরীরও ভাল নেই—সেবা করবে কে, সংসারই বা দেখবে কে?" পরেশ কহিল, "আপনি কি এখান থেকে নিয়ে যেতে চান?" সতোন কহিল, "হ্যাঁ সেখানে সবাই যখন রয়েছেন—" পরেশ কহিল, "বেশ, আরও একদিন দেখি, যদি সুবিধে না হয় তাই করবেন।"

করুণ কণ্ঠে সত্যেন্দ্র কহিলেন, "তখন উপায় থাকবে তো?"

পরেশ কহিল, "তা থাকবে।"

আরতি আসিল না, দুখের মা দুই কাপ চা লইয়া আসিল। সতোন কহিল, "তোমার মাসীমা কি করছেন?" দুখের মার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেলেও ভারী লজ্জাবতী, লজ্জায় থসুথসে হইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, "মাসীমা ছ্যান করতে গেইছেন। এখন আসতে পারবেন নিকো।" বলিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পরও পরেশ আসিল। সতোনবাবু বাড়িতেই ছিলেন, আরতি রান্নাঘরে ছিল। রোগী দেখিয়া গল্প করিয়া চলিয়া আসিল। আরতি একবারও দেখা দিল না।

রাত্রে খাওয়ার পরে ডাক্তারী বই সামনে লইয়া পরেশ আরতির চিন্তা করিতে লাগিল। একটা দিনের মধ্যেই আরতি যেন আবার অপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছে। কাছে আসে নাই, কাছে গেলে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কথা কহে নাই, কথা কহিতে গেলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কি তাহার অপরাধ? বন্ধুত্বে আরতির অরুচি হইয়াছে, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় কিছু তাহার কাছে চায়। তাহা যে কি সে আন্দাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আশা করিয়া কি আরতি আহার সহিত আলাপ করিয়াছিল! তাহারা হিন্দু সমাজের ছেলেমেয়ে; তাহাদের জাতি ভিন্ন; এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে তাহাদের মিলন যে অসম্ভব, তাহা তো আরতি বুঝে। তাহা ছাড়া তাহার নিজের অবস্থাও অত্যন্ত জটিল। কমলার সহিত তাহার বিবাহ স্থির এবং যতদূর বুঝা গিয়াছে কমলা এখন হইতেই মনেপ্রাণে পত্নীত্বের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখানে বাস করিতে হইলে কমলাকে বিবাহ করিয়া কার্তিকের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লওয়াই যে লাভ ও লোভনীয় তাহা এ কয় দিনেই প্র্যাক্টিসের সুরাহাতে বুঝা গিয়াছে। আরতিকে বিবাহ করিয়া অকূলে তরী ভাসাইবার যদি তাহার শক্তি ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তো সে বর্বিকেই বিবাহ করিতে পারিত। বর্বিকে মনে পড়িল পরেশের, মনে পড়িল সেদিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি। বর্বি বিদায় লইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে যদি কোন দিন সে গ্রামে আসে, আর সে এখানে থাকে, হয়তো তাহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু সেদিন তাহার সীমন্তে থাকিবে পরাধিকারের রক্তপতাকা, প্রকোষ্ঠে লৌহ নিগড়। সেদিন তাহার মুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত চলিবে না, অনাত্মীয়ার অবগুণ্ঠন দৃষ্টিপথ রোধ করিবে এবং যে ভালবাসা দেহে রক্তস্রোতের মত নিঃশব্দ-গতিতে তাহার মনের শিরা উপশিরায় একদা প্রবাহিত হইত, তাহা ততদিনে হয়তো জমাট বাঁধিয়া উঠিবে। কিন্তু গ্রামান্তের ক্ষুদ্র নদীটি হঠাৎ শুকাইয়া গেলে বা গতিপথ পরিবর্তিত করিলে যেমন মন ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তীব্র বেদনায় আর্ত হইয়া উঠে না, বর্বিকে হারাইয়াও পরেশের মনে তেমনই ক্ষণিক ক্ষোভ জন্মিয়াছে, কিন্তু জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির তীব্র বেদনাবোধ জন্মে নাই। কারণ, বর্বির ভালবাসা তাহাকে আত্মতৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা মিটায় নাই। যে বস্তু তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা অহরহঃ কামনা করিতেছে, তাহা বর্বির ছিল না, কমলারও নাই, তাহা হয় তো আরতির কাছে মিলিতে পারে। অথচ আরতিকে পাওয়ার পথে কত যে অন্তরায়, তাহা তাহার নিজের বা আরতির কাহারও অবিদিত নয়। তবু আরতি যে দিন দিন দূরে সরিয়া যাইবে এবং অচিরে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া চিরদিনের মত হারাইয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মন ব্যথায় নীল হইয়া উঠিল।

(২৮)

দুই দিন পরে। সকাল আটটায় দূরের একটা ডাকে যাইবার পথে পরেশ সুনীতিকে দেখিবার জন্য হেডমাস্টারের বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈঠকখানা দুখের মা ঝাঁট দিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া ঝাঁটা ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া সলজ্জ হইয়া উঠিল। পরেশ কহিল, "এ'রা সব কোথায়?" দুখের মা মিহি গলায় কহিল, "মাসীমা ঘুমুচ্ছেন, রাত জেগেছেন কি না!" পরেশ কহিল, "বাবু?" দুখের মা কহিল, "বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

সত্যেন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু!" বসিয়া কহিলেন, "কাল সারারাত ভারী ছটফট্ করেছে—ভোরের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে, এখনও ঘুমুচ্ছে।" পরেশ কহিল, "তা হ'লে জাগাবার দরকার নেই; ওষুধ যা

ফুটবল— D. G. B. —ফুটবল

ব্লাডার সহ	৫নং	৪নং	৩নং
স্পেশ্যাল ইংলিশ T.	২২৷৷০	১৮৲	১৪৲
ইম্‌প্রুভড ইংলিশ T.	২০৲	১৬৷৷০	১৩৷৷০
বেষ্ট ইংলিশ T.	১৮৷৷০	১৫৷৷০	১২৲
নিউ স্পেশ্যাল T.	১৭৷৷০	১৫৲	১১৲
ইম্‌প্রুভড D.G.B. T.	১৫৲	১৩৲	৯৷৷০
1944 I. F. A. T.	১৩৷৷০	১১৷৷০	৯৲
নিউ কহিনুর T. '44'	১২৲	১০৷৷০	৮৲
বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট T.	১০৲	৮৲	৭৲
স্পেশ্যাল সার্ভিস	১৬৷৷০	১৩৷৷০	১১৲
স্পেশ্যাল প্লেয়ার	১৪৷৷০	১২৷৷০	১০৷৷০
স্পেশ্যাল ম্যাচ	১৩৷৷০	১২৲	৯৲
স্কুল ম্যাচ	১০৷৷০	৯৲	৭৲
বেষ্ট প্লেয়ারী	৯৷৷০	৮৲	৬৷৷০

২নং ৪৲ ১নং ৩৲ **ভলি বল**—১০৲

ফুটবল বুট উৎকৃষ্ট ১৬৷৷০, মধ্যম ১৩৷৷০

ব্লাডার—১নং ১।৵০, ২নং ১।৶০, ৩নং ১৷৷০, ৪নং ১৷৷/০, ৫নং ১৷৷৶০। মাশলাদি ৸০

ইনফ্লাটার—১নং ১৸০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩৷৷০, ৪নং ৫৲, ৭৷৷০

ফুটবল মোজা—ফুট লেস উৎকৃষ্ট ৫৷৷০, সাধারণ ২৸০, ফুটসহ উৎকৃষ্ট ৭৲, সাধারণ ৩৷৷০।

ব্যাডমিণ্টন ব্যাট—প্রত্যেকটি ১নং ১০৲, ২নং ৭৷৷০, ৩নং ৫৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫নং ৩৷৷০, ৬নং ২৷৷০, ৭নং ১৷৷০, ৮নং ১৲।



পালকের বল কম্পিটিসন—প্রতি ডজন ১নং ১৮৲, ২নং ১৫৲, ৩নং ১২৲। প্রাক্‌টিশ সুপিরিয়র ১নং ১০৲, ২নং ৮৲, ৩নং ৬৲।

জুনিয়র সুপিরিয়র ১নং ৫৲, ২নং ৪৲, ৩নং ৩৷৷০ ডজন। **চিপ্‌ কোয়ালিটী** ২৷৷০ ডজন। পালকের বল ও র‍্যাকেটের অর্ডার দিবার সময় অন্ততঃ ১৲ অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

ব্যাডমিণ্টন নেট অর্ডিনারী ছোট।৵০, মাঝারী ৷৷৵০, বড় ৸৵০। প্রাক্‌টিস ১নং ১৷৷০, ২নং ৩৲, ৪৷৷০। কম্পিটিসন ১নং ৫৷৷০, ২নং ৭৷৷০, ৩নং ১০৷৷০।

ভলিনেট ১নং ২৷৷০, ২নং ৩৷৷০, ৩নং ৫৷৷০। কম্পিটিসন ১০৲ ও ১৫৲।

কাপ—৩″ ১৸০, ৪″ ২৷৷০, ৫″ ৩৷৷০, ৬″ ৪৷৷০, ৮″ ৬৲, ১০″ ৮৲, ১২″ ১২৲, ১৫″ ২০৲।

মেডেল অর্ডিনারী ৸০, উত্তম ১নং ১।০, ২নং ১৸০, ৩নং ২।০।

ছিপ, বঁড়শী, সুতা, হুইল, ফাতনা

ফোল্ডিং ছিপ তিন ভাঁজ ৮৷৷০।

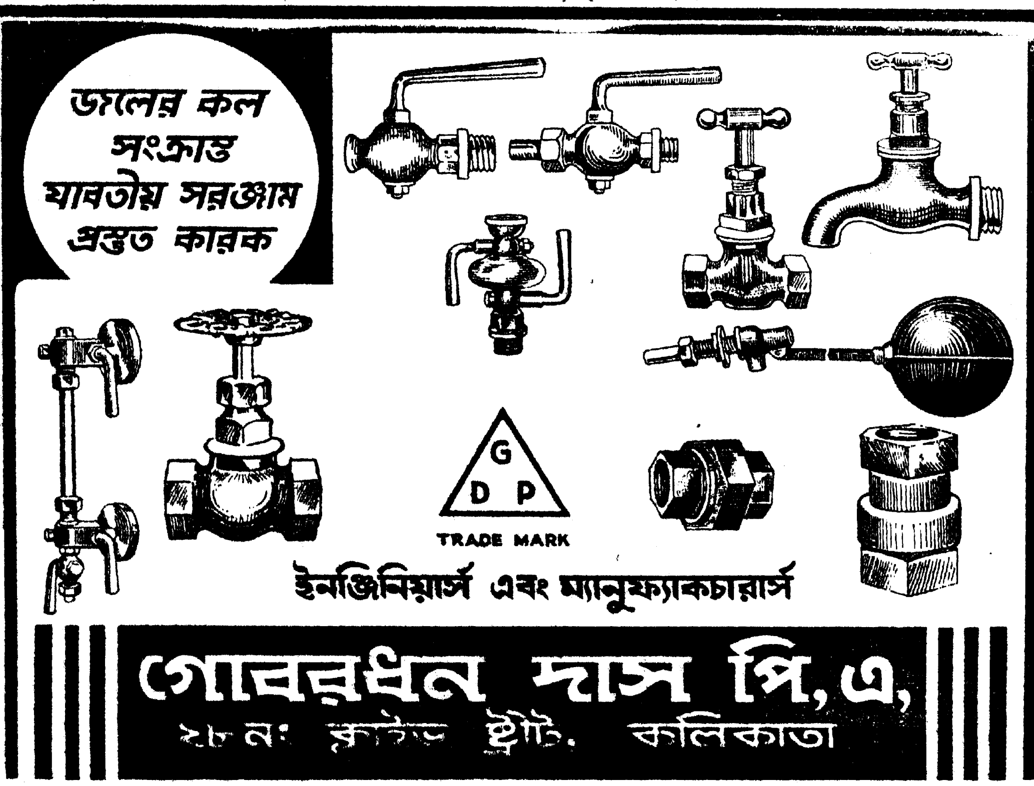
পিতল হুইল অর্ডিনারী ১৷৷″ ১৷৷০, ২″ ২৲, ২৷৷″ ২৷৷০, ৩″ ৩৲। মধ্যম ২″ ৩৲, ২৷৷″ ৩৸০, ৩″ ৪৷৷০।

উৎকৃষ্ট এলুমিনিয়াম পারফোরেটেড ২″ ৪৲, ২৷৷″ ৫৲, ৩″ ৬৲, ৩৷৷″ ৮৸০, ৪″ ১০৲, ৪৷৷″ ১১।০, ৫″ ১২৷৷০।

মুগা সুতা—নকল ১৲, আসল ২৲, ঐ উত্তম ২৷৷০। হাতে পাকান একগুঁয়া স্পেশ্যাল ৪৷৷০ প্রতি ভরি। **বঁড়শী**—বর্ধমান ও ধনেখালী বড় ।০, মাঝারী ৶০, ছোট ৵০, জোড়া খাঁটান মজুরী ৵০ প্রতি জোড়া। ডি, জি, বি গোল বঁড়শী ।৵০ জোড়া। বিলাতী থ্যাচের বা কাতলা বঁড়শী ১।০ জোড়া, ঐ দেশী ।৵০ আনা। দেশী লিমরীক হুক (টমসনের ন্যায়) (১—২০) ২০৲ হাজার। ফাতনা প্রত্যেকটি ৵০, চার ৷৷০ কৌটা।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। **ব্রাঞ্চ**—৭৭।১, হ্যারিসন রোড। ফোন বি বি ৬৭৪৫



দেওয়া আছে, তাই খাওয়াবেন, আমি ফিরতি-পথে দেখে যাব।" সত্যেন কহিল, "কখন ফিরবেন?" পরেশ কহিল, "ডেলিভারী কেস্, দেরি হবে সম্ভবতঃ; যখনই ফিরি দেখে যাব নিশ্চয়ই।"

ফিরতি-পথে পরেশ সত্যেনের বাড়িতে নামিল। বেলা প্রায় দুইটা। দরজায় ধাক্কা দিতেই আরতি দরজা খুলিয়া দিল। পরেশের মুখের দিকে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই পরেশ কহিল, "আপনার দিদি কেমন আছেন?" আরতি ভ্রূ দুইটিতে ক্ষীণ কুঞ্চনের আভাস জাগাইয়া কহিল, "ভাল নয়, বসুন।" বলিয়া চলিয়া গেল।

খোকা আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু আসুন।" খোকার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, আরতি নাই। খাটের পাশে চেয়ারে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "ভাল নয়।" পরেশ কহিল, "দেখি একবার হাতটা?" সুনীতি হাত বাড়াইল। জ্বরতপ্ত হাতখানি নিজের হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সত্যেনবাবু স্কুলে?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। অদূরে একটি টেবিলের উপর একটা কাগজে জ্বরের তাপ-মাত্রা-তালিকা লেখা ছিল। কাগজটি দেখিয়া পরেশ কপাল কুঁচকাইল তারপর খোকাকে কহিল, "চল খোকা, বাইরে যাই।" এমন সময়ে আরতি আসিয়া সুনীতির কানে কানে কি বলিতেই সুনীতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আরতি আপনাকে নেয়ে খেয়ে যেতে বলছে।" পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছু দরকার নেই, আমি বাড়িতে গিয়েই খাব এখন। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এখনই যেন আনিয়ে নেওয়া হয়।" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সুনীতি কহিল, "বেলা অনেক হয়ে গেছে, খেয়েই যান।" পরেশ কহিল, "তা হোক, তা হোক, ব্যস্ত হবেন না, তা ছাড়া বাড়িতে মাসীমা অপেক্ষা করে বসে আছেন।" বলিয়া আরতির দিকে চাহিতেই একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষাঘাত লাভ করিল। সামলাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "নমস্কার, চলি।" বলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল। একটা কাগজ টানিয়া লইয়া প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া খোকার হাতে দিয়া কহিল, "তোমার মাসীমাকে দাওগে।" তারপর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া সদর দরজায় পৌঁছিতেই পিছন হইতে আরতির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, আরতি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টক্‌টকে রাঙামুখ, শাণিত ছুরির ফলার মত চোখ, কম্পমান ওষ্ঠাধর—

আরতি মুহূর্তকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চাপাকণ্ঠে কহিল, "আসুন।" পরেশ কাছে আসিয়া কহিল, "মাসীমা অপেক্ষা করছেন যে!" আরতি অশ্রুঘনকণ্ঠে কহিল, "আমিও অপেক্ষা করে আছি, এখনও খাইনি আমি।" পরেশ কহিল, "তাই নাকি? দেখুন দেখি কি অন্যায়—বাড়িতে অসুখ।" আরতি জবাব না দিয়া চলিয়া গেল, পরেশ আসিয়া চেয়ারে বসিল।

স্নান সারিয়া খাইতে বসিয়া পরেশ কহিল, "আপনিও বসে গেলেন না কেন?" আরতি একটা পাখা হাতে সামনে বসিয়াছিল, জবাব দিল না। ভাতে হাত দিয়া পরেশ আরতির মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখনও গরম রয়েছে।" আরতির মুখে একটি অতি ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, "বসে রইলেন কেন? যান, খেয়ে নিন গে।" আরতি মৃদুস্বরে জবাব দিল, "পরে খাব এখন।"

পরেশ কহিল, "ডাক্তার হিসাবে আমার কথা আপনার শোনা উচিত। এক রোগী নিয়েই সব অস্থির, তার ওপর আপনি পড়ে গেলে সত্যেনবাবুর হাতে হাতা উঠবে যে।" আরতি গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "আপনি খেতে দেরি না করলেই আমার দেরি হবে না।"

পরেশ কহিল, "তা বটে! আমার কথা যখন আপনি শুনবেনই না, তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।" বলিয়া খাইতে সুরু করিল। আরতি কহিল, "আপনি আবার আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন।" পরেশ মুখ তুলিয়া কহিল, "তা কি করব? যা সব সময় হেডমাস্টারের মত গোমড়া মুখ করে রেখেছেন, 'তুমি' বলতে সাহস হচ্ছে না।" আরতি ফিকা হাসি হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টারণী যে! আপনার কমলরাণীর কমলের মত মুখই বা কোথায় পাব, আর তেমন হাসিই বা কোথায় পাব?"

পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "তা কি আমি বলছি? আপনি কথায় কথায় ভারী রাগ করেন।"

খাইতে খাইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া পরেশ দেখিল, আরতি [illegible] দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। চোখে চোখে মিলিতেই আরতি কহিল, "ওকি থামলেন যে!" পরেশ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না?" আরতি কহিল, "কি?"

"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করতে গেলেন কেন?"

আরতি জবাব দিল, "আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, তার বদলে এটুকুও করব না?"

পরেশ কহিল, "আর কোন কারণ নেই তো?"

আরতি কহিল, "না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ ধারালো স্বরে কহিল, "থাকলেও আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই।"

পরেশ নতমুখে খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

সেদিনের আরতির আত্মপ্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরেশ আরতির প্রতি তাহার আকর্ষণকে একতরফা বলিয়া জানিত ও ভাবিত, ইহা একজন যুবতী নারীর সাহচর্যে যুবক মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহার আয়ু, আরতি যতদিন চোখের সম্মুখে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত, আরতি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অস্তরাগের মত উহা মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আরতিও যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা আশা করিবার মত আত্মাভিমান তাহার ছিল না। তাহা ছাড়া তাহার সামাজিক সংস্কার, সাংসারিক বুদ্ধি, বিশেষ করিয়া কমলার সহিত তাহার অবশ্যম্ভাবী বিবাহ-যোগ অবিরত ভ্রূ-সংকেত করিয়া তাহার মনকে নিরস্ত করিত। কিন্তু যখন আরতি তাহার কাছ হইতে ঠুনকো বন্ধুত্বের বদলে মজবুত কিছু চাহিয়া তাহার প্রতি নিজের আসক্তির আভাস দিল এবং তাহার অপারগতার অভিমানে প্রতি মুহূর্তে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে পরেশ নিজের মনকে নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে নূতন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, আরতির প্রতি তাহার যে আকর্ষণকে সে নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার বলিয়া অবহেলা করিয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাতে তাহার জীবনের গভীর ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়াছে। সমাজ, সংসার, আত্মীয়স্বজনের প্রীতি, আর্থিক উন্নতির প্রতি লোভ, কমলার প্রতি মোহ ও কর্তব্যবুদ্ধি, যাহা তাহার মনকে চারিদিক দিয়া এতদিন টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা যেন ক্রমে শিথিল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, আরতি যদি হৃদয়ের সত্য ভালবাসার জোরে একবার টান দেয় তো তাহারা যে এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে এ সম্বন্ধেও সে ক্রমে নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিল। আজ তাহার জন্য আরতির প্রীতিপ্রণোদিত উদ্বেগ, তাহার কষ্টলাঘবের জন্য ক্লেশ স্বীকার ও তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার আশাভঙ্গজনিত প্রিয়জনসুলভ রোষ, তাহাকে নিঃসন্দেহভাবে বুঝাইয়া দিল যে, আরতি তাহাকে ভালবাসে। যে ছেলে বরাবর টানাটানি করিয়া পাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সর্বপ্রথম হইয়া পাস করার মত তাহার সাধারণ জীবনে ইহা এত অসম্ভব, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব ঘটনা যে, তাহার মন বিস্ময়ে ও পুলকে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

আরতি কহিল, "কি এত ভাবছেন?" পরেশ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "কিছু না।"

আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভাবছেন বইকি! না হ'লে খেতে ভুলে যাচ্ছেন কেন?" পরেশ কহিল, "কই না।" আরতি চক্ষের ইঙ্গিতে দুইটা তরকারির বাটী দেখাইয়া কহিল, "ও দুটোতে হাত পর্যন্ত দেন নি। অথচ আপনার জন্যই রান্না করা হয়েছে।" পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল, "ওঃ! তাই নাকি!" বলিয়া সেই তরকারিগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত খাইতে শুরু করিল।

খাওয়ার পরে পরেশ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, ঘণ্টাখানেক পরে আরতি আসিল। পরেশ কহিল, "খাওয়া হ'ল?" আরতি জবাব না দিয়া কহিল, "দুখের মাকে পাঠিয়ে দিলুম ওষুধ আনতে; আপনার মাসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিলুম।" কিছুক্ষণ পরে আরতি কহিল, "জামাইবাবু আজ বর্ধমানে চিঠি লিখে দিয়েছেন—ও'র দাদা আছেন সেখানে।" পরেশ কহিল, "কেন?"

"দিদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "তাই নাকি?"

আরতি কহিল, "আমিই বললুম লিখতে; ভাল লাগছে না আমার আর এখানে; শরীরটাও আবার আগের মত খারাপ হচ্ছে।" পরেশ সোদ্বেগে কহিল, "তাই নাকি। ওষুধটা আর খাচ্ছেন না?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়া ঠোঁট ফুলাইল।

[illegible]







"এমনই। ওষুধ আর খাব না। যা হবার হোক গে।" শেষ দিকটায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনে কহিল, "কাল যদি চিঠি পেঁছায় পরশু নিশ্চয় লোক আসবে, তারপর দিনই আমরা চ'লে যাব।" পরেশ চিন্তিতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি ম্লান হাসিয়া কহিল, "দিনকয়েক আপনাকে খুব বিরক্ত ক'রে গেলুম। যাক, এরপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "জীবনে কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না আর।"

পরেশ এতক্ষণ নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিল, কহিল, "আরতি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?" ভ্রূ দুইটি কিঞ্চিৎ তুলিয়া আরতি কহিল, "রাগ কিসের? কি করেছেন আপনি?" পরেশ কহিল, "অভিমান?" আরতির অধরোষ্ঠে একটি মৃদু হাসির ক্ষীণ আভাস জাগিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল; কহিল, "আপনার ওপর অভিমান করবার আমার কি অধিকার? আমি কি কমলা?"

পরেশ বলিয়া ফেলিল, "তুমি কমলার চেয়ে বেশি।"

আরতি চোখ বড় করিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বলেন কি? সত্যি!" পরেশ কহিল, "সত্যি! আমি এতদিন বলবার মত মনের জোর পাইনি, আজ তোমার কাছ থেকেই জোর পেয়েছি। তা ছাড়া নিজের মনের কথা জানতে পেরেছি আজ—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।" আরতি হাসিল, আগের দিনের মত উজ্জ্বল, মধুর ও মদির হাসি—সারাদিন মেঘলার পরে যেন সূর্যের হাসি—পরেশের হৃদয় উল্লসিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, "কমলাকে এই সব কথা ব'লে পাঠাচ্ছি, মজা টের পাবেন এখন।" পরেশ কহিল, "আরতি, তুমি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে বর দাও, কমলার রোষে আমার ভয় নেই।" আরতি কহিল, "কি বর চাই আপনার?" পরেশ গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে চাই।" আরতি পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল, "কমলার রাঁধুনী হিসাবে বুঝি? আমার হাতের রান্না খুব ভাল লেগেছে আপনার?" পরেশ সক্ষোভে কহিল, "আরতি, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ।" আরতি মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, "ওঃ! ঠাট্টা নিষেধ! বেশ গম্ভীর হচ্ছি।" পরেশ কহিল, "আমার কথার জবাব দাও।" আরতি কহিল, "আপনি বলতে চান কমলাকে নিয়ে আপনি যে সংসার পাতবেন, সেই সংসারে আমাকে—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "কমলাকে নিয়ে সংসার কোন দিন পাতব না, আরতি। যদি কোন দিন পাতি, তোমাকে নিয়েই পাতব, তুমিই হবে আমার সংসারের লক্ষ্মী।"

কটাক্ষে পরেশের দিকে চাহিয়া আরতি কহিল, "কমলার কি হবে?"

পরেশ কহিল, "কমলার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তার কথা তার শুভানুধ্যায়ীরা ভাববে, তুমি তোমার কথা বল আমাকে।" আরতি মুখ নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি বলতে হবে?"

আরতির ডান হাতটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া আরতির মুখের দিকে দুই চক্ষের ব্যাকুল দৃষ্টি একাগ্র করিয়া, হৃদয়ের মূক প্রার্থনাকে কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মুখর করিয়া, পরেশ কহিল, "আরতি, তুমি কি আমাকে চাও?"

চাপা হাসিতে মুখচোখ উজ্জ্বল করিয়া আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহস্যময় কণ্ঠে কহিল, "নাড়ী দেখে বুঝুন না।"

রাত্রি আটটায় বাড়ি ফিরিতেই মাসীমা কহিলেন, "হ্যাঁরে, এতক্ষণ কি করছিলি ওখানে? বেলা তিনটে পর্যন্ত ও-বেলা তোর জন্যে ভাত নিয়ে ব'সে রইলাম। ভাবলাম—এই আসে—এই আসে, শেষে হেডমাস্টারের ঝি এসে জানিয়ে গেল, তুই খেয়েছিস ওখানে। হ্যাঁরে, ওদের বাড়িতে বামুন আছে তো, না ওদের হাতেই খাস?" পরেশ জবাব না দিয়া কহিল, "আমার যন্ত্রপাতিগুলো লোকটা দিয়ে গেছে তো?" মাসীমা কহিলেন, "সেগুলো তো কখন দিয়ে গেছে। আমি ছুঁইনি বাপু। উঠোনেই পড়ে ছিল। বউমা সব গুছিয়ে রেখে গেছে।"

পরেশ কৌতূহলের সহিত কহিল, "তার মানে?" মাসীমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "তার মানে আবার কি? বিকেলে পিঠে করেছিলাম—বউমাটি পাশেই রয়েছে, খাবে না? তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বেয়ানটি আমার লোক ভাল, ডাকবামাত্র পাঠিয়ে দিল। সারা বিকালটা বউমা ঘুরে ঘুরে ক'রে ঘুরল আমার সঙ্গে সঙ্গে, কত কাজ ক'রে দিল আমার!"

পরেশ জবাব না দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। মাসীমা বলিতে লাগিলেন, "ভারী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। যেদিন থেকে ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হয়েছে, সেই দিন থেকেই তোর রোজগার বেড়েছে।"

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলো সারিবন্দী করিয়া সাজানো হইয়াছে; আলনার কাপড়গুলি গুছানো হইয়াছে; বিছানাটি পরিপাটী করিয়া পাতা হইয়াছে; এবং মশারিটি চারিদিকে সমান করিয়া টাঙানো হইয়াছে। মেঝেতে ও ঘরের কোণে যে ধুলো ও আবর্জনা অনেক দিন ধরিয়া নির্বিবাদে জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নির্বাসন-দশা ঘটিয়াছে। তাহার মা ও বাবার ফোটো দুইটি ধুলো ও ঝুল মাখিয়া অস্পষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; তাহার নিজের ফোটোটি এতদিন একটা ট্রাংকের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল, সেটি দেওয়ালে উঠিয়াছে। কয়েক জোড়া জুতা খাটের নীচে জড়ো হইয়াছিল, সেগুলিকে পাটি মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজানো হইয়াছে।

মাসীমা ঘরে ঢুকিয়াই দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কেমন গুছিয়েছে বল দেখি! যেখানে যেটি সেখানে। তা ছাড়া এখন থেকে কত দরদ, কত মমতা, যেন কতদিন ঘর করেছে।" ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "দিদি যদি দেখে যেত!" অঞ্চল দিয়া নাক ও চোখ মুছিয়া কহিলেন, "অনেক ভাগ্যে অমন বৌ মেলে, বাছা! ও এলে এ বাড়ির চেহারা বদলে যাবে, আমি ব'লে দিচ্ছি।"

পরেশ জবাব না দিয়া জামা কাপড় বদলাইয়া চেয়ারে বসিয়া একটা বই টানিয়া গম্ভীর মুখে পড়িতে শুরু করিয়া দিল। মাসীমা কহিলেন, "খেতে দেব?" পরেশ কহিল, "দাও।"

খাইতে বসিয়া পরেশ দেখিল, থালায় ও থালার পাশে নানা প্রকারের পিঠে, পায়স, তিল ও নারিকেলের মিষ্টি। মাসীমা কহিলেন, "মিষ্টিগুলো তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।" পায়সটা খাইয়া পরেশ তারিফ করিতেই মাসীমা কহিলেন, "বউমা নিজের হাতে করেছে।" ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "অনেক কাজ জানে বাছা। মা শুধু আদরই দেয়নি, সব শিখিয়েছে। একাই একটা সংসার সামলাবার ক্ষমতা আছে ওর।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কতদিন ভেবেছি যে, অগোছালো ছেলে আমার, একটি বেশ চালাক-চতুর, গোছালো বউ হয় তো ওকে সামলাতে পারবে। তা ভগবান আমার মনের কথা শুনেছেন, ওর হাতে সংসার সঁপে দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারব।"

পরেশ কহিল, "তোমার এত ছুটি নেবার তাড়া কেন?"

মাসীমা কহিলেন, "কি করব বাছা! জামাইটির চাকরি জানিস তো, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন বাইরে কাটাতে হয়—মেয়েটার একটা দোসর নেই।"

রাত্রে কমলার রচিত শয্যায় শুইয়া পরেশ আরতির চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

আজ সন্ধ্যার পূর্বে সুনীতি আরতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "সারাদিনটি খাটছিস্, যা না ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু ঘুরে আয়, দুখের মা তো রয়েছে।"

দুইজনে বেড়াইতে গিয়াছিল। আরতি সাজগোজ কিছুই করে নাই, পরণে ছিল কালো পাড় সাদা সাধারণ শাড়ি, সাদাসিধে ব্লাউজ, গায়ে একখানা রঙিন শাল, পায়ে স্যাণ্ডাল। বাগানের পাশের সেই পুকুরটায় জলের ধারে বড় বড় ঘাসের উপর তাহারা বসিয়াছিল। গল্প করিতে করিতে সে ঘাসের উপর হাতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িতেই আরতি নিজের কোলের উপর তাহার মাথা টানিয়া লইয়াছিল। আরতির দেহের স্পর্শে ও গন্ধে তাহার সারা দেহে সুধাস্রোত বহিয়াছিল। সন্ধ্যা বিশাল ডানা মেলিয়া ঘনাইয়া আসিল, কালো আকাশের ছায়া বুকে লইয়া পুকুরের জল কালো হইয়া উঠিল, জলচর পাখীর দল একে একে বাসায় ফিরিয়া গেল,—তাহারা দুইজন দুইজনের চোখের পানে তাকাইয়া হাতে হাত রাখিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বাস্তব জগৎকে ভুলিয়া রহিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আকাশে তারা ফুটিল, বাতাস কন্‌কনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, "চল বাড়ি যাই।" সে কহিল, "আরতি, আজ এমন কিছু দাও, যেন আজকার দিনটিকে চিরদিন আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।" আরতি হাসিয়া কহিল, "কি?" সে মুখে জবাব না দিয়া চোখের চাহনিতে মনের কথা প্রকাশ করিল। আরতি সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া তাহার ওষ্ঠে একটি দীর্ঘ ও তপ্ত চুম্বন মুদ্রিত করিল।

(২৯)

পরদিন বেলা আটটায় সত্যেনের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম বসিয়া আছে। পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "এই যে বাবাজী, এস।" পরেশ কহিল, "কখন এলেন?" ঘনশ্যাম কহিল, "এসেছি অনেকক্ষণ। তা তোমার এত দেরি হ'ল?" পরেশ জবাব না দিয়া সত্যেনকে কহিল,



এবার পূজায় বাজে খরচ করিবেন না

পূজা যখন আসে তখন মধ্যবিত্তও নিজেকে লাখপতি মনে করেন। কারণ, যে সব উৎসব বাংলার ঘরে দেখা দেয় তার মধ্যে দুর্গা পূজাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়। এই সময় মানুষ সারা বছরের সঞ্চয় খরচ করে। কিন্তু এ বছরটা বিশেষ করে খারাপ সময়ঃ দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অসময়, যুদ্ধ আর মহামারী—এ বছরের দুর্ঘটনার যেন শেষ নাই। পূজায় আনন্দ করুন কিন্তু বাজে খরচ করবেন না। যতটুকু পারেন সঞ্চয় করুন—আগামীকাল কপালে কি আছে তাও আপনি জানেন না। দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। সুদিনকে ঘনিয়ে আনতে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, তখন বাজে খরচ করা হয়ত সম্ভব হবে। সুদিন আসবে জাতীয় শিল্প-উন্নতির মধ্যে দিয়ে। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলবার জন্যে যতটা পারেন সঞ্চয় করুন।

সঞ্চয় এবং জাতীয় শিল্প গড়ে তোলা, উভয় কাজেই সিভিল্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উভয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে শ্রীযুত এস্ আর রাহা, বি এল,-এর নেতৃত্বে একদল সুযোগ্য কর্মী মেতে উঠেছেন। সুদিন দুর্দিন — সব সময়ই এঁরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ফোনঃ কলিঃ ৩২৭৬
গ্রামঃ ধনাগার

এ, কে, ঘোষ,
ম্যানেজার

এম, কে, সেন,
অর্গানাইজিং অফিসার

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

৩, ম্যাঙ্গো লেন - কলিকাতা

"কি খবর বলুন?" সত্যেন কহিলেন, "আজ সকালেই ১০৩°, অনুমান বোধ হয় আজ ১০৪° ছাড়িয়ে যাবে।" পরেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "চলুন দেখিগে।" সত্যেনের পিছু পিছু পরেশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

বারান্দার অপর প্রান্তে আরতি দাঁড়াইয়াছিল। চোখে চোখ মিলিতেই তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রোগী দেখিবার সময়ে আরতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাত্রে ঘুম হয়নি তো?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত হয়েছিল।" রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া পরেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যেন বৈঠকখানায় চলিয়া গেল।

আরতি আসিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, "এখনই যেও না, চা খেয়ে যেও।" এই অতি-আপনারজনের মত একান্তে আরতির অনুরোধ পরেশের কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। মনে মনে কহিল, "তুমি আদেশ দিলে এখন কেন, কখনও যাইব না।" তবু ধমক খাইবার লোভে কহিল, "থাকগে, চা খেয়ে এসেছি। ভারী জরুরী ডাক আছে একটা।" আরতি কালো চোখে ঝিলিক হানিয়া কহিল, "তা হোক, এখন যেতে পাবে না। একটু দেরি হলে রোগী পালিয়ে যাবে না তোমার। আর শোন, বিকেলে একবার এসো আজ, দরকারী কথা আছে।"

বৈঠকখানায় আসিতেই পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া উচ্ছ্রিত হাতের উপর মুখ রাখিয়া সত্যেনের চেয়েও চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পরেশকে দেখিয়াই ঘনশ্যাম কহিল, "কেমন দেখলে বাবাজী, যা শুনছি, ব্যাপার তো শক্ত মনে হচ্ছে। একা সামলাতে পারবে, না বুড়োকেও একবার ডাকবে ভাবছ।"

পরেশ গম্ভীর মুখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিতে লিখিতে কহিল, "প্যারা-টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। তা একবার ডাকলেও হয়।"

সত্যেন কহিলেন, "আপনি যদি প্রয়োজন মনে না করেন তো দরকার কি? "ঘনশ্যাম পোজ বদলাইয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে কহিল, "পরেশ বাবাজী একা পারবে না, তা তো বলছি না। তবে বুড়ো জীবনে অনেকবার বানচাল নৌকা সামলেছে তো, একবার ডেকে পরামর্শ নেওয়া আর কি।"

পরেশ জবাব দিল না। ঘনশ্যাম সত্যেনকে কহিল, "বাড়িতে তো লোকজন আপনার নেই। সেবা-যত্ন রান্নাবান্না কে করছে?" সত্যেন কহিলেন, "আরতিই সব করছে।" ঘনশ্যাম প্রথমটা যেন বুঝিতেই পারিল না—এমনই ভাব করিয়া ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিল, তারপর কপালটা কুঁচকাইয়া মাথাটা উপরে ও নীচে নাড়িয়া কহিল, "ওঃ! বুঝেছি, আপনার শালী তো! তা তাঁরও তো শরীর খারাপ—"

সত্যেন কহিলেন, "তা তো খারাপ,, পরেশবাবুর চিকিৎসায় ভাল আছে একটু; তবে বেশি দিন হলে পারবে না। তা ছাড়া ওর ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।"

ঘনশ্যাম কপাল কুঁচকাইয়া ঠোঁটের প্রান্ত দুইটা ঝুলাইয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা হলে তো মুশকিল মশায়! টাইফয়েড রোগ, দু চারদিনের মামলা তো নয়—হয়তো এক মাস লেগে যাবে।" সত্যেন চিন্তিত মুখে কহিলেন, "সেই তো!" ঘনশ্যাম কহিল, "আপনার দাদা তো কাছেই আছেন, সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে হয় না? পরেশ বাবাজী কি বল?" পরেশ কহিল, "বেশ তো! সত্যেনবাবুর যদি তাই ভাল মনে হয়, আমার আপত্তি কি?"

ঘনশ্যাম সান্ত্বনার সুরে পরেশকে কহিল, "এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি নে, বাবা। আরতি দেবী যদি এখানে থাকতে পারতেন তো কথা ছিল না; কিন্তু উনি যে চলে যাচ্ছেন, সেই তো হয়েছে মুশকিল।" —বলিয়া বিপন্ন ও বিষণ্নমুখে পরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দুখের মা'র দুখে দুই কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "তুই এখানে চাকরি করিস নাকি?" দুখে এক গাল হাসিয়া কহিল, "আমি কেন করব? মা করে। মা বললেক্ কালো চক্কোত্তি বসে আছে, আমি যাব না, তুই দিয়ে আসগে যা, তাই তো দিয়ে এলম।" সত্যেন ও পরেশ ওষ্ঠে ফুটিয়া-উঠা হাসিকে সবলে চাপিতে লাগিল। ঘনশ্যাম জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ করেছিস, তা তুইও বুঝি তোর মায়ের সঙ্গে রোজ আসিস্ এখানে?" চায়ের কাপ দুইটি নামাইয়া দিতে দিতে দুখে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। সত্যেন কহিলেন, "খোকাকে নিয়ে থাকে, আর কোন সঙ্গী নেই তো।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "বেশ, বেশ।" দুখের উদ্দেশে কহিল, "ভালভাবে থাকবি, কিছু নিয়ে-টিয়ে পালাস না যেন।" দুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।" বলিয়া চলিয়া গেল। সত্যেন সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন, "ও-সব অভ্যাস আছে না কি?" ঘনশ্যাম মুখ কুঁচকাইয়া চোখ দুইটি অর্ধমুদ্রিত করিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ছোটলোকদেরই ওই অভ্যাস। কি ছেলে, কি বুড়ো—ভাল জিনিস দেখলে আর লোভ সামলাতে পারে না।"

সত্যেন কহিলেন, "ঘনশ্যামবাবু, চা খান।" ঘনশ্যাম দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, "মাপ করুন, সকালে পুজো-আহ্নিক না ক'রে ও-সব খাই না।" পরেশ চা খাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল; ঘনশ্যাম তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল, "যে খাবার সে খেতে শুরু ক'রে দিয়েছে, বলতেও হয় নি।" হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি আসি। ওই ব্যবস্থাই করুন—যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।" যাইতে উদ্যত হইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া সত্যেনকে কহিল, "কার্তিক ডাক্তারকে বলব নাকি?" সত্যেন কহিলেন, "আপনাকে বলতে হবে না। দরকার হ'লে আমিই চিঠি লিখব।"

ঘনশ্যাম যাইতেই সত্যেন কহিলেন, "রোগের যে রকম গতি দেখছি, সারতে অনেক দিন লাগবে। আমার এখানে রাখতে সাহস হচ্ছে না—কাল দাদাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।" পরেশ কহিল, "শুনেছি, আরতি দেবী বলছিলেন।"

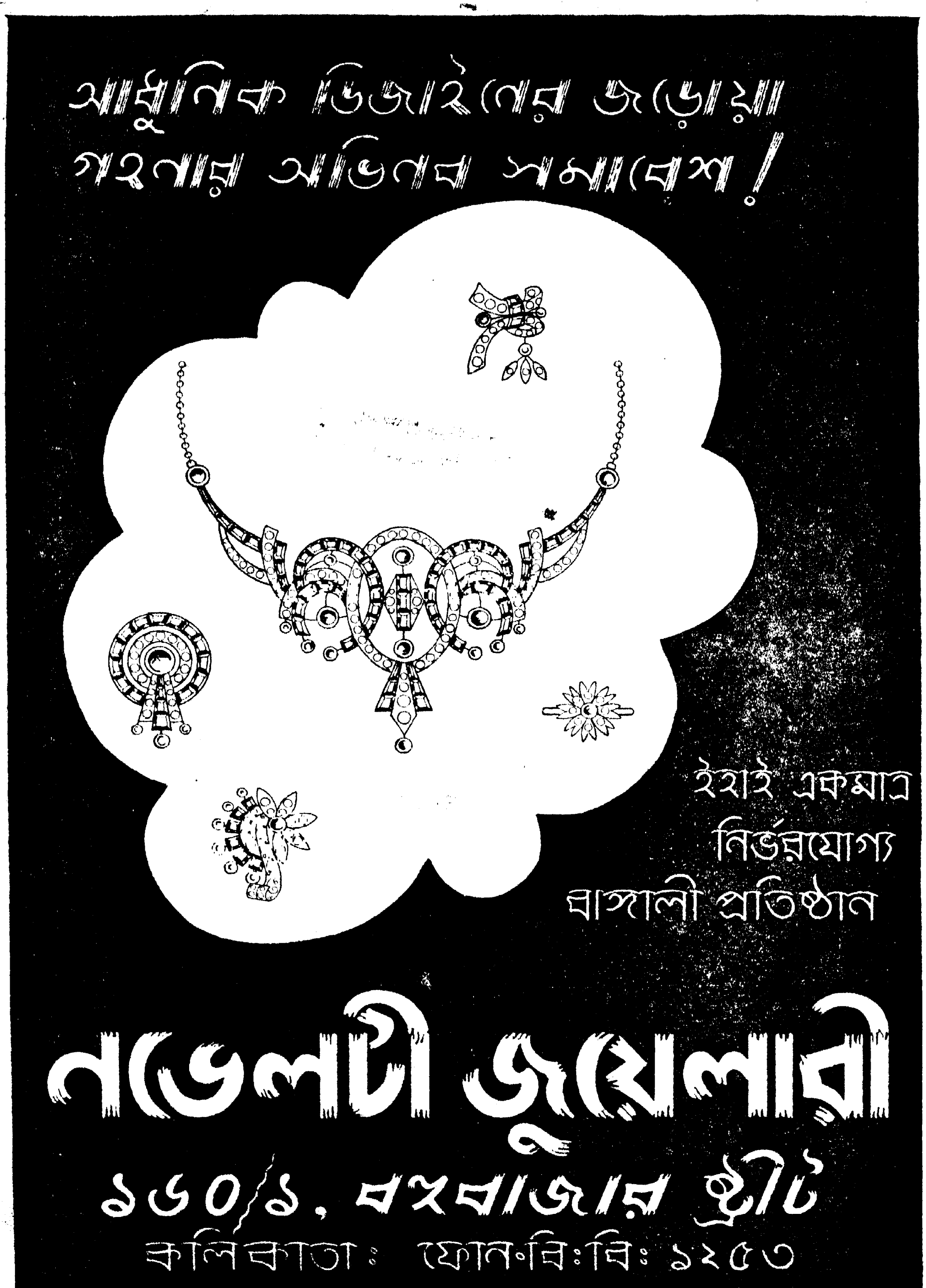
সত্যেন কহিলেন, "ওরই পরামর্শে লিখলুম—ও আর সাহস করছে না। তা ছাড়া ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে ওর।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দাদা যদি একজন কাউকে পাঠিয়ে দেন তো সে আর আরতি দুজনে মিলে ও'কে নিয়ে যেতে পারবে না?" পরেশ গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা পারবেন না কেন?" এই সময়ে দুখে চায়ের কাপ লইতে আসিল, সত্যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর দিদিমা কি করছে?" দুখে কহিল, "ছ্যান করছে।"

"বলুগে, স্নান করা হ'লে এখানে যেন একবার আসে, পরেশবাবু ডাকছেন।"

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া পরেশকে কহিল, "কি বলছেন?" পরেশ তাহার সদ্যস্নাত, সুপরিচ্ছন্ন, সুন্দর মূর্তির পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ভিজা চুল পিঠে লুটাইতেছে; সামনের চুলে ত্বরিত-হস্তে প্রসাধনের চিহ্ন, কপালের মাঝখানে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, পরণে একটি লাল পাড় সাদা শাড়ি, সেমিজ ও ব্লাউস, পা খালি।

সত্যেন কহিলেন, "ছোট গিন্নী এসেছ?" আরতি কৃত্রিম ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিতেই সত্যেন কহিলেন, "রাগ কিসের?" গিন্নী তো তোমাকেই বদলি দিয়ে ছুটি নিয়েছেন।" পরেশ হাসিতেই আরতি কহিল, "দায় পড়েছে আমার আপনার গিন্নীর বদলি হতে।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি জন্যে ডাকছেন?" সত্যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল, "উনি ডাকেন নি, আমি ডাকছিলুম। ব'স দেখি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।" আরতি বসিয়া কহিল, "কি পরামর্শ বলুন। আমার অনেক কাজ।"

সত্যেন কহিলেন, "তোমার দিদির বোধ হয় টাইফয়েড—অনেক দিন ভুগতে হবে; তোমার আর বেশি দিন ছুটি নেই বলছ, কাজেই বর্ধমানে রেখেই আসতে হবে। ডাক্তারবাবুরও তাতে অমত নেই বলছেন। কাল যদি দাদা কোন লোক পাঠিয়ে দেন, ত হ'লে সে আর তুমি কি তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে পারবে?" আরতি চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আমার তো দেখছ—বড়দিনের ছুটির আগে কোথাও যাবার উপায় নেই।" আরতি কহিল, "হাতে তো দুদিন এখনও আছে; অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাক্। আর যদি তেমনই হয়—" পরেশের দিকে তাকাইয়া "ডাক্তারবাবু একদিনের জন্য সঙ্গে যেতে পারবেন না?" পরেশ সোৎসাহে কহিল, "খুব পারব।" সত্যেন কৃতজ্ঞতায় বিগলিতপ্রায় হইয়া কহিলেন, "পারবেন পরেশবাবু! আপনার কাজের কোন ক্ষতি হবে না?" পরেশ কহিল, "কি আবার ক্ষতি হবে? এক দিনের মামলা বই তো নয়।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "আপনার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলব না পরেশবাবু।" পরেশ কহিল, "উপকার বলবেন না, আপনজনের প্রতি কর্তব্য বলুন। সুনীতি দেবীকে আমি আমার দিদির মত মনে করি।" লজ্জিতমুখে সত্যেন কহিলেন, "তা আমি জানি পরেশবাবু। শুধু আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ দিন দিন ভারী হ'য়ে উঠছে।" পরেশ কহিল, "আপনার ঋণ ভারী হয় নি—আমারই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ দিন দিন শোধ হচ্ছে।"


আধুনিক ডিজাইনের জড়োয়া
গহনার অভিনব সমাবেশ!
ইহাই একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান
নভেলটী জুয়েলারী
১৬০/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা: ফোন-বিঃবিঃ ১২৫৩

আরতি হাসিয়া কহিল "আপনারা দুজন দুজনের পিঠ থাবড়াতে থাকুন, আমি চললুম রান্নাঘরে।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "খাবার না খেয়েই চলে যাবেন না যেন, আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

(৩০)

বাড়িতে ফিরিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। মাসীমা কহিলেন, "তোর শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।" পরেশ বিরক্তির সহিত কহিল, "আবার এখন এতখানি ছুটতে হবে? মুশকিল করেছে দেখছি।" মাসীমা কহিলেন, "সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হিল্লী-দিল্লী ক'রে আসতে পারলি, আর এইটুকু যেতেই তোর মুশকিল হ'ল? ধন্যি ছেলে বাছা!"

পরেশ কহিল, "রাত্রিতে নেমন্তন্ন করলেই পারে, সারাদিনটা নষ্ট!" মাসীমা কহিলেন, "আজ বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো যে; সারা পৌষ মাস প্রতি বৃহস্পতিবারে বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয়; তা না হ'লে লক্ষ্মীর এত দয়া!" পরেশ জবাব না দিয়া বিরসমুখে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

কার্তিক ডাক্তারের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল, ডাক্তার বারান্দায় দাঁড়াইয়া গামছায় হাতমুখ মুছিতেছেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গা খালি; শুভ্র উপবীত চওড়া লোমবহুল বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ঝুলিতেছে; মাথার ঠিক মাঝখানে নাতিদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ, যাহা সাধারণতঃ চুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সম্প্রতি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—ডাক্তার এইমাত্র পুজো সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন।

পরেশকে দেখিয়া ডাক্তার মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। রান্নাঘরের বারান্দায় কমলা ও তাহার দুই চারিজন বন্ধু এবং শ্রীমতী গল্প করিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া তাহাদের গল্পস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কার্তিক কহিলেন, "ব'স বাবাজী, আমি আসছি।" বলিয়া উপর কোঠার চলিয়া যাইতেই মেয়েদের মধ্যে মৃদুগুঞ্জন ও চাপা হাসি শ্রুত হইল। পরেশ খাটিয়ার উপরে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল।

শ্রীমতী কাছে আসিয়া কহিল, "কিহে, কার কথা ভাবছ?" পরেশ জবাব দিল, "কারও না।"

"তবে প্যাঁচার মত মুখ ক'রে কি ভাবছ বল দেখি?"

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তাও আপনাকে বলতে হবে!" শ্রীমতী চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হবে না? তোমার মন এখন আমাদের কমলীর লাখেরাজ সম্পত্তি, তার খোঁজখবর করবার ভার আমার উপরে।" বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া চোখের ইঙ্গিতে নিজেকে নির্দেশ করিল। পরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যেই!" শ্রীমতী কহিল, "তা নয় তো কি? দরদাম চুকেছে, বায়নাপত্তর হ'য়ে গেছে, এখন তো কেবল দলিলে লেখাপড়া মাত্র বাকি।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তবু বাকি তো!" কার্তিকের খড়মের শব্দ শোনা গেল—নামিয়া আসিতেছেন; শ্রীমতী রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

শোবার ঘরের বারান্দায় খাইতে দেওয়া হইল। খাইতে বসিয়া কার্তিক কহিলেন, "হেডমাস্টারের স্ত্রী কেমন আছেন?" পরেশ কহিল, "টাইফয়েড্ ব'লেই মনে হচ্ছে।"

পরেশ খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া রান্নাঘরের বারান্দার দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, কয়েক জোড়া কালো চোখের দৃষ্টি তাহার উপর একাগ্র হইয়া আছে; একজোড়া কমলার, বাকিগুলি তাহার বন্ধুদের। কমলার বন্ধুগুলি পাড়ারই মেয়ে; কাজেই, পরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই লজ্জারক্ত মুখে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লইল। কমলা কিন্তু স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। পরেশ হাসির জবাব না দিয়া মুখ নামাইয়া লইল। কমলার মুখখানি যে বিদ্যুৎপ্রবাহবিমুক্ত বিজলীবাতির তারের মত দেখিতে দেখিতে নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহা তাহার চোখে পড়িল না; তারপর আবার যখন সে মুখ তুলিল, দেখিল, কমলা ও তাহার সঙ্গিনীরা চলিয়া গিয়াছে।

কমলার জন্য পরেশের মনে করুণামিশ্রিত বেদনা জাগিল। বেচারী এখনও তাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আছে। সে জানে না, পদ্মার স্রোতের মত ভাগ্যস্রোত অলক্ষ্যে তাহার আশ্রয়ভূমিকে শিথিল ও শূন্যগর্ভ করিয়া আনিতেছে—যে-কোন মুহূর্তে ভাঙিয়া, ধসিয়া, গুঁড়া করিয়া, উন্মত্তবেগে কোন এক অজ্ঞাত কূলে নূতন করিয়া চর রচনা করিবার জন্য বহিয়া লইয়া যাইবে। সবির মত কমলাও দুঃখ পাইবে, বেদনা পাইবে, হয়তো লুকাইয়া গোপনে চোখের জল ফেলিবে; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও সান্ত্বনায় দুই দিনেই সামলাইয়া উঠিয়া আবার আর এক-জনকে ভালবাসিবার জন্য মনকে তৈয়ারি করিবে এবং ভবিষ্যতে বিবাহিত স্বামীর বিধি ও নীতিসঙ্গত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিবার সময়ে একদা যাহার উদ্দাত, উন্মত্ত, নীতি ও বিধি-নিরুদ্ধ বাহুবন্ধনকে প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে স্মরণ করিয়া 'হৃদয়হীন' বলিয়া ধিক্কার দিবে।

খাওয়ার পরে কার্তিক কহিলেন, "একটু বিশ্রাম করবে তো কর।" বলিয়া হাঁকিলেন, "ওগো, শুনছ!" পরেশ কহিল, "থাক্‌গে, বাড়ি যাই—একটু কাজ আছে।" কার্তিক-গৃহিণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কি বলছিলে?" কার্তিক কহিলেন, "বাবাজীকে বলছি একটু বিশ্রাম করতে, তো বলছেন—বাড়িতে কাজ আছে।" বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া মুখের কথা চোখের ইঙ্গিতে জানাইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "এই খেয়ে এত রোদে গিয়ে কাজ নেই—পাশের ঘরে বিছানা ক'রে দিয়েছে, একটু শুয়ে যেও।" নিশ্চিতমৃত্যু রোগীর বিশ্বাসপরায়ণ আত্মীয়স্বজনের কাছে সহৃদয় চিকিৎসক যেমন রূঢ় সত্য প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন, পরেশ তেমনই কার্তিক ও তাঁহার স্ত্রীর কাছে আসন্ন আঘাতের আভাস দিতে দ্বিধাবোধ করিল। এক মুহূর্ত ভাবিয়া সে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির উপর পরিপাটী করিয়া শয্যা রচনা করিয়াছে—বোধ হয় কমলা নিজে। অদূরভবিষ্যতে সে নিজে এই শয্যার অংশভাগিনী হইবে ভাবিয়া হয়তো তাহার সারাদেহে পুলক জাগিয়াছে, বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়াছে, মনের মধ্যে সুধাক্ষরণ হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে চোখোচোখি হইবামাত্র কমলার হাসি তাহার মনে পড়িল—কামনার বস্তুকে নিশ্চিতরূপে করতলগত করিয়া মানুষ যেমন করিয়া হাসে, তেমনই হাসি। যেন তাহাদের দুইজনের জীবনযাত্রাপথ চিরদিনের জন্য এক হইয়া গিয়াছে, আর কোন দিন কোন কারণে তাহারা বিযুক্ত হইবে না। প্রভাতে সূর্যের দিকে প্রথম চোখ মেলিয়া কমল যেমন সারাদিনের কথা ভাবিয়া হাসে, কমলাও হয়তো তেমনই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাদের আগামী মিলিত-জীবনের শত সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাসিয়াছে।

আরতিও আজ সকালে এমনই হাসি হাসিয়াছিল। সেও নির্বিচারে, একান্ত নির্ভরতার সহিত নিজের জীবন-পথকে তাহার পথের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। তাহার অন্তরাত্মাও এই মিলনকে পরম আগ্রহ ও প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিয়াছে। তবু কমলার কথা ভাবিয়া তাহার মনে ব্যথা বাজিল।

ঘর অন্ধকার; ঘরের এক কোণে মাকড়সার জালে একটা মাছি ধরা পড়িয়া আর্তগুঞ্জন করিতেছে; ঘরের বাতাসে একটি মিষ্ট ও সোঁদা গন্ধ। বাহিরে উঠানে কতকগুলা কাক কলরব সহকারে কলহ করিতেছে; রান্না-ঘরের বারান্দায় মেয়েদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতেছে। এই পরিচিত শব্দ-গন্ধময় জীবনের পরিমণ্ডল একেবারে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া কোন্ এক অপরিচিত জীবনের মধ্যে যাইতে হইবে ভাবিয়া পরেশের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী দরজা খুলিয়া ঢুকিল। মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, "কিহে, কি করছ?" পরেশ চোখ মেলিয়া তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, "ঘুমুচ্ছ নাকি?" পরেশ কহিল, "না, ঘুম আসছে না।" শ্রীমতী নাক উচাইয়া কহিল, "কমলীর বিছানার শুয়ে ওর বালিশে মাথা রেখে ঘুম আসছে না কেন? কিসের এত ভাবনা তোমার?" পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি আর ভাবনা? দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না আমি।" কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিল, "কারও সাড়া পাচ্ছি নে আর, কোথায় গেলেন সব?" শ্রীমতী কহিল, "তোমার শাশুড়ী আর দিদি শাশুড়ী গেল ঘনশ্যামদের বাড়ি, তোমার 'সব'ও গেছে তাদের সঙ্গে। বললাম এত ক'রে থাকতে, শুনল না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "কমলীর মন ভাল নেই কিনা!" পরেশ কহিল, "কারণ?" শ্রীমতী খনখনে স্বরে কহিল, "কি ক'রে থাকবে? যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সম্বন্ধে যা-তা কথা কানে আসলে কারও মন ভাল থাকে", পরেশ উৎসুককণ্ঠে কহিল, "কার কাছে কি শুনেছে? শ্রীমতী কহিল, "খুদের মার কাছে, ফচকে ছুঁড়িটির তোমাকে নিয়ে কাণ্ড-কারখানার কথা।" পরেশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল, "তার মানে?" ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, "তার মানে তুমিই ভাল জান।" বলিয়া এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোমার জন্যে বেলা দুটো পর্যন্ত না খেয়ে ব'সে থাকা, বিয়ে-করা বউয়ের মত সামনে ব'সে খাওয়ানো, দরজা বন্ধ ক'রে পাশে ব'সে হাসি, গল্প, রসালাপ, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া—" কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর করিয়া কহিল, "সব শুনেছি হে, শুনতে কিছু বাকি নেই আমাদের।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "আপনাদের

গুপ্ত-চরটি অনেক বাড়িয়ে বলেছে। দূরের একটা ডাক থেকে ফিরে ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি না খাইয়ে ছাড়লেন না। ভদ্র শিক্ষিতা মহিলা উনি, আপনার নাতনীটির মত পুরুষের গায়ের আঁচ লাগলে গ'লে যান না, কাজেই সামনে ব'সেই খাইয়েছিলেন, খাওয়ার পর গল্প করেছিলেন, হয়তো হেসেও ছিলেন, কিন্তু তাতে দোষটা কি হয়েছে শুনি?" শ্রীমতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "দোষ হয় নি? বাড়িতে একটা পুরুষ নেই, ঘরের গিন্নী অসুখে প'ড়ে, এ অবস্থায় একটা ধেড়ে পুরুষকে নিয়ে একটা ধিঙ্গী মেয়ের ঢলাঢলি করায় দোষ নেই? এই তোমার বুদ্ধি?" পরেশ জবাব দিল না, শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "মেয়েটার এত বয়স পর্যন্ত বর জোটে নি, তাই কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে যার তার জিনিসে মুখ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তুমি? দুদিন বাদে একটা মেয়ের জীবন-মরণের ভার নিতে যাচ্ছ, আর সে মেয়ে যা-তা, যার-তার নয়—তোমার এই কাণ্ড! তাছাড়া বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের মেয়ের হাতে ভাত খাওয়া! জাত গেছে তোমার। ভাগ্যে কার্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, তাই কেউ কিছু বলছে না, না হ'লে গাঁয়ের লোক একঘরে করত তোমায়।" পরেশ কহিল, "বেশ তো! একঘরে ছিলাম একদিন, আবার হ'লেই বা ক্ষতি কি?" চোখ দুইটা কুঁচকাইয়া শ্রীমতী কহিল, "তার মানে?" পরেশ কহিল, "আমার ওপর আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, কি করছি, কোথায় যাচ্ছি দেখবার জন্য পিছনে যদি চর লাগাতে হয়, তো বিয়ে বন্ধ ক'রে দিন না। এখনও অনেক সময় আছে, চেষ্টা করলেই মনের মত পাত্র যোগাড় ক'রে ঠিক দিনেই কমলার বিয়ে দিতে পারবেন।" শ্রীমতী দুই চোখ বড় করিয়া সভয়ে কহিল, "ও সব কি কথা হে?" পরেশ নীরসকণ্ঠে কহিল, "ঠিক কথাই তো বলছি। ডাক্তারকে সকলের বাড়িতেই যেতে হয়, সকলের সঙ্গেই মিশতে হয়, সবাই তাকে আত্মীয়ের মত আদর আপ্যায়ন করে, এসব সহ্য করবার মত মনের প্রসারতা যে মেয়ের না থাকে, তার ডাক্তারের স্ত্রী হওয়া চলে না, হ'লেও তার বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।"

শ্রীমতী ভয়ে ভয়ে কহিল, "কমলা তো কিছুই ব'লে নি ভাই। ও বরং দুখের মাকে কাউকে বলতে মানা ক'রে দিয়েছে।" পরেশ কহিল, "আপনিই তো বললেন এইমাত্র, ও রাগ করেছে।"

শ্রীমতী কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমি মিথ্যে ক'রে বলেছিলাম। ও তেমন মেয়ে নয়। ওর যে কত বুদ্ধি, তা তুমি যখন ওকে নিয়ে ঘর করবে, বুঝতে পারবে। আজ একটু আগে ওকে আমি ডেকে বললাম, 'আজ কে কোথাও, তোর বরের সঙ্গে ঝগড়া করবি চল্', ও কি জবাব দিলে জান, বললে—'ঝগড়া ক'রে কি হবে? ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা আমি সারাক্ষণ করছি, তিনি যদি তা শুনে থাকেন, তো ওকে আমি পাবই, কেউ ওর মন ভাঙতে পারবে না।' আমি তো ওইটুকু মেয়ের মুখে ওই কথা শুনে অবাক।" বলিয়া গালে হাত দিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিল। পরেশ মনে মনে কহিল, এ যদি আপনার বানানো কথা না হয় তো আমিও অবাক।" প্রকাশ্যে মৃদু হাস্যসহকারে কহিল, "তাই নাকি! কিন্তু যদি ভগবান না থাকেন? আর থাকলেও যদি তাঁর কানের দোষ ঘটে থাকে, বয়স তো কম নয়!" শ্রীমতী জিভ কাটিয়া কহিল, "ছিঃ! ছিঃ! ওসব কথা ব'লো না, ওতে পাপ হয়।" পরেশ নীরব রহিল। শ্রীমতী কহিল, "কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—এ কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিও না। ও তোমাকে মনে প্রাণে স্বামী ব'লে জেনেছে, এখন থেকেই নাম পালতে শুরু করেছে। তোমাকে সারাদিন একবার না দেখতে পেলে ডাঙায় তোলা মাছের মত ছটফট করে, দেখলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়।"

কমলার মুখখানি পরেশের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান—সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা; স্বল্প আশা ও স্বল্পে সন্তোষ। তাই তাহার মত একজন সাধারণ লোককে ঘেরিয়া মনে মনে সুখ-সৌধ রচনা করিয়াছে। যেদিন তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই স্বপ্ন-সৌধ স্বপ্নের মতই মিলাইয়া যাইবে, সেদিন যে অপরিসীম ব্যথায় তাহার মুখখানি বিবর্ণ ও বিহ্বল হইয়া উঠিবে, তাহার উত্তাপ পরেশ যেন নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। অথচ উপায় নাই। আরতিকে তাহার চাই-ই। আরতির মত দেহে ও মনে সৌন্দর্যময়ী নারীকে নিজস্ব ভাবে পাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মিটাইবার সাধ্য কমলার মত সাদাসিধে পানসে গ্রাম্য বালিকার নাই।

শ্রীমতী কহিল, "কি হে, রাগ পড়ল? শাস্তি দিতে হয় তো আমাকেই দাও ভাই, কমলার উপর রেগে থেকো না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "সত্যি বলছি—আমরা দুজন ছাড়া কেউ কিছু জানে না—আর জানবেও না। কিন্তু আমার একটু অনুরোধ রাখতে হবে ভাই! দু বেলা দুবার শুধু রোগী দেখে আসবে, নাই বা ওই ছুঁড়িটার সঙ্গে এত মিশলে। আজ না পড়ুক, লোকের চোখে তো পড়বেই একদিন—তখন নানা কথা উঠবে, তখন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কি মনে হবে বল দেখি!" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে নিয়ে উনি তো চলে যাচ্ছেন পরশু।"

শ্রীমতী পরম পুলকের সহিত কহিল, "সত্যি নাকি!" নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক ভাই, ভালয় ভালয়— আমি সত্যনারায়ণের পুজো দেব একদিন।"

(৩১)

সেদিন পরেশ যখন সত্যেনের বাড়িতে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বেশি দেরি নাই। বৈঠকখানা খোলা ছিল, পরেশ একটা চেয়ার টানিয়া সশব্দে বসিল। অনতিবিলম্বে আরতি আসিল। মুখ নির্বাতিশয় গম্ভীর। ভারী গলায় প্রশ্ন করিল, "বিকেলে এলে না?" পরেশ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "একটা কাজে ছিল।" চোখ দুইটি ছোট করিয়া আরতি কহিল, "কল ছিল বুঝি?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, নেমন্তন্ন ছিল।"

"কোথায়?"

"কমলাদের বাড়িতে।"

ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে আরতি কহিল, "কমলার কাছেই ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, কমলার এক দিদিমা গল্প করছিলেন—"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আরতি কহিল, "দিদিমা! ভাল।" কপাল কুঁচকাইয়া কণ্ঠস্বরে শান দিয়া কহিল, "তা আমার কথাটা মনেই ছিল না বোধ হয়।"

পরেশ জোর দিয়া কহিল, "বা রে! মনে ছিল না! বল কি আরতি!" কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের আমেজ মিশাইয়া কহিল, "কিন্তু এমনই নাছোড়বান্দা মেয়েমানুষ যে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।"

আরতি গম্ভীর স্বরে কহিল, "ওঁদের কিছু জানিয়েছ?" পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "পাগল! এখন আবার জানায়!" আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এখনই তো জানানো উচিত, ওঁরা তা হ'লে অন্যত্র চেষ্টা করতেন।" পরেশ কহিল, "তাতে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হতো।" ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আরতি কহিল, "তা হ'লে কি করবে ঠিক করেছ?" পরেশ কহিল, "আমি তো বলেছি আরতি, তোমারও যা পথ, আমারও তাই।" আরতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "কিন্তু কমলার পথের মায়াও তো ছাড়তে পারছ না দেখছি। ভাবছ আমাকে পথে বার ক'রে, আমার সুযোগমত ফেলে পালিয়ে এসে কমলার পিছু নেবে—" পরেশ আহত স্বরে কহিল, "আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা আরতি?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, "উঠছ যে!" পরেশ ক্ষোভের স্বরে কহিল, "মনটা খারাপ হয়ে গেল, এখন যাই, সত্যেনবাবু এলে আসব।" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আরতি চাপা সুরে ডাকিল, "শোন।" বলিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল। পরেশও ফিরিয়া আরতির মুখোমুখী দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, "কেন তুমি বিকেলে এলে না? আমি সারাক্ষণ—" আরতি কথা শেষ করিতে পারিল না—অভিমানের বাষ্পে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। পরেশ আরতির চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "একি আরতি, কাঁদছ নাকি! তুমিও ছেলেমানুষ!" আরতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া জলভরা চোখে বিদ্যুতের চমক হানিয়া কহিল, "এর মধ্যে বুড়িয়ে গেছি ভাবছ নাকি! তোমার কমলাই বুঝি কাঁচা টসটসে!"

দরজায় দাঁড়াইয়া দুখের মা কহিল, "মাসীমা, উনুন ধ'রে গেছে, চায়ের জল চড়িয়ে দেব?" পরেশ শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আরতি মুখ ফিরাইয়া কড়া গলায় কহিল, "ওর জন্যে অনুমতি নিতে হবে নাকি? দাওগে যাও। আর ময়দাটা মেখে রাখগে। যাচ্ছি এখনই।" দুখের মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরেশ কহিল, "দুখের মাটা দেখে গেল, সব ওদের বাড়িতে গিয়ে ব'লে দেবে—মাগী গোয়েন্দাগিরি করে।"

আরতি কহিল, "তাই নাকি! আগে জানলে আরও ভাল ক'রে দেখিয়ে দিতুম, তোমার লুকোচুরির পালা শেষ হয়ে যেত।"

বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই আরতি ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, "জামাইবাবু আসছেন, আমি যাই, তুমি ব'স।" আরতি দ্রুতপদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দ্র আসিয়া পরেশকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু, কখন এলেন?" পরেশ কহিল, "এইমাত্র।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "বসুন, আমি ধড়া-চূড়াগুলো ছেড়ে আসি।" বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে জামা-কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "সকালে যা ভয় করছিলুম, তা হয় নি। জ্বরটা আর বড়ে নি, বরং কমতে শুরু করেছে।" পরেশ আগ্রহের সহিত কহিল, "তাই নাকি! তা হ'লে হয়তো আজকালের মধ্যে জ্বরটা রেমিশান হয়ে যেতে পারে।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "জ্বরটা যদি দু-একদিনে ক'মেই যায়, তা হ'লে এত হাঙ্গামা ক'রে বর্ধমান পাঠিয়ে কি হবে?" পরেশ কহিল, "আরতি দেবী থাকতে পারবেন না বেশিদিন বলছিলেন যে!" সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ওর সেক্রেটারি লিখেছে—শরীর সেরে উঠলে বড়দিনের ছুটির আগেই জয়েন করতে। ও যদি লিখে দেয়—ওর শরীর সারে নি—আর আপনি একটা সার্টিফিকেট দেন তো আরও ছুটি পেতে পারে।"

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া হাজির হইল—দুই হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে পিছনে আসিল দুখের মা—দুই হাতে দুই গ্লাস জল।

পরেশ কহিল, "আবার আমার জন্যে নিয়ে এলেন?" আরতি কহিল, "বড়লোক শ্বশুরের বাড়িতে না হয় খেয়েই এসেছেন, তা ব'লে গরিবের বাড়িতে এক মুঠো খুদকুঁড়ো খেতে দোষ কি?"

পরেশ কহিল, "তা কি আমি বলছি, আমার ক্ষিদে নেই।"

আরতি নীরসকণ্ঠে কহিল, "ক্ষিদে না থাকলে ফেলে রাখবেন, আমি চা নিয়ে আসি।" বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্যেন কহিলেন, "মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে দেখছি। আর এতেও না হয়! সংসারের ঝক্কি, তার উপর রোগীর সেবা। আপনার ওষুধটা আশ্চর্য কাজ করেছে তাই, না হ'লে ওর যদি রোগটা এই সময় চাড়া দিয়ে উঠত তো মুশকিল হ'ত।" আরতি আসিল, সত্যেন্দ্র হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "আপনারও ক্ষিদে নেই বুঝি?" সত্যেন্দ্র ম্লানমুখে সখেদে কহিলেন, "ছিল, উবে গেছে। একজনের একচোখোমি দেখলে ক্ষিদে থাকে?" আরতি কৃত্রিম কোপে অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "ওই হচ্ছে আর কি? খেয়ে নিন চটপট—আমার অনেক কাজ প'ড়ে।" পরেশকে কহিল, "খাচ্ছেন যে! জোর ক'রে খেয়ে কাজ নেই—শেষে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী আমাদের গালাগালি দেবেন।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "পরেশবাবু, থালাশুদ্ধু না খেতে পেরে নাকি কবে দুঃখ করছিলেন, আজ আর সে দুঃখ রেখে কাজ নেই, সব গিলে ফেলুন, না হ'লে আরতির রাগ যাবে না।"

আরতি নতমুখে চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল, "বেশ তো, খান না—ডাক্তার মানুষ এমন এক হজমীগুলি তৈরি ক'রে খাবেন যে, সব হজম হয়ে যাবে।"

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার কি সত্যি আর ছুটি নেই?"

আরতি চকিতে মুখ তুলিয়া কহিল, "মানে? আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?" সত্যেন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "না না, তা বলি নি, মানে—বড়দিনের ছুটিটা কাটিয়ে গেলে চলে না?" আরতি কহিল, "চলবে না কেন? চাকরির মায়া ছাড়তে পারলে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া চলে।" বলিয়া পরেশের দিকে একবার চাহিয়া আবার নতমুখে চা ঢালিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র হতাশভাবে পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তা হ'লে আর কি! নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই বজায় রাখতে হবে।" পরেশ কহিল, "সেই ভাল, স্থান পরিবর্তন অনেক সময় ওষুধের চেয়েও বেশি কাজ করে—এখানের চেয়ে সেখানে হয়তো উনি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।"

আরতি রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন ও পরেশ গল্প করিতে লাগিল। স্থির হইল, পরের দিন শেষরাত্রে পরেশ এবং যে লোকটি আসিবে সে, গরুর গাড়িতে করিয়া নিকটবর্তী স্টেশনে রওয়ানা হইবে; সকালে আরতি ও সুনীতি পালকী চড়িয়া যাত্রা করিবে। গোমস্তা মহাশয় পালকী ও গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে বাহিরে সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়া ঝিমঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল এবং শীতের তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস তীক্ষ্ণতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, "বৃষ্টি শুরু হ'ল যে! বাদলা হবে নাকি?" পরেশ সবজান্তার মত কহিল, "পৌষের মেঘ তো, সকালেই ছেড়ে যাবে বোধ হয়।"

রাত্রি আটটার সময়ে পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "রাত হ'ল, চলি তা হ'লে।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "পাগল নাকি! এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবেন?"

পরেশ কহিল, "এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না, খুব যেতে পারব।"

সত্যেন কহিল, "পারবেন, তা জানি—আপনার মত বয়সে আমিও পারতুম। তা হ'লেও আরতির মতামতটা একটু জেনে আসা দরকার।" বলিয়া সত্যেন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না, আসিল আরতি, আদেশের সুরে কহিল, "এই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যেতে হবে না—এইখানেই খেয়ে নাও, তারপর যদি বৃষ্টি ছাড়ে তো বাড়ি যেও।" তারপর আকাশে কালো মেঘের বিদ্যুতের এক টুকরা যেন আরতির কালো চোখে চমক দিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া আরতি কহিল, "এত বাড়ি যাবার তাড়া কেন বল দেখি! কে আছে সেখানে? একটা রাত্রি এখানে থাকলে দোষ কি?"

পরেশ পরম বিস্ময়ের সহিত আরতির মুখের দিকে তাকাইল। দুই দিনেই কণ্ঠস্বরে মালিকানার সুর লাগিয়াছে, প্রণয়িনী প্রহরিণী হইয়া উঠিয়াছে। তবু নূতন চাকরির মত আরতির এই নূতন কর্তৃত্ব পরেশের ভাল লাগিল। মাথা চুলকাইয়া কহিল, "মাসীমা ভাববেন।" আরতি কহিল, "মাসীমা যাতে না ভাবেন, তার ব্যবস্থা করা হবে—দুখের মা বাড়ি যাবার সময়ে খবর দিয়ে যাবে।" তারপর মুখ ও চোখের ভাবে ব্যাপারটির চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া কহিল, "আমার রান্নার বেশি দেরি নেই। তুমি হাত-মুখ ধোবে তো ধুয়ে নাওগে।" বলিয়া চলিয়া গেল। পরেশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি দশটার পরে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ আরও বাড়িয়া গেল। পরেশ সত্যেনকে কহিল, "একটা ছাতা দিন, তা হ'লেই যেতে পারব।" সত্যেন কহিলেন, "এই ঝড়ে ছাতা নিয়ে যেতে পারবেন কি?" পরেশ কহিল, "খুব পারব।" সত্যেন ছাতা আনিতে গেলে আরতি দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, "কই, যাও দেখি!" সত্যেন ছাতা আনিলে পরেশ কহিল, "যেতে পারব না ব'লে মনে হচ্ছে।" সত্যেন হাসিয়া কহিলেন, "বললুম যে, পারবেন না—তবু ওল্ড মেনদের কথায় তো আপনারা কান দেবেন না।" বলিয়া পরেশের মত পরিবর্তনের আসল কারণটির দিকে কটাক্ষ করিলেন।

বৈঠকখানায় চৌকি পাতিয়া পরেশের বিছানার ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সকলে রোগীর ঘরে কাটাইল। সুনীতির জ্বর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, ঘুমের ঔষধের প্রভাবে শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সত্যেন পাশের ঘরে খোকাকে লইয়া শুইতে গেল, আরতি রহিল রোগীর ঘরে, পরেশ আসিয়া নিজের বিছানায় শুইল।

পরেশের ঘুম আসিল না। বাহিরে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝোড়ো বাতাস পাগলের মত গাছের ডালে নাড়া দিয়া, দরজা-জানালায় ধাক্কা দিয়া কখনও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিদ্যুতের আলো দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সারা ঘরটাকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে, মেঘের গুরু-গুরু ডাকে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পরেশের মনের মধ্যেও বাহিরের এই মাতামাতির ছোঁয়াচ লাগিল। লজ্জা-সঙ্কোচ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, শিক্ষা-শালীনতা কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটি কোমল, কমনীয়, কবোষ্ণ নারীদেহকে দুই সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার সমস্ত দেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আজ সন্ধ্যার পর হইতে আরতি তাহাকে কারণে-অকারণে কতবার স্পর্শ দিয়াছে। রাত্রে খাওয়ার পরে রোগীর ঘরে একটা ছোট টেবিল ফেলিয়া বসিয়া তিনজনে তাস খেলিতেছিল। আরতি তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল। কতবার হাতে হাত ঠেকিয়াছিল, পায়ে পা ঠেকিয়াছিল, আরতির কানের উপরের কুচা চুলগুলি তাহার গালে ঠেকিয়াছিল। আরতি ইচ্ছা করিয়া কতবার নিজের পায়ের পাতা দিয়া তাহার পায়ের পাতায় চাপ দিয়াছিল



এবং একবার পরেশ অনেকক্ষণ আরতির হাতটি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। শুইতে আসার ঠিক পূর্বেই (সত্যেন অবশ্য কাছে-পিঠে ছিলেন না) তাহার গালে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া চোখের দৃষ্টি ঘন, কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া, ইঙ্গিতময় হাসি হাসিয়া আরতি কহিয়াছিল, "যাও, শুয়ে শুয়ে তোমার কমলার স্বপ্ন দেখগে।" উত্তরে পরেশ আরতির গালটি টিপিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অপ্রিয়ভাষিণীর আরও গুরুতর শাস্তিবিধানের উদ্যোগ করিতেই সত্যেনের পায়ের শব্দ শুনিয়া আরতি ভ্রূ দুইটিতে সতর্কতাসূচক তরঙ্গ তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা মনে হইল, কে যেন দরজায় মৃদু আঘাত দিতেছে। পরেশ লাফাইয়া উঠিয়া বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আরতি আসিয়াছে নাকি? কিংবা হাওয়ার শব্দও হইতে পারে। আবার মৃদু আঘাতের শব্দ। পরেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। দুই লাফে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার শব্দ! চাপাকণ্ঠে পরেশ প্রশ্ন করিল, "কে?" সতর্ক মৃদুকণ্ঠে জবাব আসিল, "আমি—আরতি, দরজা খোল।"

পরেশ দরজা খুলিতেই এক ঝলক শীতল জোলো হাওয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল আরতি—গায়ে নীল রঙের র‍্যাপার, মাথা খোলা, চুল বিশৃঙ্খল, মুখে রহস্যময় হাসি, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মত কালো চক্‌চকে চোখ।

উত্তেজনায় পরেশের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, কোনমতে কহিল, "এই একলা ঘরে, মানে সত্যেনবাবু—"—আরতি বাধা দিয়া আদেশের সুরে কহিল, "দরজা বন্ধ ক'রে দাও না—ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে যে!" পরেশ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আরতি বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ কাছে আসিতেই কহিল, "খুব ঘুমুচ্ছিলে বুঝি," পরেশ কহিল, "না।" আরতি কহিল, "এতক্ষণ ধরে ধাক্কা দিচ্ছি, খোলো নি কেন?" পরেশ অপরাধীর মত কহিল, "শুনতে পাই নি—যা বাতাস আর বৃষ্টির শব্দ—তোমার দিদি কি করছেন আরতি?" আরতি কহিল, "খুব ঘুমুচ্ছে। আমার কিছুতেই ঘুম এলো না—কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি গে, দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চ'লে এসেছি। তা, তোমাকে বোধ হয় এসে দিলাম ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে।" পরেশের ঠোঁট দুইটি শুকাইয়া গিয়াছিল, জিভ দিয়া ভিজাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "বল কি আরতি! আমারও ঘুম আসে নি—তোমার কথাই ভাবছিলাম।" চোখ দুইটি নাচাইয়া পরিহাসের সুরে আরতি কহিল, "সত্যি নাকি! আমার ভাগ্য!"

লণ্ঠনের অতি মৃদু আলোকে আলো-ছায়াভরা ঘর, বাহিরে বর্ষণ-মুখর রাত্রি, কাছে পিঠে কেহ কোথাও জাগিয়া নাই, সামনে দাঁড়াইয়া আরতি। পরেশের মনে হইল, কল্লোলময় সমুদ্রের মাঝখানে, নির্জন এক দ্বীপে, প্রায়ান্ধকার প্রদোষে, সে ও আরতি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি কহিল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শোও, আমি বরং একটা চেয়ার টেনে বসি।" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, তুমি বিছানায় ব'স, আমি চেয়ারে বসছি।" বলিয়া ঘরের এক পাশে জড়ো-করা চেয়ারগুলো হইতে একটা টানিয়া আনিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইতেই খপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "কমলার মত কোমল আর কচি নয় ব'লে আমার কাছে বসতে ইচ্ছে করে না বুঝি?"

আরতির চাহনি, কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ পরেশের মনে যে আগুন জ্বালিতেছিল, তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিল। চকিতে ফিরিয়া আরতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া বাহু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "করে আরতি, আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে।" আরতির পাতলা রাঙা ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল মারাত্মক মদির হাসি। চোখের তারা দুইটি হইয়া উঠিল ভ্রমরের মত চঞ্চল, মুখ লাল করিয়া মৃদু কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কি?" মুহূর্তের মধ্যে উদ্দাম আবেগে পরেশ আরতিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, নিষ্ঠুর বাহুবন্ধনে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তাহার মুখে চোখে কপালে কপোলে গ্রীবায় চুম্বন করিতে লাগিল। আরতি নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া কহিল, "ছাড়! তুমি বোধ হয় ভুল করছ, আমি কমলা নয়—আরতি।"

পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "জানি, তুমি আমারই আরতি—আমার জীবনে সর্বপ্রথমা নারী, যে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে।"

আরতিও গভীর আবেগের সহিত কহিল, "তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ—যার হাতে ধরা দিলাম।" বলিয়া নিঃশেষে নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

নিভৃত মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা থিতাইয়া আসিবার পর তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া, একই শাল গায়ে জড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল।

আরতি কহিল, "তুমি কি আমাদের পেঁছে দিয়ে ফিরে আসবে ভাবছ?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" জানাইল। আরতি কহিল, "তারপর?"

"এখানের সব ব্যবস্থা ক'রে তোমার কাছে ফিরে যাব।" আরতি আবদারের সুরে কহিল, "না, যা ব্যবস্থা করতে হবে, কালই ক'রে ফেল, আর আসতে পাবে না তুমি।" পরেশ কহিল, "এত তাড়াতাড়ি!" বাধা দিয়া আরতি কহিল, "তা হোক্‌, কি এমন ব্যবস্থা করতে হবে? বিনয়বাবুকে ব'লো, ক'রে দেবেন।" পরেশ কহিল, "বিনয় কাকা যে বাড়িতে নেই।" আরতি কহিল, "নাই বা থাকলেন, পরে চিঠি লিখলেও চলবে। মোট কথা, আমি আর ছেড়ে দেব না তোমাকে।" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমাকে বিশ্বাস হয় না নাকি?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, পুরুষকে বিশ্বাস করি না আমি।" পরেশ কহিল, "কেন?" জবাব দিল না আরতি।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—তাহার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু। তাহাদের বাড়িতে আসিত, তাহাকে পড়াইত, কত উপহার দিত। সুখেন্দু পড়িত স্কটিশচার্চ কলেজে, সে পড়িত বেথুন স্কুলে—একসঙ্গে প্রতিদিন ট্রামে করিয়া পড়িতে যাইত তাহারা, একসঙ্গে বাড়ি ফিরিত। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া সে স্কটিশচার্চে ভর্তি হইল, সুখেন্দু তখন ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্র, সেই সময়ে দুইজনে কতদিন কলেজ হইতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গড়ের মাঠে, আলিপুরে জুতে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আরও কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আবার যথাসময়ে ভাল ছাত্রছাত্রীর মত বাড়ি ফিরিত। এমনই করিয়া তাহারা দুইজন দুইজনকে ভালবাসিল, দুইজন দুইজনের মন জানিল, দুইজন পাশাপাশি বসিয়া কতদিন রঙিন কত স্বপ্ন দেখিল। বি-এ পাস করিয়া সুখেন্দু ইউনিভার্সিটিতে চলিয়া গেল। সেখানে সহপাঠিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রী, নামজাদা সুন্দরী সুমিত্রার ফাঁদে ধরা পড়িল। তারপর তাহাদের বাড়ি আসা বন্ধ করিল সে, তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিল এবং অচিরে অবলীলাক্রমে তাহাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভালবাসা লজ্জায় অপমানে মনের কোণে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিল।

আরতি কহিল, "কেন আবার—এমনই বিশ্বাস করি না। তুমি ফিরে এলে আর হয়তো ফিরবে না, কমলার হাতেই ধরা দেবে।"

পরেশ আরতিকে ঘনতর করিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "পাগল নাকি!"

আরতি মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি পাগল হই আর যাই হই, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে, কালই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল। আমার হাতে যখন ধরা পড়েছ, যতদিন বেঁচে থাকব—ছাড়া পাবে ব'লে ভেব না।"

ঘর হইতে যাইবার আগে আরতি কহিল, "কমলার উপর হয়তো অন্যায় করছি আমি, কিন্তু ভগবান নিজে থেকে আজ পর্যন্ত কোনও কিছু আমাকে দেন নি, তাই পরের হাত থেকে নিজের প্রার্থিত বস্তু ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে হচ্ছে। কমলা হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু জানি, তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আবার তার মুঠি ভ'রে দেবে—"

(৩২)

পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরিবার সময়ে পরেশ দেখিল, বিনয়ের বৈঠকখানা খোলা। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া হাঁকিল, "কাকাবাবু!" বিনয় সাড়া দিল, "কে? পরেশ? এস বাবা।" পরেশ বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিল, বিনয় ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা এলেন না?" বিনয় কহিল, "পাগল! পৌষ মাসে আবার আসে? তা ছাড়া, বাবির বিয়ে না হ'লে আসবে না।" একটা চেয়ার দেখাইয়া কহিল, "ওই চেয়ারটায় ব'স বাবাজী।" পরেশ কহিল, "থাক, বসব না। বাবি সেরেছে?" বিনয় কহিল, "হ্যাঁ, ঘাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।" ঢোক গিলিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবির বিয়ে কোথাও ঠিক হ'ল নাকি?" বিনয় কহিল, "ঠিক এমন কিছু হয় নি, তবে আমার শালা চেষ্টা করছে। আমার শালাকে জানো তো—মোক্তার মানুষ, কোথাও একটা লাগিয়ে দেবে ঠিক।"

পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় কহিল, "তা' বাবাজী, তোমার খবর বল—প্র্যাক্টিশের কিছু উন্নতি হয়েছে?" পরেশ কহিল, "তা একটু হয়েছে বইকি!" বিনয় হাসিয়া কহিল, "আমি তো বলেছিলাম বাবাজী, সুবিধে হবে। বিয়ে না হতেই এই, বিয়ে হবার পরে আরও অনেক সুবিধে হবে।" পরেশ কহিল, "আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি কাল।" বিনয় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "এখন কলকাতা কেন? বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?"



পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "হ্যাঁ, ওষুধ কতকগুলো কিনতে হবে। তা ছাড়া আরও কতকগুলো দরকারী জিনিসপত্র—"

বাধা দিয়া বিনয় কহিল, "ফিরছ কখন?"

পরেশ কহিল, "দু'চার দিন দেরি হবে। মাসীমা একা থাকবেন—খোঁজখবর নেবেন একটু—"

বিনয় কহিল, "আমাকে বলতে হবে না বাবা, আমি তো নেবই, তা ছাড়া তোমার ডাক্তার আছেন, ঘনশ্যাম আছে, ওরা সবাই নেবে।"

সন্ধ্যার পরে পরেশ একটা বড় ট্রাঙ্কে কাপড়জামা, ডাক্তারি বই ও অন্যান্য জিনিষপত্র ভরিতেছিল, মাসীমা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, "কলকাতা কি জন্যে যাচ্ছিস?" পরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, "কাজ আছে।" মাসীমা কহিলেন, "কি কাজ শুনি?"

"ওষুধপত্তর কিনতে হবে—জামাকাপড় তৈরি করাতে হবে।"

বাধা দিয়া মাসীমা কহিলেন, "তোর শ্বশুরবাড়িতে বলেছিস?" পরেশ কহিল, "কি দরকার? দু'দিন পরেই ফিরে আসছি তো!" মাসীমা কহিলেন, "তবু বলা উচিত ছিল, এখন ওরাই হ'ল তোর সত্যিকার আপনার, ওদের না জানিয়ে কোন কাজ করা উচিত নয় তোর।" পরেশ নীরবে নিজের কাজ করিতে লাগিল। মাসীমা কহিলেন, "তাড়াতাড়ি ফিরবি বাপু, বিয়ের আর বেশি দেরি নেই—"

(৩৩)

দিন দশ পরে বিকাল পাঁচটার সময়ে কার্তিক ডাক্তারের বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কার্তিক ডাক্তারের উঠানে আসিয়া জড়ো হইল। কার্তিক ডাক্তার বারান্দায় খাটের উপরে খাড়া উপবিষ্ট, কপালে কুঞ্চনরেখাবলী, মুখে কঠোর গাম্ভীর্য, রক্তবর্ণ চক্ষের দৃষ্টি ভূমির উপরে ন্যস্ত। খাটের পাশে একটা মোড়ায় ঘনশ্যাম বসিয়া আছে; জানুর উপরে স্থাপিত ডান হাতের উপর মুণ্ডটি তির্যক্‌ভাবে রক্ষিত। তাহার ক্ষতি ও ক্ষোভের মাত্রা যে কার্তিকের মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পৌঁছিয়াছে, মুখের ভাবে তাহাই সে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হারু ও পরাণ মোড়া সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উঠানেই লম্ফঝম্প ও হাঁক-ডাক শুরু করিয়া দিয়াছে। কার্তিকের অন্যান্য পারিষদেরা বারান্দায় কেহ উবু হইয়া বসিয়া, কেহ খাড়া দাঁড়াইয়া, নীরবে অথবা সরবে ক্ষোভ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

রান্নাঘরের বারান্দায় কার্তিক-গৃহিণী দেওয়ালে ঠেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশেই গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার মা। উভয়েরই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। তাঁহাদের দুইজনকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে পাড়ার মেয়েরা—ইহারাও নিজ নিজ মুখে যথাসাধ্য সমবেদনার ভাব ফুটাইবার চেষ্টাকরত 'আহা-উহু' করিতেছে। শ্রীমতী ও কমলা এখানে নাই। কোঠার উপরে, অন্ধকার ঘরে পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া খালি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে কমলা।

হারু চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছুতেই সহ্য করব না, যারা এর ভেতরে আছে তাদের নখে টিপে টিপে মারব।" বলিয়া বাম হাতের বুড়া আঙুলের নখের উপর ডান হাতের বুড়া আঙুলের নখটি টিপিয়া, দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, চোখ দুইটা ছোট ও কপাল কুঞ্চিত করিয়া উকুন মারিবার ভঙ্গী করিল।

পরাণ মুখহাত নাড়িয়া কহিল, "হয়েছে, হয়েছে! তখন যে ভোজ খাবার লোভে সব দিশেহারা হয়ে গেলে কিনা! না হ'লে বলি নি তখন, মহেশ আচার্য্যির ছেলে, ও ঝাড়ের বাঁশ সোজা হবার নয়; শহরে লেখা-পড়া শিখে এলেও ভাল ক'রে দেখেশুনে বাজিয়ে তবে সব ঠিক কর? না, তখন বুক ঠুকে বলা হ'ল—কোন চিন্তা নেই, আমি যখন সুতো ধরেছি, তখন আর গোঁৎ খেতে সাহস করবে না। যতই হোক্ ছাত্র তো! এখন গুরুভক্তির ঠ্যালাটা সামলাও!" বলিয়া ঘনশ্যামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথাটা ঝাঁকাইয়া দিল। ঘনশ্যাম ঝাঁকড়া ভ্রূ দুইটির মধ্যস্থ সংকীর্ণ ফাঁকটুকু একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভারী গলায় কহিল, "ঠিকই বলেছিলাম, কিছু গোলমাল হ'ত না, তবে পাড়ার লোকে বদ্ চাল দেয় তো কি করব বল!" হারু এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "তার মানে? কিছু করতে পারব না আমরা? সারা সমাজের গায়ে একটা লোক খোঁচা মারবে হরদম, আর আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সহ্য করব! তার চেয়ে সব এক সঙ্গে গলায় কলসী বেঁধে নতুন পুকুরের জলে ডুবে মরিগে চল।" বলিয়া বোধ করি ডুবিয়া মরিবার জন্যই সদর দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু কেহই তাহার অনুগামী হইল না বা তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিল না দেখিয়া কতকটা যাইয়াই ফিরিয়া আসিয়া ডান হাতটা শূন্যে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "ডুবে মরব কিসের জন্যে? মরদের বাচ্চা, মেয়েমানুষ তো নয়! কেউ না পারে একাই আমি শোধ নেব, কেমন ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়, দেখে নেব।"

পরাণ হাঁকিয়া কহিল, "আর ফটফটানি করতে হবে না। সব বাহাদুরি দেখা আছে। বিয়ে কি ক'রে বন্ধ করবে শুনি? ছেলেকেই যখন সরজমিন থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তখন—।"

হারু বাধা দিয়া কহিল, "এই মাথাতে অনেক বুদ্ধি আছে বাবা!" বলিয়া নিজের তালুতে বারকয়েক চাঁটি মারিয়া কহিল, "তোমাদের মত ভেজিটেবল্ মার্কা ঘি নয়, আসল গাওয়া ঘি আমার মাথায়।" বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, বাম চোখটি ছোট করিয়া ঘাড়টি বাঁকাইয়া কহিল, "বরের আসন থেকে হাতকড়া দিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে আসব।" বলিয়া বাম হাতের উপর ডান হাতটি চাপাইয়া পরাণের দিকে বাড়াইয়া দিল।

হারু ও পরাণের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ঘনশ্যাম মোড়ার উপরে গম্ভীরভাবে আর বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। দাঁড়াইয়া কহিল, "তোমরা বাজে বোকো না দেখি! কার যে কত ক্ষমতা, কত বুদ্ধি সব জানা আছে। ও ছেলের আশা ছেড়ে দাও—টেনে-হিঁচড়ে ধ'রে এনে ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে হবে—এমন ফ্যালনা মেয়ে আমাদের নয়। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে এনে ঠিক দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কার কি ব্যবস্থা করতে হবে, সে এখন মুলতুবি থাক। আসল কাজ শেষ ক'রে সবাই মিলে ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে স্থির করতে হবে।" সমবেত ইতরশ্রেণীর লোকগুলার উদ্দেশে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "তোরা সব ঘর যা; কিছু ভাবনা নেই তোদের। ঠিক দিনে ভোজ খেতে চ'লে আসবি সব।" মহিলাদের উদ্দেশে কহিল, "তোমরা সব বাড়ি যাও, কাজকর্ম করগে, বিয়ে বন্ধ হবে না। জেনে রেখো,—পিঁপড়ের পাখা বেরোলেই পাখী হয় না, পাখা ছিঁড়ে পিষে মারবার জন্যে আমরা এখনও বেঁচে আছি গাঁয়ে।" বলিয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া, হাতের মুঠো দুইটা বন্ধ করিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিল।

কার্তিক ও পারিষদবর্গ ব্যতীত একে একে সকলে চলিয়া গেলে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "শ্রীমতীদিদি কোথায় গেলে?" উপর-কোঠা হইতে শ্রীমতী সাড়া দিল, "এই যে এখানে রয়েছি, যাই।"

অনতিবিলম্বে শ্রীমতী আসিতেই কার্তিক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছে?"

শ্রীমতী কহিল, "কাঁদছিল, চুপ করেছে।"

কার্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হুঁ।"

ঘনশ্যাম ফিস ফিস করিয়া শ্রীমতীকে কহিল, "তুমি একবার বিনয়ের ওখানে যাও দেখি, আসল ব্যাপারটা জেনে এস। পরেশ ওর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে পালিয়েছে, না সেই কায়েত ছুঁড়ীটার সঙ্গে গিয়ে জুটেছে।" হারু কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাধা দিয়া কহিল, "পাগল হয়েছ নাকি! বামুনের ছেলে—" ঘনশ্যাম সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া কহিল, "যেমন বুদ্ধি! যার মা বামুনের মেয়ে হয়ে আগুরীর হাতে জাত দিয়েছিল, তার ছেলে তো! তা ছাড়া, আজকাল এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে।" বলিয়া শিবনেত্র হইয়া ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই বিস্ফোরণ ও বিস্ফারণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মাত্র একখানি চিঠি, পরেশের—কার্তিকের নামে। বেলা দুইটার সময়ে পিয়ন বিলি করিয়া গিয়াছিল, বেলা তিনটার সময়ে দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া নিদ্রাজড়িত চক্ষে চিঠি পড়িতে পড়িতে কার্তিক ডাক্তারের চোখের ঘুম এক মুহূর্তে উবিয়া গিয়াছিল।

পরেশ লিখিয়াছিল ঃ—

কলিকাতা,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সবিনয় নিবেদন মিদং, আমি নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া দুই-চারিজন সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া আর গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিতেছি, সুবিধা হইলে এইখানে অথবা অন্য কোন শহরে ব্যবসা শুরু করিব। এ অবস্থায় শুধু


আমাদের
সকল পৃষ্ঠপোষককে
আমরা শুভ শারদীয়ার
সম্ভাষণ জানাই।
Bathgate & Co.

ঘুমের কোলে



ফোটোশিল্পী—শ্রীনীরদ রায়

সম্ভব আমার সহিত কমলার বিবাহ দিতে আপনি রাজী হইবেন না। কারণ আমি জানি, আপনি আপনার কন্যাটিকে নিজের চোখের সামনে রাখিতে চান। কাজেই আমি কমলাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে এই কয়দিনের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট দিনে কমলার বিবাহ দিতে পারিবেন। এ কয়দিন আপনার কাছে যে স্নেহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। ভবিষ্যতে কর্মজীবনে যদি কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনাদের চরণ দর্শন করিব। আশা করি, তখনও আপনাদের স্নেহ-বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইব না। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহপ্রার্থী **পরেশ**

(৩৪)

সেইদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় লণ্ঠন জ্বালিয়া বিনয় পড়িতেছিল, হঠাৎ শ্রীমতী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনয় রয়েছিস নাকি?" বিনয় কহিল, "কেঁ? শ্রীমতী পিসি? এস, বস।" শ্রীমতী ঢুকিয়া মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, "মহেশ আচায্যির বাড়ি গিছলাম, জানিস তো পরেশ কি কাণ্ড করেছে!" বিনয় সবিস্ময়ে কহিল, কি?" শ্রীমতী তীক্ষ্নদৃষ্টি বিনয়ের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে ব্যংগের সূক্ষ্ম আমেজ মিশাইয়া কহিল, "জানিস না?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না তো!" শ্রীমতী বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "পরেশ আজ চিঠি লিখেছে ডাক্তারকে। জানিয়েছে, গাঁয়ে আর ফিরবে না, কমলাকে বিয়ে করবে না, শহরে ডাক্তারি করবে, আর কোন এক শহুরে মেয়েকে বিয়ে করবে। ওর মাসীকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে, ও যেন ঘর-দোর বন্ধ ক'রে চাবি তোর কাছে দিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে যায়।" বিনয় বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, "তাই নাকি?" তারপর যেন কিছু মনে পড়িল, এইভাবে মুখ ও চোখের ভংগী করিয়া কহিল, "তাই বুঝি ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে চ'লে এল?" শ্রীমতী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিল, "আসবে না। ওরই হাতে গড়া সম্বন্ধ। ও মাঝে না থাকলে মহেশ আচায্যির ছেলের সংগে কার্তিক ডাক্তার কি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হ'ত! যার মায়ের অমন কীর্তি। ঘনশ্যাম অনেক ব'লে-ক'য়ে ডাক্তারকে রাজী করেছিল।" বিনয় চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "শুধু ঘনশ্যাম কেন, সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল যে! ডাক্তার-অন্ত-প্রাণ সব, আসবে না? শুধু তোকেই দেখলাম না।" বিনয় লজ্জিত মুখে কহিল, "কিছু জানতাম না, স্কুলে ছিলাম কিনা। যাব কাল সকালে; ডাক্তার বুঝি মুষড়ে পড়েছেন?"

"তা একটু পড়েছে বইকি! সব আয়োজন হয়ে গেছে, বিয়ে না হ'লে তো সব পণ্ড। তা ছাড়া, পাকাপাকি হয়ে বিয়ে ভেঙে যাওয়া মেয়ের পক্ষে ভারী খারাপ, এই লগ্নে যেমন ক'রে হোক বিয়ে দিতে না পারলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দায় হবে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোকে কোন চিঠি দেয় নি পরেশ?" বিনয় প্রবলবেগে ঘাড়

নাড়িয়া কহিল, "না তো।" শ্রীমতী অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "তোর কাছে তো একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল তার, তোকে এত ভক্তি করে, বিশ্বাস করে, তোর কাছেই ঘরের চাবি রাখতে বলেছে।" বিনয় বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "তা নিশ্চয়ই করে, চিরদিন তাকে স্নেহ করেছি, তার মঙ্গল কামনা করেছি, ভক্তি করবে না?" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমতী কহিল, "কে মানা করছে রে? যত ইচ্ছে ভক্তি করুক, তাই ব'লে কি পরের ভরাডুবি ক'রে দিতে হবে?" বিনয় তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "কি বলতে চাও তুমি?" শ্রীমতীও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও উচ্চ করিয়া কহিল, "কি আর বলব? সবাই বলছে—পরেশ নাকি যাবার আগে তোকে সব জানিয়ে গিয়েছিল।" বিনয় প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা! আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে একেবারে চ'লে যাচ্ছে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানায় নি। বলেছিল—কলকাতা যাচ্ছি, দু-চারদিন পরে ফিরব, ওর মাসীর যেন খোঁজ-খবর নিই।" শ্রীমতী এতক্ষণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল, ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, উপরে নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ওই তো জানানো হ'ল।" হঠাৎ কণ্ঠস্বর প্রখর করিয়া কহিল, "কার্তিক ডাক্তার তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে রে?" বিনয় নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিতে লাগিল, "তোর উচিত ছিল সেদিন তখনই ডাক্তারকে খবর দেওয়া, তা হ'লে গাঁয়ের মুরুব্বিদের ডেকে সামনা-সামনি খোলাখুলি কথাবার্তা হয়ে যেত। ছোঁড়া যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই বলত, তা হ'লেও ডাক্তার তার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে চাইত, এমন ফ্যালনা মেয়ে তার নয়। এমন হ্যাংলামি করাও তার কোষ্ঠিতে লেখেনি। তার পয়সার অভাব নেই, মেয়েরও রূপ-গুণের অভাব নেই যে, লোকের তোষামোদ করতে হবে।" কণ্ঠস্বর প্রখরতর করিয়া কহিল, "আর তোর যদি পরেশকে জামাই করবারই ইচ্ছা ছিল, কার্তিক ডাক্তারকে আগে বললেই পারতিস। তা হ'লে ডাক্তার ওদিকে আর হাত বাড়াত না, বরং এমন মানুষ যে, হয়তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে দিত।" দম লইয়া কহিল, "এত চাল চালতেও হ'ত না, গাঁ থেকে পালাতেও হ'ত না। আর যদি চুপ ক'রেই ছিলি তো শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রেই থাকলে হ'ত, মিছেমিছি এতবড় একটা মানুষের মাথা হেঁট করালি, একটা নির্দোষ মেয়ের মনে কষ্ট দিলি—" বিনয় হতবুদ্ধির মত নির্বাক-ভাবে শ্রীমতীর কথা শুনিতেছিল। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তোমাদের সকলের ধারণা, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে আমারই পরামর্শে পরেশ এখান থেকে পালিয়েছে?"

ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, "আমি কিছু জানি না বাবা, সবাই বলছে।"

বিনয় কহিল, "সবাইকে ব'লো, আমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। আমি গরিব বটে, তবু পরের জিনিসে লোভ করবার মত নীচ নই।" শ্রীমতী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "তাই নাকি? কোথায় হ'ল? কবে খবর পেলি?" বিনয় কহিল, "আজই চিঠি এসেছে। দেখতে চাও তো আনছি।" বলিয়া বিনয় বাড়ির ভিতরে গিয়া একটা পোস্টকার্ড লইয়া আসিল। শ্রীমতী কহিল, "প'ড়ে শোনা দেখি!"

বিনয়ের স্ত্রী লিখিতেছে:—দাদা এখানে বেবির জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটি দ্বিতীয়পক্ষ; বয়স কিছু বেশি বটে, কিন্তু পুলিসে চাকরি করে, মাসে মোটা উপার্জন। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র ছেলে ও মেয়ে আছে। আমি মত দিয়াছি, আমাদের মত গরিবের মেয়ের ইহার চেয়ে কি ভাল বর জুটিবে? দাদা তোমার কথা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমার হইয়া মত দিয়াছি। ভাগ্যে থাকিলে মেয়ে এখানেই সুখী হইবে। আগামী ৫ই মাঘ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি পত্রপাঠ ছুটি লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।

শ্রীমতী মুখ কালো করিয়া কহিল, "পুলিসের চাকরি! তবে তো অনেক টাকা রোজগার!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভারী সুখী হলাম শুনে। তাই তো বলেছিলাম বউমাকে—ভাইয়ের কাছে মেয়েকে নিয়ে যা, তারা শহরের লোক—অনেক রকম জানে-শোনে; ধরাধরি ক'রে মেয়ের তোর গতি ক'রে দেবে।" মাথা নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "না হ'লে গাঁয়ে যা দুর্নাম উঠেছিল, ও মেয়ে পার করা শক্ত হ'ত। আমি উঠি বাবা! সবাইকে বলি গিয়ে।" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, "এক কাজ কর্, চিঠিটা আমাকে দে, কাগজে-কালিতে দেখলে কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।"

(৩৫)

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

বহুবাজার স্ট্রীটের একটা ছোট দোতলা বাড়ির ছাদের এক কোণে আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আরতি ও পরেশ। এই বাড়ির দোতলায় দুইখানা ঘর তাহারা ভাড়া লইয়াছে। আজ আরতির বন্ধু কর্পোরেশান স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা দাস ও তাহার স্বামী প্রীতীন দাসের বাড়িতে ও তাহাদের চেষ্টায় পরেশের সহিত আরতির হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রাত্রি এগারোটার পর চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার মৃদু স্নিগ্ধ আলো, ঐশ্বর্যময়ী কন্যার প্রতি দরিদ্র পিতার স্নেহোপহারের মত আলোকময়ী নগরীর উপর কুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইতেছিল। সেই জ্যোৎস্নার এক টুকরা চারিদিকের উঁচু বাড়িগুলার মাথা ডিঙাইয়া কোনমতে আরতিদের ছাদের এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-চিক্কণ নীলাভ ধূসর আকাশের পানে তাকাইয়া আরতি ও পরেশ স্বপ্ন দেখিতেছিল—আগামী অজ্ঞাত ভবিষ্যতের নয়, পশ্চাতে ফেলিয়া-আসা অতি পরিচিত অতীতের।

পরেশের মনে পড়িল, বেবির কথা, কমলার কথা। বেবির অশ্রুসজল মুখখানি, কমলার সেদিনের সেই হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি মনে পড়িল। জীবনের বাঁকে বাঁকে কে কোথায় হারাইয়া গেল, আর কোনদিন তাহাদের সহিত হয়তো দেখা হইবে না।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—ধবধবে ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, খাড়া নাক, বিস্তৃত কপাল, চোখে দৃপ্ত দৃষ্টি! আরতি একদা ভালবাসিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু সে ভালবাসা মরিয়া, গলিয়া, ধুলা হইয়া মনের এক কোণে জঞ্জালের মত জড়ো হইয়া আছে। তবু এখনও কোন কোন দিন আরতি স্বপ্নে সুখেন্দুকে দেখে—সেই আগের দিনের মত কলেজ পলাইয়া তাহার সঙ্গে সারা কলিকাতা শহরে টো- টো- করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুইজনের সুখাবিষ্ট আনন্দোজ্জ্বল মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম করুণ সুর বাজিয়া উঠিল, দুইজনেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আরতি আরও কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, "কি ভাবছ গো?" পরেশ কহিল, "তুমি?"

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

কোন এক মফস্বল শহরে মোক্তার-মামার বাড়িতে বেবির বিবাহের প্রথম পর্ব অর্থাৎ কন্যাদান ও শুভদৃষ্টি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর—এই শহরের পুলিসের দারোগা, বয়স চল্লিশের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। বৎসরখানেক আগে বিপত্নীক হইয়াছে। প্রথম পক্ষের দরুণ বৎসর দশের একটি ছেলে ও বৎসর পাঁচের একটি মেয়ে আছে। কাজেই বিবাহ না করিয়া কোন রকমে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একটানা এক বৎসর ব্রহ্মচর্য সাধন করিবার পর মনটা তাহার ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। উপরন্তু অন্দরে বৃদ্ধা পিসিমা, বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের দল পত্নীহীন জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে তাহার চোখের সামনে এমনই ভয়াবহ চিত্র আঁকিতে শুরু করিল যে, শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিতে রাজী হইয়া পড়িল। এবং জনৈক মোক্তার বন্ধু (বেবির মামা) তাহার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলে প্রথমত বয়সের তারতম্যের দরুণ একটু খুঁতখুঁত করিল বটে, কিন্তু মেয়েকে স্বচক্ষে দেখিবার পর আপত্তি তো করিলই না বরং অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া উঠিল। বরের বয়স, লম্বা-চওড়া মেদবহুল, লোমশ দেহ ও মেটে রং দেখিয়া সুখদা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দাদার কাছে ধমক খাইয়া, তাহা ছাড়া সস্তায় কার্য সাধন হইবে ভাবিয়াও রাজী হইয়া গেল।

বাসর-ঘরে কন্যা ও বর বসিয়া আছে। বাড়ির মেয়েরা বরের বয়স ও পদমর্যাদা স্মরণ করিয়া কেহ কাছে ঘেঁষিতে সাহস করে নাই, জানালা ও দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া মৃদু গুঞ্জন করিতেছে। বর একটা গড়গড়া হইতে লম্বা সটকায় তামাক টানিতেছে। পাশে লাল চেলীতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া বেবি বসিয়া আছে। সুখদা একবার ঘরে ঢুকিয়া দ্বিধা-কম্পিত পদে কাছে আসিয়া বেবির বাম হাতটি বরের ডান হাতে চাপাইয়া দিয়া, মুখস্থ-পড়া বলার মত, ফিস ফিস করিয়া

কহিল, "তোমার হাতে সঁপে দিলাম, বাবা! নেহাৎ ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। দোষ ত্রুটী হ'লে ক্ষমা ক'রো।" বর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বধির কোমল-কম্পমান হাতটি নিজের বাঘের থাবার মত প্রকাণ্ড কড়া-পড়া হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া বাজখাঁই গলায় কহিল, "কিছু ভাবনা নেই আপনার। ছেলে-ছোকরা তো নয় যে বুঝিয়ে বলতে হবে! মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।" সুখদা কম্পিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বর বধির সুগোল, সুগঠিত, কাঁচা সোনার মত রঙের হাতে পাতলা, হাল্কা সোনার চুড়িগুলির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে আড়ালে-আবডালে দণ্ডায়মানা রমণীবৃন্দের উদ্দেশে কহিল, "এ্যা! এ যে তারের মত সরু দেখছি, বেশ ভারী ভারী চুড়ি গড়িয়ে দেব এখন।" বলিয়া হাতটি পরম লোভের সহিত টিপিতে লাগিল। বধি হাতটি সরাইয়া লইবার জন্য টান দিতেই বর কহিল, "লাগছে নাকি?" বধি নীরব। বর কহিল, "কথা কওনা যে, ঘুম পেয়েছে নাকি? পেয়েছে তো হাত-পা মেলে শুয়ে পড়। আমিও একটু গড়াব ভাবছি, যা ধকল গেছে সারাদিন! এ বয়সে কি ও সব সয়?" বলিয়া হাতটি ছাড়িয়া দিতেই বধি হাতটি টানিয়া লইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া ঘোমটা আরও আধ হাত টানিয়া দিল।

বর শালমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই এপাশ-ওপাশ করিয়া বধিকে কহিল, "বসে রইলে কেন? শোও না।" বলিয়া বোধ করি প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বধি তেমনই বসিয়া রহিল।

বাহিরে মেয়েরা একে একে সরিয়া পড়িয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল, বাড়ির অন্যান্য লোকজন যে যেখানে পারিল চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সারা বাড়িটা দিনান্তে হাটতলার মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। শুধু বধির বরের নাসিকাধ্বনি, শীতের তীক্ষ্ন-শীতল বাতাসে বাড়ির পাশে অশ্বত্থগাছের আন্দোলিত পাতাগুলোর সরসর শব্দ, একটা রাত্রিচর পাখীর একটানা ডাক, বাড়ির সদর দরজার সামনে স্তূপীকৃত এঁটোপাতার চারিদিকে সমবেত কুকুরগুলোর কলহের শব্দ—নিত্য প্রবহমান জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল। বর ঘুমাইয়া পড়িতেই বধি মাথার ঘোমটা খাটো করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মন এক মুহূর্তে তাহার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিয়া অতীত জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহার পরেশদাদাকে ঘেরিয়া কত আশা ও আনন্দ, কত হাসি ও কান্না, ভাবীজীবনের কত স্বপ্ন দেখা ও কল্পনার তুলিতে কত ছবি আঁকা। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল; কোথায় আসিল সে, কোথায় গেল পরেশদাদা—জীবনে কোন দিন আর বোধ হয় দেখা হইবে না। সেদিন যদি শুধু পা না পুড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইত, যদি পরেশদাদার চোখের সামনে তাহার চোখে জল দেখিয়া সে মরিতে পারিত, তাহা হইলে যাহাকে সে কোন দিন চাহে নাই, তাহারই চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাকে আজ দেহ-মন সঁপিয়া দিতে হইত না।

বধির দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল।

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

কার্তিক-কন্যা কমলারও বিবাহের প্রথম পর্ব শেষ হইয়াছে; বর ও কন্যা বাসরে গিয়া বসিয়াছে। কার্তিক ও কার্তিক-গৃহিণী খুঁতখুঁত করিলেও, পাত্রটি ভালই। বয়স বেশি নয়—পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বাবা-মা বাঁচিয়া নাই, জেঠাইমা মানুষ করিয়াছেন। জেঠা-জেঠাইমারও নিজেদের একঘর ছোট-বড় ছেলেমেয়ে—কাজেই, কার্তিক ঘরজামাই রাখিতে চাহিলে তাঁহাদের আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছেলেটি শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়া কোন এক কোলিয়ারিতে গুদমবাবুর কাজ করে। দেখিতে ঢ্যাঙা, কাহিল; রং ফর্সাই বটে, তবে কয়লাখাদের কড়া জল-হাওয়াতে কাসুচে রং ধরিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘনশ্যাম যে এমন ভাল পাত্র জুটাইয়াছে, এইজন্য পাড়ার লোক ঘনশ্যামকে ধন্য ধন্য করিতেছে।

বাসরঘরে বর ও কন্যাকে ঘেরিয়া পাড়ার মেয়েরা জটলা করিতেছে। শ্রীমতী বরের সামনে বসিয়া কহিল, "কিহে, পছন্দ হয়েছে?" বর হাসিয়া কহিল, "কি ক'রে বলব বলুন? ভাল ক'রে একটিবারও তো দেখতে পেলাম না!" মেয়েরা কোলাহল করিয়া উঠিল; একজন কহিল, "দেখা এত শস্তা নাকি? সামনে হাঁটুগেড়ে ব'সে, গলায় কাপড় দিয়ে, হাত জোড় ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে বল দেখি—'বদন তোল, ঘোমটা খোল চন্দ্রমুখী!'" শ্রীমতী ধমক দিয়া কহিল, "তোরা সব চুপ কর্ দেখি!" কমলার কাছে গিয়া কহিল, "বাসরঘরে বরের সামনে এত ঘোমটা দিতে হয় না, খোল্ দেখি।" বলিয়া ঘোমটাটি সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেই কমলা শ্রীমতীর হাতটি সরাইয়া দিয়া তীক্ষ্ন চাপাস্বরে কহিল, "যাও!" শ্রীমতী বোধ করি কমলার মনের কথা বুঝিল, বরকে কহিল, "ও ভাই, আমাদের সামনে ঘোমটা খুলবে না বলছে—আমরা গেলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খুলিও এখন।" বর হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সে কোলিয়ারিতে চাকরি করে, মেয়েদের ঘোমটা-খোলা বিদ্যা তাহার জানা আছে। তাহাদের খাদের টাইমবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল তাহার। ভারি লাজুক মেয়েটি, দেখিবামাত্র একহাত ঘোমটা টানিত। বউদিদি-দেবর সম্পর্কের জোরে মাস দুই আনাগোনা করিয়া হাতের জল ও পান খাইয়া মেয়েটিকে ঘোমটা খোলাইয়াছিল সে। মেয়েটি শুধু ঘোমটা খুলে নাই—চিরদিনের মত ঘোমটার বালাই তুলিয়া দিয়াছে শেষে। স্বামীর ঘর ছাড়িয়া, হাতের পর হাত বদলাইয়া এখন সে রাণীগঞ্জে স্বাধীন ব্যবসা করিতেছে।

প্রচুর গান, গল্প ও রসিকতার পর মেয়েরা একে একে বিদায় লইল। সকলের শেষে উঠিয়া শ্রীমতী কহিল, "থাক হে দুজনে। চললাম।" বলিয়া মুচকি হাসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঘর নির্জন হইতেই বর কমলার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই কমলা একটু সরিয়া বসিল। বর দুই হাত দিয়া কমলাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই কমলা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিল, "এমন করলে আমি চলে যাব বলছি।" বর ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "ওরে বাবা! এ যে আমাদের ম্যানেজার সাহেবের মত মেজাজ দেখছি! থাক, আর চলে গিয়ে কাজ নেই, কাছেই ব'স, তবে ঘোমটাটা খুলে রাখো দয়া ক'রে—মুখ দেখেই প্রাণটা ঠাণ্ডা করি এখন।" তারপর চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, "একদিন তো ধরা দিতে হবেই।" কমলা বরের দিকে পিছন ফিরিয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

এক হৃদয়হীন পাষাণের কথা ভাবিয়া তাহার রুদ্ধ অশ্রুস্রোত আর বাধা মানিল না।



লৌহিত্যপূর্ব ভূখণ্ডের প্রত্নৈশ্বর্য

ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

১। ময়নামতী পাহাড়ের ভূতত্ত্ব

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের লালমাই ষ্টেশন হইতে ত্রিপুরা জেলার সদর ষ্টেশন কুমিল্লা সহর পর্যন্ত বিস্তৃত দশ মাইল রেলপথের সমান্তরালে, দক্ষিণাংশে রেলপথ হইতে ½ মাইল এবং উত্তরাংশে তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নামতী-লালমাই পাহাড়টি ঐ পথে ভ্রমণকারী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এগার মাইল দীর্ঘ, প্রস্থে উত্তরাংশে অধিকাংশ স্থানেই মাইলখানিক মাত্র। দক্ষিণার্ধ প্রশস্ততর, কোন কোন স্থানে দেড় মাইল, পৌনে দুই মাইল হইবে। পাহাড়ের অনেকগুলি মুড়া বা শিখর, সর্বোচ্চ শিখর প্রায় একশত ফুট উচ্চ। ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযোজনকারী বাদশাহী রাস্তা বা ট্রাঙ্ক রোড চাটগাঁ হইতে সোজা উত্তরে কুমিল্লা পর্যন্ত আসিয়া কুমিল্লা হইতে সোজা পূবে দাউদকান্দি পর্যন্ত গিয়া মেঘনা তীরবর্তী হইয়াছে। দাউদকান্দি নামক বিখ্যাত বন্দরটি প্রকৃতপক্ষে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত, কিন্তু মেঘনা নদের এক শাখার সহিত এই স্থানে গোমতীর মিলন হইয়াছে। তাই দাউদকান্দিতেও গোমতীর এক মুখ বটে, কিন্তু গোমতীর প্রকৃত মুখ মতলববাজার নামক স্থান হইয়া দাউদকান্দির প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণে।

এই কুমিল্লা-দাউদকান্দিগামী বাদশাহী রাস্তা ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত ভেদ করিয়া গিয়াছে। সঙ্গীয় মানচিত্র দেখিলেই সমস্ত স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পাহাড়ের উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর পাহাড়, দক্ষিণাংশের নাম লালমাইর পাহাড়। দক্ষিণ প্রান্তের অদূরে অবস্থিত রেলওয়ে ষ্টেশনটি তদনুসারে লালমাই নাম পাইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, চারিদিকে সমতল ভূমির মধ্যে দেব-নৈবেদ্যের মত স্থিত এই ক্ষুদ্রকায় পাহাড়টি ত্রিপুরার পর্বতমালারই পশ্চিমতম তরঙ্গ। ভূপৃষ্ঠের ক্রমসঙ্কোচনের ফলে ভূমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক প্রাকৃতিক বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সেই নটরাজের তাণ্ডবে সমুদ্রবুকে পর্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং পর্বত মিলাইয়া গিয়া সেই স্থানে সাগর গড়িয়া উঠে। পৃথিবীর জন্ম-দিন হইতে উহার বুকে অনবরত এই প্রকার ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে, সুপরিচিত ভূমিকম্পগুলি সেই ভয়াবহ প্রলয় নৃত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমনি এক প্রলয়ঙ্কর বিক্ষোভের ফলে এক যুগে ভূপৃষ্ঠ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এখন যেখানে হিমালয় পর্বতমালা, সেই যুগে সেইখানে প্রশান্ত মহাসাগরের এক শাখা ছিল। সেই সাগরশাখার তলদেশ ভূতরঙ্গশীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় পর্বতরূপে উন্নীত হইল। হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে এশিয়া মহাদেশের বুক জুড়িয়া ভূতরঙ্গরূপে পর্বতমালা জাগিল। এই তরঙ্গ সমূহের গতি ছিল উত্তর-দক্ষিণ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তের দক্ষিণভাগে ভূতরঙ্গগুলির গতি হইয়াছিল পূর্ব-পশ্চিম; তাহারই ফলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া, নাগা পাহাড়; কাছাড়-ত্রিপুরা-মণিপুর-পার্বত্যচট্টগ্রামের পাহাড়গুলি; ব্রহ্মদেশ ও মলয় উপদ্বীপের পাহাড়গুলির জন্মদান করিল। এই তরঙ্গেরই পশ্চিমতম তরঙ্গ ময়নামতী-লালমাই পাহাড় এবং বীচিবিভঙ্গ ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল-মধুপুরের উচ্চভূমি ও টিলাসমূহ। উত্তর-দক্ষিণগামী ভূতরঙ্গ এবং পূর্ব-পশ্চিমগামী ভূতরঙ্গের সংঘাতে বাঙ্গলা দেশের নিম্ন ভূমির সৃষ্টি,—উহার নিম্নতম অংশগুলিই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছিল। এই বাঙ্গলা দেশের নিম্নভূমি বা গর্তকে, উহার তিন দিকের পর্বতমালা হইতে নিঃসৃত নদীসমূহ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পলি মাটি দ্বারা ভরিয়া বাঙ্গলার সমতল প্রান্তর,—বাঙ্গলার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিলক্ষ্মীকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

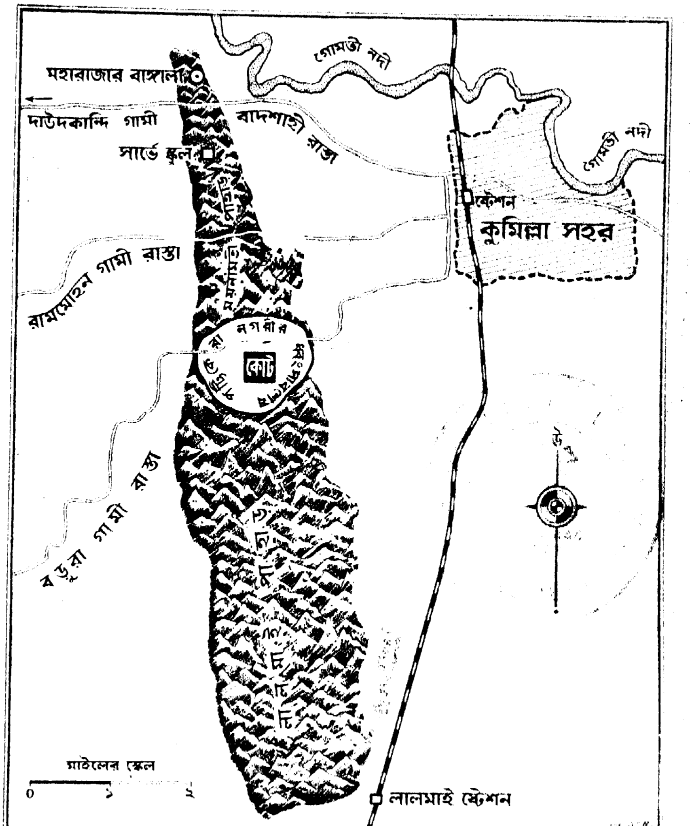
ময়নামতী-লালমাই পাহাড় তাই ভূতত্ত্ব আলোচনায় আনন্দেচ্ছুগণের পরম শিক্ষাপ্রদ বিচরণ ক্ষেত্র। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণতম প্রান্তের শিখরদেশের নাম চণ্ডীমুড়া। উহার উপরে নাতিবৃহৎ একটি চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, চণ্ডীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই মুড়ার অনেক স্থানে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নমুনা ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে, কলিকাতায় বড় যাদুঘরেও নিশ্চয়ই আছে। স্থানীয় লোকে এই প্রস্তরখণ্ডসমূহকে বলে অসুরের অস্থি এবং এগুলির অস্তিত্বকেই চণ্ডীর সহিত এইস্থানে অসুরের যুদ্ধের অকাট্য প্রমাণরূপে উপস্থিত করে। এই প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডগুলি দেখিতে অবিকল এক টুকরা লাকড়ীর মত,—কাঠের আঁশগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। হাতে লইলেই শুধু বুঝা যায়, এ গুলি কাঠ নহে, পাথর। এই অসুরের অস্থি বা ফসিল্ অনেক পাহাড়েই পাওয়া যায়, একমাত্র লালমাই পাহাড়েরই ইহা বিশেষত্ব নহে।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের আর এক ভূতাত্ত্বিক বিশেষত্ব অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কিনা জানি না। ত্রিপুরা মহারাজার বাঙ্গলা ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, ইহার পরেই পাহাড় শেষ। শেষ বটে, এবং ইহার উত্তরেই সমতলভূমির আরম্ভও বটে, কিন্তু শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই। ইহার উত্তরেও অনেক দূর পর্যন্ত, সোজা এক লাইন ধরিয়া ক্রমহ্রীয়মান ক্ষুদ্রতর টিলাসমূহ ধানক্ষেতের মধ্য হইতে কিছু দূরে দূরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ময়নামতী লালমাই পাহাড় স্রষ্টার যেন ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের ডিম্বাকার মালা গাঁথিয়া তৃপ্তি হয় নাই, আবার দুই প্রান্তে দুইটি টিলার ফুলঝুড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছেন। উত্তর প্রান্তের ফুলঝুড়িটি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, দক্ষিণ প্রান্তেও এমনি ফুলঝুড়ি থাকিবার কথা, কিন্তু আমি নিজ চোখে দেখি নাই।

ময়নামতী পাহাড়ে বা উহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতেই যে মানুষের বাস আরম্ভ হইয়াছিল, চট্টগ্রাম পাহাড় হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তর যুগে মানুষ প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিত,

ইহা সকলেরই জানা আছে। ত্রিপুরা চট্টগ্রামের পাহাড়গুলিতে কিন্তু পাথর নাই, এগুলি শুধুই মাটির ঢিপি মাত্র। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে একরকম অত্যন্ত নরম পাথর পাওয়া যায়। যে নীলাভ কৃষ্ণ-মৃত্তিকা জমিয়া ক্রমশঃ কষ্টিপাথরে পরিণত হয়, সীতাকুণ্ডে প্রাপ্ত এই পাথরগুলি তাহারই প্রথম অবস্থা মাত্র। রোদে শুখান এঁটেল মাটির সঙ্গে উহার বিভিন্নতা অল্প। ময়নামতী পাহাড়ের প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডগুলি ইহার অপেক্ষা অনেক শক্ত। প্রস্তর যুগের মানবের ব্যবহৃত, ময়নামতী পাহাড়ের প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত একটি অতি সুন্দর পালিশ করা সূক্ষ্মাগ্র বিন্ধনাস্ত্র চট্টগ্রাম পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছিল, উহা এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগেও ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত অসুরের অস্থি আদিম মানব কাজে লাগাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। এইবার ইতিহাসের যুগের কথায় নামিয়া আসা যাউক।

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে ময়নামতী পাহাড় অদ্যাপি ক্রমবর্ধমান এবং লক্ষ বৎসর পরে হয়ত উত্তর-দক্ষিণের ফুলঝুড়িসমূহ উচ্চতর হইয়া মূল পাহাড়ের সহিত যুক্ত হইবে এবং পাহাড়ের দৈর্ঘ্য অনেকটা বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু বর্তমান মানব সভ্যতার বয়স দশ বার হাজার বৎসর মাত্র, এই অল্পকালে ময়নামতীর পাহাড়ের উচ্চতা বা আয়তনের লক্ষ্যের যোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। কাজেই ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম নিদর্শনও ময়নামতীর পাহাড় হইতে আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তৃতি পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখী এবং সেই সভ্যতার তরঙ্গ ময়নামতী পাহাড়ের গায়ে আসিয়া লাগিতে অনেক দেরী হইয়াছিল। আর্যগণ ময়নামতী পাহাড়ে অথবা তাহার আশেপাশে বসতির অতি সামান্য চিহ্নই রাখিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তারের বিচিত্র ইতিহাস যথাসম্ভব অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রত্নৈশ্বর্য আবিষ্কারের একটা সংক্ষিপ্ত কালানুযায়ী বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।



১। লৌহিত্যপূর্ব ভূখণ্ডে প্রাচীনতম প্রত্ননিদর্শন

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে, সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর ইত্যাদি প্রত্যন্ত রাজ্যের রাজারা মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে "সর্বকর-দান—আজ্ঞাকরণ—প্রণাম এবং আগমন" দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিতেন। কামরূপ বর্তমান আসাম দেশ, ইহা সর্বজনবিদিত। আসামের দক্ষিণার্ধ, নওগাঁ জেলা এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহ প্রাচীনকালে ডবাক নামে পরিচিত ছিল, ইহা প্রথম সপ্রমাণ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়। আমি ১৯১৪ সালের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত A forgotten kingdom of Eastern Bengal নামক প্রবন্ধে প্রথম প্রমাণ করি যে ত্রিপুরা জেলা সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিন বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় মানচিত্র ও নূতন নূতন যুক্তি সহকারে দেখাইয়াছি (আষাঢ়, ১৩৪৮, ৮৫ পৃঃ) যে, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্বস্থ এবং আসাম ও ত্রিপুরার পর্বতমালার দক্ষিণ ও পশ্চিমস্থ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরস্থ সমস্ত সমতল ভূভাগ লইয়া অর্থাৎ বর্তমান কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার পূর্বার্ধ এবং ঢাকা জেলার প্রাচীন লৌহিত্যের পূর্বস্থ কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া প্রাচীন সমতট রাজ্য গঠিত ছিল। জানিতে পারিলাম, আমার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করার অপরাধে সম্প্রতি এই মত-বিরোধী পরীক্ষকগণ কর্তৃক ডক্টরেটের একটি থিসিস্ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। কাজেই এই বিষয়টি সাবধানতা সহকারে আলোচনার যোগ্য। এই আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া এই স্থানে শুধু এইটুকু জানিলেই হইবে যে, সমুদ্রগুপ্তের আমলেও অর্থাৎ ৩৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়েও সমতট বা ত্রিপুরা জেলা উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বহির্ভূত, প্রান্তস্থিত ম্লেচ্ছ রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই ইহার পূর্ববর্তী কালের আর্য সভ্যতা সংশ্লিষ্ট কোন প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার ত্রিপুরা জেলা হইতে বড় সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাও সম্ভব হইয়াছে, এবং প্রচুর না হইলেও, এই অঞ্চল হইতে প্রাক্‌-গুপ্ত যুগের অন্ততঃ দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রত্ন নিদর্শনের আবিষ্কারের বার্তা আমরা জানি।

ক। ময়নামতীতে মৌর্য যুগের কার্ষাপণ আবিষ্কার

যে স্থানে প্রাচীন লৌহিত্য হইতে লক্ষ্যা নদী বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানের নাম লাখপুর। এই স্থানে বানার বা প্রাচীন বানহার নদ আসিয়া লৌহিত্যে পড়িয়াছে, এবং তাহাই পরে শীতললক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণে বাহিয়া গিয়া নারায়ণগঞ্জ সহরের নিম্নে ধলেশ্বরী নদীতে পড়িয়াছে। বানহার নদের নাম লক্ষ্মণ সেনের ভাওয়াল-তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই তাম্রশাসনখানি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লাখপুরের পশ্চিম-উত্তরস্থ, বানারের পশ্চিম পারে অবস্থিত কাপাসিয়া নামক বিখ্যাত গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে রাজাবাড়ী

গ্রামে পাওয়া যায়। (J.A.S.B., 1942, P. 1 ff. দ্রষ্টব্য)।

বানার নদ ব্রহ্মপুত্রের বান হরণ করিয়া জামালপুরের কিছু নীচে জন্মগ্রহণ করিয়া, মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম দিয়া বহিয়া, বহু দূর পর্যন্ত ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার সীমানা-রূপে পশ্চিম হইতে পূর্বে বহিয়া, ত্রিমোহিনী নামক স্থানে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, লাখপুরে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। শীতললক্ষ্যা নদী বর্তমানে ইহারই দক্ষিণাভিমুখী সম্প্রসারণ মাত্র। বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশের পূর্ব ও পশ্চিম ধারে ভাওয়ালের টিলাময় অঞ্চলগুলি অবস্থিত। প্রাচীনকালে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ এই টিলাময় স্থান ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইত। ময়নামতী-লালমাই পাহাড় যেমন ক্রমবর্ধমান, ভাওয়ালের টিলাগুলি তেমনি ক্রমবর্ধমান হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যে এই টিলাগুলি ভেদ করিয়া সোজা দক্ষিণে না নামিয়া ক্রমশঃ এই অঞ্চলের উত্তর প্রান্তবাহী ও পূর্বাভিমুখী হইয়া ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদের সহিত মিলিতে বাধ্য হইয়াছে, এই ব্যাপারও টিলাগুলির অতি ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধনেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশের পূর্বে আরও দুইটি স্বাভাবিক জলপ্রবাহ দেখা যায়। প্রথমটির নাম পাহাড়িয়া নদী। দ্বিতীয়টির নাম আড়িয়ল খাঁ। ভাওয়াল-টিলার ক্রমবর্ধনের ফলে ব্রহ্মপুত্র পূর্বদিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, সম্ভবতঃ এই পাহাড়িয়া নদী ও আড়িয়ল খাঁ নদীই ক্রমান্বয়ে উহার প্রধান খাতে পরিণত হয়। ভৈরববাজারগামী খাতের জন্ম হয় ইহারও পরে। সকলেই জানেন, ভৈরববাজারগামী খাতও বর্তমানে শুষ্কপ্রায়, ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে মধুপুর-ভাওয়াল অঞ্চলের পশ্চিম দিয়া যমুনা খাতে প্রবাহিত।

ভাওয়াল-মধুপুর অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিকগণ বলেন Older alluvium বা প্রাচীনতর পলি গঠিত অঞ্চল। সুপ্রাচীন কালে বর্ষা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত এবং নিম্নবঙ্গের সমস্ত স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইত, তখন ভাওয়াল অঞ্চল জলের উপরে থাকিত। প্রধানতঃ এই গুণেই পূর্বভারতে আর্য সভ্যতা প্রসারের অতি প্রাচীন যুগ হইতে এই লৌহিত্য, পাহাড়িয়া ও আড়িয়ল খাঁর পারে পারে জন-বসতি আরম্ভ হইয়াছিল। আড়িয়ল খাঁর তীর-বর্তী মরজাল গ্রাম হইতে কয়েক বৎসর আগে মৌর্য যুগের বহুতর রৌপ্য মুদ্রা বা কার্ষাপণ আবিষ্কৃত হয়। আমি বহু চেষ্টায় উহাদের ৯০টি ঢাকা যাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই স্থান লাখপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্বে এবং এই স্থানে মৌর্য যুগের মুদ্রার আবিষ্কার হইতে বুঝা যায়, কত প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। লৌহিত্যকে আমরা সমতটের পশ্চিম সীমানা ধরিয়াছি, কাজেই এই স্থানকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে।

লৌহিত্যের পূর্ব পারে অবস্থিত এগার-সিন্ধু নামক স্থানটির নামার্থ মনোযোগ সহ-কারে বোধিতব্য। এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পারে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে। এই স্থানে একা-দশটি নদী একত্র মিলিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছিল এগার-সিন্ধু। নদী অর্থে সিন্ধু শব্দটির ব্যবহার বৈদিক যুগেই হইত, কাজেই এই নামটিই এই স্থানের প্রাচীন-ত্বের সাক্ষী। আড়িয়ল খাঁর তীরবাসিগণ মৌর্য যুগে যখন কার্ষাপণ ব্যবহার করিত, প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের সমগ্র নৌ-বাণিজ্য যখন বিশাল লৌহিত্যের বক্ষ বাহিয়া সমুদ্রে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চলাচল করিত, সেই সময়েই এগারটি মোহনার উপরে অবস্থিত এই লক্ষ্মীমন্ত স্থানটি এই নাম পাইয়া থাকিবে। এই নামটি এবং এই অঞ্চলের গ্রামের নামের মধ্যে সিংহশ্রী, বসুশ্রী ইত্যাদি নাম দেখিয়া এই অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তারের বয়স অনুমান করা যায়। প্রাচীন লৌহিত্য ও আড়িয়ল খাঁ নদের মধ্যবর্তী পাহাড়িয়া অঞ্চল শুধু ভূতাত্ত্বিকেরই বিপুল অনুসন্ধান ক্ষেত্র নহে, মরজালে কার্ষাপণ আবিষ্কার হইতে বুঝা যায় যে, ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরও অতি লোভনীয় অনুসন্ধান-ক্ষেত্র। অথচ বলিতে গেলে এই অঞ্চলে অদ্যাবধি কোন অনুসন্ধানই হয় নাই।

খ। শিলুয়ায় ২য় খৃঃ পূঃ-র লিপি আবিষ্কার

সমতটে প্রাক্ গুপ্ত যুগের দ্বিতীয় নিদর্শনটি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। নোয়াখালি জেলার ছাগলনাইয়া থানাটির আকৃতি ভারি চমৎকার। সমগ্র নোয়াখালি জেলায় আর কোথায়ও পাহাড় নাই, কিন্তু এই স্থানে পার্বত্য ত্রিপুরার পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দুইটি শৈলশ্রেণী যেন কুমীরের দীর্ঘ ও দন্তবহুল দুইটি ঠোঁটের মত ছাগল-নাইয়া থানাটিকে মুখে পুরিয়া অবস্থান করিতেছে। কাজেই সহজেই বোধগম্য যে, দুই ধারে পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত এই স্থানটী বেশ প্রাচীন স্থান। সমগ্র নোয়া-খালী জেলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ডাকাতিয়া ফেণী বাহিত পলি দ্বারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবার পূর্বেও, এই পর্বতমালাবেষ্টিত স্থানটিতে লোক-বসতি হইবার কথা। আর্য সভ্যতা প্রসারের আদি যুগেও এই স্থানেই হয়ত প্রথম উহা প্রসৃত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অনুমানের সমর্থক প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণও মিলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ফেণী বলিয়া পরিচিত আধুনিক মহকুমা সহরটির মাইল তিনেক পূর্বে ছাগলনাইয়া থানার সীমানার মধ্যে, শিলুয়া নামে একটি বিস্তৃত স্থান আছে। উত্তর শিলুয়া, মধ্য শিলুয়া, দক্ষিণ শিলুয়া ইত্যাদি নামে এই প্রকাণ্ড গ্রামটি বিভক্ত। এই গ্রামে ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের ভূতপূর্ব সর্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশী-নাথ দীক্ষিত মহাশয় খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের লিপি যুক্ত একটি মূর্তির পাদপীঠ আবিষ্কৃত করেন। এই আবিষ্কার স্থানটি বর্তমানে আইন অনুসারে সংরক্ষিত বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য এই স্থানে খননাদি আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রত্নবিভাগ এই আবিষ্কারের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা ব্যতীত, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্বন্ধে এপর্যন্ত আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। এমন কি লিপিটি যে সত্যই দ্বিতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দের সেই সম্বন্ধে কোন প্রমাণও অদ্যাবধি প্রকাশিত করেন নাই। তাই এই আবিষ্কার সন্দেহ-সমাকুল হইয়া রহিলেও, ফেণী অঞ্চলের বিদ্বজ্জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহার বার্তা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

৩। পরবর্তীকালের প্রত্ননিদর্শনসমূহ

ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-গুলির কালপর্যায় অনুসারে সজ্জিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। **মহারাজাধিরাজ বৈন্য গুপ্তের তাম্র-শাসন।** এই তাম্রশাসনখানি বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই তাম্রশাসন-খানির আবিষ্কর্তা। ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুণাইঘর গ্রামে ১৯২৫ সনে এই তাম্র-শাসনখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩০ সনের Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসনখানি গুপ্তাব্দের ১৮৮ সনে অথবা ৫০৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্র-শাসন দ্বারা মহারাজা বৈন্য গুপ্ত সামন্ত মহারাজা রুদ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত এক বৌদ্ধবিহারে এগার পাটক অথবা ৪৪০ দ্রোণ ভূমি দান করেন। প্রদত্ত ভূমির এক সীমানায় গুণিকাগ্রহার গ্রামের উল্লেখ আছে। ইহাই যে বর্তমান গুনাইঘর গ্রাম, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য এই যে, সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকালে যে সমতট রাজ্য প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল, তাহা এখন মহারাজাধিরাজ বৈন্য গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সামন্ত মহারাজ রুদ্র দত্তের বিহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া জানা যায়, তিনিই এই সময় এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বৈন্য গুপ্তের ৫০৮ খৃষ্টাব্দে এই ভূমি দানের ৪০।৪২ বৎসরের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়, এবং পূর্ব ভারত হইতে গুপ্ত শাসন লোপ পায়। সেই স্থানে ক্রমান্বয়ে আমরা ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক মহারাজাধিরাজ উপাধি-

ধারী তিনজন সম্রাটপদাভিমানী রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। লৌহিত্যের পূর্ব পারে ইহাদের শাসন সীমা প্রসৃত ছিল, এমন কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। লৌহিত্যের পূর্বেস্থিত ভূখণ্ডে তখন প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বরের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর (পঞ্চখণ্ড) শাসনে দেখা যায়, পঞ্চখণ্ড পরগণায় তিন শতেরও অধিক ব্রাহ্মণ ভাস্করের পঞ্চম পূর্বপুরুষ ভূতি বর্মা স্থাপিত করেন। সেই তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কর্ণসুবর্ণ রাজধানীতে থাকিয়া ভাস্কর বর্মা পুনরায় তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণের অধিকার স্বীকার করেন। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মা দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ভূতি বর্মা নিজেও একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলায় ভূতিবর্মার সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার দেখিয়া বুঝা যায়, ত্রিপুরা নোয়াখালিও বাকী ছিল না, এবং সমগ্র সমতট প্রদেশেই প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। আসামের পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার প্রশংসনীয় প্রত্নোৎসাহসম্পন্ন শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় কিছুদিন পূর্বে ভূতি বর্মার একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ইহার পাঠ আমি আষাঢ়, ১৩৪৮-এর "ভারতবর্ষ" পত্রে প্রকাশিত করি। ইহার তারিখ ৫৫৪ খৃষ্টাব্দ। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মার দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বাহ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মনে হয়, ভূতি বর্মার পিতামহের আমলেই সমতট অধিকৃত হইয়া থাকিবে এবং বৈন্য গুপ্তের ৫০৮ খৃষ্টাব্দে গুণাইঘরের সংলগ্ন গ্রামে ভূমি দানের পরে, ক্রমহ্রীয়মানশক্তি গুপ্ত রাজগণের শাসন লৌহিত্যের পূর্ব পারে দ্রুত লুপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সমাচার দেবের শাসন লুপ্ত হইলে পূর্ব ভারতে শশাঙ্কের অভ্যুদয়। শশাঙ্ক বেশ প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ভারতের সম্রাট পদবী বাচাই হইয়াছিলেন। গাঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা ও বিহার তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শশাঙ্কের অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা হইতে তাঁহার দুইখানা তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া উত্তরাপথের সম্রাট হর্ষবর্ধন বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ভাস্কর বর্মা বাঙ্গলা দেশ অধিকার করেন এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে তাম্রশাসন প্রচার করেন। সমতটে আগে হইতেই প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজগণের অধিকার ছিল, এইবার বাঙ্গলা দেশেও তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইল।

হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মের মৃত্যুর পরে পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে জয়নাগ নামক একজন রাজার অস্তিত্বের পরিচায়ক তাম্রশাসন ও স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে জয়নাগ শশাঙ্কের পূর্ববর্তী রাজা।

এই সময়ের অব্যবহিত পরে, পর-গুপ্ত বংশের আদিত্য সেন যখন মগধে রাজা, তখন সমতটে এক নূতন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাই খড়্গ বংশ।

২। দেবখড়্গের আশ্রফপুর তাম্রশাসনদ্বয়

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পারে অবস্থিত লাখপুর নামক স্থানটির পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। লাখপুর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আশ্রফপুর গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি পুরানা মাটির ঢিপি কাটিতে এই তাম্রশাসন দুইখানা এবং কয়েকটি ধাতুময় ছোট চৈত্য পাওয়া যায়। একখানি তাম্রশাসনের পাঠ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উদ্ধার করেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির স্মারিকা পত্রিকার (Memoir) প্রথম খণ্ডে, ১৯০৫ সনে, অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান প্রত্নতাত্ত্বিক গঙ্গামোহন লস্কর মহোদয় দুইখানি তাম্রশাসনেরই পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসন দুইখানি দ্বারা মহারাজাধিরাজ দেবখড়্গ স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে ভূমি দান করেন। প্রথম তাম্রশাসনখানিতে মহারাণী প্রভাবতী ও রাজপুত্র রাজরাজ ভট্টের উল্লেখ আছে। দুইখানি তাম্রশাসনই জয়কর্মান্ত বাসক হইতে প্রদত্ত। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধে এই স্থানকে আমি বর্তমান বড়কামতা বা চান্দিনা বলিয়া অনুমান করি। সম্প্রতি দেখিতে পাইলাম, লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়কামতা নামে একটি গ্রাম আছে। এই স্থানে কোন প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আছে কি না অনুসন্ধেয়। এই তাম্রশাসনদ্বয়ের সহিত দেবখড়্গ-মহিষী মহারাণী প্রভাবতীর লিপিটিও বিবেচ্য।

৩। দেউলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত মহারাণী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত সর্বাণী মূর্তি

কুমিল্লা সহরের ১৪ মাইল দক্ষিণে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার উপর দেউলবাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে অনেক বৎসর আগে এই মূর্তিখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯২০ সনে এই মূর্তিখানি কুমিল্লায় আনীত হইলে ইহার পাদপীঠের লিপি অনুসন্ধিৎসুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত এপিগ্রাফিয়াইণ্ডিকা পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডে ৩৫৭-৩৫৯ পৃষ্ঠায় এই মূর্তির বিবরণ ও লিপির পাঠ আমি প্রকাশিত করিয়াছি। লিপিতে দুইটি শ্লোকমাত্র। প্রথম শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, খড়্গোদ্যম নামে একজন নৃপাধিরাজ ছিলেন, তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ, জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ। তাঁহার রাজ্ঞী মহিষী মহাদেবী শ্রীপ্রভাবতী, ভক্তিসহকারে সর্বাণী প্রতিমাকে সোনা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্বাণী অষ্টভূজা ও দণ্ডায়মানা, প্রায় হাত খানিক উচ্চ, নীচে বাহন সিংহ। দুই ধারে দুই অনুচরী। প্রতিমার গায়ে স্থানে স্থানে সোনা লাগিয়া ছিল। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ চণ্ডীমুড়ার মন্দিরে লইয়া মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তথা হইতে মূর্তিখানি চুরি যায়। কিছুদিন আগে শুনিতে পাইয়াছিলাম, মূর্তিখানি নাকি আবার পাওয়া গিয়াছে।

সমতট রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রাপ্ত খড়্গ বংশের এই তিনখানি লিপি হইতে খড়্গ রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন সঙ ৬৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সমতটে আসিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক পরিব্রাজক ৬৭৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সমতটে আসিয়া উহার সিংহাসনে রাজভট্টকে দেখিতে পান। কাজেই হিউএন সঙ দেবখড়্গের বা তাঁহার পিতার সময়ে সমতটে আসিয়াছিলেন। দেবখড়্গের তাম্রশাসনে এক "বৃহৎ পরমেশ্বর" প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর ভাস্কর বর্মা হইবারই সম্ভাবনা। কারণ এই সময়ের অনেক পূর্ব হইতেই এই অঞ্চল প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরগণের পূর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

৪। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন

সমতটের দক্ষিণার্ধে অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি জেলা জুড়িয়া যখন খড়্গ বংশের রাজত্ব চলিতেছিল, তখন (৭ম শতাব্দ) উহার উত্তরার্ধে শ্রীহট্ট কাছাড় জেলায় যে ভিন্ন বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বা নিটকবর্তী কালে ত্রিপুরা মহারাজার জমিদারী ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Mr. MacMinn একখানি তাম্রশাসন বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিবার জন্য শাসনখানি এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ধার লইয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুর পরে তাঁহার পিতা শাসনখানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে কিছুদিনের জন্য ধার দেন। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় তখন ইহার পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে সেই পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসনখানি সপ্তম শতাব্দের কুটিলাক্ষরে লিখিত। এই শাসন হইতে আমরা লোকনাথ নামক একজন সামন্ত নরপতির পরিচয় জানিতে পারি। লোকনাথ শাসনে পিতার নাম করেন নাই। মাতার নাম গোত্র দেবী। গোত্রদেবীর পিতা কেশব ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান, জাতিতে পারশব বলিয়া উল্লিখিত।

এই পারশবের দৌহিত্র লোকনাথের একজন ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত ছিলেন প্রদোষ শর্মা। তিনি সুবুংগ বা সুব্বুংগ বিষয়ে "কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবি ভুখণ্ডে" যেখানে—"মৃগ-মহিষ-বরাহ-ব্যাঘ্র-সারসৃপাদি" নিজেদের বাড়ী ঘর করিয়া সুখে যথেচ্ছ বাস করিতেছে সেইখানে, অনন্ত নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া আবেদন করিলে লোকনাথ এই মন্দিরের জন্য এবং সেই স্থানবাসী ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড দান করেন। সান্ধিবিগ্রহিক প্রশান্তদেব এই দানকর্ম দলিল সম্পাদনাদি দ্বারা সুসম্পন্ন করাইয়া দেন। ব্রাহ্মণগণের নাম ও কে কত জমি পাইবে তাহা শাসনে উল্লিখিত আছে। মোট জমির পরিমাণ বহু শত দ্রোণ এবং বর্তমান মাপের দুই তিন বর্গ মাইল জুড়িয়া উহা অবস্থিত ছিল।

লোকনাথ সম্বন্ধে নিম্ন তথ্যগুলি অবগত হওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে বীর্যবান ও সাহসী ছিলেন, তাঁহার অনেক অশ্বসাদী সৈন্য ছিল। পরমেশ্বর অর্থাৎ সার্বভৌম নরপতি, যিনি লোকনাথের অধিরাজ ছিলেন, তিনি লোকনাথের সহিত সংঘর্ষে অনেকবার সৈনিক ক্ষয় করিয়াছেন, কিন্তু লোকনাথকে অধিকারচ্যুত করিতে পারেন নাই। জয়তুঙ্গবর্ষ নামক স্থানের দুর্লংঘ্য যুদ্ধে লোকনাথের আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া দেখিয়া এবং লোকনাথের নানারূপ প্রশংসা শুনিয়া জীবধারণ নামক নরপতি মন্ত্রিগণের পরামর্শে লোকনাথের সৈন্য এবং বিষয় কোনটাতেই হাত দিলেন না।

এই শাসন প্রদত্ত ভূমি কোথায়, সুবুঙ্গ এবং জয়তুংগবর্ষ কোথায় তাহা প্রায় ত্রিশ বছর ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছি, বঙ্গের অন্যান্য প্রত্নপ্রেমিক পণ্ডিতগণও করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। এত দিনে যেন উহার সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাচীন আমলে মহাযানী বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি বৌদ্ধ গৃহস্থের ঘরে ঘরে এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহে রক্ষিত হইত। এই গ্রন্থের বহু হাতের লেখা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের একখানা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, উহা ১০১৫ খৃষ্টাব্দের নকল। আর একখানা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বর্তমান কালের কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের শিব, গৌহাটীর নিকটস্থ কামাক্ষ্যা দেবী, চন্দ্রনাথের শিব ইত্যাদির মত সেই আমলেও বিখ্যাত বিখ্যাত দেবস্থান ও দেবদেবী মূর্তি ছিল। ঐ প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি দুইখানিতে স্থানের নামসহ ঐ সমস্ত দেবদেবীর ছবি দেওয়া আছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসে তাঁহার বৌদ্ধ-মূর্তি তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই সমস্ত লেবেলযুক্ত দেবদেবীর ছবির তালিকা দিয়াছেন, কতকগুলির ছবিও দিয়াছেন। মদীয় মূর্তি তত্ত্বের পুস্তকেও পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মূর্তির বর্ণনা ও ছবি দেওয়া আছে। এই তালিকায় দেখা যায়, সমতটে জয়তুংগ নামক স্থানে একটি বিখ্যাত লোকনাথ মূর্তি ও মন্দির ছিল। ত্রিপুরা শাসনের জয়তুঙ্গবর্ষ এবং এই লোকনাথের মন্দিরের অধিষ্ঠানভূমি জয়তুংগ নামক স্থান যে এক স্থান নহে, এমন কোন প্রমাণ নাই। এই জয়তুংগবর্ষ লোকনাথের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়। লোকনাথের শাসনের অক্ষর এবং দেবখড়্গের শাসনের অক্ষর একই সময়ের, কাজেই ইহারা দুইজনে সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। খড়্গদের অধিকৃত সমতটের অংশ ত্রিপুরা নোয়াখালি জুড়িয়া ছিল। কাজেই লোকনাথের রাজ্য সমতটের অপর অংশ শ্রীহট্ট কাছাড় হইবার সম্ভাবনা। এই যুক্তিপরম্পরা অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া নজরে পড়িল, শীলচরের ১৪ মাইল উত্তরে দুলু নদীর এক শাখার নাম সুবংগ গাঙগ। শীলচর সহরটি বরাক নদীর উপরে অবস্থিত। এই সহরের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জাটিংগা নদী উত্তর হইতে আসিয়া বরাকে পড়িয়াছে। এই মিলন স্থানের আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে দুলু বা সুবঙ্গ গাঙ্গ আসিয়া জাটিংগাতে পড়িয়াছে। শীলচরের আট মাইল উত্তরে আবংগ নামে স্থান, ১১ মাইল উত্তরে জাটিংগা নামক স্থান। আবঙ্গের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বামনীপাড়া নামক স্থান, প্রাচীন ব্রাহ্মণ বসতির স্মারক। জাটিংগাই জয়তুংগ এবং স্থানের নামে নদীর নাম হওয়ার সম্ভাবনায় সুবংগ নামটি সুবুংগ বিষয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চিত হইবার পূর্বে ইহার বেশী আর জোর করিয়া বলা চলে না।

ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্য ভাগে প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম্রাট ভূতি বর্মা শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে তিন শতাধিক ব্রাহ্মণ বসাইয়া তথায় আর্য সভ্যতার এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার শত বৎসর পরে, খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দের মধ্য ভাগে দেখিতে পাই, সামন্তরাজ লোকনাথ পঞ্চখণ্ডের ৩০ মাইল পূর্বে জাটিংগা-দুলু-সুবংগ গাঙ্গের উপত্যকায় অনন্ত নারায়ণের মন্দিরে এবং ব্রাহ্মণ পালনের জন্য ভূমি দান করিয়া সেই আর্য সভ্যতা প্রসারের সহায়তাই করিয়া চলিয়াছেন। এই অপূর্ব হিন্দু মিশনের কার্য এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়া আমরা আর্যসভ্যতার পূর্বাভিমুখী প্রসারের গতি লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। শীলচরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সুবিখ্যাত তীর্থ ভুবন পাহাড়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি এবং অদ্ভুতনির্মাণ সুদীর্ঘ পর্বতগুহা ও সুড়ঙ্গ কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি।

লোকনাথের অধিরাজ জীবনধারণ নৃপের অন্য কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মের বংশীয় ছিলেন, ভাস্কর বর্মের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দে কাছাড় হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালি পর্যন্ত ভূভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইলাম। কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জয়তুঙ্গ বা বর্তমান জাটিংগা উপত্যকা পর্যন্ত যে সমতট দেশ বিস্তৃত ছিল, তাহারও একটা আভাস পাওয়া গেল।* পূর্ব ভারতের বাকী অংশ অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলার প্রাচীন নাম ছিল হরিকেলা মণ্ডল। চীনা পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে কয়েকবার হরিকেল নামে এই দেশের উল্লেখ আমরা পাই। উত্তর সমতটে যখন লোকনাথের বংশ, দক্ষিণ সমতটে যখন খড়্গ বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তখন বা তাহার অব্যবহিত পরে হরিকেলা মণ্ডলে কান্তিদেব নামক একজন রাজার অস্তিত্বের কথা আমরা জানিতে পারি।

৫। কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ শিকদার মহাশয় চট্টগ্রাম সহরের বড় আখড়া নামক মন্দিরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই শাসনখানি আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ সনে ইহা ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হয়। ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির একটি চিত্র সম্বলিত পাঠ প্রকাশিত করেন। ইহা একখানি অসমাপ্ত তাম্রশাসন, ইহাতে রাজবংশাবলি অংশ আছে কিন্তু দানাংশ নাই। বর্ধমানপুর নামক রাজধানী হইতে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব এই শাসনখানি প্রচার করিতেছেন। বর্ধমানপুর কোথায় ছিল অদ্যাবধি জানা যায় নাই। ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির প্রাপ্তিস্থান এবং হরিকেল দেশের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলের ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, অথচ তিনি নিজেকে মহারাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন নাই। সমতটের দেবখড়্গও মহারাজাধিরাজ! এই যুগের পরেই একশত বৎসর বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া পূর্ব ভারতে অরাজকতা চলিয়াছিল। কামরূপ রাজগণ দুর্বল হইয়া

---

* লোকনাথের পরে কাছাড় শ্রীহট্ট অঞ্চলের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে জানা যায় ১১শ—১২শ শতাব্দে এই অঞ্চলে গোবিন্দ-কেশব দেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১৯শ খণ্ড।

পাঠাইয়াছিলেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে কামরূপে ভাস্কর বর্মের বংশের শাসন লুপ্ত হয় এবং ম্লেচ্ছরাজ শালস্তম্ভ কামরূপ অধিকার করেন। ফলে পূর্ব ভারতে অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আর অবধি রহিল না। অবশেষে ৭৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বৎসরে বাঙ্গলার উত্যক্ত জনসাধারণ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করিয়া পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলে পূর্ব ভারতের এই ভয়ানক অবস্থা দূর হয়। লৌহিত্যের পূর্বে পাল বংশের শাসন প্রসৃত হইয়াছিল কি না জানিবার কোন উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। হইয়াছিল বলিয়াই বর্তমানে ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ ৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রতিহার সম্রাট মহেন্দ্র পাল যখন প্রবল হইয়া বাঙ্গলা-বিহারব্যাপী পাল রাজ্য অধিকার করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে লৌহিত্যের পূর্বে পারেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর হইতে মহেন্দ্র পালের ৫ম বৎসরের লিপি পাওয়া গিয়াছে এবং মহেন্দ্র পাল-পুত্র মহীপালের দুইখানি লিপি ত্রিপুরা জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬। মহীপালের বাঘাউড়া লিপি

মহীপালের লিপিযুক্ত একখানি বিষ্ণু মূর্তি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার বাঘাউড়া গ্রামে একটি পুরাতন পুকুর হইতে মাটি তুলিতে আবিষ্কৃত হয়। ঢাকার প্রত্নোৎসাহসম্পন্ন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি-টি মহোদয়ের চেষ্টায় ১৯১৪ সনে ঢাকায় উহার ফটোগ্রাফ আনীত হয় এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় মূর্তির পাদপীঠস্থ লিপির এক পাঠ প্রকাশিত করেন। পরের মাসে আমি এক সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করি। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডে আমার এই পাঠ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিপির মর্ম এই যে, মহীপালের তৃতীয় রাজ্যসম্বতে সমতটে বিলকিন্দক গ্রামনিবাসী বসুদত্ত পুত্র বণিক্ লোকদত্ত মাতা, পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় এই নারায়ণভট্টারক নামক কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই লিপির সহিত মহীপালের অপর লিপিখানিও বিবেচ্য।

৭। মহীপালের নারায়ণপুর শিলালিপি

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মতলব থানার অধীন নারায়ণপুর গ্রামে পুরানা পুকুর ঝালাইতে একখানি লিপিযুক্ত গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৫০, শ্রাবণের প্রবাসীতে এই লিপির পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। লিপিখানি মহীপালের চতুর্থ রাজ্যসম্বতের অর্থাৎ ৯৯২ খৃষ্টাব্দের। সমতটের বিলিকন্দক গ্রাম-নিবাসী জম্ভল মিত্রের পুত্র বণিক বুদ্ধ মিত্র মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রথম লিপির বিলকিন্দক এবং দ্বিতীয় লিপির বিলিকন্দক নাম সাদৃশ্যে এক গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। বাঞ্ছারামপুরের কিছু পশ্চিমে রেল লাইনের ধারে বিলকেন্দুয়া বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাম ধনী বণিকগণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। কোন প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে কি না অনুসন্ধেয়। সম্ভবতঃ এই গ্রামেরই দুইজন ধনী বণিকের কীর্তি এই দুইখানি লিপিযুক্ত মূর্তি। এই লিপি দুইখানি সমতটের অবস্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইরকম আরও কত লিপি যে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, কে জানে? ত্রিপুরা জেলায় যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে পূর্ণ ও স্থায়ী প্রত্নানুসন্ধান চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। পরলোকগত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় এই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। কুমিল্লায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, শ্রীকাইলে সম্প্রতি আর একটি কলেজ হইয়াছে। হাইস্কুলের তো অভাবই নাই। কিন্তু প্রত্নে দরদ কোথাও দেখিতেছি না।

এই দুইখানি লিপি হইতে জানা গেল, খৃষ্টাব্দের ৯৯১ এবং ৯৯২তে ত্রিপুরা জেলা প্রতিহার মহীপালের উত্তর ভারতব্যাপী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ পাল রাজ্যের অন্তর্গত রূপেই, পাল রাজা প্রতিহার সম্রাটের পদানত হওয়ায় পাল রাজ্যের এই অংশও প্রতিহার অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য, তাহা নাও হইতে পারে। লৌহিত্যের পশ্চিম পার পর্যন্ত অধিকার করিয়া প্রবল প্রতাপ প্রতিহার সম্রাট লৌহিত্যের পূর্বে পারস্থ পূর্ব ভারতের বাকি অংশটুকুও অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন।

প্রতিহার সম্রাটের এই আঘাত হইতে পাল রাজ্য উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্মপাল-দেবপালের দিন আর ফিরিয়া আসে নাই। পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ববঙ্গে তাহাদের প্রভাব একেবারে কমিয়া গেল। ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি লিপি হইতে জানা যায়, প্রতিহার শাসন লোপের পরেই চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণের অধিকার ত্রিপুরা জেলায় বদ্ধমূল হইয়াছিল। বঙ্গেও বিক্রমপুরকে রাজধানী করিয়া, এই যুগেই শ্রীচন্দ্রের বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। লয়হচন্দ্রের ভারেল্লা নর্তেশ্বর মূর্তিলিপি

এই লিপিখানির আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়। ত্রিপুরা জেলার প্রত্নসম্পদ উদ্ধারে বৈকুণ্ঠবাবু অদ্যাপি অক্লান্ত উৎসাহসম্পন্ন। ১৯১১ সনে আমি কুমিল্লা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া যাই, তখন বৈকুণ্ঠবাবু এই লিপির ছাপ আনিয়া আমার হাতে দেন। ইহা প্রতিভা পত্রিকায় এবং ১৯১৪ সনের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় A Forgotten Kingdom of East Bengal নামক মদীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ১৯১৫ সনে আমার সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয়। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডে ইহা আবার প্রকাশিত হয়।

এই লিপির মর্ম এই যে, শ্রীমল্লয়হচন্দ্র দেবের অষ্টাদশ সম্বৎসরে কর্মান্তপাল শ্রীকুসুম দেবের পুত্র ভাবু দেব কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে এই নর্তেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অক্ষয় তত্ত্বের বিচারে এই লিপি ১০০০ খৃষ্টাব্দের যুগের। জ্যোতিষিক বিচারে যে সমস্ত বৎসরে এই সমস্ত তিথি নক্ষত্র বারের মিলন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯৮৩ খৃষ্টাব্দই এই লিপি সম্পাদন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার বৎসর বলিয়া সম্ভবপর মনে হয়।

সমসাময়িক যুগে বঙ্গে বিক্রমপুর রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচন্দ্র নামক নরপতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। শ্রীচন্দ্রের অদ্যাবধি চারিখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, দুইখানা ফরিদপুর জেলায় ইদিলপুরে এবং কেদারপুরে। দুইখানা ঢাকা জেলায়, রামপালে এবং ধুল্লা নামক গ্রামে। বংশধারা এইরূপঃ—পূর্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিলেন—"আধারো হরিকেলরাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াম্"—হরিকেল রাজের রাজচিহ্ন যে ছত্র, তাহা যে লক্ষ্মী স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত করিতেন, তাহার আধারস্বরূপ ছিলেন। এবং দিলীপের মত তিনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজা হইয়া পৃথিবী একাতপত্র করিয়াছিলেন।

ইহার পরে বঙ্গের আর একজন রাজার সংবাদ আমরা জানিতে পারি। ইঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্র। চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল পূর্ব ভারত জয়ে আসিয়া ১০২৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই ১০২৩ খৃষ্টাব্দের এধারে ওধারে ইঁহার রাজত্বকাল। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত লিপিযুক্ত দুইখানি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একখানি সূর্যমূর্তি, হাতিয়া কি সোনদ্বীপে আবিষ্কৃত, বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বতের। অপরখানি বিষ্ণুমূর্তি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় বেতকা গ্রামে আবিষ্কৃত, বর্তমানে আউটশাহী গ্রামে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের ২৩ সম্বৎসরে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দচন্দ্র ১০০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী বৎসরে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিলে তাঁহার পূর্ববর্তী

A New Home for an Old Quest

IT has always been a Goodyear working principle that nothing is good enough which can be made better.

And it has been Goodyear experience that the source of betterment is less often the materials used than what is done with them.

On this premise Goodyear since its earliest days has pursued research to advance the usefulness and value of its industrial rubber products and printing supplies.

It was this unresting quest for improvement which fathered the first cord-bodied transmission belt, the first vulcanized belt-splice, the first mile-long conveyor belt, the first asbestos cord steam hose, the first high-capacity dredging sleeves plus a host of other Goodyear advances.

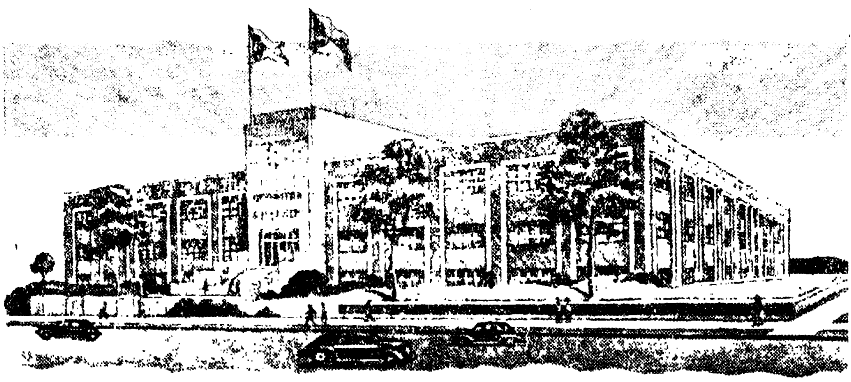
During this past year Goodyear dedicated a new home for its scientific resources — what is believed to be in personnel, facilities and equipment the finest laboratory for its purpose in the world.

Its bold and various activities now are concentrated on war products, but the lessons learned will inevitably insure greater service to industry when applied to the products of peace.

From the developments spurred by war, such possibilities are foreseeable as steel cable transmission belts, plastic glass, feather-light insulating materials, hundred-mile conveyor belt systems, plastic water pipes burstproof against freezing, metal-wood laminations for plane and car bodies, mildew-proof tents and awnings, synthetic latex cushioning, crashproof fuel tanks, and many like wonders on which we now are at work.

Firm in its purpose to stand forth always as "science headquarters" of the rubber industry, Goodyear aims to fulfil the promise "the best is yet to come."

PRODUCTS OF GOODYEAR RESEARCH



GOODYEAR

THE GREATEST NAME IN RUBBER

M/90

রাজা শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরের সিংহাসনে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আরোহণ করেন।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখা যায়, চন্দ্র উপাধিধারিগণের "রোহিতাগিরিভুজাং বংশে" বংশের আদি পুরুষ পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রোহিতাগিরি লালমাই পাহাড় বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, লালমাই পাহাড়ের মালিক চন্দ্র উপাধিধারী এক রাজবংশ প্রায় ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চলে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। লয়হচন্দ্র এই বংশেরই একজন ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অষ্টাদশ সম্বৎসর হইলে, তিনি ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রোহিতাগিরির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং এই বংশেরই এক শাখার বংশধর প্রায় সমকালেই বঙ্গে বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। পাহাড়শ্রেণীর মাঝামাঝি স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বড়ুরাগামী রাস্তা যেখানে পাহাড় পার হইয়াছে তথায়, পর্বতের উপরে বেশ বিস্তৃত সমতল স্থান আছে। তথায় কোটবাড়ী বলিয়া পরিচিত সমচতুষ্কোণ ধ্বংসস্তূপের শ্রেণী আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। রাস্তা প্রস্তুতকালে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। এই স্থানেই কিছুদিন পূর্বে ইটের জন্য খুঁড়িতে যাইয়া সামরিক পূর্তবিভাগের ঠিকাদারগণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং বহু ধাতব মূর্তি ও আরাকানী মুদ্রা এবং পট্টিকেরা নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কার করে। উহাদের মধ্য হইতে একখানি ধ্যানীবুদ্ধ মূর্তি ঢাকা মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থানে পর্বতশীর্ষে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত ছোটখাটো একটি সহর যে ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম প্রান্ত জুড়িয়া ৮।১০ মাইল পর্যন্ত পাটিকারা পরগণা বর্তমান। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, পর্বতশীর্ষে এই ধ্বংসস্তূপ ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত প্রাচীন পট্টিকেরা নগরীর। ফুসে সাহেব ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা যে অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি হইতে সেই আমলের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দেবদেবীর তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে "পট্টিকেরে চুন্দাবরভবনে চুন্দা" দেবীর উল্লেখ এবং ছবি দেওয়া আছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানায়ও পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে।

৯। রণবংকমল্ল শ্রীহরিকাল দেবের তাম্রশাসন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ময়নামতী পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ার করিবারকালে ইহা পাওয়া যায় এবং ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইলিয়ট উহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পণ্ডিত কোলব্রুক্ সাহেব ১৮০৭ সনে ইহার পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৯২৯ সনে মদীয় Iconography পুস্তকে আমি দেখাই যে, এই শাসনে পট্টিকেরা নগরীর উল্লেখ আছে, কোলব্রুক পড়ার ভুলে উহা ধরিতে পারেন নাই। ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়াটারলি পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই শাসনখানির সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শাসনখানি দ্বারা রাজা রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকাল দেবের সপ্তদশ সম্বৎসরে ১১৪১ শকাব্দে তাঁহার মন্ত্রী ধাড়ি-এব পট্টিকেরা নগরে দুর্গোত্তারা মন্দিরে বেজখণ্ড গ্রাম হইতে ২০ দ্রোণ ভূমি দান করেন। ১১৪১ শক=১২১৯—১২২০ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই হরিকাল দেব ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে পট্টিকেরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দেই পট্টিকেরার চুন্দাদেবী বিখ্যাত হইয়াছিলেন দেখিয়া ঐ সময় হইতেই বা তাহারও পূর্বে আমরা পট্টিকেরা নগরের অস্তিত্ব জানিতে পারি। সম্ভবতঃ রোহিতা গিরিভোগকারী চন্দ্ররাজগণ পট্টিকেরাতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পট্টিকেরা রাজ্যের করুণ ও রৌদ্ররসপূর্ণ ইতিহাস এই যুগের ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সহিত যুক্ত।

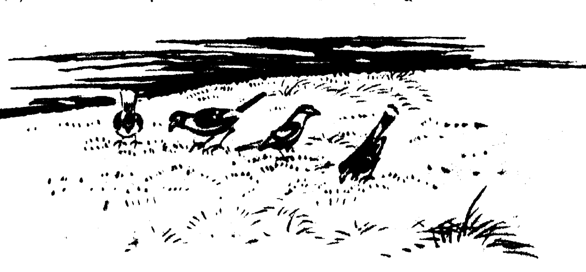
ব্রহ্মরাজ ক্যানজিট্‌ঠার (১০৮৪—১১১২ খৃঃ) পরমাসুন্দরী একমাত্র কন্যার নাম ছিল শোয়ে-এঙ্-থি। পট্টিকেরা রাজকুমারের সহিত তাহার প্রণয়ের ফলে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তিনিই ব্রহ্মদেশের বিখ্যাততম রাজা অলংশিশু (১১১২—১১৮৭ খৃঃ)। অলংশিশু পট্টিকেরা রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতেন এবং স্বয়ং এক পট্টিকেরা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অলংশিশু পুত্র নরথু (১১৮৪—১১৯১ খৃঃ) দ্বারা নিহত হন। নরথু স্বহস্তে বিমাতা পট্টিকেরা রাজকুমারীকে বধ করেন। মর্মাহত পট্টিকেরারাজ প্রেরিত দুঃসাহসী আটজন বীরের হস্তে নরথু নিহত হন এবং হরিকাল দেবের রাজ্য প্রাপ্তির মাত্র দশ বৎসর পূর্বে পট্টিকেরা বীরগণ এই অদ্ভুত প্রতিহিংসা গ্রহণ কার্য সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মরাজধানী পেগানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

সামরিক পূর্ত বিভাগের খননের ফলে ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের শিখরে শিখরে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন পট্টিকেরা নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন মূর্তি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্ন বিভাগ কর্তৃক এই সমস্তের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইলে পট্টিকেরার প্রাচীন ইতিহাস নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

পট্টিকেরার দক্ষিণে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে এই সময় আর একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১০। দামোদর দেবের তাম্রশাসন।

অদ্যাবধি দামোদর দেবের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথমখানি পাওয়া যায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম সহরের নিকট নসিরাবাদ গ্রামে। ইহার তারিখ ১১৬৫ শকাব্দ বা ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। বংশধারা এইরূপ:—পুরুষোত্তম, মধুসূদন, বাসুদেব, দামোদর। দ্বিতীয় শাসনখানি পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে। উহা দ্বারা সমতট মণ্ডলে মেহার গ্রামে ভূমিদান করা হইয়াছে। উহার তারিখ ১১৫৬ শকাব্দ, রাজত্বের চতুর্থ সম্বৎসরে প্রদত্ত। কাজেই দামোদর ১১৫৩ শকাব্দে বা ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। মেহার পর্যন্ত ইহার অধিকার বিস্তৃত দেখিয়া মনে হয়, এই সময় সম্ভবতঃ পট্টিকেরা রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল কারণ, মেহার হইতে পাটিকারা অল্পই দূরে। দামোদর দেবের উপাধি ছিল অরিরাজ-চানূর-মাধব ইঁহার অল্প পরেই আমরা সম্ভবতঃ এই বংশেরই অরিরাজ দনুজমাধব উপাধিধারী দশরথ দেবকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। এই সময়ের পূর্বে লৌহিত্যের পশ্চিম পার হইতে সেন বংশের শাসন লুপ্ত হইয়াছিল। দশরথ দেব লৌহিত্যের দুই পারের সমস্ত ভূমি,—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ,—মিলাইয়া একটি বেশ প্রবল প্রতাপ রাজা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।



ভিখারিণী

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভাদ্র মাসের এক পড়ন্ত বেলায় খাল-ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের জ্বালায় শহরবাসীরা অস্থির। মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁর ত্যাজ্য সন্তান বঙ্গবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা চালান তারই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খাল-ধারের মেটে রাস্তার ধুলোয় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে গেল। বরাতে দুঃখ আছে ভেবে দৌড়ে হাঁটা শুরু করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুদূরে যেতে না যেতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।



ভিখারিণী আবার বল্লে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু-চার জন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর ঝোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগ্‌লে আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপরে বলাৎকার শুরু ক'রে দিলে।

অনন্যোপায় হোয়ে কাক-ভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাঁট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগ্‌লে। আমার বাড়ি অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশ-পাশের চারদিকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ হোলো। গলিটা বেশ চওড়া—দুখানা গরুর গাড়ি পাশা-পাশি যেতে পারে। গলির দুধারেই খোলার বাড়ি, একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথার লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চ্যাঁচাচ্ছিল—সে আক্ষেপের মধ্যে আল্লা ও খোদার বাহুল্য শুনে মনে হোলো সে ব্যক্তি মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে; বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে সামনের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এ পারে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে লোকটার কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গবেষণা করছি, আল্লা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগ্‌লে। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হ'য়ে পড়ল। বৃষ্টিধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চেপে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল-সমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়া শ্রেয়ঃ এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার কাণের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হোলো—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ-তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মেঘের মত ময়লা। একখানা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়েছে, তার ছিদ্র অবকাশ দিয়ে উত্তমাঙ্গের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিণীর মত কৃশ নয়, বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কমনীয়তা ও লাবণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিণী আবার বল্লে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দেখলুম সে থর থর করে কাঁপছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠ্‌ল একটি পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়্‌ল। চোখ দুটি এমন কিছু সুন্দর নয়; কিন্তু কি অদ্ভুত চাহনি সে চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। হতশ্রী মালঞ্চের এক কোণে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নির্জন স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বুকে ফুটে উঠতে দেখা যায়,

তার চোখ দুটিতে যেন সেই ব্যথা স্থির হ'য়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না ক'রে একটা পয়সা পকেট থেকে বের ক'রে তার হাতে দিলুম।

ওপারে সেই অন্ধ বৃদ্ধ তখনো তারস্বরে খোদাকে আবেদন জানাচ্ছে, বৃষ্টিধারা সমানে চলেছে; মেঘমণ্ডিত স্তিমিত সূর্যালোক আমার চারদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে দাঁড়াল। তারপরে হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধের হাতে পয়সাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। মনে হোতে লাগল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বুড়োরই কেউ হবে, চারদিক থেকে ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এসে বুড়োর কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে ঢুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। ওরি মধ্যে কখনো চেপে আসে কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সন্ধ্যে হোয়ে এলেও মেঘ কেটে যাওয়ায় তখনো একটু আলো আছে। বৃদ্ধ ভিখারীর চীৎকার একটু মন্দা পড়েছে, বোধ হয় সারাদিন চেঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চামচিকের মতন কালো আর রোগা, ধপধপে সাদা একখানা চওড়া পাড় শাড়ি পরা চুল বাঁধার বাহার দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম সেখানকার দরজাতেও দু-চার জন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছে। অন্ধকার ঘোর হবার আগেই তারা বেসাতি খুলে বসল দেখলুম ওপারের সেই অন্ধ বৃদ্ধও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই দেখলুম আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিণী পরিষ্কার কাপড় পরে সেই দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বৃষ্টিও একেবারে থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ চেয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হোয়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিণীর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিংড়ে কাঁধে ফেলেছিলুম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হোয়ে ভিখারিণীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একেবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাব ও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দোব না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত্র পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি?

—আদরিণী, আংরী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিটমারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রশ্ন শুনেই আংরী হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—আহা কত ঢঙই জান! আজ কি নেশা করা হয়েছে শুনি?

এই বলেই সে ভিজে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বল্লে—দাঁড়াও উনুনের ধারে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসি—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোট জায়গায় এসে আজ জামাটাই বুঝি আক্কেল সেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখুনি সে ফিরে এসে বল্লে—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ধুতিটাতে হাত দিয়ে বল্লে—এঃ ধুতিও যে ভিজে গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বল্লে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধুতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বল্লুম—ও এখুনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হোয়ে বোসো তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি!

শাড়িখানা ছুড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বল্লে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না?

—তুমি তো মোড়ের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু-তিনবার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না—বল্লুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বল্লুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দোষ ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমার ঠেসে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আপনি কি পুলিশের লোক? বাবা আমি কোনো দোষ করি নি, আমার ওপর কোনো অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা দুটো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লুম। কেন যে আদরিণী অতখানি বাড়াবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বল্লুম—আমি মোটেই পুলিশের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বল্লে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে—বাবার বয়েস কত? —তেইশ বছর।

আদরিণী খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বল্লে—বেশ হোল—বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে ঝঙ্কার দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে! কে এয়েচে?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সে বলে উঠল—তোর বর এয়েচে। রাস্তা থেকে তোর বর নিয়ে এয়েচি—আয় না ভেতরে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে

হোলো দীনবন্ধু মিত্তিরের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে এল।

আদরিণী বল্লে—দেখ্ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে এনেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয়?

—মুখে আগুন! দিনে দিনে কত রঙ্গই হচ্ছে! নে নে আদিখ্যেতা রেখে শীগ্গির কর। আবার লোক আস্বে—

এই বলে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আদরিণী হাসতে হাসতে বল্লে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে আমার মাকে?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি?

আদরিণী অন্যদিকে মুখ করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। দেখলুম আমার ধপধপে সাদা সিল্ক টুইলের সার্ট ধোঁয়ায় প্রায় কাল হ'য়ে গিয়েছে, আর তা থেকে মাছের ঝোল আর ধোঁয়ায় মিলিয়ে এমন একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে, গায়ে দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে কাছে রাখলে বমি ঠেলে আসে।

জামাটাকে গুটিয়ে পাশে রেখে বল্লুম—রসিকতা তো খুব হোলো, এবার আমার কথার জবাব দাও দিকিন।

—কি বল?

—আমার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ঐ যে অন্ধ বুড়োটাকে দিলে, ও তোমার কে হয়?

আদরিণী কিছুক্ষণ অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—ও তুমিই বুঝি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলে! এতক্ষণে বুঝেছি!

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার?

—কে আবার হবে! ও তো মোচোলমান।

—তবে?

আদরিণী কোনো কথা বল্লে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বল্লুম—তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন? আর কার জন্যেই বা কর?

আদরিণী চট্ ক'রে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কি দেখে ফিরে এসে বল্লে—বাবা, আজ তুমি বাড়ী যাও, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে—বলব—তোমাকে আমার সব কথা বলব, কিন্তু আজ নয়—কবে আস্বে বল?

—আবার আসতে হবে?

—নিশ্চয় আসতে হবে। ভুলো না, আমি তোমার মেয়ে।



অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বল্লে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।
—কি বল?
—আমি এই বাড়ি ছেড়ে দিতে চাই।

তোমরা কি জাত?

—জাতটাত আমি জানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোত্তর?

—ভরদ্বাজ।

—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল—পরশু এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় সে রসুইয়ে বামুনের কাজ করত। লোকের বাড়ি পুজো ও বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে কাজ ক'রে সে বেশ দু-পয়সা উপার্জন করত। পরিবার থাক্ত দেশে, কিন্তু আদরিণীর যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুল্লে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে থাকতেই বাড়িউলির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগ্ল। আট বছরের আদরিণী তার মা-মরা ভাইটিকে মানুষ করতে লাগ্ল। ভাইটি তার কাছেই থাকে, সেই তাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। তার ওপরে নতুন মার সঙ্গে খাটে, সংসারের কাজে যোগান দেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে আনে। দোষ করলে বাপও ঠেঙায়, নতুন মাও ঠেঙায়—গালাগালি গুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এমনি ক'রে দিন চল্ছিল। যখন তার দশ এগারো বছর বয়েস, সেই সময় তার বাপ মারা গেল। বাপ মারা যেতে নতুন মা তাকে এক বাবুদের বাড়ি বাসনমাজার কাজে লাগিয়ে দিলে। সক্কালবেলা উঠে সে তার ভাই নন্দকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি চলে যেত কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাত্রি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই দু-বেলা খেতে পেত। দু-টাকা তার মাইনে ছিল বটে; কিন্তু সে টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে গিয়ে বাবুদের কাছে গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আস্ত—ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলতে পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিকা মনের অভিমান। নন্দর জামা-কাপড় কোনো কিছুর খরচই নতুন মা দেয় না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে। দু-চার পয়সা যা পায়, তাই জমিয়ে জমিয়ে ভাইকে জামা-কাপড় কিনে দেয়। মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছোট ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে এসে সংসার পাতবে, দিদির দুঃখ ঘোচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট সহ্য করতে রাজী।


CORRUGNATE
THE KING OF
ANTI-CORROSIVE PAINTS
USED ALL OVER INDIA
SINCE 1898
The STANDARD PAINT WORKS LTD.
'PAINT HOUSE' 44, BEADON ROW, CALCUTTA

নন্দর ছ-বছর বয়স হোলো। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামা-কাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছুই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশী জেদাজেদি আরম্ভ করায় নতুন মা বল্লে—আমি এত পয়সা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার তুই পয়সা রোজগার ক'রে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে—বিনা সুপারিসে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মতন ক'রে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশ্যাবৃত্তি তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়, আর তারই খরচ জোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যেবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাত্রে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করবার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে! এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পয়সা তুই রাখিস—তার আগে একটি পয়সাও পাবি নে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে ক'রে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কাটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে সিগ্রেট বিড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইস্কুলের মাইনে তাতেই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেল্লে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিস নি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হোলে আমার দুঃখ ঘুচবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার ভাল লাগে না, লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মা-ও তার সঙ্গে সায় দিলে। বল্লে—এতগুলো ক'রে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—যদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায় দায় হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উস্কোখুস্কো, চোখ রাঙা।

নতুন মা-র সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোকে আর খেতে দিতে পারব না—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়, নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সন্ধান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা ক'রে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন-মা তাকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বল্লে—যাস্‌নি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি রইল। দুদিন থাক, দেনাটা শোধ হোয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেল।

আদরিণীর সংসার শূন্য হোয়ে গেল। ভাইকে মানুষ ক'রে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে কোরে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল, এই তার লক্ষ্য ছিল। এই জন্য তেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালো মেঘ এসে তার মানস-উদ্যান ছেয়ে ফেল্লে, তার জীবন অন্ধকার হোয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল সে-ই অতি রূঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুক্ষ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়া-খাওয়া হয় নি। সে পয়সা চায়। কিন্তু আদরিণী পয়সা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেরুতে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু-তিন ঘুরে বেশ রোজগার হোতে লাগল। ভিক্ষার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার তার মনে রঙীন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময়ে আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিনে নয়, তার ঘরে চোদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু দেখে কিছু শুনে একটু একটু করে জানতে পারলুম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন-যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায় কাজকর্ম করে অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাহিরের সংসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলেছে। যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানস জীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরুচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি ক'রে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তব জীবনে সে রাস্তার মুটে, মানস জীবনে সে বিশ্বের রাজা। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানস জীবনের যে যত বেশী আপোষ করতে পারে সেই তত বেশী কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তব জীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী হোলেও আমি দেখতে পেতুম মানস জীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী সে সেখানে—স্বামী, পুত্র পরিজন ও আশ্রিতজনে ভরা তার গৃহ। বাস্তব জীবনে সে নিঃস্ব কিন্তু মানস জীবনে তার দান ধ্যানের অন্ত নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরম-কারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি দেহ বিক্রয় করা তার উপজীবিকা কিন্তু মনে হয় সে সাবিত্রীসমা। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বল্লে—বাবা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বরণ করেছিলুম সে তো বদমাইস হোয়ে গেল। আর কেন! তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বল্লুম—আমার বাড়িতে গিয়ে কি করবে? সে বল্লে—তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমায় মাইনে দিতে হবে না—দুবেলা দুটী খেতে দেবে।

সমানবয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হোলে আমার পিতৃদেব যে কেউ বিশ্বাস করবে না সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সংকোচ হোলো। বল্লুম—আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌ব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠোনে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলুম আদরিণীর ডানদিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারদিকে অনেকখানি জায়গা কালশিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে, কি ক'রে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বল্লে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা ক'রে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিন দশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ

ষষ্ঠীর দিনে —



দুর্গাপূজার প্রারম্ভে, ষষ্ঠীর দিনে সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে মায়েদের উপবাস করা হিন্দুর প্রচলিত রীতি। কিন্তু মায়েদের জানা উচিত, কেবল উপবাসে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, কেননা "স্বর্গের করুণা শুধু তাঁরই মেলে যিনি নিজেও চেষ্টা করেন।" ষষ্ঠীর দিনে তাই সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা আর একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে। শিশুর স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে খাদ্যের উপর। শিশুর পক্ষে কোন্ খাদ্য শ্রেষ্ঠ? মাতৃদুগ্ধ?—কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যবস্থা। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তন্যে তার জন্যে সব চেয়ে উপযোগী খাদ্য বর্তমান। কিন্তু কোন কারণে যদি স্তন্যদান সম্ভব না হয়? তাহলে? গরুর দুধ? কখনো না। শিশুর পক্ষে গরুর দুধ বড় বেশী গুরুপাক, সেজন্যে বমি, যকৃৎপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি জন্মায়। ডাক্তাররা তাই মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ গুণযুক্ত গুঁড়া দুধ (Humanised Dried Milk) দিতে বলেন। আবার তা কিন্তু টাট্‌কা হওয়া চাই। বিদেশী দুধ এদেশে আমদানী হ'তে যে সময় নেয়, তারই মধ্যে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। অপর পক্ষে **ভিটামিল্ক** পাওয়া যায় টাট্‌কা তাজা অবস্থাতেই।

শিশুর স্বাস্থ্যে দৃষ্টি দিন



ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিমিটেড্, কলিকাতা

মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকায় দুপুরে বেলা ভিক্ষায় বেরুতে পারে নি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রেগে গিয়ে সে তাকে মেরে অজ্ঞান ক'রে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বল্‌ব না তো আর কি বল্‌ব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমের গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগ্‌লে। তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হোলো একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশংকা করছিলুম এবার বোধ হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বল্লে—বাবা তোমাকে একটা কথা বল্‌ব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে ক'রে চলে যাব এখান থেকে।

সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে?

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বল্লুম—সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ঐ যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

ও কাদের ছেলে?

হাড়ীদের!!!

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়েছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকঘর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চেটাই পেতে টিকে দিত এই জন্য এই মাঠকে ও অঞ্চলের লোকেরা 'টিকে পাড়া'র মাঠ বল্‌ত। সে সময় কলকাতার অনেক যায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শুয়োর পুষত আর সেই শুয়োরের দল মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চেটাইয়ের আধ শুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোতো।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজোলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরাণীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়ের বদলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজো-পার্বণে লোকের বাড়ীতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চ্যাঁচারি দিয়ে ঝুড়ি, চেটাই, দর্মা ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরী করত। মেজোলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ী মেথরাণীর কাজ করত আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ীর কেউ মেথর মেথরাণীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মার নাম ছিল নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাস করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হোতো। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলুম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতকগুলো খালিঘর ছিল। সেগুলোকে সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে বলা হোতো খোপে। আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন মিলনকুঞ্জ। বাইরের যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টায় দু-আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোপের কথা তখনকার দিনের গুণীলোক মাত্রেরই জানা ছিল।

হাড়িপাড়ার মেয়েদের দেহসৌষ্ঠবের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দুপাট্টির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোপেতে দেখা যেত। মাঝে মাঝে সেখানে শাশুড়ী বৌয়ে, মায়ে ঝিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি হোয়ে গিয়ে তুমুল কান্ড উপস্থিত হোতো। এইখানকারই এক বয়স্থা হাড়ী গিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোপেতে আস্‌ত মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোকটি খোপেতে আস্‌ত তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দু-দিকে ঘোঁট বাধিয়ে তুল্লে। এই ঘোঁট যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলুম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগ্‌ল না। বিয়েতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল।

আদরিণী আমায় বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল—বাবা তুমি কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে ক'রে কি তার চেয়ে ভাল থাক্‌বে?

আদরিণী বল্লে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলুম, নইলে লোকের বাড়ি গতর খেটে আমার ভাত-কাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হোলো একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত ক'রে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোনো একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করবে—না হয় এমনিই ভদ্রভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। সে বল্লে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হ'য়ে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়সেই লেখাপড়া শেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতেন। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বী ছিলেন। আশ্রমে অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে কয়েকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হোতো। আমি সাহস ক'রে একদিন আশ্রমের কর্ত্রী ঠাকরাণীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বল্লুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চেপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে বেশ একটি করুণ কাহিনী রচনা ক'রে তাঁকে শোনালুম।

সব শুনে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সংগে তোমার কি সম্বন্ধ? কোথায় আলাপ হোলো?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হোয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক জেরা ক'রে তিনি আমায় বল্লেন—আপাততঃ তাঁদের ফন্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ধারকামী যুবতী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী—এই শুভ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সংগে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাবাও মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। ক'লকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ বালক বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি ক'রে একটা আশ্রম খোলা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হোতো। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সস্তায় একখানা ভাঙা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি কাজ সুরু ক'রে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি মুষ্টি ভিক্ষায় বেরুতেন। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আধ মণটাক চাল ও কিছু তরকারি নিয়ে বাড়ি ফিরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোলো। সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হোলো—দেশজোড়া তাঁর নামডাক হোলো, তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হোলো। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃদ্ধবয়সে বদনামের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হোলো।

সে কথা যাক্, আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে দুঃখের কাহিনী আমি তৈরি করেছিলুম, তা শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হোয়ে উঠ্ল। কি ক'রে তার সংগে আমার পরিচয় হোলো, তার সংগে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্লেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ (তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স), এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বল্লেন—তাইত হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বল্লে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তা হোলে বিপথগামিনী হোতে পারে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হোতে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বল্ব। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বল্লেন—এক কাজ করা যাক। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বোনের বাড়িতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ভগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি ক'রে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বল্লুম—তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—খুব ভাল লোক তারা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠ্ল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে—তুমি আমার সত্যিকার বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম, ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠ্তে বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাকে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বল্লে—আহা আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড্ড ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড় গড় ক'রে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগ্ল। আমি বল্লুম—আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

আদরিণী বল্লে—এখানকার কোনো জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন এক্ষুনি জন্মিয়েছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বল্লুম—তবুও একটা দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হোয়ে আদরিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে সে বল্লে—এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে কিন্তু—

বল্লুম—বেশ!

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

—কারা?

যেখানে যাচ্ছি।

—তারা ক্রীশ্চান, জাতটাত মানে না।

—এ্যাঁ! ক্রীশ্চান! গরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পোঁটলাটাকে তাচ্ছিল্যের সংগে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বল্লুম—ক্রীশ্চান হোলেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন সুরে বল্লে—না বাবা, জীবন ভোর অনেক পাপ করেছি, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরাতে যা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথাগুলো শুনে আমার রাগ হোলো। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী ক'রে যে হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দুত্ব যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজী হোলো না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এরি মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হোলো? দিনরাত অমন ক'রে মরছ কেন?

আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগ্ল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বল্লে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ সব কি বুদ্ধি দিচ্ছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচানাচি সুরু করেছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুনি?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?

—বল্লে চলে যাব, বিয়ে করব—লেখাপড়া শিখব। যা দিকিন্, তুই—

আদারিণী এবার গর্জে উঠ্‌ল—আলবৎ যাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিক্রমে আদারিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে আরম্ভ করলে। আদারিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগ্‌ল—মার মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে বুঝব।

ফাদার নিস্তারের চীৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদারিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটা ঘটি টেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদারিণীর মাথা ও মুখ থেঁৎলাতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেল্লুম। বাড়ির মধ্যে তখন বাইরেরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছে, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আংরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত্র নিস্তারিণী গর্জে উঠ্‌ল—ভাল হবে না বল্‌ছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি—আমায় চেনো না?

আমার মাথায় তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলুম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বল্লুম—আমি একে পুলিসে দোব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আংরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দর্শকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদের পাড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল—কে কাকে মেলে! আংরী—আংরী কোথায়?

একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক ক'রে দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আদারিণীকে দেখে বল্লে—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেলে? বল কে মেলে?

আদারিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বল্লে—চ আংরী আমাদের ঘরকে চ—কাল লগননা আছে—

আদারিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বল্লে—চ।

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপরের মতন ভোঁস্ ভোঁস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম ক'রে কিছু ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদারিণীকে অগ্রসর হোতে দেখে সে গর্জে উঠে বল্লে—খবর্দার আংরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কি খুন ক'রে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে আদারিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া টপ্‌কে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাঁদি নৎ। দুই কাণের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি ক'রে মাকড়ী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নৎ ও এক কাণের দু-তিনটে মাকড়ী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তধারা ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

—ওরে বাবা, এত রক্ত—বলে নিস্তারিণী তো ঘুরে মাটিতে পড়ল, ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদারিণীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমাদ্দম লাথি মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগ্‌ল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। আদারিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়ে তাকে ধরে ফেল্লে।

আদারিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—চ হেমা।

আমি গুটি গুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলুম। আদারিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বল্লে—বাবা বুঝি মেয়ের কীর্তি দেখে সরে পড়ছিলে?

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মাঠের কাছে পেঁছে আমি বল্লুম—আচ্ছা এবার আমি চল্লুম।

আদারিণী বল্লে—চল্লে বাবা! আচ্ছা তাহ'লে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বল্লুম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু-এক দিনের মধ্যে আসব।

—না না কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বল্লে—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভরদ্বাজের দিব্যি রাখতে পারি নি। বোধ হয়, সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আদারিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম তার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে ক'রে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ডগমগ হোয়ে আদারিণী বল্লে—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমাদের দুজনেরই রেলে চাকরি হয়েছে—মেথর ও মেথরাণীর কাজ। ও পাশ আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—



কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ১৯১৪ ইং — হেড অফিস ঃ---কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস ঃ—৪নং ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট

নিরাপদ সংস্থানার্থ এই ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

সারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

মূলধন এবং রিজার্ভ তহবিল

সন	বিক্রয়ীকৃত	আদায়ীকৃত	রিজার্ভ
১৯৪২ ...	৩৯,৩৬,৬০০,	২২,২০,০৫৫,	৯,৪০,০০০,
১৯৪৩ ...	৫৫,৮৬,৮৬০,	৩০,৪৭,৭২১,	১৪,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	৮০,০০,০০০,	৪০,০০,০০০,	২০,০০,০০০,

আয়, লাভ এবং গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি

সন	আয়	নীট্ লাভ	গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি
১৯৪২ ...	১১,৬২,২৮১,	২,১৭,৭৫৫,	১,০৯,৫৩,১০০,
১৯৪৩ ...	১৬,৪৭,৪৫৭,	৩,৬১,২৩৬,	২,০৯,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	১০,৮৩,২২৮, (জুন পর্যন্ত)	৩,৭৯,২০৯, (জুন পর্যন্ত)	২,৭৫,০০,০০০, (আগষ্ট পর্যন্ত)

এজেন্সী ও শাখা অফিস সমস্ত পৃথিবীতে

লণ্ডন এজেণ্ট ঃ—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট ঃ—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া

এমেরিকান এজেণ্ট ঃ—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ এন, সি, দত্ত এম, এল, সি।



রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

প্রমথনাথ বিশী

যে সব নাটককে আমরা নৃত্যনাট্য বলিতেছি সেগুলি কবির শেষ জীবনে লিখিত। আবার ঋতু নাট্যগুলিও শেষ জীবনের রচনা। স্থূল বিচারে এই দুই শ্রেণীর নাটককে এক জাতীয় মনে হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। এই দুই শ্রেণীর নাটকই সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান হইলেও নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনই সেভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ, ঋতু নাট্যের নৃত্যকে সম্বহুলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজ সভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্য নাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোন যোগ নাই; তাহা এককের সুখদুঃখকে, এককের আশাআনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে সঙ্গীত যেমন তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার নাট্যপ্রবাহের আলোচনা করিলেও তেমনি দেখা যাইবে যে শেষ জীবনের নাটকের মধ্যেও গানের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য দ্বারা কবি তাঁহার নাট্য জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—ঋতু নাট্য ও নৃত্য নাট্যের গানের দ্বারাই সে জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম জীবনের গীতি নাট্যে ও শেষ জীবনের এই শ্রেণীর নাটকে কত প্রভেদ।

ঋতু নাট্যে ও নৃত্য নাট্যে চারিটি বস্তুর সম্মিলন ঘটিয়াছে। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেকনিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে-কোন পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সুরের স্বাদ পাওয়াও দুরূহ নয়, স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন; কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সেই নৃত্যের ছন্দ সৌন্দর্য জানেন; রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের অঙ্গাভরণে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেই পরিণত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরুদ্ধার করা যাইবে না, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাঁহার শেষ জীবনের এই দুই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে, কাব্য, সুর, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সম্মিলিত সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যাংশই প্রকট হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্ততঃ কল্পনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রতি অবিচার করিবার আশঙ্কাই সমধিক।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাঁহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানা নাটককে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণ ভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটু, করিয়া গদ্য বা পাত্রপাত্রীর উক্তি। গ্রীক নাটক মূলে যেমন গীতি-সর্বস্ব ছিল, কালক্রমে তাহাতে সঙ্গীতের প্রাধান্য কমিয়া নাটকীয় অংশ বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সংকীর্ণতর হইতে হইতে শেষবয়সে একেবারে সঙ্গীতকে আসর ছাড়িয়া দিয়া তাহারা নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সঙ্গীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য শেষ জীবনে সঙ্গীত তাঁহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল সুরও যেন আর তাহাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে-আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকৃতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নূতন নূতন বাহনের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সন্ধানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ

পড়িবার মতন নভেল

শশধর দত্তের

রক্তাক্ত ধরণী	২৸৹
স্বর্গাদপি গরীয়সী	২৲
আগুন ও মেয়ে	২৲
সব্যসাচীর প্রত্যাবর্তন	২৸৹

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

সাঁঝের প্রদীপ	২৲
নীড় ও বিহঙ্গ	২৲
ধূলার ধরণী	২৲
ঢেউয়ের দোলা	২৲
মাটির মায়া	১৸৹
দীপের আলো	১৸৹

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের

পতিতা ধরিত্রী	১৸৹

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

রাহুগ্রস্ত শশী	২৲
নব-নায়িকা	২৲

যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের

সাধের কাজল	২৲
পথের বাণী	২৸৹

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর

খেয়ালী তরুণী	১৸৹

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরিচিতা	২৸৹
মুক্তিমণ্ডপ	২৲

আশালতা সিংহের

সহরের মোহ	১৸৹

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অনাথ আশ্রম	২৲
হোমানল	১৲

শৈলবালা ঘোষজায়ার

বিনির্ণয়	১৸৹
অরু	১৸৹
গঙ্গাপুত্র	১৸৹

প্রফুল্লময়ী দেবীর

চাষা	১৸৹
পূর্ণিমা	১৷৹

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেউলিয়ার জমা খরচ	১৷৹
বিয়ের ফুল (২য় সং)	১৸৹
স্রোতের ফুল (২য় সং)	২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবনের জটিলতা	১৸৹
ধরাবাঁধা জীবন	১৲

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

বিয়োগান্ত	১৸৹

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুরনারী	১৷৹

বিধায়ক ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্য্যের
একাঙ্ক নাটক

পুনর্মূষিকোভব	৸৹

কেশবচন্দ্র গুপ্তের

গণ্ডগোল	২৲

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন ধরণের য়্যাডভেঞ্চার

১। অর্থমনর্থম্
২। আরামবাগ
৩। ইরাবতী ৬। ঊর্ণা
৪। ঈপ্সা ৭। ঋষি-মশাই
৫। উপকণ্ঠ ৮। "ঌ"কার

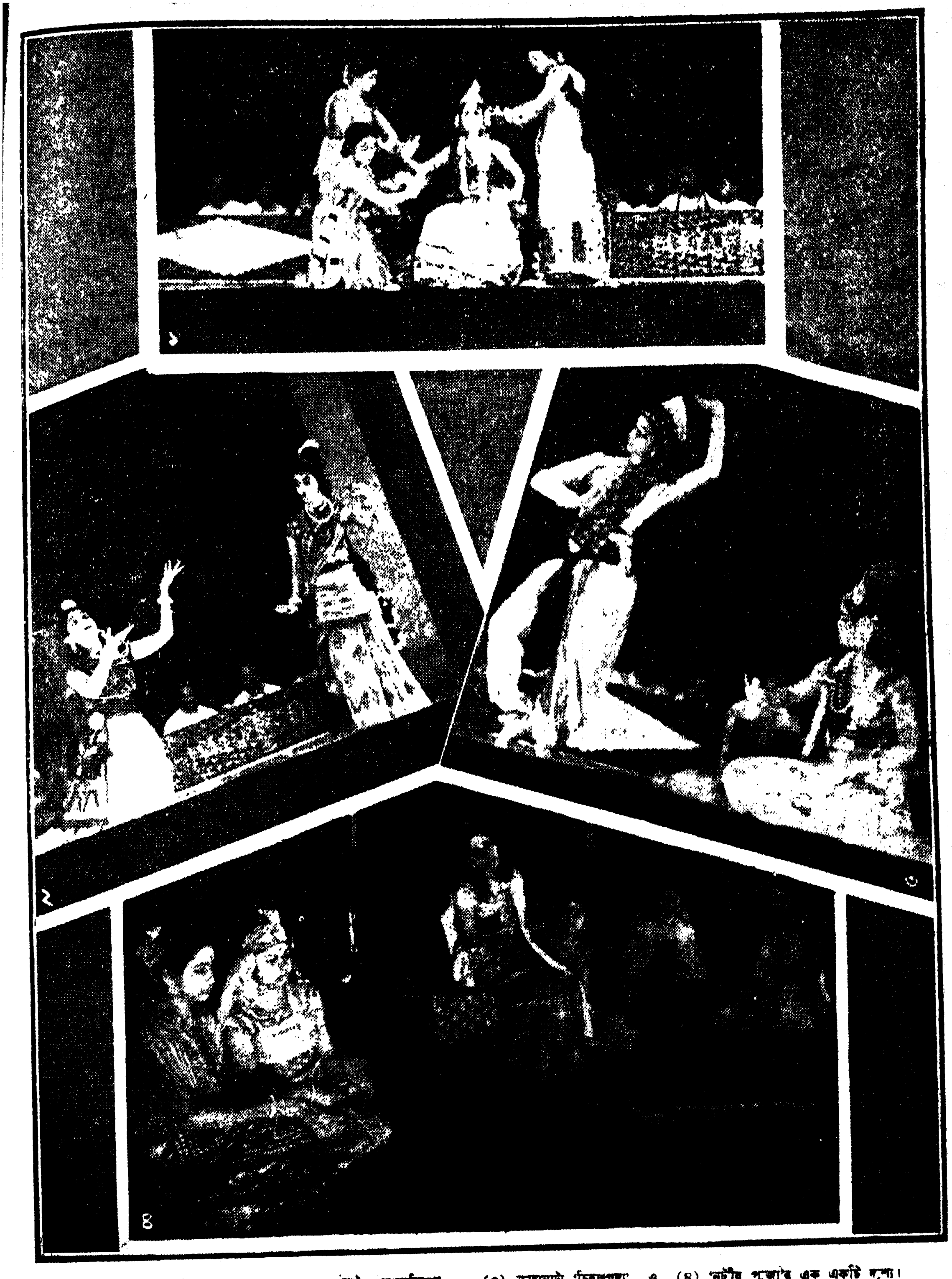
বিস্ময়কর গ্রন্থ।
অভিনব রচনাকৌশল।
ক্রাইম নভেল নূতনতম
ঘটনার সমাবেশ।
প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ১৸৹

রহস্যরোমাঞ্চ য়্যাডভেঞ্চার সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস
প্রত্যেক উপন্যাসের
মূল্য ১৲ টাকা।

১। মৃত্যুচক্র (২য় সং)
২। রক্ত-পিপাসা (,,)
৩। রহস্য-বিভীষিকা (,,)
৪। গুপ্ত-চক্রান্ত (,,)
৫। সয়তান-সঙ্গিনী (,,)
৬। রোজার ঘাড়ে বোঝা
৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা (২য়)
৮। মরণের মায়াজাল (,,)
৯। শত্রু-সংঘর্ষ
১০। মৃত্যু-ষড়যন্ত্র
১১। খুনের-জের
১২। রক্ত-তাণ্ডব
১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
১৪। পিশাচ ব্যাধের জাল
১৫। চীনা দস্যুর ইন্দ্রজাল (২য় সং)
১৬। জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭। পরীর পাহাড়
১৮। দস্যু-মায়াবী
১৯। খুনের নেশা
২০। রক্ত-লোলুপ
২১। মৃত্যুরণ
২২। নীল সাগরে রক্ত-লীলা (২য়)
২৩। ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত
২৪। ফিপথ্ কলম (২য় সং)
২৫। মৃতের প্রতিশোধ
২৬। মরণজয়ী
২৭। খুন ডাকাতি গুম
২৮। পিশাচিনী
২৯। দস্যুরাজ

প্রকাশক—ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



(১) নৃত্যনাট্য 'শ্যামা', (২) নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা', (৩) নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও (৪) 'নটীর পূজা'র এক একটি দৃশ্য।
শ্রীনন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে।

নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই ইহার প্রাণবস্তু। ওই নৃত্যটি ছাড়া নাটকের বক্তব্য কিছুতেই প্রকাশ করা যাইত না; নৃত্যটিকে বাদ দিলে নাটক অন্যরূপ ধারণ করিবে। নৃত্যই এই পর্যায়ের নাটকের বাহন আগে বলিয়াছি—এবারে তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নাটকের সমস্ত গতি গোড়া হইতে এই চরম পরিণামের দিকে ধাবিত এবং শেষ মুহূর্তে কেবল শ্রীমতী নয় সমগ্র নাটকখানি আত্মোৎসর্গের নৃত্যের মধ্য দিয়া শান্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে নটীর পূজার অলোচনার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও এখানে এই তথ্যটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

জীবনপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প গীত ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তাগিদেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোন সজীব আদর্শ নাই; যে-নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রুচিকর নয়, আর কতক তো তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহা তো কেবল নৃত্য মাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য; অর্থাৎ একটা জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত দেহের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাঁহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালি দ্বীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাঁহার প্রতিভার শেষ বাধাকে দূর করিয়া দিল। নৃত্যনাট্যের একটা আদর্শ লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন। এই পর্যায়ের চারখানি নাটকই ১৯২৭-এর অনেক পরে লিখিত।

নটীর পূজা অবশ্য ১৯২৬-এ লিখিত, কিন্তু তাহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয়, যে নৃত্যনাট্য রচনার আকৃতি তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল, কিন্তু আদর্শের অভাবেই আকৃতি রূপ লাভ করিতে পারিতেছিল না।

এখানে যে-সব পত্র উদ্ধৃত করিতেছি তাহার সমস্তই 'জাভা-যাত্রীর পত্র' হইতে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পত্রেই ওদেশের নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় জাভার এই প্রাণ-বস্তুটিই কবিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অগোচরে মনের মধ্যে যেন একটা সজীব নৃত্যনাট্যের আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছিল।

"এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হ'য়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিক মতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিক মতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়ীতে আমরা নাচ দেখ্‌ছিলুম। খানিকবাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ে বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ'ড়ে তোলে।" যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

জাভার নৃত্যাভিনয় হইতে কবি যে তাঁহার নৃত্য নাট্যের আদর্শ পাইয়া থাকিবেন—ইহার পরে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু জাভার নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি তাহাতে একটি বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। জাভার বাণীহীন নৃত্যের সঙ্গে তিনি বাণীর যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভায় যাহা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সংগীতসনাথ নৃত্যনাটিকায় পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন "এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।" জাভার "নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে, তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।" আর "বাঙলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হ'য়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।" জাভার নৃত্যাদর্শের সঙ্গে বাঙলার আত্মপ্রকাশের পন্থা সংগীতের যোগ সাধনেই তাঁহার কৃতিত্ব—এবং সেই জন্যই হয়তো তাঁহার নৃত্যনাট্য জাভার নৃত্যাভিনয়ের চেয়ে পূর্ণতর।

দ্বিতীয়ত, কবি বলিতেছেন, "এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ'ড়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দুটি ধারাই লক্ষিত হয়। 'শাপ মোচনে' ঘটনা নাই বলিলেই হয়, কেবলই বিশুদ্ধ ভাবের আবেগের প্রকাশ,—নৃত্যে এবং সংগীতে। কিন্তু চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামাতে ঘটনার ধারা স্তিমিত হইলেও তাহা বর্তমান—এবং ঘটনা ও ভাবনা যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে—নৃত্যে এবং সংগীতে।

"আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দু'জনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। * * খানিকটা কথাবার্তার পরে দু'জনের লড়াই। * * *

"নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ যারা নাচ্‌ছে, তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কি সেইটেই দেখ্‌বার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হ'য়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।" যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবি মেয়েকেই পুরুষের ভূমিকা দিতেন। বাঙালী বালিকার অর্জুনের ও বজ্রসেনের ভূমিকা গ্রহণে ওই একই রসের উদ্ভব হইত—"কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।"

"কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হ'য়ে গেল। পূর্ব রাত্রে যে-দুইজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ প'রে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরো মাত্রায় বিদূষকতা ক'রে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হোলো না। বেশ-ভূষার সৌন্দর্যেও একটু মাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না ক'রেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন ক'রে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেক্‌লো। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখ্‌তে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকে বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।" যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

এই বিদ্রূপনৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাসের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সংগীতে এই বিদ্রূপনৃত্যের ভঙ্গী।

"সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোষ-পরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলুম, তার থেকে বেশ বোঝা যায়—মুখোষ-তৈরি একপ্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপণা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোষ-তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাব-বৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ পরে এলে আমরা তখনি দেখ্‌তে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূলে ধুয়োটা তারা বাঁধা, এমন ক'রে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়। কিছু অসংগত

না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখ্‌লুম।" যন্ত্রী; প্রভাবতীর পত্র।

মুখোষ-নৃত্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জাতীয় নাটক রচনায় তিনি মনোযোগ দেন নাই। মুখোষ-নৃত্য রচনা করিয়া গেলে বাঙলা সাহিত্য আর একটা দিকে যে কেবল সমৃদ্ধতর হইত তাহা নয়, রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভারও একটা নূতনতর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমার তো মনে হয় মুখোষ-নাট্য তাঁহার প্রতিভার বিশেষ অনুকূল ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীর বিকাশেই অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নাটকে ব্যক্তির মনে যে দ্রুত লয়ে ঘন ঘন ভাববিবর্তন ও পটপরিবর্তন ঘটে, শ্রেণীর মনে সে রকমটি ঠিক ঘটে না; শ্রেণী-মনের ভাব ও পট পরিবর্তন ঢিমে তালে ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ঘটনার তাল ও ব্যক্তির ভাবনার তাল এক সঙ্গে চলিতে পারে না; অর্থাৎ নাটকে যে রকম আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও মুহুর্মুহু ভাব বিপর্যয় দর্শকে আশা করে, তাহাতে ঠিক তেমনটি নাই। অভিনেতার মুখে অবিরাম ভাব-বলাকার সঞ্চরণ না ঘটাতে মুখটা অনেক পরিমাণে অবিচলিত মুখোষের সগোত্র হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যে অভিনেতা যে পরিমাণে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি করিয়া যেন সে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। অভিনেতার মুখের উপরে একটা মুখোষ তুলিয়া দিলে মুখের এই মৌলিক ত্রুটি ঢাকা পড়িয়া গিয়া যেন একটা গুণে পরিণত হইতে পারিত।

বিশেষ করিয়া তাঁহার 'তাসের দেশ' একান্তভাবে মুখোষ-নৃত্যের উপযোগী। এই নাটকের তাসের জনতায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চেয়ে শ্রেণী-ব্যক্তিত্ব অধিকতর। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ব্যক্তি, কিন্তু তাস ও তাসানীগণ শ্রেণীস্বরূপ। এক্ষেত্রে তাহাদের মুখে মুখোষের ব্যবস্থা হইলে অভিনয়ের অঙ্গ হানি না হইয়া, শ্রেণীরূপটি স্পষ্ট হইয়া ওঠাতে রস-বর্ধন হইত বলিয়াই মনে হয়।

এইযে নৃত্যনাট্যের কথা বলিলাম—ইহার মূলের তত্ত্বটি কি? আগেই বলিয়াছি যে জীবন-দর্শনের পরিণতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার আর্টে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—এবং এই পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি প্রথম বয়সের গীতিনাট্য হইতে গতানুগতিক কমেডি, ট্রাজেডি ও তত্ত্বনাট্যের ভিতর দিয়া শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যে আসিয়া পোঁছিয়াছেন। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যে নিছক ঘটনার ও আবেগের মাত্র প্রকাশ; তাহার মূলে কোন সচেতন তত্ত্বরূপ নাই। শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মূলে একটি সচেতন তত্ত্ব নিহিত আছে। কবির দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে এই তত্ত্বের দিকে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে বলা যাইতে পারে নটরাজ শিবের আইডিয়া। যে শিল্পী নটরাজ মূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের কারণ-স্বরূপ মূল আবর্ত ছন্দে লীলায়িত হইয়া জীবনে ও জগতে এক রহস্যময় বিচিত্র দিব্য-শক্তির লীলা চলিতেছে; তাহারই নৃত্যছন্দের পদপ্রান্তে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে; বীভৎসতা ও সৌন্দর্য, ভীষণতা ও মাধুর্য, নিঃস্বতা ও পরিপূর্ণতা তাহার নৃত্য চঞ্চল দুই চরণের যেন দুই বিরুদ্ধ গুণ। যে-হতভাগ্য খণ্ডশঃ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছে তাহার চোখে ইহা রিক্ত, ভীষণ, বীভৎস, ভাঙন-মুখী ও অসম্পূর্ণ; সে কেবল তাণ্ডবের চন্দ্র সূর্য তারা খসিয়া-পড়া ভগ্ন বিশ্ব-অট্টালিকা-টাই দেখিতে পাইল; কিন্তু যে-সৌভাগ্যবানের দৃষ্টি পরিপূর্ণ, সে নটরাজের দুই চরণের লীলা-ই প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া জীবন ও জগৎ তাহার কাছে সুন্দর, মধুর এবং চির পরিপূর্ণ; সে দেখিতে পায় চন্দ্র সূর্য তারা খসাইয়া লইয়া নূতনতর বিশ্বহর্ম্য গড়িয়া উঠিতেছে; সে দেখিতে পায় সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর উপাদান ছানিয়া মহত্তর জীবন গঠনের লীলা হইতেছে, তাহার চোখে জীবন ও জগৎ

রিপূর্ণ এবং সুন্দর। খণ্ড-দৃষ্টি নটরাজের মঞ্চের বাহিরের পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া লে—ইহাই বাস্তব, আর বাস্তব বীভৎস এবং স্তুর। পরিপূর্ণ দৃষ্টিবান্ রঙ্গমঞ্চের পর্দা-না উঠাইয়া নটরাজের নৃত্যলীলা দেখিয়া লে সব শুদ্ধ মিলিয়া কি সুন্দর, আর রিপূর্ণ!

এখন জীবনের সাধনায় এই পরিপূর্ণতার দৃষ্টির অধিকারী কবি হইয়াছেন বলিয়াই তাঁন আর পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া হতাশ ন নাই; একেবারে নৃত্যের আসরে উপস্থিত ইয়া স্বয়ং নটরাজের নৃত্য দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ভাঙন নূতন গড়নের ভূমিকা ; মৃত্যু জীবনেরই অঙ্গ; বিরহ নিবিড়তর মিলনেরই সূচনা—আর সবসুদ্ধ মিলিয়া জগৎ জীবন স্বকীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, বিম্বিধৃত।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিকষে বির এই তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায়, বের অণুপরমাণুর বিবর্তনে, (নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা); মানুষের জীবনের বিরহ মিলনের লীলায়, (শাপ মোচন); রূপ ও রূপাতীত সত্তার দ্বন্দ্বে (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা); প্রেম ও দেহের বিপরীত দাবীর সংগ্রামে (নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা'); অর্থাৎ এই তত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্ব মাত্র থাকে নাই, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একার্থক হইয়া উঠিয়া ইহা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে; ইহা তাঁহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণতাকেই বোঝেন।

এক্ষণে তাঁহার রচনা হইতেই এই তত্ত্ব-রূপটি প্রকাশের চেষ্টা করা যাক্।

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে বপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের সেই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়। নটরাজ পালা গানের ইহাই মর্ম।" নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা।

আমরা যাহাকে জগৎ বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'বহিরাকাশে রূপলোক,' আর আমরা যাহাকে জীবন বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'অন্তরাকাশে রসলোক।' যে-সৌভাগ্যবান্ নটরাজের লীলায় যোগ দিয়া তাঁহার নটসঙ্গী হইতে পারিয়াছে, তাহার মন 'বন্ধন-মুক্ত' হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহারাই সন্ন্যাসী, ইহাই সন্ন্যাস। সংসারত্যাগী গতানুগতিক সন্ন্যাসীরা কেবল নটরাজের ভাঙন-মুখী চরণখানাই দেখিতে পাইয়াছে, তাই তাঁহার কাছে তাহাদের কোন গুরুত্ব নাই।

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত না হইলেও এক্ষেত্রে তাহার আলোচনা অসঙ্গত নয়, কারণ কবির নৃত্যতত্ত্বটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ইহাতে প্রকট।

জগৎ ও জীবন মিলিয়া যে বিশ্বব্যাপার তাহার মধ্যে কবি নটরাজের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।"

নটরাজের নৃত্যের তালেই কবির রসলোক হইতে সুপ্ত নির্ঝরিণী স্বপ্ন ভাঙিয়া জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়ে।

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁদে নৃত্যের ছায়া"
"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভানু"

নটরাজের এক পদক্ষেপ কবির রসলোকে আর এক পদক্ষেপ বহির্লোকে; বহির্লোকের পদপাতে অনুপরমাণু যে কেবল উন্মথিত

হইতেছে তাহা নয়, বিদ্রোহী বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

"তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।"

সুখদুঃখ সেই নৃত্যছন্দের তরঙ্গের ওঠাপড়া এবং জীবন-মৃত্যুর আক্ষেপ ও উল্লাসে সেই নৃত্যের ডম্বরুর ধ্বনি।

এ হেন নটরাজের কবিশিষ্য তিনি।

"নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি মন্ত্র ল'ব।"

"প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণ-তলে, তুমি মোর গুরু।"

"অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি,"

নটরাজের কবিশিষ্যের ইহাই সন্ন্যাস, কারণ গুরুর সঙ্গে বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াতে তাঁহার মন বন্ধন-মুক্ত। এই বিশ্বনৃত্যে তাল ভঙ্গ হইলেই নটরাজের অভিশম্পাত বর্ষিত হয়, তখন আবার দীর্ঘ সাধনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (শাপমোচন)।

"এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যে বেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী! আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা। তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগ্‌তো না, এটাকে পাগলামি বল্‌তুম।

"দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রাখবো না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করবো যাঁরা 'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ।' যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার লীলা।" পথে ও পথেরপ্রান্তে; পত্র ৪৭

কবি যাঁহাদের লোকহিত ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী বলিয়াছেন তাঁহারা নটরাজের ভাঙন-ধরাণো চরণখানার লীলাই দেখিতে পান, কাজেই তাঁহারা দেখেন, 'বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই।' কিন্তু কবির দৃষ্টি পূর্ণতর, তিনি নটরাজের নৃত্যের সবটা দেখিতে পান, কাজেই তাঁহার কাছে সবশুদ্ধ মিলিয়া বিশ্বব্যাপার সুন্দর—'বাস্তবের ময়লা ছেঁড়া পর্দাখানাই' একান্ত নয়। আর এই বাস্তবের অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পর্দাখানা অপসারিত করিয়া দিবার উপায় নৃত্য, শিল্প। নৃত্যের আনন্দের অভিঘাতে পর্দাখানা সরিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবের লক্ষ্মীছাড়া দরিদ্রনারায়ণই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ।

এই পত্রখণ্ডে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। কবি 'দরিদ্র নারায়ণের' রূপক লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবের রূপে বারংবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—নটরাজ যে শিবের অন্যতম রূপ।

উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির সাহায্যে কবির নৃত্যতত্ত্ব হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। এবারে তাঁহার নৃত্যনাট্য চারখানি লইয়া আলোচনা করা যাক্‌।

'শাপমোচন'

'শাপমোচনকেই' যথার্থভাবে নৃত্যনাট্য বলা চলে—কারণ শাপমোচনের শাপের হেতু গন্ধর্ব সৌরসেনের সংগীতকলায় তালভঙ্গ। নটরাজ জন্মমৃত্যু, ভাঙা গড়ার মধ্যে তাল রক্ষা করিয়া বিশ্বনৃত্য করিতেছেন, যে-হতভাগ্য তাঁহার তালের সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া না চলিতে পারিতেছে জীবনে তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এই রকম এক তাল ভঙ্গের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কিন্তু আর এক হিসাবে 'শাপ মোচনের' চেয়ে পরবর্তী তিনখানি নাটক সম্পূর্ণতর; প্রথমখানিতে কেবল ভাবাবেগের প্রকাশ; শেষের তিনখানিতে ভাবাবেগের সঙ্গে ঘটনার বেগও আছে।

"গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীত সভায় কলানায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের মন ছিল উদাসী। তাই অনবধানে তার মৃদঙ্গে তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হ'য়ে। স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হ'য়ে গেল, অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হ'ল গান্ধার রাজগৃহে।"

এইরূপে সৌরসেনের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ।

আবার এদিকে—

"মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইলো, বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিওনা, দেবী একই লোকে আমাদের গতি হোক্‌, একই দুঃখ ভোগে, একই অবমাননায়।' শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বল্‌লেন—'তথাস্তু, যাও মর্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।' মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।"

সৌরসেন তাল ভঙ্গের অপরাধে বিকৃত সৌন্দর্য অরুণেশ্বর হইল। তাহার কারণ নটরাজের দুই চরণের লীলা-সামঞ্জস্য যে দেখিতে না পায় জগৎ তাহার কাছে অসুন্দর।

মদ্ররাজ কন্যা কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বিবাহ স্থির হইল।

"রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্ক বিহারিণী বীণা। স্তব্ধ সংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ। যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।"

এবারে কমলিকার প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষা আরম্ভ হইল—কারণ ভগ্নতাল স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া দুঃখের অর্ধভাগও যে তাহার।

"নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূ সমাগম। কমলিকা বলে—'প্রভু তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'..........

"রাজা বল্‌লেন—'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট করো না এই মিনতি।'"

মহিষীকে দুঃখিত দেখিয়া রাজা বলিলেন, কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নাগকেশরের বনে সখাদের সঙ্গে তাঁহার নৃত্যের দিন। রাণী তখন যেন তাঁহাকে দেখিয়া লয়। চৈত্র সংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন। রাণী বলিলেন নাচতো দেখিলাম কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন কুশ্রী কেন?

"রাজা স্তব্ধ হ'য়ে রইল। কিছু পরে বল্‌লে, ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান। কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, মরুনীরস কালো মর্ত্যের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"

"রস-বিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে'—এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল। রাজা তার হাত ধ'রে বল্‌লে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

রাণী সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

"রাজা বল্‌লে—'তাই হোক, ভীরুতা যাক্‌ কেটে।' দেখা হ'ল। টলে উঠ্‌ল যুগলের সংসার। 'কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা'—বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।"

কমলিকা রাজগৃহ হইতে দূরে আত্ম-নির্বাসন করিল। রাণীর দুঃখের কারণ—সুন্দর ও কুশ্রী, আনন্দ ও দুঃখ মিলাইয়াই যে জগতের পরিপূর্ণরূপ—এ তত্ত্ব সে বোঝে নাই। অসুন্দর-ছাঁটা জগৎকে, দুঃখ-ছাঁটা জীবনকেই সে একান্ত ভাবিয়াছিল, কাজেই প্রিয়তমও তাহার চোখে কুশ্রী। বিরহের তপস্যায় এই পূর্ণতার বোধ তাহার মনে উদিত হইল—তখন চোখের দৃষ্টির উপরে

আর তাহার ভরসা রহিল না, তখনই সে প্রিয়তমকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিল।

রাণীর নির্বাসনের বনের প্রান্তে রাত্রির পরে রাত্রি রাজার বীণাধ্বনি ও নৃত্য চলিতে থাকে। এমনি করিয়া কিছুদিন যায়।

"রাজ মহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ আমি যাবো। আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।"

"বীণা থামলো। মহিষী থমকে দাঁড়ালো। রাজা বললে—ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।......

"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হ'ল।—এই বলে' মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে। কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার। কখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহ বেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হ'য়ে পড়ে গেছে।"

রাণীর যে দৃষ্টিতে রাজাকে কুশ্রী মনে হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ, এখন যে দৃষ্টিতে রাজাকে সুন্দর মনে হইল তাহা পূর্ণ। এই পূর্ণতা লাভের জন্য তপস্যার প্রয়োজন—এক্ষেত্রে বিরহের দুঃখই সেই তপস্যার তাপ। রাজাও বিরহের দ্বারা, দুঃখের গ্লানির দ্বারা ছন্দঃস্খলনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্যকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'

শাপমোচন ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তত্ত্ব অনুরূপ। প্রেমের মোহ ও প্রেমের মুক্তি মিলিয়াই প্রেমের পূর্ণতা। প্রেমে দুই-ই আছে, কিন্তু কোনটাই একান্ত নহে। যে কোন একটাকে একান্ত করিয়া দেখিলেই ছন্দঃপতন ঘটে—এবং দুঃখের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দু'জনেই প্রেমের মোহটাকেই একান্ত বলিয়া মানিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিতর হইতে আঘাত পাইয়া প্রেমের মুক্তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রেমের সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চন্ডালিকার রঙ্গমঞ্চের পুস্তিকায় ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে। এই ছায়াভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যাইবে খুব সম্ভবতঃ এই ধারণাটিও কবি জাভা হইতে পাইয়াছেন। জাভাযাত্রীর পত্রে একাধিকবার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে।

"সেখানে মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাত পাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলোকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চলাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গামেলান বাজে।" যাত্রী: জাভাযাত্রীর পত্র।

চন্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সুপরিচিত গ্রন্থ, কাজেই তাহাদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা দু'জনেই একই ভুল করিয়াছিল। খন্ডদৃষ্টিবশতঃ প্রকৃত সৌন্দর্য কাহাকে বলে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কমলিকার চোখে রাজা কুশ্রী, আবার অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা বুঝিতে পারিল নারীর ললিত সৌন্দর্য তাহাতে নাই। বিরহের তপস্যাতেই দুই জনের পূর্ণ দৃষ্টি-লাভ ঘটিল। স্বামী বিরহিতা তাপিতা কমলিকা পূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামীকে দিব্য সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতে পাইল। আর চিত্রাঙ্গদার বিরহ আত্মদ্বৈতে। দেবদত্ত সৌন্দর্যময়ী নারী প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে আড়ালে রাখিয়া সব সুখ যেন ভোগ করিতেছে—এই দুঃখই চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বলদান করিল; তখনই সে অনায়াসে দেবদত্ত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বরূপ সৌন্দর্য অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সাহস সঞ্চয় করিল।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতি দুইজনেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; মদনের বর ও মাতার নাগপাশ মন্ত্র। অলৌকিক উপায়েই দুইজনে সিদ্ধকাম হইল। ইহাতে প্রেমের মোহের পরিচয়।

কিন্তু আবার দু'জনেই মোহ ভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রেমের পূর্ণতার প্রাচুর্যেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কীর্তির পথে ছাড়িয়া দিল; প্রকৃতি আনন্দকে ছাড়িয়া দিল তাহার ধর্ম সাধনার পথে। একজনের বীর্য সাধনা, অপরের ধর্ম সাধনা নষ্ট করিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে খর্ব না করিবার ইচ্ছা। এমন যে করিতে পারিল তাহার কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে মিলন ও বিরহ মিলাইয়াই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ।

নাগপাশ মন্ত্রাবদ্ধ যে আনন্দকে প্রকৃতি পাইবার মুখে ছিল, সে তো তৃষ্ণার জলপ্রার্থী সাধন-সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্তি নয়; প্রকৃতি দেখিল মন্ত্রাহত এই পরিম্লান পুরুষ আগেকার মূর্তির ভগ্নাংশ মাত্র। হস্তগত প্রণয়াস্পদের ভগ্নাংশের চেয়ে ছাড়া-পাওয়া পূর্ণ মূর্তিকে প্রকৃতি কাম্যতর মনে করিল; তাই সে অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল। চিত্রাঙ্গদাও যে অনায়াসে অর্জুনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ছিল পাছে তাহার মুগ্ধ-সৌন্দর্যের লীলা তরঙ্গিণীতে বীরকীর্তি বিসর্জন দিয়া বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পূর্বতন অস্তিত্বের খন্ডাংশে পরিণত হয়।

শ্যামার সমস্যা, নিদারুণ, এবং তাহার পরিণামের মধ্যে সান্ত্বনার লেশ মাত্র নাই। কমলিকা, চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির ত্যাগের মধ্যেই তাহার তৃপ্তি আছে। কিন্তু শ্যামার ভাগ্যে নিদারুণ অভিলাঞ্ছনা ছাড়া আর কি জুটিল? উত্তীয়ের মৃত্যুর পাপের জন্য বোধ করি এইরূপ পরিণামের প্রয়োজন ছিল। পাপের দ্বারা লব্ধ প্রেম ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

অরুণেশ্বর, অর্জুন ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রসেনের ট্রাজেডি এই যে শ্যামাকে সে সত্যই ভালবাসে কিন্তু পাপবোধের চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিবার পথের অন্তরায়। তাহার অর্ধেক শ্যামাকে চাহে, অপরার্ধ সেই তৃষ্ণার ভৃঙ্গার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। সে জানে বিধাতা পাপীকে ক্ষমা করেন কিন্তু তাহার ক্ষমাহীনতার জন্য তাঁহার ক্ষমা নাই।

"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিণী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা॥"

নৃত্যনাট্য কয়খানির বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহাদের ভাবের সঙ্গে ভাব প্রকাশের বাহনের কি নিগূঢ় যোগ! যে-কোন ঘটনাকে নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করিলে চলিবে না, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। জাভার নৃত্যনাট্যগুলিতে ভাব ও ভাব প্রকাশের বাহনের মধ্যে এমন দেহাত্ম যোগ আছে—এমন মনে করা চলে না। ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অনিবার্য যোগ সাধনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। এই নৃত্যনাট্যগুলিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি পুরাতন সত্য; তাঁহার যৌবনের রচনাতেই তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ভাবকে নূতন বাহনের হাতে সমর্পণ করিবার দৃষ্টান্ত নৃত্যনাট্যগুলি। জাভাতে নৃত্যনাট্যের সজীব আদর্শ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আংশিক ঋণী; তাহার পূর্ণাদর্শ আমরা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে দেখিতে পাইলাম বলিয়া আমাদের ঋণ কবির কাছে পূর্ণতর।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা

৪৬ বৎসরের আবিষ্কৃত

স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্ষীণ ও দুর্বল দেহ সবল ও পুষ্ট হয়। অনন্তমূল ও তোপচিনি প্রভৃতি ৮০ প্রকার শোণিত শোধক ও বলকারক উপাদান এবং স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত এই অমৃত সালসা সকল ঋতুতে ও সকল বয়সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। যে কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হউক না কেন, সর্বাগ্রে তাহা সংশোধন করাই প্রধান কর্তব্য। এই শোণিত সংশোধন কার্যে অমৃত সালসাই সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। বাত, খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, শরীরে চাকা দাগ, দূষিত ক্ষত ও রক্তদুষ্টিজনিত শারীরিক বিকৃতি এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য অমৃত সালসা সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। অমৃত সালসার আরও একটি অদ্ভুত ক্ষমতা—**ইহা সর্বপ্রকার স্ত্রীব্যাধির মহৌষধ।** ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও অমৃত সালসা উৎকৃষ্ট টনিক। **গুণের পরীক্ষা**—অমৃত সালসা সেবনের পূর্বে একবার আপনার দেহ ওজন করিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, দেহের ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বলের সঞ্চার হইতেছে।

মূল্য ১ শিশি—১৲, ডাক মাশুল—৮০ আনা। ৩ শিশি—২৸৹, ডাক মাশুল—১৷৴৹ আনা।

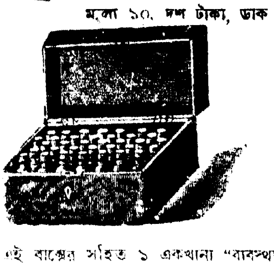
মহাশ্বাসারিষ্ট

শ্বাস, কাস ও হাঁপানীর একমাত্র মহৌষধ।

শ্বাস ও হাঁপানীর মত যন্ত্রণাদায়ক ও প্রাণান্তকর রোগ আর নাই। শ্বাসরোগ যেমনই কঠিন আমাদের মহাশ্বাসারিষ্ট তেমনই অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহার ২।৩ দাগ সেবনে শ্বাসের প্রবল টান বন্ধ হয়। নিয়মিত সেবনে চিরতরে শ্বাস ও হাঁপানীরোগ আরোগ্য হয়। ইহার শক্তি কখনও বিফল হয় নাই। মহাশ্বাসারিষ্ট হাঁপানী রোগীর পরম বন্ধু। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৹, মাশুলাদি ৷৴৹ আনা।

গৃহ চিকিৎসার বাক্স

মূল্য ১০৲ দশ টাকা, ডাক মাশুল ১৷৹ আনা।



সুলভে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রচার ও সর্বসাধারণের উপকারের জন্য বহু মূল্যবান ২৬ প্রকার ঔষধ সম্বলিত এই গৃহ-চিকিৎসার বাক্স বর্তমান দুর্দিনের বাজারে নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। এইরূপ একটি বাক্স প্রতি গৃহে থাকা একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসকগণও ইহার সাহায্যে প্রভূত লাভবান হইবেন। এই বাক্সের সহিত ১ একখানা "ব্যবস্থাপত্র" ও "কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা" নামক ১ খানা পুস্তক অতিরিক্ত উপহার দিয়া থাকি। এই বাক্সের ২৬ প্রকার ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ পৃথক লইলে প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ লাগিবে। প্রত্যেক প্রকার ঔষধ ৫ সপ্তাহ করিয়া থাকে।

মধুপর্ণা

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যই কুললক্ষ্মীগণের পরম সম্পদ। নীরোগ ও সুস্থ থাকিলেই সেই সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোগই সংসারে সুখ ও সৌন্দর্যের পরম শত্রু। বহু পরিশ্রম ও গবেষণালব্ধ আমাদের **'মধুপর্ণা'** নিয়মিত সেবনে যাবতীয় স্ত্রী-ব্যাধি অচিরে আরোগ্য হইয়া কুললক্ষ্মীগণকে অতুল সুখ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী করে।

মাসিক ধর্মের গোলযোগ, প্রদর, বাধক, গুল্ম, ঋতুগত ও জরায়ুগত দোষ এবং তজ্জনিত হাত, পা ও চক্ষু জ্বালা, মাথাধরা ও হৃদরোগ প্রভৃতি উপসর্গ দূর করিতে 'মধুপর্ণা'র সমকক্ষ ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে 'মধুপর্ণা'ই নারী সৌন্দর্যের অফুরন্ত আকর। তাই আজ প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অপরিসীম আদর। মূল্য ১ শিশি—২৷৹ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৴৹।



বিশুদ্ধ পদ্মমধু যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। নানাবিধ চিকিৎসায় যে সকল চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় নাই এবং ছানি না কাটাইলে যে চক্ষুরোগ আরোগ্য হইবে না বলিয়া ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, সেই চক্ষুরোগ আমাদের পদ্মমধু আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করিবে। মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ৮০ আনা; তিন শিশি ২৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ ৮০ আনা।

শিবশক্তি বটিকা

ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের যম

আর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বরে আমাদের বহু গবেষণালব্ধ শিবশক্তি বটিকার শক্তি অসাধারণ। সর্ব সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ কর্তৃক ইহা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না। বহু চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী শিবশক্তি বটিকা ব্যবহারে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছেন। মূল্য ১নং ১ কৌটা ৷৴৹ আনা, ২নং ১ কৌটা ৷৷৴৹ আনা, ৩নং ১ কৌটা ৮০ আনা। ডাঃ মাঃ ৮০ আনা।

মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৫৲
৩০ মাত্রা ১৷৹ টাকা।

ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—২০৲
৩০ মাত্রা ২৷৹ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৩০৲
৩০ মাত্রা ৪৲ টাকা।
ডাঃ মাঃ ৮০ আনা।

কবিরাজ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪।১নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ

১ শিশি—২৲, ডাঃ মাঃ—৮০

মৃগনাভি

আসামের—১ তোলা—
৫০৲ টাকা।
নেপালের—১ তোলা—
৪০৲ টাকা।

স্বর্ণভস্ম

১ তোলা—১২৫৲ টাকা।

বুদ্ধ ও মল্লিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চম্পানগরে 'সুবসন্তক'—বসন্ত উৎসব;
পথে উপবনে ভবনে-ভবনে উঠে তারই কলরব।
নগরীর নটী শ্রেষ্ঠ রূপসী গৃহবাতায়নে একাকিনী বসি'
মুক্ত আকাশে মেলি' দিয়া তার ক্ষুব্ধ নয়ন-মন,
জ্যোৎস্নাধারায় ভাসায় নীরবে বেদনার আবেদন!

সারা নগরীর বরসুন্দরী মল্লিকা নাম তার,
কৃষ্টিকলার শ্রেষ্ঠপ্রতিমা, মূর্ত্তি সে প্রতিভার;
কত রস-রুচি শিল্প যতনে বাঁধে বাসা তার ঐ দেহমনে,
নৃত্যে চিত্রে, সুরস বাণীতে তুলনা তাহার নাই;
যত জ্ঞানী-গুণী নিশি নিশি আসি' সঙ্গপিয়াসী তাই!

চম্পারাজ্যে যুগ-রীতি,—যে-বা রূপসী কণ্ঠহার,—
অনূঢ়া যুবতী,—প্রকৃতিরই মতো ভোগ্যা সে সবাকার!
জ্যোৎস্না যেমন স্পর্শ-উদার, মলয়া যেমন মুক্ত-দুয়ার,
সেবা-অধিকার তেমনই তাহার সবার অনুক্ষণ;
সৌরভসম অকুণ্ঠ তার রূপ-রস-যৌবন!

—সেই মল্লিকা, কত-না জনার কাম্য যে কামনার,
কা'র কামনায় আজি সে কাটায় বঞ্চিত নিশি তার?
যে পুর-গোষ্ঠী তা'র পাশে আসে নিতি সাঁঝে সুখসঙ্গপিয়াসে,
কোন্ বেদনায় দৃষ্টি তাহার করি' আজি পরিহার,
পর্ব্বযামিনী যাপে একাকিনী একান্তে আপনার!





সারা নগরীর সেরা যৌবন প্রণয়-ভিখারী তার;
একখানি মুখ শুধু তারই মাঝে মনে পড়ে বারবার;—
নগরপালের তরুণ কুমার নয়ন-মনের আনন্দ তার,—
আনন্দ নাম,—এ হেন সন্ধ্যা মিলন-বন্ধ্যা করি'
নবসাজ পরি' চোখেরই উপরি গেছে তারে পরিহরি!

কাব্যরসের দোসর যেজন, সঙ্গীত-সহকারী,
নৃত্যকলার ছন্দে-বন্ধে অভিজ্ঞ অধিকারী;
তা'রে ছাড়ি' আজি নিষ্ফল রাতি, নিষ্প্রভ চোখে চন্দ্রের বাতি,
নর্ম্মের সখা মর্ম্মের সাথী সে ছাড়া নাই যে কেহ;
নিজরূপে তাই লাগে ধিক্কার, নিজগুণে সন্দেহ।

অদূরে কোথায় ডাকিছে কপোতী,—নিশি যায়, নিশি যায়;
জ্যোৎস্না-বিভোল মত্ত মলয়া থেকে থেকে শিহরায়!
মধু-মালতীর মদির সুবাস অধীর উছাসে ফেলে নিশ্বাস;
পুরবাসী যবে মধু-উৎসবে ভরিছে রঙের ঝারি,
তারি মাঝে কাঁদে পড়ি' মায়া-ফাঁদে বসন্ত-রাণী নারী!

চতুর্দ্দশীর চন্দ্র লুকায় দূরে দিগন্তপারে;
ব্যথাতুরা নারী তেমনই জাগিয়া বসি' বাতায়ন-ধারে;
কত-না চিন্তা, কল্পনা নানা বিহঙ্গ সম ঝাপটিছে ডানা,—
আহত ব্যথায় পথ নাহি পায় বন্দ খাঁচার দ্বারে,
সহসা যেন-বা টুটিল দ্বন্দ্ব মনের অন্ধকারে!

—মনে হ'ল যেন পুষ্পবনের নিখিল গন্ধ হরি'
আকাশ ছাড়িয়া নামিল চন্দ্র আনন্দ-রূপ ধরি';
ধীরে ধীরে তার মুখে দিয়া চুমা, বলে নিশিভোর, ঘুমা সখি, ঘুমা,
অমনি ভাঙিল তন্দ্রাজড়িমা, ফিরে' এল সম্বিৎ,
বাতায়ন-পথে প্রভাতের বায়ু পশিলা আচম্বিত!

মনে পড়ে' গেল, গত বসন্তে হেন প্রভাতের কথা,—
প্রমোদবনের হিন্দোলে সেই চঞ্চল ব্যাকুলতা;—
ফুল-রাশি ছিঁড়ি ভাগ্যের হাতে যেদিন সহসা আনন্দসাথে
অঘটনমুখে সেই বুকে-বুকে চকিতের পরশন,—
সুধা-বিষে-মেশা সেই সুখনেশা, শঙ্কিত শিহরণ!

জাগ্রত চোখে পড়ে যেন সেই ক্ষণিক স্বর্গবাস,—
কৌমার ভাঙা সেই লাজে-রাঙা যৌবন উচ্ছ্বাস;
প্রেম-বোধ-হীন গত জীবনের নব জাগরণ দেহ ও মনের—
মদির-অধীর সেই দুজনের চপল চোখের চাওয়া,—
সেই বিহ্বল পলকের মাঝে আপনা হারায়ে-যাওয়া!

তারপরে,—সেই নৃত্যসভার উন্মদ মধু-নিশি,—
রক্তের সাথে স্মৃতির সুরভি আজও আছে যেন মিশি'!
সেই দুজনের সুখ-সঙ্গতি ছন্দ ও তাল, বন্ধ ও যতি,
সুরতরঙ্গে নন্দিত গতি নন্দন-সভাপথে,
সারা নগরের গুণী-রসিকের বন্দিত মনোরথে!

সুকৃতি-অন্তে ভাগ্যের মতো, হায়রে, ঘটিল কি যে—
সুর-সঙ্গতে কেটে গেল তাল—কেমনে সে বুঝেনি যে!
আনন্দ যেন আনন্দ নয়, কোথা গেল সেই প্রীতি-পরিচয়,
মল্লিকা মনে মানে বিস্ময়, কি যে তা'র অপরাধ,—
প্রণয়ের পথে যাহে জীবনের ফুরাইল সুখসাধ!

—কত অভিমান,—ভেসে গেল সব, সে মনে না পেয়ে সাড়া
সেতারের তার কেটে যেন তা'র, বেদনায় সুরহারা!
এই কি সে প্রেম, এই ভালবাসা! এই কি নারীর প্রাণান্ত আশা,—
এরি লাগি' এত প্রাণের পিপাসা করেছে সে পরিহার,
হায়রে প্রণয়, নারীর ভাগ্য! হায়, তা'র অধিকার!

রূপজীবিনী সে,—নগরপালের গ্রহণ-যোগ্য নয়,—
বন্ধুর মুখে ইঙ্গিতে শুধু পেয়েছে সে পরিচয়!
প্রেমবন্ধন—তারও জাতিকুল! সমাজধর্ম—সেই নির্ভুল?
প্রাণের ধর্ম করে নির্মূল বিধি-নিষেধের মানা,—
মানুষের গড়া আচার,—সে দিবে দেবতার দ্বারে হানা!

প্রাণের মন্ত্র অপৌরুষেয়,—বেদের উপরে স্থান,—
সাক্ষী তাহার অন্তরবাসী মানুষের ভগবান।
সংহিতা আর শাস্ত্রের বুলি চিত্ত তাহার তুলিল ব্যাকুলি',
তৃতীয় দৃষ্টি গেল যেন খুলি' সহসা তাহার ভালে,
ক্রুদ্ধ বাঘিনী জাগিয়া উঠিল মনের অন্তরালে!

—লইল শপথ,—করিবে না ক্ষমা, জীবন থাকিতে তার,
দৃষ্ট ছাড়িয়া অদৃষ্ট-হাতে অসহ অত্যাচার!
যেথা প্রাণ, সেথা শ্রদ্ধা তাহার, তুচ্ছ আচার করি' পরিহার,
বিচারের বলে প্রাণের ধর্ম মানিবে সে শুধু আজ,
নির্যাতনের ভয় নাহি গণি', অপবাদে নাহি লাজ।

বিদ্রোহ তার অন্তরে জ্বলে, বিদ্রোহ বাণীমাঝে,
দু'টি চোখে তার বিদ্রোহ-জ্বালা বহ্নিশিখায় সাজে!
অতীতের রূপ—কোথা গেল আজ, নয়ন-ভোলান' প্রসাধন-সাজ
করিবে না আর,—সে যে বড় লাজ—প্রণয়ের অপমান;
বিদ্রোহে তার জাগিল নারীর মূর্ছিত সম্মান!

—শুধু এক ব্যথা,—আনন্দ লাগি' প্রাণ করে হায়, হায়!
প্রেম-অঙ্কুরে অমর যে তরু, অনাদরে সে কি যায়?
মৃণাল-দণ্ড—যদি ভাঙ তারে, অন্তরে তার সূত্র না ছাড়ে,
মমতা-ফল্গু—বালির বেলায় সে কি কভু বাঁধা পড়ে?
গোপন-বাহিনী আপনা লুকায়ে শতধারে সে যে ঝরে!



(২)

রাজপুরীদ্বারে জাগিল প্রহরী, প্রভাতী উঠিল বাজি',
পূর্ব আকাশে উদিল অরুণ বাসন্তী রঙে সাজি';—
সহসা ডঙ্কা পড়ে চারিভিতে— আজই প্রাতে এই চম্পাপুরীতে
উদিবেন আসি' পূর্ণাতিথিতে পূর্ণচন্দ্রসম—
প্রভু ভগবান সুগত বুদ্ধ চিরপুরুষোত্তম।

অমাত্যগণসঙ্গে নৃপতি অমনি পদব্রজে
নগর-তোরণে বরিতে চলিল বুদ্ধের পদরজে।
পৌরবৃন্দ চলে সাথে-সাথে যার যা' সাধ্য, উপায়ন হাতে,—
আবালবৃদ্ধ লভিতে প্রভুর দুর্লভ দরশন;
উৎসব ভুলি' নব উৎসাহে মাতিল সবার মন।

রাজপুরীমাঝে সজ্জিত সভা মর্ম্মর চত্বরে,
শতেক স্তম্ভে চন্দ্রাতপের শুভ্র বিতান ধরে।
কারু প্রচ্ছদে চারু শিলাতলে চিত্রলিখন—শ্বেত শতদলে,
মুক্তার মালা ঝুলিছে ঝালরে অজস্র অগণন;
একান্তে তারই তথাগততরে স্বর্ণ-সিংহাসন।

সহস্রদল পদ্ম যেন সে ফুটিল কনক-সরে;
শুকতারা সম আয়ত নয়নে দীপ্ত করুণা ঝরে!
মুণ্ডিতশির সন্ন্যাসীদল গৈরিক যেন গঙ্গার জল!
ঢালে শ্রাবণের বন্যার ধারা জনসমুদ্রমাঝে;
গদগদনাদী গোমুখী যেন-বা মানবকণ্ঠে বাজে!

স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ দেব, অমিতাভ ভগবান!
'শরণং গচ্ছামি' বলি' সবে বিকায় মনঃপ্রাণ।
চারিপাশে যেন ভিক্ষুকদল, ভিক্ষু হইতে বাসনা প্রবল,
পরশি' প্রভুর চরণকমল গাহে সঙ্গীতি-গান—
জয় জয় জয় শাক্যতনয়, স্বাগত অধিষ্ঠান!

বন্দনাশেষে বুদ্ধ তাঁহার তুলিয়া পদ্মপাণি
আশিসি সবারে ধীরগম্ভীরে বিলান অমৃতবাণী:—
জীবন-নাটের যবনিকা তুলি' মর্ম্মদৃশ্য দেখাইল খুলি'
দুঃখ-শোকের বিয়োগান্তক যত-কিছু অভিনয়:—
মিথ্যা জীবন, মরণের হাতে নিতি যা'র পরাজয়!

রূপ-যৌবন মিথ্যা সকলই, মৃত্যু সত্য-সার;
প্রজ্ঞা সমাধি শাসনে কেবল পায় জীব উদ্ধার;
দুঃখশোকের শান্তি লভিতে সিদ্ধি সাধনা চাই সমাধিতে,
বাসনার বীজ থাকিতে নরের নাহিক মোক্ষ-আশা,
ভোগের তৃষ্ণা ভুলাইতে নারে দুঃখের দুর্বাসা!

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি চলিল তত্ত্বকথা;—
সব সভাজন একমনে যেন পান করে সে বারতা!
নূতন দৃষ্টি লভি' আজি সবে দীন যেন ফিরে' পায় বৈভবে,
সূর্যের আলো যেন-বা পড়িল অন্ধনিশির বুকে,—
মুক্তি-তরণী মিলিল সহসা বুদ্ধ-কারার মুখে!





সারাদিন ধরি' শুনিল সকলে, অসীম ভাগ্য মানি',
মানবমনের মুক্তি-নিদান বৈরাগ্যের বাণী;
ভিক্ষুদলের গেরুয়াবর্ণে চম্পাবাসীর মানসপর্ণে
ঘনতর হয়ে ঘনাইল রং গৈরিকরাঙা বাসে;
বুদ্ধচরণে যতেক যাত্রী মিলিল মোক্ষ-আশে।

অযুতকণ্ঠে বৈরাগ্যের উঠে জয়-জয়নাদ;
পূর্ণিমাচাঁদ করে শুধু হেসে জ্বলন্ত প্রতিবাদ!
দলে-দলে লোক লভিয়া দীক্ষা করে বুদ্ধের করুণা ভিক্ষা,
শিষ্যপ্রধান আনন্দ শুধু প্রভুর চরণতলে
ভিক্ষা জানায় জুড়ি' দুই পাণি, তিতিয়া নয়নজলে।

"জানি, দেব, তব অহেতুকী কৃপা এ অধমে সর্বদা,
তবু কেন দীনে মিলিলনা আজও তব 'উপসম্পদা'?
বৈরাগ্যের গৈরিকবাস পায়নি শুধু এ অক্ষম দাস,
সবার অঙ্গে তব পবিত্র পতাকা দেখিতে পাই,
শ্রীচরণে মোরে ঠাঁই দিলে প্রভু, তবু তা যে মিলে নাই!"

(৩)

বিরল বসনে বিরল ভূষণে হেনকালে মল্লিকা—
আঁখি-কোণে চাপা অশ্রুর আড়ে দু'টি প্রদীপ্ত শিখা!—
বুদ্ধচরণে নমি' বারবার জানায় কাতরে নিবেদন তার,
"তব নব বাণী শুনিয়াছি স্বামি,—সে শুধু কথার মোহ,
অসত্য সেই তত্ত্বের মোর উত্তর,—বিদ্রোহ!

বিধির বিধানে বিশ্বের বুকে তুমি আদি-বিদ্রোহী;
তোমার বাণীর বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ-কেতু বহি।
ভিক্ষুতে তা ভরিলে জগৎ   রুদ্ধ হবে এ সৃষ্টির পথ,
ধর্ম তোমার বিশ্বনাথের বিরুদ্ধপথগামী;—
তোমার সত্য আমার মিথ্যা, তাই বিদ্রোহী আমি।"

শান্তনয়নে চাহি' তার পানে রহিয়া কতক্ষণ,
অরুণ হইল বুদ্ধের আঁখি, করুণ হইল মন।
শ্রীকরপদ্মে অতি ধীরে ধীরে   পরশটি তার বুলাইয়া শিরে—
স্তব্ধ হইয়া প্রভু ভগবান রহিলা নিরুত্তর,—
তুষার গলিয়া ঝরি' পড়ে যেন করুণার নির্ঝর!

ক্ষণপরে ধীরে কহে মল্লিকা কাটাইয়া অবসাদ,
"ক্ষমা কর প্রভু, অবোধ জনার অবিনয়-অপরাধ।
দুঃখ-সুখের নূতন তত্ত্ব,   যেমন করেই বল সে তথ্য,
মোর কাছে শুধু নয় অবোধ্য, অসত্য অতিশয়;
জরা ও মরণই সত্য যদি সে,—যৌবন কেন নয়?

ফুলের গন্ধ ফুলের সুষমা মিথ্যা তোমার কাছে,—
বর্ণ গন্ধ সবই যদি মায়া,—সে কি ফিরে' মরিয়াছে?
পূর্ণিমা-চাঁদ হোক্ মায়া-ফাঁদ   আঁধার-কায়ার সে যে প্রতিবাদ!
ত্যাগের অর্থ কোথা থাকে, যদি ভোগেরে কেহ না মানে?
প্রকৃতিরই তা'রা যমজ-পুত্র সৃষ্টির উপাদানে!

যে কামনা মোর রক্তে নাচিছে, সেই তো জীবন মোর;
প্রাণতরঙ্গে মুক্ত-ধারা যা', সে কি বন্ধনডোর?
বাসনাই মোর সৃষ্টির মূল,   তা'রে বল' প্রভু, দৃষ্টির ভুল?
আলোক-বাতাস সার্থক কিসে? আমারই তো ইচ্ছায়,—
মোরই কামনায় মূলরস পেয়ে তবে তারা প্রাণ পায়।

হিংসার কথা তুলিও না প্রভু, হিংসায় বাঁচে প্রাণ,—
একেরে রাখিতে শতেকে মারেন স্রষ্টা যে ভগবান!
এই জীবলোকে সজনে-বিজনে   গিরি-অরণ্যে গৃহে তপোবনে,
বিশ্ব ভরিয়া নিত্যনিয়ত যে সৃষ্টিলীলা চলে,
হিংসাই তার প্রধান মন্ত্র—উদ্গীত পলে পলে।"

সুস্মিত মুখে বুদ্ধ তথাপি রহিলা বাক্যহীন;
যুক্তি যে তার ক্ষুরধার, বুঝি, বুঝে তাহা উদাসীন!
আশিস্-হস্ত রাখি' তার শিরে   স্নেহের আদর বুলায় সে ধীরে,
শুভ্রললাটে চিন্তার রেখা বুঝি-বা ফুটিয়া উঠে,—
পুষ্পের বুকে পিপীলিকাসম পূজার পত্রপুটে!

(৪)

চম্পানগরে আজি বুদ্ধের এল বিদায়ের পালা,
বিজয়ার ছায়া শ্রীহীন করেছে বিজয়োৎসবশালা!
রাজ্যের লোক নূতন ধর্মে   ছোপায়ে বসন মনের মর্মে
প্রভুর কৃপায় ভিক্ষু-দীক্ষা লয়ে যায় দলে-দলে;
নানা উপদেশে স্তবে আরাধনে রাত্রি বাড়িয়া চলে।

বুদ্ধ আদেশে আনন্দ আসি' শুভদীক্ষার তরে
নতজানু হয়ে প্রভুর সমুখে বসিল ভক্তিভরে।
'উপসম্পদা' সবে সুরু হয়,—   মল্লিকা আসি' এ হেন সময়
বন্যার মত ভাঙিয়া পড়িল বুদ্ধের রাঙা পায়;—
অনুচ্চারিত রহিল মন্ত্র,—বিস্ময়ে, বেদনায়!

কুন্তলভার ধূলায় এলায় প্রভুর চরণ-ঢাকি';—
পদ্ম বেড়িয়া লুটে যেন বাণ-বিদ্ধ বনের পাখী!
কাঁদি' কহে, "দেব, বড় দয়া শুনি,   মোরে করি' লহ তব ভিক্ষুণী
আজি হ'তে তব অপার কৃপার সঙ্গ না যাব ছাড়ি',
সুখহারা এই শূন্য জীবন আর তো সহিতে নারি।"

উত্তরে শুধু কহিলা বুদ্ধ করুণাসিক্ত স্বরে,
"মল্লিকা, শোন উপদেশ মোর ফিরে' যাও তুমি ঘরে;
চম্পায় যবে ফিরিব আবার,   স্নিগ্ধ হইবে বাসনা তোমার,"—
এত বলি প্রভু যাত্রার লাগি' ত্বরিতে দাঁড়ায়ে উঠে;
মল্লিকামুখে, কি ভাবি, না জানি, আনন্দালোক ফুটে!

চম্পা হইতে সেই যাত্রাই হইল তাঁহার শেষ;
সুভাষিতামৃতে ধর্মবাণীতে ভরি' দিয়া দিক্‌দেশ,
হিরণ্যবতী নদীর ওপারে   কুশীনগরের অরণ্যধারে
ভিক্ষুপ্রয়াসী আনন্দ কোলে মাথাটি রাখিয়া তা'র—
শেষ-নিঃশ্বাসে রক্ষিলা প্রভু নশ্বর দেহ-ভার।



(৫)

কয় বৎসর গেছে তারপর, তথাগত কথাশেষ;
বুদ্ধ-কিরণ সম্পাতে ধীরে উজ্জ্বলি, উঠে দেশ।
সঙ্ঘের কাজ লয়ে নিজ হাতে   আনন্দ নব উৎসাহে মাতে,
কর্মের ভার বহি' চলে তার শুধিতে প্রভুর ঋণ;—
কস্তুরীমৃগ আপন গন্ধে ছুটে যেন নিশিদিন!

উদয় হইতে অস্ত অবধি বিশ্রাম নাহি জানে;
যেথায় রাত্রি, পথের যাত্রী দেহ ঢালে সেইখানে।
কোথা নালন্দা, বিদিশা, কোশল,   কোথায় মথুরা, পারা, পিপ্পল
নূতন ধর্ম প্রচারের লাগি' উদ্যম অনিবার,—
আর্যাবর্ত জুড়ি' বুদ্ধের পড়ে জয়-জয়কার।

—চম্পার সেই মধুপূর্ণিমা, গত সে তো কতদিন,
জ্যোৎস্নায় মেশা কত সুখনেশা সেই হ'তে স্মৃতিলীন;
কত দক্ষিণা-বায়ু-বসন্ত   ফুলবাস বয়ে হয়েছে অন্ত,
যৌবন-বনে কত বিহঙ্গ দিয়া গেছে সুখসাড়া,—
প্রভুর কৃপায় আনন্দ কাছে সবই আজি সুরহারা!

—একখানি মুখ তবু থেকে থেকে চোখে ভেসে উঠে তা'র,—
কামনায়-গড়া সেই মায়াভরা মুরতি মল্লিকার!
প্রভুর স্নেহের শ্রেষ্ঠাধিকারী বাক্‌বৈভবে অপূর্ব নারী,
ভিক্ষু-দীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে যা'র লাগি' বারেবার,
বুদ্ধ আদেশে সঙ্গ যাহার করেছে সে পরিহার!

নীতি, উপদেশ, আচার, ধর্ম, দশশীল ব্যাখ্যান—
গুরুর যা-কিছু গ্রন্থে গাঁথিবে—এই আজি তা'র ধ্যান।
মীমাংসা তারই করিবারে স্থির অর্হৎসাথে যতেক স্থবির—
সঙ্ঘমিলিত মহাসঙ্গীতি করেছে সংগঠন,—
রাজগৃহে আজই সপ্তপর্ণী গুহায় সে আয়োজন।

উঠে কলরব, শুভ উৎসব—সময় প্রভাতকাল;
গেরুয়া-ছটায় রৌদ্রের আলো রাঙিয়া হয়েছে লাল!
দিক্‌দেশ হ'তে সভার জন্য মিলিয়াছে আসি' জন-অরণ্য,—
কত উপাসক, কত দর্শক, কত-না ভক্তজন—
বারাণসী হ'তে শ্রাবস্তী-সীমা—অপূর্ব সে মিলন!

শোভাযাত্রায় চলে আনন্দ স্থবির দলের মাঝে,
বুদ্ধদেবের জয়গান সাথে তূর্য-ডঙ্কা বাজে।
পুষ্পে ও লাজে ভরে' ওঠে ঠাঁই, লোকারণ্যের সীমাশেষ নাই;
বিরাট জনতা দ্বিধা-বিভিন্ন ধীরে দেয় পথ ছাড়ি',
—এ হেন সময় রুদ্ধশ্বাসে কেবা আসে ঐ নারী!

(৬)

মল্লিকা আসি' সহসা ধরিতে বসনপ্রান্তখানি,
চমকি' থমকি' থামে আনন্দ, মুখে নাই তা'র বাণী!
প্রভুর আদেশ করিয়া স্মরণ চকিতে টানিয়া লয় সে বসন,—
সবল মুঠির কবল হইতে নিষ্কৃতি নাহি তবু,
ডাকে মনে মনে, "অশরণ জনে উদ্ধার কর, প্রভু!"

রুদ্ধকণ্ঠে কহে মল্লিকা,—"জানি তব পরিচয়,
আনন্দ মোর, বন্ধু আমার, তুমি তো ভিক্ষু নয়!"
রুদ্ধ প্রেমের দীপ্ত গরিমা ক্ষুব্ধ প্রাণের দৃপ্ত মহিমা
সৌন্দর্যের নাহি বুঝি সীমা আজি সে মল্লিকার;
শতজন্মের বাসনার শিখা চক্ষে জ্বলিছে তা'র!





প্রচণ্ড বলে আনন্দ তা'র বসন লইল টানি',—
সে শক্তি কিসে ব্যর্থ করিবে অবলার ক্ষীণ পাণি?
সেই গুরুবেগে পড়ে সে ধরায়, শিলা-সংঘাতে চেতনা হারায়!
কুণ্ঠাবিহীন চলে আনন্দ না করিয়া দৃক্‌পাত,
দ্রুততর পদে, ছাড়ায়ে যেন-বা মোহন মারের হাত!

গিরিগুহাতলে মহাসঙ্ঘের নৈষ্ঠিক্ প্রথামত
সিদ্ধান্তের মন্ত্রণা লাগি' মাতে অর্হৎ যত।
পঞ্চ বল ও সপ্ত আচার, সূক্ষ্মতত্ত্ব, বিনয়, বিচার,
অহিংসা, শুচি, খাদ্য ও রুচি, সমাধি ও নির্বাণ;
তর্কে, আলাপে, মন্ত্রে ও শ্লোকে কেটে যায় দিনমান।

আগত গোধূলি,—কাটিল না তবু মূর্ছা মল্লিকার;
ভক্তেরা ভাবে—ভক্তির কিবা শক্তি চমৎকার!
এই তো প্রভুর সমাধি-সাধিকা, এই তো মুক্তি ধর্মোপাসিকা,
আনন্দ শুধু উন্মনা হ'য়ে চাহে দিগন্তপানে,—
দিনান্ত-চিতা যেথা হ'তে তা'র রক্ত নয়ন হানে!

সন্ধ্যাপরশে চেতনা লভিয়া ধীরে উঠে বসে নারী—
উৎসের পাশে দ্বিতীয় উৎস,—নয়নে উৎস-বারি!
সভা-শেষে যবে জন-অরণ্য শতমুখে গাহি' ধন্য ধন্য,
এই পথ দিয়ে ঘরে ফিরে—গাহি' বুদ্ধের জয়গান,—
তারি পাশে বুঝি শিহরিয়া উঠে দুঃখীর ভগবান!

(৭)

রাজগৃহ আজি ধ্বংসাবশেষ,—কেবা করে কা'র নাম?
কোথা বৈভার, সপ্তপর্ণী, কোথায় তপোদারাম!
কোথা অহিংসা, কোথায় শান্তি? চিরমানবের মনের ভ্রান্তি
তেমনই চলিছে—সেই আগে-পিছে জরা-মরণের পথ,—
দুঃখ-সুখের যুগাশ্বে চলে বিশ্বনাথের রথ!

সুখ-দুঃখের অতীত জীবন গড়িতে নূতন করি'
ত্যাগের ভিত্তি রচিলাম আশা ভোগেরই রাজ্য ভরি'!
—কোথা গেল সেই পুণ্যকীর্তি কোথায় বা সেই ত্যাগের ভিত্তি?
যেমন মানুষ তেমনি চলিছে প্রকৃতির নির্দেশে,—
বাসনা হারায়ে মানুষ সে তো আর পাথর হ'ল না শেষে?

কামনার হাতে নিষ্কৃতি পেতে, পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
জড়ত্ব লাগি' তপস্যা যে-বা, চাহি' মোক্ষের মুখ;—
কৃচ্ছ্র-কঠিন সেই যে সাধনা— যদি বলি, সেও নূতন কামনা,
সহজ মার্গ এড়ায়ে সে শুধু অন্য ভিন্ন পথ,—
সন্ন্যাসী যাহে ঘর ছেড়ে যায় মরু-দরি-পর্বত!

দিনরাত্রির আঁধারে-আলোকে চলেছে কালের চাকা,
বাহি' বিচিত্র সৃষ্টির লীলা—বিভিন্ন রঙে আঁকা!
প্রকৃতির চির-নৃত্য-সভায় ছয় ঋতু নাচে ধরা-আঙিনায়,
শ্যামল-স্বর্ণ বিবিধ বর্ণে বারে-বারে ঘুরে-ফিরে;
চলিয়াছে চির-আরতি-নৃত্য নটরাজ-মন্দিরে।

বৈরাগ্যের গৈরিকে নাহি যায় রক্তের রাঙা!
ধরণী ভাসায় যে অশ্রু,—সে কি ছাড়ে বৈরাগী-ডাঙা?
ভগবান এসে বলে যায় ভুল, সে ভুল কাটে না তবু একচুল!
বাসনা-কামনা তেমনই চলিছে মানবের সুখে-দুখে,
প্রণয়ের শিখা তেমনই জ্বলিছে প্রেমিকের বুকে-বুকে!

রাজগিরি-বুকে আজও হেরি' সেই উষ্ণ-প্রস্রবণ,
মনে হয়, বুঝি—মল্লিকারই সে অনন্ত ক্রন্দন!
কত-না বিহার, স্তূপ নবরূপে পরিণত আজি ধ্বংসের স্তূপে;
বিরহের চোখে অশ্রুধারাতে নিভে না সে প্রেম-শিখা;
—তাই ভাবি, একি! কা'রে ফিরে' দেখি—বুদ্ধ, না মল্লিকা?

যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপর বর্তমান গাথা-কাব্যটির রচনা সম্ভবপর হইয়াছে, দিল্লীর সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত মহাশয়ের 'মল্লিকা' আখ্যানটি তাহার অন্যতম। ভারতের বিচারসহ ইতিহাস নাই; তাই, বুদ্ধদেবসংক্রান্ত আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার ইতিকথার উপাদানের উপর লিখিত বর্তমান প্রেমমূলক কাব্যখানির সৌকর্যার্থ অনেকখানি কল্পনার রং চড়াইতে সাহস করিয়াছি। কারণ কাব্য কাব্যই, ইতিহাস নহে।—লেখক।





১

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী

প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে আমায় চিন্তিত করে' তুলেছিল তার আর ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড়? ক'হাত লম্বা ক'হাত চওড়া চিঠি চাও? শেলী রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয়



তুমি আমার মনের কত নিকটে

কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটন' ফরমাস করে' বসছ কেন, পর তো দুল হঠাৎ 'পাইজোর' চাইছ কেন বুঝতে পারছি না। যাক্—চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কি করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী হয়েছিল কিন্তু। আমার গা ঘেঁসে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই
তোমার চিঠি আশা করছি। দু'একদিন পোস্টা-
ফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই
খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে
কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পর্
গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে
কিন্তু। তুমি লিখেছ, "ভগবান বোধহয়
করে' বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত গানের
একেবারে নষ্ট করে' দেন নি। ভগবানের
দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গা
কি দরকার......"

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে
প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ,
করে' তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আ
গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কি
দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবানে
আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আ
সিসুর জন্যে অনুরোধ করতাম একট
বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি
জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারে
আমি যেমন করে' হোক পাঠাব। লি
শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে
যেটা পরে শিখব বলে' ফেলে রেখেছি
শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো
অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই,
আরম্ভ কর সেতার।

......এখন রাত্রি অনেক। রাস্তায়
চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে
বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কা
প্রৌঢ় 'টাইম পীসটি' কেন জানি
সাতটা এগারো মিনিটে থেমে
যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ
যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হ
হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের

ংস্না উঠেছে। আমার কিন্তু
ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল
চাঁদিনী প্রাণ উনমাদনী"—
চেয়েও—
পাত মোদিত
মাতিয়া
চ ডাহুকী
তিয়া
ল লাগে আমার।
র মুখের তুলনা
প্রিয়া ছিল না,
ও লাগে নি।
দের কোন-
একটুও
চাঁদের
রেই।
নয়ে
ছ,

পাচ্ছি তুমি শুয়ে ঘুমুচ্ছ...এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের উপর...কান দু'টি চুল দিয়ে ঢাকা...চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছ......

২

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

একি শুধু কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্বে এ'র সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে করে' দেখলাম ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোছের। সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন কাটল। ক্রমশঃ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে চিনতে পারি নি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এ'রই সাতটি সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম। কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ রতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ টে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক লন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া জের লোক ছিলেন। পান থেকে চূণ উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভাল-। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও তেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। লে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে ', কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও নেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন ীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। র ওঁর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে তেন জানি না। মোট কথা, আমি রিনি ওঁকে। একটা জিনিস কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে ান অকর্তব্য করেন নি। আমাদের তক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি। 'চে ছিলেন, আমাদের কোন কষ্ট ছিল র পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের রে' গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শহরে পাকা বাড়ি করে' গেছেন, লাইফ ওরেন্স করে' গেছেন। সেদিক দিয়ে র কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে একটা অভাব বোধ করছি বই কি। কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন নি (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, াতেন না কিছু) তবু এটা আমি ব যে, তিনি আমাকে ভাল-দনের সে ঘটনাটা ভুলব না

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, "চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে, তেকে পাঠিয়েছি। চললুম—"

"কোথায়?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে,—"

"ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোন্‌টা গাইব।"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, গান' না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে..."

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে।



একেবারেই চিনতে পারছো না—না?

যে কোন লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুল মাসীর গলার স্বরও নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

৩

নীলিমার চোখমুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে!

"আমাকে ডেকেছ কেন?"

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "আমাকে চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার?"

"না।"

"একটুও না?"

"না।"



বোবা কান্না

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"চৈতে কুয়া, ভাদরে বান,—নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।" খনার বচনে আছে। তেরশো পঞ্চাশ সালের কার্তিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াসা হয়েছিল কিনা—একথায় কেউ বলে—ওরেঃ বাপরে! একবারে কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত চারিদিক ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই? কেউ বলে —হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা ক'রে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে যার অর্থ হ্যাঁ অথবা না দুই হ'তে পারে। কেউ বলে—উঁহু! নাঃ; তা' ছাড়া চৈত্রে কুয়াসার সঙ্গে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায় তা' ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত, তার ওপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলে—যে দেশে আকাশে অমাবস্যে লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াসা হ'লে আট মাস পরে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চটেও ওঠে—বলে—মা চণ্ডী আছেন, শনি-সত্যনারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের—তাদের কাছে যাও না। রাত দুপুরে আমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াও গে রুগীকে—ওষুধ দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভট্টাচায্যির কাছে; যা—ভাগ—ভাগ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের ভয়ানক রাগ ওই ভট্টাচায্যির ওপর। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য—চণ্ডীমায়ের পূজক প্রবীণ মানুষ—অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে এতটুকু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বুজে ধ্যান করতে ব'সে—চোখের কোন থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌঢ়ের ঠোঁট দুটি কাঁপে —লোকে বলে—গভীর রাত্রে নির্জনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরা ভট্টাচায্যির কথাবার্তা হয়। পাথরের মূর্ত্তি থেকে মা না কি বেরিয়ে এসে ভট্টাচায্যির মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। অদ্ভুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্যন্ত কখনও ওষুধ খান নাই। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা—গায়ে কখনও জামা কি চাদর কিম্বা আলোয়ান কিছু দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ে জুতোর কথা এর পর বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ গাঁয়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচায্যির গল্প করে—তারা অন্ততঃ প্রয়োজন বোধ করে না। ভট্টাচায্যি হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন—উই পোকার পক্ষোদ্গমের আস্ফালন। দু-জনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চলে আসছে।

এই ঝগড়া চলে আসছে নেপথ্য দ্বন্দ্বের মত। দু-চারবার মুখোমুখী ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল ত্রিপুরা ভট্টাচায্যির ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচায্যের নাতির জ্বর হয়েছে; সাতদিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোনক্রমেই বাগ মানে নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, পেটে বেদনা, মাথায় যন্ত্রণা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে ভুলও বকছে রোগী। ভট্টাচায্যের ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধ'রে বলেছিল—ডাক্তার বাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল—ত্রিপুরা ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচায্যির ছেলের আকৃতিতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভদ্রলোকের দু-চোখের কোণ থেকে জলের দু'টী ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাত্মীয়ের মত বললে—এ কি? তার জন্যে আপনি কাঁদছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চলুন এখুনি আমি যাচ্ছি, ভয় কি! আমি বলছি ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

ভট্টাচায্যির ছেলের নাম গিরিজা; গিরিজা চোখের জল মুছে একটা গম্ভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে,— বাবা বলছেন ডাক্তার

বাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে উঠে তার গলার ভেতরটা যেন চেপে ধরলে, শুধু ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঝড়ো হাওয়ার তাড়নায় অশ্বত্থের পাতার মত।

—কি বলছেন আপনার বাবা? রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মসৃণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

অনেক কষ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ করে বললে—বাবা বলছেন—ডাক্তার ডাকবি ডাক, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে—মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ করে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছের কথা ত্রিপুরা ভটচায নিজেই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সংগে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল বক্স থেকে ওষুধ বের করে নিজে হাতে মিকশ্চার তৈরী ক'রে দিলে, ইনজেকসন দিলে, একখানা কাগজে যথা সম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা ভটচায একটি কথাও বলেন নি। এবার অদ্ভুত একটু হাসি হেসে বললেন—দেখলেন?

—দেখলাম। টাইফয়েড। দেখাতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা ভটচায নীরবে আবার একটু হাসলেন।

ডাক্তার বললে—রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা যাক। ভয় নেই সেরে যাবে।

ভটচায ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সুস্পষ্ট।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে—আপনি কি মানুষ?

ভটচায বললেন—মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোন হাত নাই।

—কি বলছেন আপনি?

—ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভটচায বললেন—সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—; কথা অসমাপ্ত রেখে ত্রিপুরা ভটচায আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে—আপনি এসব বলবেন না ও'দের কাছে। ও'রা নার্ভাস হ'লে সেবা যত্ন ঠিক মত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

ত্রিপুরা ভটচায বললেন—মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তারবাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়—ও রোগ মৃত্যু রোগ।

শুধু একদিন নয়, আটাশ দিন পর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলল; এই আটাশ দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একুশ দিনই ত্রিপুরা ভটচায ওই একই কথা বলেছেন—একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শান্তভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর বসে ডাক্তারের রোগী দেখে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফিজের কথা বলে নাই ওষুদের দামের হিসেব রাখে নাই, নিজে থেকে প্রত্যহ দুবার করে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বুঝলে রাত্রে পর্যন্ত থেকেছে; আঠারো দিনের রাত্রে, একুশ দিনের রাত্রে, আটাশ দিনের রাত্রে সে সমস্ত রাত্রি রোগীর বিছানার পাশে ঠায় জেগে ব'সে থেকেছে। আটাশ দিনের রাত্রে তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

ত্রিপুরা ভটচায দাওয়ার উপর বসেছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন—তারা মা! তারপর সুস্পষ্ট একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"সকলি তোমারই ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

ডাক্তার রূঢ় স্বরে বললে—না। আপনার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আজকের ক্রাইসিস কেটে গেছে।

ভটচায আজ চমকে উঠল।

ডাক্তার বললে—কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে চলবে মনে হচ্ছে। সবিস্ময়ে ভটচায ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হ'ল না, ছেলেটি এরপর ধীরে ধীরে সেরেই উঠল। প'য়তাল্লিশ দিনের পর সে অন্নপথ্য করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাতৃহীন দৌহিত্র, মাতামহ মাতামহী যাকে বলে চক্ষের মণি; দুরন্ত ছেলে চুরি ক'রে একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশঃ প্রচন্ড আক্ষেপের সংগে ধনুকের মত বেঁকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার লক্ষণ দেখে অনেক অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলে ঘোড়ার আস্তাবলে খেলতে গিয়ে হুঁচট খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠে গেছে। কথাটা অনেক দিনের, তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ দেশে



সবিস্ময়ে ভটচায ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তখন তেমন তৈরী হ'ত না, ভারত মহাসাগরে 'এমডেনের' দৌরাত্মে বিদেশ থেকেও মাল আসত না; মিহির ডাক্তারের যে ওষুধটির দরকার ছিল সে কোনক্রমেই পাওয়া গেল না। বড়লোকের বাড়ী, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে স্পষ্টই বললে—ওষুধ নেই—আমার কোন হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন; দেব-মন্দিরে পুজো গেল, স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করলেন—কোন আশা নেই।

মাতামহী মার্বেল পাথরের মেঝের উপর মাথা কুটতে আরম্ভ করলেন; তাঁর সে বুকফাটা কান্নায় বাড়ীটা ভরে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগে। ছেলেটি বিছনার উপর পড়ে আছে—নিথর নিস্তব্ধ। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে ব'লে পাঁজরের উপরটা শুধু নড়ছে; মধ্যে মধ্যে এক একটা আক্ষেপ আসছে আর সমস্ত লোক শ্বাস রুদ্ধ ক'রে স্থির দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয় তো হঠাৎ এখুনি সব স্থির হয়ে যাবে।

সামান্য এক টুকরো ঐ তুলো জড়িয়ে সুচটাকে পরিশোধন করে নেয়।

ডাক্তারখানার বাইরের দাওয়ায় ব'সে শশী ডোম বলে—ডাক্তার বাবু!

—কে? শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি? কুইনিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ

—রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তোকে কোত্থেকে দেব রে?

শশী বললে—আজ্ঞে, তা হ'লে যে আমি মরে যাব বাবু। রোগ ধরলে—। শশী চুপ ক'রে যায়। ডাক্তার একটু হাসে। বলে—কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে? এই ধান চালের বাজার তার ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? ডাক্তার এবার হা-হা ক'রে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে থাকে। সেও মুচকে মুচকে হাসে। এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকোবার জন্যেই সে মুখ নামায়।

(দুই)

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল থেকে ভিখিরী-নিকিরি, এমন কি এখানকার কুকুরগুলো পর্যন্ত তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে না; তবে বিখ্যাত নয় কুখ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর। শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়। শুধু এবার এই নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার বছরেই নয়—বরাবরই সে খায়। "কাত্তিকের সাত অঘ্রাণের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ, হাঁড়ি তুলে শুধাবি ভাত।" এ সময়টায় পেটপুরে খেতে দিতে পর্যন্ত বারণ আছে। শশী সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বুঝে এসেছে জেলে। সে অনেক দিন আগে—শশীর তখন কাঁচা বয়েস, জেল বোধ হয় দ্বিতীয়বারের জেল, বর্ধমান জেলে কয়েদীদের মধ্যে কম্প জ্বর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন কয়েদীদের ফাইল বন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল ডাক্তার প্রত্যেকের হাতে দিত এক একটা কুইনিনের বড়ি; তারপর জমাদার হাঁকত'—স—র কা—র!

কয়েদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বড়ি। এর ফলে শশী ওই কম্পজ্বরের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি সামর্থ্য লাভ ক'রেছিল; সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি ক'রেছিল 'কুনিয়ানের' উপকারিতা। অবশ্য আরও একটা বল তার ছিল—ত্রিপুরা ভটচাযের দেওয়া 'মা-চণ্ডীর' আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলী; কুনিয়ান খাওয়ার সঙ্গে মাদুলীটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন, ব্রাণ্ডি সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর ধারণা ভটচাযের মা চণ্ডীর মাদুলী ধোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী 'কুনিয়ান' অব্যর্থ। "ম্যালোয়ারীর বাবারও সাধ্যি নাই যে কাছে আসে।" শশী তার সহচর অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে। কিন্তু তারা তেতো বলে আর কাণ ভোঁ ভোঁ করে বলে কুনিয়ান কিছুতেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারে না।

শশী মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত কুইনিন কিনে খায়, চণ্ডীতলায় যায় কোনদিন দুটো কলা, কোনদিন দুটো শশা, কোনদিন বা গণ্ডাখানেক উচ্ছে মায়ের উঠানে ঢেলে দিয়ে প্রণাম করে, ভটচায মশায়কে বলে—একটুকুন চন্নামেত্য দেবেন বাবা!

ভটচায প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণামৃত দিয়ে বলেন—তোর ভক্তিতো অগাধ রে শশী—কিন্তু মা তোকে সুমতি কেন দেন না সেইটে বুঝি না!

শশী চরণামৃতটুকু সুপ শব্দ ক'রে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি মাথায় বুলাতে বুলাতে দাঁত মেলে হাসে।


ক'রে তুলুন
ভারতকে
এক মহাশক্তিমান্
দেশ
দি ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল
ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ
দি
ইণ্ডিয়ান কাট্‌লারী
ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ
সেদিনকার যুদ্ধশিশুদের হাত হইতে যে কল্যাণময় রণচক্র আজ পৃথিবীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিতেছে - জানেন কি যে সেই রণচক্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন কাটিবার যন্ত্রগুলির যাহা না হইলে সমস্ত যন্ত্রচক্রই অসম্পূর্ণ ?
ইতিহাসে অতুলনীয় এই মহাযুদ্ধ সত্যিকারের কোথায় চ'লছে জানেন কি ? জলে নয়, স্থলে নয়, আকাশেও নয়, এই মহাযুদ্ধ চ'লছে পৃথিবীর যন্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিতে।
★ যুদ্ধ ক'রছেন আজ ভারতমাতা অতীতের সেই দশপ্রহরণধারিণী শ্রীদুর্গার মত অসুরদের হাত হ'তে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য। মাকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে নিয়ে পূজা করুন।
ম্যানেজিং এজেন্টস্
ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
ফোন - কলিঃ ১৮১৭
একমাত্র স্বত্বাধিকারী - শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য
টেলিগ্রাম - 'ইণ্টিস', কলিঃ

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভটচায মশায়ের চরণামৃতের বলে বলীয়ান হয়ে সে গভীর রাত্রে বর্ষার ঝিপ-ঝিপ জলে ভিজে—হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি ক'রে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভটচায দু'জনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভটচায দু'জনেই এই নিষ্ঠার জন্য চোর শশীকে না ভালবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হ'ল। ডাক্তার বলেলেন—সত্যিই কুইনিন আজ পাবি নে। শশীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুনিয়ান পাওয়া যাবে না?"

দূরে আকাশে কোথায় গোঁ গোঁ শব্দ উঠছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোর হাড়-পাঁজরা সার অবস্থা; কেউ দুদিন কেউবা চারদিন মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, এই অবস্থাতেও সব ছুটে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। 'উড়ো জাহাজ! উড়ো জাহাজ!'

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো জাহাজটা এখনও নজরে পড়বার মত কাছে আসে নাই, দেখা যাচ্ছে না। দেখতেও ইচ্ছে হয় না। এক তো দেখে দেখে অরুচি ধরেছে প্রায়। সকাল থেকে রাত্রি দুপ্পহর তিন পহর পর্যন্ত ও গুলোর যাওয়া আসার বিরাম নাই; গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে আসছে; আসছে যাচ্ছে। কখন একখানা, কখন দুখানা—চারখানা, এক সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আবার দশ বিশখানা পাখীর দলের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। তার ওপর ওগুলোর ওপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওইগুলোর ধাক্কা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ ছিরকুটে গিয়ে এমন ধারায় সর্বনাশা জল ঢেলেছে—তাতেই ভাদ্রে এমন প্রলয় বান হয়েছিল।

ওগুলো নাকি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! কথাটা মনে ক'রে শশী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। এখানকার লোকে বলে কাল যুদ্ধ! দশ টাকা—পঁয়ত্রিশ টাকা মণ চাল! দশ টাকা বিশ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি নাই, কেরোসিন তেল আনতে হয় ইউনিয়ন বোর্ডের টিকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চার টাকা—ও সব দূরের কথা—ভাঙা দরজা মেরামত করবার জন্যে একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর—একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল—একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?!

দোকানী হেসে বলেছিল—এর পরে চার আনা দিলেও আর পাবি না।

পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠুকে বসিয়ে দাও, আরও চারটে পয়সা দেব। বলে রাগ ক'রে শশী একটা আনি ফেলে দিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল। এবং সেই দিন রাত্রেই দোকানীর গোলা থেকে দুটি বস্তা ধান চুরি ক'রে এর শোধ দিয়েছিল। শোধ বলা চলে না, সাজা দিয়েছিল বলতে হয়;—কারণ দুটো বস্তায় অন্ততঃ একমণ হিসেবে দু'মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দরে ছত্রিশ টাকা। শশী অবশ্য পেয়েছে পনেরো টাকা। চার পয়সার বদলে পনেরো টাকা—নরুণের বদলে নাকের চেয়েও বেশী।

ধান চালের দরের দিক দিয়ে হিসেব করলে শশীর এখন বেশ সুসময়। এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। মধ্যে তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট একটাকার নোট জমা করে—হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছিল—সে পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান চালের এই বাজারের জন্য হায় হায় করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরণের কথা মনে হলে আজও শশী মদের মুখে বলে—ভগমান—কানে কালা করে দাও, চোখে কাণা করে দাও। না হয় তো একবারে জানে মেরে দাও বাবা।

নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা—অর্থাৎ আরম্ভ। আষাঢ় শ্রাবণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হল বান।

আকালের পর বান—বানের পর মড়ক। 'নরমুণ্ড গড়াগড়ি' কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্যসত্য গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই—কুকুর নাই—অন্নহীন গ্রাম থেকে নরমাংস লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পূর্ব দক্ষিণ কোণে শ্মশান;—ও দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শকুনের পাল—পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে ওঠে। শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জ্ঞাতি ভাইকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিল। কাঁচা বয়স, শূর বীরের মত চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হত যেন পাকা তালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড় পাঁজরা বেরিয়ে হয়েছিল যেন শুকনো খেজুর গাছ। তারপর ধরল জ্বরে, জ্বরের পরই হাত-পা ফুলতে সুরু হল। দিন পনের পর ঘরের চালের ফুটোয় তালপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ 'কি হ'ল' বলে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা গাছের মত মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বসল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারদিকে মড়ার মাথা আর হাড়! ভাইপোর চিতা সাজাতে চার চারটে মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হ'ল নদীর জলে। হরেন অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল—সেই বললে উটা তাঁতী বউয়ের মাথা, উইটা হ'ল ঘোষেদের ছোটকার আর উইটো লাগছে যেন মিস্তিরীদের ঝিউড়ী মেয়েটার।

হবে। তাব আর আশ্চর্য্য কি? হরেন্দ্র এ বাজারে মড়া পোড়াবার কাঠ কেটে দেওয়ার কাজ করতে আরম্ভ ক'রেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে শ্মশানে আসে।

একজন বলেছিল—বাকী গুলো কে?

হরেন্দ্র এবার চুপ করে গিয়েছিল। চারদিকেই মড়ার মাথা চোখ নাকে শূন্য গহ্বর—দু'পাটি প্রকট দাঁত বের করে সমস্ত মাথাগুলো একই রকম বীভৎস চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে; জোর বাতাস দিলে গড়িয়ে কোনটা কার জায়গায় গিয়ে ঠেকে কে তার হিসেব রাখে? মড়ার মাথার আশ্চর্য কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্যের। প্রথমে জ্বর, তারপর হাত পা মুখ ফোলা, তারপর হঠাৎ কারুর কারুর হচ্ছে কলেরার মত ভেদ বমি তাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারুর আর একটা পাল্টা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিন্তু মরণ আচম্বিতে, ভেদ-বমি জ্বর এসব কিছুই না—আচম্বিতে মরছে। যে মরছে সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না—কখন কি হ'ল।

শশী সে দিন অনেক ভেবে চিন্তে বলেছিল—ভাদর মাসের পাকা তাল পড়ছে যেন! শশীর উপমাটি হাস্যকর অথবা গ্রাম্য হ'লেও যারা ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়া দেখেছে তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাঁতী বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলেছিল! তাঁতী বউয়ের জ্বর হয়ে হাত পা ফুলেছিল, সামান্য, বেশী নয়। সে দিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম করেছে, হাটবার ছিল স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে—বিশেষ করে বলে দিয়েছে—হিন্দুস্থানী আমসত্ত্ব আচার-ওয়ালারা যদি আসে তবে একটুকুন আমসত্ত্ব নিয়ে এস। দাস অর্থাৎ তন্তুবায় মশায় হাট থেকে ফিরে এসে দেখে দাওয়ার উপর আয়না চিরুণী, সিন্দুর কৌটো, তেলের বাটি রেখে বউ শুয়ে আছে পাশেই। শুয়ে নয়, মরে পড়ে আছে।

দত্তদের সেজ দত্ত রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়ে সকালে আর উঠল না। দিব্যি ঘুমন্তের মতই শুয়ে আছে, দেহ কাঠের মত শক্ত, বরফের মত ঠাণ্ডা, মুখের পাশে খানিকটা গেঁজলা জমে আছে আর তারই চারি-পাশে লেগেছে অজস্র কাঠ-পিঁপড়ে।

মিস্তিরী মানে মিস্ত্রি বাড়ীর আট দশ জন লোকের মধ্যে থাকল শুধু দেড়জন—একটা বউ আর ছোট একটা ছেলে, সেটাকে ধরতে

হলে আধখানার বেশী ধরা চলে না। আট দশ জনের মরণ ঠিক ওই ভাদ্রমাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়ীটা ফাঁক হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাঁজা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছিল, হঠাৎ একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ করেই চুপ ক'রে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে। মেজ জন গিয়েছিল কুটুম্ব বাড়ী। কালী পুজার দিন—বেচারা কুটুম্ব বাড়ীর পুজোয় মাংস খাবার লোভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল—কেমন ভাবে যে মরল সে কেউ দেখে নি—তবে দেখা গেল পথের ধারে একটা গাছ তলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মরে পড়ে আছে। ছোটজন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে পুড়িয়ে এসে শ্মশান বন্ধুরা হাঁকলে—মুড়ি কই, নিমপাতা কই? একটুও ঠিক ক'রে রাখতে পার নি বাপু?

সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে মিশ্রগিন্নী তিন সন্তানের শোকে কাতর হয়ে বসেছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রূঢ়স্বরে শ্মশান বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের চাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। ছেলে মরেছে—শোক হয়েছে জানি, সইতে না পার আমাদের মুড়ি নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পারতো গলায় দড়ি দিয়ো, জল আছে ডুবে মরো, যা খুসী করো।

মিশ্রগিন্নী তবু নড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা ঠেলে বললে—শুনছ গো! —অ—। তার মুখের কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত করে বললে—একি— এ যে—এ যে—! ততক্ষণে তার হাতের নাড়া যেটুকু পেয়েছিল—তারই ফলে মিশ্রগিন্নীর দেহখানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে পড়ে গেল।

ক'দিন পরেই মরল মিশ্রদের ঝিউড়ি মেয়েটা। সেও মরে পড়েছিল, হাতের কাছে তেঁতুলের আচারের একটা পাতা—হাতে মুখে আচারের দাগ, বোধ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সরকারের বউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল, একটু তাড়াতাড়িই উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল—তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের বৃত্তান্ত মনে করতে করতে শশীর হাত-পা যেন হিম হয়ে আসে। শরীর আনচান করে ওঠে। শশী অস্থির হয়ে নিজেকে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুইনিন না হলে তার চলবে কি করে? জ্বর যদি হয় তারপর যদি হাত-পা খোলে? রাত্রে ধান বোঝাই বস্তা মাথায় করে চলবার সময় কি পথের উপর পড়ে মরে থাকবে?

—কুনিয়ান আমার চাই ডাক্তার বাবু। দাম যা লেন—দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই। শশীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গীতে ডাক্তার চমকে উঠল।

মিহির ডাক্তারও বড় রোখা লোক। সে অন্যায় চোখ রাঙানী কারুর সহ্য করে না, সে রাজা রাজড়াই হোক আর শেঠ মহাজনই হোক কিম্বা দারোগা জমাদারই হোক। ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললে—না। তারপর আপনার কাজ করতে আরম্ভ করলে; একটু পর আবার বললে—যারা রোগে ভুগছে তাদের না দিয়ে ও ওষুদ তোকে দিতে পারব না। আর বেশী দাম নিয়ে ওষুধ আমি বেচি না।

শশী দমে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর এক উপায় আছে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। সে দিতে পারে। বেশী দাম নেয় বলেই শশী আজও তার কাছে কুইনিন কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শশী রাস্তার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের সামনে কম্পাউণ্ডারকে কুইনিনের জন্য বলা যে উচিত নয় এ জ্ঞান শশীর টনটনে। ডাক্তারের পাশের ঘরে কম্পাউণ্ডার চিনে-মাটির সাদা খলটায় খট খট ক'রে ওষুধ মাড়ছে। এ দিকে তাকালেই শশী সুট করে তাকে দু'টি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কম্পাউণ্ডার তাকিয়েছে; শশী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হল না। সে, কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার, অন্য রোগী যারা ছিল—তারা সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাস্তাটা যেখানে পশ্চিম মুখ থেকে বেঁকে একেবারে দক্ষিণ মুখ ফিরেছে সেইখান থেকে রোল উঠল বল—হ—রি—, হরি—বো—ল!

কেউ গেল আর কি?

কে? ডাক্তার ভেবে দেখছিল—কে হতে পারে? কিন্তু ডাক্তারও ভেবে ঠিক করতে পারে না! চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশী ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে। যে কেউ। হঠাৎ মনে হল—হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য কিছু নাই, এ বাজারে বাঁচাই আশ্চর্য—কিন্তু তবুও সবাই রাস্তার ওইদিকটার উপর চেয়ে রইল। শশীও চেয়ে রইল। চারটে লোক অতি কষ্টে মড়া বয়ে আনছে; মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে! একটি বউ মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা!

ব—ল হ—রি—

—কে? কে মারা গেল? ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল।

—আনু, আনু। আনু ঠাকুর। ওই যে কেষ্ট দীঘির পাড়ে থাকত।

—আমার অনিরুদ্ধ, ডাক্তারবাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা! চীৎকার করে উঠল একটি প্রৌঢ়া বিধবা—অনিরুদ্ধের মা। —ওরে বাবা আনু রে—; বলে সে সেই পথের ধুলোর উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে। কোলে একটি বছর দুয়েকের ছেলে। ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দু'খানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দু'খানি পায়ের পাতা। সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে ওই হাত দু'খানি থেকে। দু গাছি রঙ চটা শাদা শাঁখা ছাড়া কোন গয়না ছিল না। কিন্তু ওতেই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা—হা।

শশীও চেয়ে দেখছিল ওই হাত দু'খানি। আনুর মা বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করছিল কিন্তু সমস্ত লোকগুলি সকরুণ অন্তরে আক্ষেপ করে ভাবছিল—ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা!

ডাক্তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে।

—আঃ! হায়—হায়—হায়। মা! এ কি করলি মা! বক্তার কণ্ঠস্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকেও চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পুজোর ফুলের সাজি হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে; বেদনাকাতর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বধুটির দিকে।

ভট্টাচার্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শশীর চোখ দুটিও কর-কর ক'রে উঠল। শশীও কেঁদে ফেললে। আঃ—হায়—হায়—হায়! হে ভগমান! কয়েক মুহূর্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আনু ঠাকুর মরেছে তাতে তো তার কাঁদবার কথা নয়! শবটা বহন করে তখন বাহকেরা খানিকটা এগিয়ে গেছে। শশী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মধ্যে প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জেগে উঠল। আনু ঠাকুর পুলিশের গুপ্তচর। সাক্ষাৎ সয়তান। বদমাস্—পাজীর একশেষ ছিল আনু ঠাকুর। কিন্তু আনুর বউ এত সুন্দর! শশী আশ্চর্য হয়ে যায়।

(তিন)

আনু ঠাকুর সত্যিই পুলিশের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিশের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আনুর গ্রাম থেকে আনুর সমবয়সী জনকয়েক ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলায়। আনুর সমবয়সী হলেও আনুর

বন্ধু কোন কালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেজের ছাত্র, আনু ছিল গ্রাম্য ঠাকুর অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে পুজো ক'রে বেড়াত। সেই মামলায় সে নির্জলা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে পুলিশের সুনজরে পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আনু নিজের গ্রামে সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য এমন ক্রিয়াকলাপ অনেক করেছিল—যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্বশেষে আনু নিজের একখানা গোয়াল ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিশকে জানালে গ্রামের লোকে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিশ সমস্ত বুঝে আনুকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আনুর এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না। ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে। এবং সৎপরামর্শ হিসেবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুরে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। বাজারপ্রধান যায়গা। কাজকর্ম জুটবে। থানার গোপন কাজকর্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জন হবে। আর এখানে থাকলে আনুর বিপদ অনিবার্য। আনু সেই এসে এখানে বাস করেছিল। আনুর মা লোকের বাড়ীতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আনু পুজো করত। অন্য সময়ে আনু এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আসত থানায়। আনুর জন্যেই শশী ধরা পড়েছে—তিনবার। আনুর জন্যেই ডাক্তারের ফেরারী এক খুড়তুত ভাই ধরা পড়ল সেদিন। গত আগষ্ট মুভমেন্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিশ খুঁজছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যও আনুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। চণ্ডী মায়ের ঐ পুজক পদটির প্রতি আনুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্যের পুজাপদ্ধতির ভুল, অবহেলা প্রভৃতির প্রতি চতুর চরসুলভ দৃষ্টি সজাগ রেখে ঘোরাফেরা সে অনেক করেছে; না পেয়ে, ভট্টাচার্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—"ত্রিপুরা ভটচার্য চণ্ডীতলা লুটে খাচ্ছে। হাতে নাতে প্রমাণ বাধা, সন্ধ্যের সময় ভটচায যখন বাড়ী যায় তখন তার পোঁটলাটা দেখো!"

চণ্ডী মাকে যে যা পুজো দেয়—তার একটা অংশ ভট্টাচার্যের বিধিমত পাওনা। দেবস্থানের অংশটা ভটচায মশায়ই ভাগ ক'রে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আনু বলত—বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরস্ততে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা!

তাতেও যখন কিছু হল না তখন আনু দারোগাকে বলেছিল, চণ্ডীতলায় ফেরারী আসামীরা সন্ন্যেসী সেজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়েস, গাঁজা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়েসী লেখাপড়া জানা সন্ন্যাসী এসেছিলেন চণ্ডীতলায়; বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের ভারী ভাল লেগেছিল সন্ন্যাসীটিকে। যত্ন করে তিনি খাওয়াতেন—যেতে চাইলে আরও দু'দিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন এসে সন্ন্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন। —আপনার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

সন্ন্যাসী হেসে বলেছিল—সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তল্লাস করলে সন্ন্যাসীর জিনিষপত্র। কয়েকখানা চিঠিপত্র পড়েই দারোগা থতমত খেয়ে গেল। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর কেদার গাঙ্গুলীর চিঠি। প্রাণাধিকেষু, My dear son বলে পাঠ—ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনতি! দারোগার বুদ্ধি যতই বাঁকা হোক এক্ষেত্রে সোজা জিনিষটা বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না। সে ক্ষমা চেয়ে বললে—যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে জানাবেন। মানে—যা দরকার হবে আপনার। মানে প্রয়োজন হলেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে—কাকে বললেন জানি না—হারামজাদা বামুন কোথায় গেল? আনু—সেই আনুটা?

সেই আনু ভটচায আজ মরল।

যারা আনুর শবযাত্রা দেখে নাই—তাদের প্রতিটি জন বললে একটা আপদ গেল। আনুর উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বারবার ভাবতে চেষ্টা করলে—আনু মরেছে বেশ হয়েছে। কিন্তু বারবারই তার মনে হ'ল নরম সোনায় গড়া সুডৌল দু'খানি হাতের কথা। রঙ উঠে যাওয়া সাদা দু'গাছি শাঁখায় সে হাত দু'খানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল—সেই হাত দু'খানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বারবারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাত্রে শশী যখন দ্রুত এবং প্রায় শব্দহীন পদক্ষেপে বাড়ী ফেরে—তখন সে জেগে কাণ পেতে বসে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায় শব্দহীন হলেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে শশী ফিরছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনেই সে জল পরিপূর্ণ ঝকঝকে তকতকে একটি কাঁসার বাটী এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে—এইবার মাদুলী ধোয়া জল খাবে। বাটীটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে—খাও।

শশী তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে—উঁ?

—মায়ের মাদুলী ধুয়ে জল খাও। ওই দেখ জল দিয়েছি।

হুঁ।

বউ চলে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে—বোতলটা দে তো।

বোতল? শশীর বউ আশ্চর্য হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো; এই ফিরে চাওয়ার মানেই হ'ল, শশী এইবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এসে তার চুলের মুঠিতে ধরে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দুটি লাথি মেরে বলবে—হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজাদী?! শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বুজে ঘাড় পিঠ সংকুচিত করে হাত দুটি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না— সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার ক'রে খানিকটা নির্জলা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল বুকের ভেতরটা যেন হু হু করছে—মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। গায়ে যেন বল নাই, পা যেন টলছে। এতটুকু মদে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল 'লা-ঘাটার' ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার খেয়াল হ'ল। ঘাটের পূর্ব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটে চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চলে গিয়েছে, তার হাত পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই—তার মুখটা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল—হাঁ ক'রে সে চেয়ে রইল ওই তিনটে জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়

ওপার থেকে খেয়া ডোঙাটা এসে এপারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এপার লাগালে নোটন মুচি—ডোঙার খেয়া মাঝি। চারিদিকে রোগ—রোগ আর রোগ—লোকের পথ হাঁটবার শক্তি কোথায়? যাবার আসবার মত মনের উৎসাহ কোথায়? তবু নোটন বসে থাকে ডোঙা নিয়ে; পেটের দায়, বিশ টাকা মণ চাল—সে চাল আসবে কোথা থেকে? যে দু'চারজন কি দশজন আসে—তাদের পার করলেও কুড়ি পয়সা হবে। সে ডোঙার ওপর বসে থাকে, আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা করে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মক্কেল। বন্যার সময় দু-একদিন রাত্রে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার করে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়—আজকালকার রোজকারের অনুপাতে সে নোটনের দশ বিশ দিনের রোজকার।

—শশী?

এ্যাঁ? নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

—কিছু বলছিস না কি? মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে। আজ রাত্রে ডোঙা চাই নাকি?

শশী উদাস কণ্ঠে বলল—আনন্দ ঠাকুর আজ মলো।

নোটন অবাক হয়ে গেল। আনন্দ মরেছে—তাতে শশী এমন মনমরা হয়ে গেল কেন? শশী বললে—পোড়াতে এসেছে আনন্দকে।

নোটন কথাটা জানে, সে এই ঘাটেই বসে আছে,—ডোঙার উপর বসে চোখ মিটমিট করে দেখছে—কে কে এল শ্মশানে। এই তো এখন তার একমাত্র কাজ হয়েছে। আজ সকাল থেকে এসেছে আটজন। ভোরবেলায় একদল তার আসবার আগেই চলে গেছে। তারপর সকাল থেকে আটজনের মধ্যে আকুনিয়া গ্রামের দুজন, কৃষ্ণপুরের একজন ফুলনাপুরের পাঁচজন—ছিদেম বাউড়ীর বউ, হরিশের নাতি, কণ্ঠর মা, গোকুল ডোম—সব শেষে এসেছে আনন্দ ঠাকুর।

নোটন বললে—হ্যাঁ। ওই সব চান করে উঠছে ঘাট থেকে।

শশী ব্যগ্র দৃষ্টিতে শ্মশানের ঘাটের দিকে তাকালে। নোটন নদীর বুকে ডোঙার উপর বসে আছে—সে দেখতে পাচ্ছে—কিন্তু ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে শশী কিছু দেখতে পেলে না। নদীর খাড়া উঁচু পাড় এবং পাড়ের উপরে কাদা-জামের ঝাঁকড়া গাছগুলোতে ঘাট আড়াল পড়েছে।

শশী এক পা—এক পা ক'রে এগিয়ে চলল।

নোটন আশ্চর্য হয়ে গেল। মরণকে শশীর বড় ভয়, নেহাত দায়ে না পড়লে সে শ্মশানে আসে না। সে ডাকলে—শশী!

শশী এগিয়ে গেল—কথার উত্তর দিলে না।

আহা মেয়েটি তো নয়—সত্যিই ননীর পুতুল।

স্নান করে উঠে গা মোছা হয় নি, কাপড় নিঙড়ে ফেলতে পারে নি, ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে লেপ্টে লেগে গেছে। ভিজে ময়লা কাপড়খানার উপরেও গায়ের চাঁপাফুলের মত রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কাল চামরের মত কসকসে কাল রুক্ষ চুলের রাশির প্রান্তভাগটা কাপড়ের প্রসার ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। চুলের ডগাগুলি বেয়ে জল পড়ছে—রোদের ছটায় টলমলে মুক্তোর মত টোপা টোপা জল বিন্দু। শশী দেখতে চেয়েছিল—সেই সুন্দর হাত দুখানি। শাঁখা দুগাছা ভেঙে দিয়েছে, লোহা খুলে ফেলে নিয়েছে;—ননীতে গড়া সেই সুন্দর হাত দুখানিকে খালি নিরাভরণ দেখে মনে সে দুঃখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত দুখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়েছে। সে তাকালে পায়ের দিকে। ইটে ঘষে আলতার দাগ তুলে দিয়েছে—পা দুখানি দেখে শশীর কান্না পেলে। —আঃ—আঃ—হায়—হায় রে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বের হল বউটির হাত দুখানি। আনন্দর মায়ের কোলে ছিল দু বছরের খোকা। নিরাভরণ হাত দুখানি বের করে বউটি ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে চাইলে।

আনন্দর মা বলে উঠল—থাক—থাক, আমার কোলেই থাক। কিন্তু মেয়েটি শুনলে না, মানলে না, জোর করে টেনে ছেলেটিকে নিয়ে আপনার বুকে ফেলে জড়িয়ে ধরলে।

শশী দেখছিল—সেই শূন্য দুখানি হাত।

ননী দিয়ে গড়া চাঁপার বরণ হাত দুখানিকে আগের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে; খাঁ—খাঁ করছে হাত দুখানি, ওই হাত দুখানির দিকে চেয়ে শশীর মন খাঁ-খাঁ করছে। বউটির আশপাশ—চারিদিকের মাঠ ঘাট—সমস্ত খাঁ-খাঁ করছে—যেন বউটি তার ওই খাঁ-খাঁ করা খালি হাত বুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত কিছুর উপর।

ব—লো—হ—রি—হরি—বোল—ল! শ্মশানবন্ধুরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সামনেই চণ্ডীতলা। সকলে গিয়ে উঠল চণ্ডীতলায়। এখানকার নিয়ম এই। শ্মশান থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম ক'রে তবে গ্রামে প্রবেশ করে। মায়ের আশীর্বাদী পুষ্প নেয়, চরণোদক খায়, চণ্ডীতলার মৃত্তিকা গায়ে মাখে। শ্মশানের অকল্যাণ দূরে যায়। শশীও গিয়ে ঢুকল চণ্ডীতলায়।

ত্রিপুরা ভটচায দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আনন্দর মা কেঁদে উঠল—চণ্ডীমায়ের উঠানে সে মাথা কুটতে আরম্ভ করলে—কি করলে মা—গো? কি দোষ ক'রেছিলাম গো!?

ভটচায বললেন—কেঁদো না—কেঁদো না। ওঠ! ওঠ! ভটচাযের কথা বলার ভঙ্গি সেই চিরকেলে আশ্চর্য ভঙ্গি। সুখও নাই—দুঃখও নাই—অদ্ভুত! বললেন—নাও চরণোদক নাও! পুষ্প নাও।

আনন্দর মা উঠল। ভটচাযের কথা বলার এই ভঙ্গির এমনিই গুণ। শুধু আনন্দর মা নয়, সব মানুষকেই উঠতে হয়, চোখ মুছতে মুছতে চরণোদক-পুষ্প নিতে হয়। যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ সে আর কাঁদতে পারে না। ভটচায হাসেন—যে হাসি তিনি পৌত্রের অসুখে হেসেছিলেন, বাবুর দৌহিত্রের শিয়রে ব'সে হেসেছিলেন—বলেন—মাকে নিষ্ঠুর বল না মা। সংসারে কত দুঃখ—কত কষ্ট—কত পাপ। তা থেকে মুক্তি দিয়ে ধুলো ঝেড়ে তিনি তাকে আপন বুকে তুলে নিয়েছেন। এ তো মুক্তি! নিজের মুক্তি কামনা কর। —যারা শোনে তারা উদাস হয়ে চেয়ে থাকে, চোখের জল যেন থমকে যায়।

আনন্দর মা চোখ মুছে চারিদিক চেয়ে বললে, বউমা কোথায় গেল? বউমা!—অ বউমা! আঃ কি বিপদেই আমি পড়েছি মা!

বউটি দাঁড়িয়েছিল নাটমন্দিরের একটি থামের আড়ালে। এদিক ওদিক দেখে আনন্দর মা তাকে টেনে নিয়ে এল।—দিন বাবা, খোকাকে চরণোদক-পুষ্প দিন। ওই দুধ-কুড়োটুকুই আমার সম্বল—আমার আনন্দর—

কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে আনন্দর মা বউয়ের ঘোমটার ফাঁকে মুখ রেখে বললে—হাত পাত—চরণোদক নাও, পুষ্প নাও, খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পাত।

বউটি মুখ তুললে—মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে সে চাইলে শাশুড়ীর দিকে।

আনন্দর মা বললে—বিরক্ত হয়েই উচ্চকণ্ঠে বললে—আমার মাথা খেয়ে হাত পাত। চরণোদক নাও। খোকাকে দাও—নিজে খাও। হাত—পা—ত!

এবার সে হাত বাড়ালে। তারুণ্যের অপরূপ লাবণ্যেভরা সুগৌর সুডৌল দুখানি হাত বৈধব্যের নিরাভরণ দীনতায় কাঙাল হয়ে গেছে। আনন্দর দেহ যখন নিয়ে যায়, তখনও হাত দুখানিতে রঙচটা পুরাণো শাদা শাঁখা দুগাছিতে যে শোভা ছিল, সে শোভা ত্রিপুরা ভটচায দেখেছিলেন। চরণোদক দিতে দিতে তিনি বলে উঠলেন—তারা—তারা—মা!

তারা নাম ভটচায প্রায়ই উচ্চারণ করেন। নাম উচ্চারণের জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্য সকলেই ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালে। তাকালে না শুধু মেয়েটি। ছেলেটিকে এক হাতে কোলে চেপে ধরে একটি হাত বাড়িয়ে সে তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভটচাযের চোয়ালের জোড় দুটি অস্বাভাবিক চাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের উপর ঠেলে উঠেছে; যেন মৃদু দ্রুত কম্পনে কাঁপছে মনে হয়।

ভটচাযের বুকের ভিতর সত্যই একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। বহুকাল—বোধ হয় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর একমাত্র কন্যা চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তাঁর মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি। কিন্তু তাঁর কন্যার নিরাভরণ হাত দুখানিতে এমন কাঙাল ভাব ফুটে ওঠে নাই। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে ভটচায বললেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার ছেলে শতায়ু হবে। মানুষের মত মানুষ হবে। ওই তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

আনন্দর মা আবার হাউ হাউ করে উঠল। শুধু আনন্দর মা নয়, শ্মশানবন্ধুরা সকলেই চোখ মুছলে। কিন্তু অবগুণ্ঠনাবৃতা

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৯)

ভারতে অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

হাওড়া, বালীগঞ্জ, কদমতলা, পাবনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও শ্যামবাজার।

খিদিরপুর, চাঁপাডাঙ্গা ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুনঃ

মিঃ এ, রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

TRADE MARK

নামের অনুকরণই গুণের অনুসরণ নয়,
সামান্য নামান্তরে যেন প্রবঞ্চিত হবেন না—

❋ কণ্ডুদাবানল—চর্ম্মরোগের জগদ্বিখ্যাত মলম।

❋ সর্বজ্বরগজসিংহ—সকলপ্রকার জ্বরে স্থায়ী ফলপ্রদ।

❋ সর্বদদ্রুহুতাশন—সকল প্রকার দাদের শ্রেষ্ঠ মলম।

❋ শূলাগুণ—সকল প্রকার বেদনার মহৌষধ।



সাবধান!

কিনিবার সময় ঠিকভাবে খাঁটী জিনিষ দেখিয়া লইবেন।

এল, এম, শাহ শঙ্খনিধি
=এণ্ড কোং লিঃ=
হেড্ অফিস——ঢাকা।
ব্রাঞ্চ—৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ন্যাশনাল সিটি ইনসিওরেন্স লিঃ

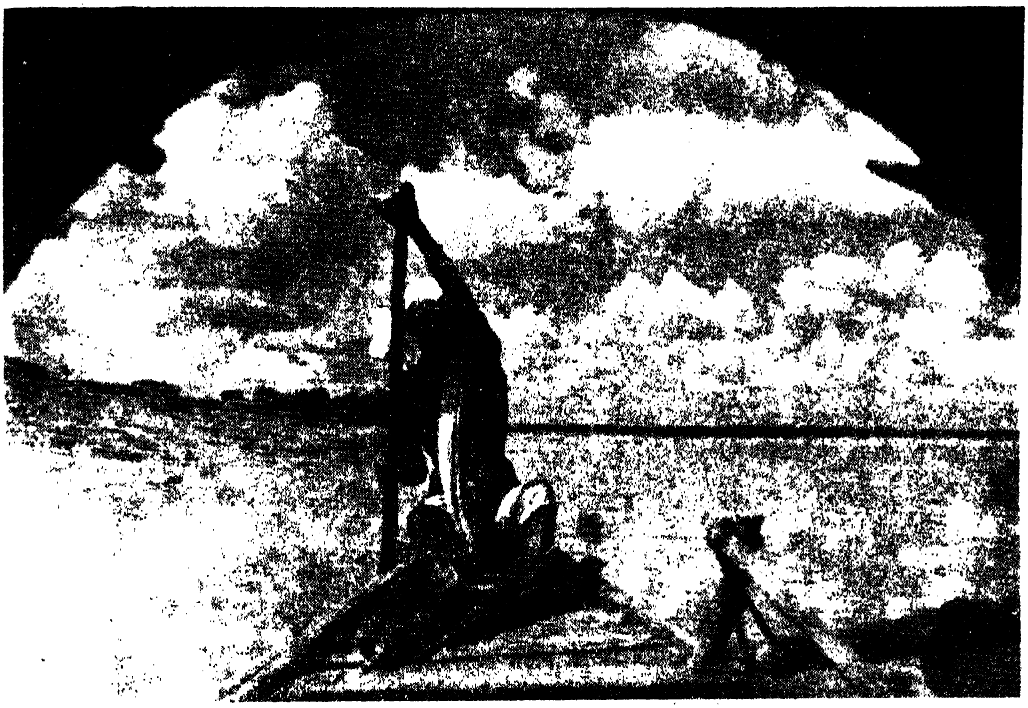
১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা　　ফোনঃ—ক্যালঃ ২৭৮

স্বল্প খরচে সর্বাধিক নিরাপদের সহিত জীবন-বীমা করার আদর্শ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৩ সাল আর একটী রেকর্ড স্থাপনকারী বছর

নূতন বীমা	৮,৫০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
জীবন বীমা তহবিল	১,১০,০০০৲	” ”
প্রিমিয়মের আয়	১,০০,০০০৲	” ”
সম্পত্তি	২,৭০,০০০৲	” ”

কে, পি, দালাল
ম্যানেজার



গাঁহন গাঙের নাইয়া ফোটোশিল্পী—শ্রীঅনিল ঘোষ

ওই মেয়েটির কোন স্পন্দন চিহ্ন বুঝা গেল না। ভিজে কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগেছিল, তবুও কিছু বুঝা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভটচায তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলে গেলেন। ঘাটে কে বসে রয়েছে! উপু হয়ে বসে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুজে বসে ছিল শশী। ভটচায বিরক্ত হয়েই বললেন—কে?

শশী মুখ তুললে। সে ব'সে ব'সে কাঁদছিল।

কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। বললে—আঃ বাবাঠাকুর আমার মরণ কেনে হয় না?

—কি হ'ল তোর?

আঃ—ওই সব কাঁচ কাঁচ মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক মরে যেছে, এ যে আর দেখতে লারছি বাবা!

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ভটচায অকস্মাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আনুর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জমে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না—তেমনি ভাবেই আনুর মায়ের বুকের ভিতটা জমে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা বজ্রাঘাত হয়—তাতে ছাদের মত জমাট বুকটায় এক একটা চিড় খায়—সে ফাটল দিয়ে অল্পস্বল্প জল ভেতরে যায়, কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চণ্ডীতলাতেই বসেছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভটচাযের ঠোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ আঁকড়ে ধরেছে। একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে সে ঢুলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধরে টানলে।

—আঃ ছাড়। কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আনুর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে—কি? আমার মাথা খাও তুমি! কি হল, কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির কপালের উপর রাখলে।

আনুর মা এবার ঈষৎ চঞ্চল হল, ভাল ক'রে নিজে ছেলেটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে—ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ। তারপর সে বললে—ও তোমার কিছু নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে সরে বস। কথাটা বলে যেন তার তৃপ্তি হ'ল না, বউয়ের হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে বললে—"সরে—ব—স—"।

শশী উপু হয়ে বসেছিল তার আর সহ্য হ'ল না, সে রূঢ়-স্বরে বললে—কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুণ? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনি তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধরে হিঁচড়ে টানছ, ঘরে গিয়ে তা হ'লে তো মারবা তুমি ধরে!

শশী জাতিতে ডোম, ও অঞ্চলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আনুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্বরণ করে বললে—ছেলেটার গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে বাবা, তাই বলছি রোদ্দুর থেকে সরে বস। তা কাণের মাথা খেয়ে কথা কাণে নেয় না আবাগী—তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও ত বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে দেখছিল—বউটি ওই ননীর মত হাত দুখানি দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে—জ্বর হয়েছে? ঠাকরুণ দেরী ক'র না। ডাক্তার দেখাও আজই।

—ডাক্তার?

—হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুষ্প দিলেন—গলায় বেঁধে দাও।

আনুর মা হাসলে; বললে—ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথা পাব বল?

—যাও কেনে ডাক্তার বাবুর কাছে। ডাক্তার বাবু তো মানুষ বটে—না—পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মায়া হবে না ডাক্তারের?

আনুর মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। সে চাউনির সম্মুখে শশী যেন কেমন অসোয়াস্তি অনুভব করলে। তাকিয়ে আছে দেখ দেখি? ঠায় একদৃষ্টে—পলক পড়ে না।

আনুর মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকরুণ কণ্ঠে বললে—ওই কচি বউ—কোলে দুধের ছেলে—আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম—ওদের আমি বাঁচাব কি ক'রে? আঃ—আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হ'ল।

(চার)

পরদিন সকাল বেলা। ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীরা এসে বসে আছে। সংখ্যায় ষাট জনের কম হবে না, কঙ্কালসার শরীর—ফুলো ফুলো মুখ—হাত পাও ফুলেছে, হলুদ চোখ, রুগ্ন গায়ের কাপড় চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কম্পাউণ্ডার চিনে মাটির বড় খলটায় খট খট শব্দে ওষুধ মাড়ছে। ডাক্তার নাই। কলে বেরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ডাক্তারকে ডাকে—ডাক্তার তাদের বাড়ীগুলো প্রথমেই সেরে আসে।

রোগে যারা বেশী কাতর তারা কাতরাচ্ছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা করছে কে কে মরেছে গত রাত্রে। বদি দত্তর বউ, মহাদেব দে'র সদ্য বিবাহিতা কন্যা, ঘোষদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাউড়ী মরেছে মাঠে; আউশ ধান কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্যন্ত ফিরল না দেখে খোঁজ ক'রে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর পাশেই ধ্বজু সিংয়ের দোকান। ধ্বজুর আড়তের সঙ্গে কণ্ট্রোলের দোকান আছে, কেরোসিন তেল, চিনি বিক্রী হয়। তারও সঙ্গে আছে সরকারী ভিক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা। ওখানে একটা জনতা জমে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে—বিলি হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিষ—নাম বলছে—বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগও করছে।

আনুর মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি নেড়ে চেড়ে বললে—এ কি করে খাবে মানুষে?

ধ্বজু বললে—এও আর বড় জোর আসছে সপ্তাহ। তার পরই ফুরুবে—আর নাই।

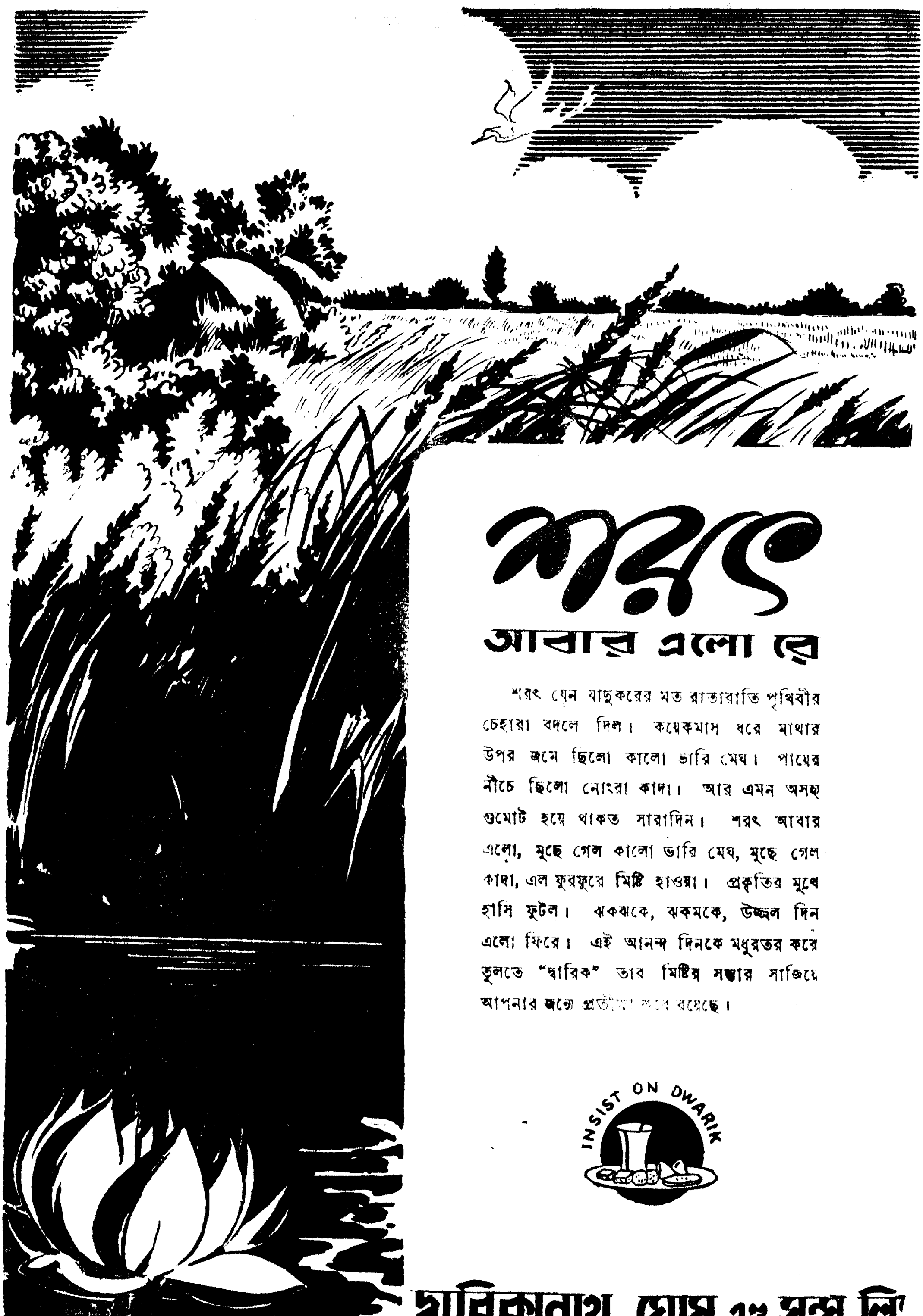
একটি লোক হেসে বললে—আজ্ঞে তা চলবে।

—চলবে? ওই দেখ—কটা বস্তা আর পুঁজি। আর লোক দেখছিস তো?

—আজ্ঞে—এ খেলে সাত দিনেই লোক অনেক পাতলা পড়ে যাবে।

আনুর মা ভাবছিল নাতিকে আর বউটাকে এই একটু বেশী ক'রে খেতে দেবে। তা হ'লেই সে খালাস। ঝাড়া হাত পা। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল। বউটাই তো—তার ভরসা। কালই সে কথা আনুর মা খুব ভাল ভাবে বুঝে নিয়েছে।

ভটচায কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু কান্নাই নয়, কাল


শরৎ
আবার এলো রে
শরৎ যেন যাদুকরের মত রাতারাতি পৃথিবীর চেহারা বদলে দিল। কয়েকমাস ধরে মাথার উপর জমে ছিলো কালো ভারি মেঘ। পায়ের নীচে ছিলো নোংরা কাদা। আর এমন অসহ্য গুমোট হয়ে থাকত সারাদিন। শরৎ আবার এলো, মুছে গেল কালো ভারি মেঘ, মুছে গেল কাদা, এল ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। প্রকৃতির মুখে হাসি ফুটল। ঝকঝকে, ঝকমকে, উজ্জ্বল দিন এলো ফিরে। এই আনন্দ দিনকে মধুরতর করে তুলতে "দ্বারিক" তার মিষ্টির সম্ভার সাজিয়ে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।
INSIST ON DWARIK
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

ভটচায তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে সে আনুর মা আশাই করে নি। শশীর কান্নাও তার মনে পড়ল—সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শশীই তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যে বলেছিল ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে—ডাক্তারের মায়া হবে না!

চণ্ডীতলা থেকে বাড়ী ফিরবার পথে শশীর কথাটা আনুর মা পরখ করেও দেখেছে। শশীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে ডাক্তার কারুর নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে। লাখ টাকা দিলে ওঠে না। ডাক্তার শুয়েছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনুর মা ভাবছিল—ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলেটার জ্বর সত্যিই বেশী। বোশেখ মাসের দুপুরের কচি লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল। জানালাটা খানিকটা ফাঁক হয়েছিল—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আনুর মা বার দুয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে—কে? কি?

আনুর মা সভয়ে বলেছিল—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোকাটির বড় জ্বর। হতভাগী আজই হাতের শাঁখা ভাঙলে—সিঁথের সিঁদুর মুছলে, আবার ওই ছেলেটুকু—তার—। আনুর মায়ের চোখ ফেটে হু হু করে জল বেরিয়ে আসছিল—তার আনু—আঃ তার সোনার আনু! কিন্তু তার জন্যে সে কাঁদলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আনুর মা দাঁতে দাঁত টিপে বারবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর। কখন জ্বর এল?

—[illegible] থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার যত্ন করে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মুখেও আনে নাই। [illegible] বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পুরিয়া ক'রে খানিকটা সাগুদানা এনে দিয়ে বলেছিল—এই সাগু করে দিয়ো। সাগুদানা বাজারে নাই। থাকলেও চারটাকা সের।

আনুর মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণ্ঠনবতী বউয়ের কাণের কাছে ডেকে বলেছিল—নাও বউমা—সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো—হাত—পাত। আঃ—কি আবাং মেয়ে গো তুমি। হাত—হাত! হাত পা—ত—!

ডাক্তার বলেছিল—বকবেন না ওঁকে। ছেলে মানুষ। তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আনুর মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল—অতি ক্ষীণ—কিন্তু অতিবক্র একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রেখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধরজু সিংয়ের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আনুর মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুঁকেছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল—সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুধই খেতে চায় নাই তো সাগুর জল!

ডিসপেন্সারীর দিকে পা বাড়াতে কিন্তু আনুর মায়ের দ্বিধা হচ্ছিল। ভাবছিল ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে—কিন্তু ডাক্তার যদি বলে ওষুধের দাম এনেছ? তার চেয়ে বাগ্দী বুড়ীকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ন্যাসাদের মধ্যে আর আনুর মাকে পড়তে হবে না। আজ সে বলে দেবে বউটাকে—যাকে বলে কাণে কিল মেরে বলে দেবে এতখানি ঘোমটার আদিখ্যেতায় কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম করো। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে। মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আনুর মা গলা বাড়িয়ে ডিসপেন্সারীর ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ—ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ি বললে—দশটার পরে ঠাকরুণ, দশটার পরে। কম্পাউন্ডার বাবু বলছে দশ বাড়ীতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমরা সব আগাম এসে বসে আছি।

'আগাম এসেছিস—তোরা সব আগাম মর', মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আনুর মা খুসী হয়ে বাড়ীর পথ ধরলে। শুধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলেই সে খুসী হয়েছে বেশী।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়ো জাহাজের দল আসছে। গোঙানী শোনা যাচ্ছে। আনুর মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শুধু সে নয়, সব লোক—সবাই চেয়ে আছে।

—এই যে আপনি!

আনুর মা চমকে উঠল। ডাক্তার! ডাক্তার তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আনুর মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাতে দিয়ে নেড়ে বলতে গেল—পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে—চলুন আপনার নাতিকে দেখে যাই।

আনুর মা অবাক হ'ল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়ে বললে—এই এদের বাড়ীতে ডাক ছিল—আপনার বাড়ীর পাশে এসে মনে হ'ল ছেলেটির কথা। তা' বাড়ীতে কেউ নাই। বউটি ছেলেমানুষ ঘোমটা টেনে ব'সে আছে—কথা বলে না—

আনুর মা হাউ মাউ ক'রে উঠল—কপাল—আমার পোড়া কপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা বল? ও মানুষ নয় বাবা—ও মানুষ নয়—গরু ভেড়ার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই। শুধু ওই চেহারা। বলতে বলতেই আনুর মা প্রায় ছুটেছিল, ডাক্তারের অনুগ্রহে সে যে কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেছে তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি যে তার ঘা-খাওয়া শক্তমনের অতি বাস্তব সচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্যন্ত একটু ব্যস্ত এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আনুর মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক্—থাক্—এতখানি ব্যস্ত হবেন না। এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখ দিয়ে কথা বের হল না—এই মুহূর্তে আনুর মা যা করলে—তাতে ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল। আনুর মা পুত্রবধূর মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললে—দেখ বাবা দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—আর আমার বুক হু-হু করে জ্বলে ওঠে। এর ওপর যদি ছেলেটার কিছু হয়।—আনুর মা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারেরও চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অদ্ভুত বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ অদ্ভুত—এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নাই; ডাক্তার বুঝতে পারলে না তার অর্থ; বিস্ময় অথবা ভয়! ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা প্রবাহ বয়ে গেল—মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয়—তবে সত্যই মেয়েটির অবস্থা কি যে হবে সে কল্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে হবে—ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ করে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেরে যাবে।

মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্বিত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে বলে উঠল—তারা! তারা!

ডাক্তার, আনুর মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভটচায, হাতে আঁকসী আর ফুলের সাজি। মিহির ডাক্তার মনে মনে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠল। ভটচাযকে সে জানে। মনে পড়ল ভটচাযের নিজের পৌত্রের অসুখের কথা;


উৎকৃষ্ট
গাছ ও বীজের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (কলিকাতা
· শাখা ·
১০ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
(নিউ মার্কেট)
· শাখা ·
শিয়ালদহ ষ্টেশন মেন
৫ নং প্ল্যাটফরম
· কলিকাতা ·

নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভটচাযের বাধে না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডাক্তার ভটচাযের দিকে চাইলে। কিন্তু ভটচায চেয়েছিলেন রুগ্ন শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভটচাযের চোখে। ডাক্তারের ভয় হ'ল। ভটচাযের করুণার অর্থ অতি বিচিত্র।

ভটচায কিন্তু বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক বলেছেন, কোন ভয় নেই।

আনুর মা বললে, বলুন বাবা—তাই বলুন—আশীর্বাদ করুন।

ভটচায বললেন, আশীর্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চলে এলে, দেখলাম খোকার জ্বর এলো, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সন্ধ্যেতে জপে বসলাম—মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল—তার আগে আমি মরি, ম'রে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পুজো যদি নিস—তবে বল, আশীর্বাদী দে—যাতে দুঃখিনীর ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভাল হয়—দীর্ঘজীবী হয়ে সে বেঁচে থাকে। বলব কি মা! ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের মাথা থেকে খসে পড়ল এই জবাফুল।

ডাক্তারের শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আনুর মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে বসে আছে পাথরের মত।

ভটচায বলছিলেন, কাল রাত্রেই ভাবলাম—যাই দিয়ে আসি মায়ের আশীর্বাদী, তা' বুড়ো মানুষ—চোখের নজর তো আর ভাল নেই। আর বেরুতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্বাদী।

আশীর্বাদী দিয়েও ভটচায দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অত্যন্ত ধীরভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখছিল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ইনজেকশনের সরঞ্জাম বের করলেন। আনুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু!

ব্যাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইনজেকশনের ওষুধের এ্যাম্পিউল বার করে ডাক্তার বললে, ভয় নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর—

—তবে? ইনজেকশন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হ'লে—

—কঠিনে যাতে না দাঁড়ায়—তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইনজেকশন দোব। এ্যাম্পিউলটির মাথায় তুলো জড়িয়ে সুকৌশলে আঙুলের চাপে মুট্ ক'রে মাথার দিকটা ভেঙে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটুকু। তারপর আনুর মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন—আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোঁটা—কুইনিন, কি আর কিছু। বলে সে এ্যাম্পিউলটি উপুড় করে ধরলে আনুর মায়ের হাতের উপর। প্রায় আধ ফোঁটাখানেক ওষুধ ঝরে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আনুর মা জিভ দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আস্বাদন অনুভব করবার চেষ্টা ক'রে বললে, কুনিয়ান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিতে বিস্ময় ফুটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আনুর মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতেই তো।

—কিন্তু এ তো তেতো নয়।

তেতো নয়! ডাক্তার ভাঙা এ্যাম্পিউলটা তুলে ধরে দেখলে, তারপর সিরিঞ্জ থেকে এক ফোঁটা নিজের হাতে নিয়ে চেটে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুধু স্পিরিটের গন্ধযুক্ত খানিকটা জল। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিরিঞ্জের ওষুধটুকু পিস্টন ঠেলে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে বললে—যাক্, ও-বেলা এসে আমি ইনজেকশন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আনুর মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোন ভয় নেই। দরকার হবে না, তবে দরকার হলে তখুনিই খবর দেবেন আমাকে।

ভটচায দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার বললেন, কোন ভয় নেই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে এলেন। পথে দুজনে এক-সঙ্গেই চলেছিলেন। ঘটনাটা নতুন। কিছুক্ষণ পর ভটচায জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ভয় নাই বলেই মনে হয়—কি বলেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললেন, আপাততঃ ভয় তো কিছু দেখলাম না। তবে—ম্যালিগন্যান্ট-ম্যালেরিয়া যদি হয়—ডাক্তার চুপ করলেন। ভটচায তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ভটচায উদাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, তারা—তারা—মা।

ডাক্তার ডিসপেন্সারীতে এসে কুইনিনের এ্যাম্পিউলগুলি প্রত্যেকটি ভেঙে নিজে আস্বাদ করে দেখে ফেলে দিলে। নিজের মনেই বললে—স্কাউন্ড্রেল। আনুর মা এ্যাম্পিউলের ভিতরের তরল পদার্থের আস্বাদ নিয়ে বলেছিল তেতো নয়। সে তার ভ্রম নয়, এ্যাম্পিউলের ভিতরে কুইনিন নাই। শুধু জল।

(পাঁচ)

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল না। রূঢ়স্বরেই সে বললে, তোকে না আমি কাল বলে দিয়েছি শশী—কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না—তোকে দিতে আমি পারব না। শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে—বেলপাতা ছেঁচে খেগে—ছাতিমের ছাল সেদ্ধ করে খেগে যা।

—আজ্ঞে না। সে জন্যে নয়; ওই—ওই আন ঠাকুরের—

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আনুঠাকুরের ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

—আজ্ঞে তেমুনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।

ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। আনুর জন্যে শশী তিনবার ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর সেই শশী এসেছে——।

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট—শশী মাথা নীচু করে ঈষৎ লজ্জিতভাবেই বললে—ওই পানে আসছিলাম—তা আনু ঠাকুরের মা বললে—আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী।

কথাটা বলেও তার মনে হ'ল বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই, ডাক্তারের সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবও এ নয়। তাই সে আবার বললে, কাল শ্মশান থেকে এল মশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়া হ'ল। আ—হা—হা—মশায়—ভগমানের—। শশীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে চুপ করে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বস। দিচ্ছি ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরী করতে। কম্পাউন্ডারটি তাঁর পাকা—কিন্তু গুঁড়ো কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে কুইনিন সরিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তার-বাবু। এক একবার মনে হচ্ছিল—আনু ঠাকুর মরেছে—বেশ হয়েছে। কিন্তুক—ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হায় হায় করেছি। শশী চুপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন করছিল—সেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির সঙ্গে তার মনের তার এক সুরে বাজছে। এর মধ্যে এতটুকু কিছু অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতরাচ্ছে।

কম্পাউন্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে বসে। মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু জীর্ণশীর্ণ রোগা মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেতো না। এক একজনের কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মড়াকান্না শুনে তার রাগ হতো। আপন মনেই সে বলত—আদিখ্যেতা। তোর কি একা মরেছে রে বাপু? কিন্তু কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে তার সব যেন ওলোটপালট হয়ে গেছে। বউটির বৈধব্য দেখে তার মন সেই যে হায় হায় করতে সুরু করেছে, সে হায় হায়-এর আর বিরাম নাই। রোগা মানুষের কাতরানি শুনে তার বুকটা কেমন করে উঠেছে, শোকাতুর মানুষের কান্না শুনে সে মনে মনে হায় হায় করে সারা হয়েছে। এমন কি কাল রাত্রে চুরি করতে বেরিয়ে ঘোষেদের কানাচের গলি দিয়ে যাবার সময় ঘোষবুড়ীর গুণ গুণ স্বরে কান্না শুনে তার সর্বাঙ্গ থর থর কেঁপে উঠেছিল। মাথার বস্তাটা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঘোষবুড়ীর মেয়ে সরলা কাল মরেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে, সবাই ঘুমিয়েছে—বুড়ী কেঁদে চলেছে। আগের দিন হলেও শশীর মনে হ'ত, এই বস্তাটা বুড়ীর বুকে চাপিয়ে দেয়; বুড়ীর ওই বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেয়; যে পথে গিয়েছে তার সরলা—সেই পথেই বুড়ীকে রওনা করে দেয়। কিন্তু আর তা মনে হয় নাই। দাঁতে দাঁত টিপে সে কোন মতে গলি থেকে বেরিয়ে যখন আনুর মায়ের বাড়ীর কানাচে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরিশ্রমের হাঁপানীর সঙ্গে একটা শোকাতুর আবেগে তার ফুসফুস ফেটে যেতে চাচ্ছিল যেন। আনুর মায়ের ভাঙা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ীর একটা নিরালা কোণে কুনড়োলতার জঙ্গলের মধ্যে বস্তাটা ন্যামিয়ে দিয়ে সেইখানেই সে বুকে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসেছিল।

চণ্ডীতলায় আনুর মা যে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দোব বাবা শশী?

সে কথাটা শশী ভুলতে পারে নাই। আনুর মায়ের দুঃখের জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুধের ছেলেটার জন্য—সেও ভেবে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সত্যই তো কি খাবে ওরা?

না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছেলেটা পাকাটির মত হয়ে যাবে—পাখীর ছানার মত চিঁ-চিঁ করে চেঁচাবে। বউটির ওই সোনার মত রঙের উপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছেঁড়া কাপড়ে তার মাথার রুখু চুলের অর্ধেকটা বেরিয়ে পড়বে, পিঠের গোটাটাই হয়তো দেখা যাবে; একটা মাটির খোলা হাতে করে ফিরবে—; শশীর বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল বস্তা হাতে। তার স্ত্রী বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এই তো পরশু—

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে তর্জন করে উঠেছিল।

শশীর স্ত্রী আর কিছু বলতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আনুর মায়ের খিড়কীর ধারে ঘুরেছে। আনুর মা যখন বাজরা আনতে এসেছিল, তখন থেকে ঘুরেছে। কিন্তু, বউটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল মাটির পুতুলের মত, তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়ীতে সে কিছুতেই ঢুকতে পারে নাই। সে একটা ঝোপের আড়ালে বসে ঘাসের ডাঁটি তুলে তার নরম দিকটা চিবিয়েছে, আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে।

তারপর এল আনুর মা—সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভটচায মশায়। ভটচায, ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ী ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আনুর মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনিভাবে বসেছিল। আনুর মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তা হলে দশ সের ধান বেচে দুটী চাল ডাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আনুর মা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি বসে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত; খালি হাত দুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শুয়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। চুপ করে বসে শশীর মনে হয়েছিল—তার টুঁটিটা যেন কে চেপে ধরেছে, বুকের ওপর একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুলিশে তাকে হাজতে পুরে রেখেছে—অন্ধকার রাত্রে ছোট ঘরটায় সে একা বসে থেকেছে, শিকঘেরা দরজার ওপাশে কনষ্টেবল ঘুরেছে—তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশীর রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই ব'সে থাকার উদ্বেগজনক কষ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আনুর মা যখন তাকে বলেছিল—আর একটু যদি কষ্ট করে বস বাবা শশী, তবে আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি বস ঠাকরুণ, তুমি বস। আমি যাচ্ছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে বসে তাদের কাতরানী শুনে তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে—উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে. কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন ডাকছে—কই আমার খোকার ওষুদ?

* * * * *

আট দিন পর।

ডাক্তার চুপ ক'রে বসেছিল তার ডিসপেন্সারীর সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাত্রি আটটা বাজে। কার্ত্তিক মাসের শেষ, এবার এরই মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ভাদ্রের বন্যার জলের ঠাণ্ডা উঠছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারটার কমে কখন স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে, লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়—তহবিলের টাকা গুণতি হয়। ময়রাদের দোকানে ভিয়েন চলে, বাতাসা কাটে—কদমা কাটে; রসের সন্দেশ পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ ক'রে কল চলে। কাপড়ের দোকানে—কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে-থাকে সাজানো চলতে থাকে। দু পাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে একদিকে মুরশিদাবাদ অন্যদিকে বেহার—সেই পথে ক্যাঁ-কাঁ শব্দ তুলে গরুর গাড়ী যায় আসে;—বেহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা; মুরশিদাবাদের দিক হ'তে আসে কলাই, কুমড়ো, পেঁয়াজ, লঙ্কা; নিকটবর্তী অঞ্চল হ'তে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালেরা আসে মজুরীর সন্ধানে; এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্বের অঞ্চলের সাত আট ক্রোশের মধ্যের গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল ষ্টেশন। এবার কিন্তু এরই মধ্যে সব স্তব্ধ অন্ধকার। দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে বসেছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে—বাবা ঘরে এসে বসুন, মা বলছেন—হিম পড়ছে যে।

—যাচ্ছি।

—খাবার করবেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। শশী ফিরবে মতিপুর গেছে। তারপর ইনজেক্‌শন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ করে ওষুধের এমন ষ্টক—জেলার সদর শহরেও নাই। 'প্রণ্টোসিল' আর কয়েকটা ইনজেক্‌শন আনতে গেছে শশী। ইনজেকশনের চেয়েও জরুরী দরকার প্রণ্টোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আনুঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিন্‌জাইটিস্‌। ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, টাইফয়েড, এগুলোর আনুষঙ্গিক হিসেবে এতদিন ছিল শুধু নিউমোনিয়া—এবার মেনিন্‌জাইটিস্‌ও এসে জুটল। কলেরাও চলছে—এখানে ওখানে। কোনটা কলেরা কোনটা ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—কোনটা বেরিবেরি সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈঋত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। লাল-নীল-সাদা তিনটে আলোক বিন্দু—উল্কার মত দ্রুত বেগে চলেছে। প্লেন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোন সময়েই বিরাম নাই। আকাশে প্লেন চলছে, পথের ওপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারী লরী; গ্রামের পায়ে চলা পথ ধরে চলছে মড়া কাঁধে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সাঁইত্রিশটা রোগী মরেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় আরও চারটে যাবে। মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক; ধীরতার সঙ্গে সে চিকিৎসা করে, ভাল মন্দ দুই-ই সে গ্রহণও করে ধীরতার সঙ্গে। মৃত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বুঝতে পারলে আগে থেকেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে বলেও দেয় সে কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা—এই হিমানী শীতল মৃত্যু ঝড়ের স্পর্শে জলের মত জমে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয় তো আজই যাবে—তা' ছাড়া আজ হোক কাল হোক, দু দিন চার দিন পরে হোক—যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত—এমন রোগী—নসুরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুখুজ্জে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই—পাঁচজন। পাঁচজন কেন—প্রণ্টোসিল আর ইনজেকশনগুলো না পেলে—; শীতপ্রধান দেশের নদীর ওপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চঞ্চল হয়ে উঠল যেন; ডাক্তারের মন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা। অচঞ্চল স্তব্ধ মেয়েটিকে সেই প্রথম দিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে একপাশে বসে থাকে—দেখা যায় শুধু দুখানি নিরাভরণতায় সকরুণ সুকোমল লাবণ্যভরা হাত—এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শুভ্র দুখানি পা; মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে তার মুখ তাতে সেই এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বুঝতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সন্দেহ হয়, মেয়েটি বোধ হয় পাগল অথবা— । ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল—একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছু তার মনকে অতর্কিতে স্পর্শ করেছে।

কান্নার রোল উঠছে। বেশী দূরে নয়। নসুরামের বাড়ী থেকে উঠছে। নসুর স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে—তাতেও সে বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি।

ডাক্তার টর্চটা জ্বাললে। ত্রিপুরা ভটচায দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল। —আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উৎকণ্ঠিত অনুভূতি বিদ্যুৎ বেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—ডাক্তারবাবু।

দৃঢ় সংকল্পের একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লী গ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার পাঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে—কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখে সূচ বেছে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল।

ত্রিপুরা ভটচায—আনুর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্যকলাপ। থর থর করে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার সূচটা সযত্নে বার করে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে। এতক্ষণ তার অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ হল। সামনেই লণ্ঠন জ্বলছে। ওপারে মেয়েটি বসে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খসে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের সূচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিঞ্জটা খসে পড়ে গেল। সে কেঁপে উঠেছে।

চকিত হয়ে ভটচায প্রশ্ন করলে—ডাক্তারবাবু!

আনুর মা ঝুঁকে পড়ল রুগ্ন নাতির উপর, অনুভব করে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে—রোগী ঘুমুচ্ছে।

ভটচায বললে—মায়ের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে—দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মুখে দীর্ঘাকৃতি কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে—কে, শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে? কণ্ঠস্বরে তার অপরিসীম উদ্বেগ।

—এখন একটু ভাল। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে—আজ্ঞে না।

ডাক্তার সযত্নে ভাঙ্গা সিরিঞ্জের কাঁচগুলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আনুর মাকে ডেকে বললে,—দেখুন!

আনুর মা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ডাক্তারবাবু?!

ভটচায এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে, দেখুন আমার—। বলেই সে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আনুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বলে উঠল—আপনি বলুন ডাক্তরবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা।

সকলের মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি—বিস্ময়—করুণা—হয়তো কিছুখানি তাচ্ছিল্যও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সব চেয়ে কম। এ সন্দেহ তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে—আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভাল থাকে কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হ'ল আপনার বাড়ীর দিকে।

ভটচাযও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে পথ চলছিলেন ভটচায।

শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই দিকে চেয়ে; লণ্ঠনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে কাঁপছে। আনুর মায়ের কথা কটির মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্ককর কিছুর সন্ধান পেয়েছে।

(ছয়)

বোবা মেয়ে কাঁদছিল। রাত্রি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আনুর বাড়ী থেকে।

কালা বোবা বউটি—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনুর মা নাতির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল। মধ্যরাত্রি থেকে আবার তার আক্ষেপ সুরু হয়েছিল; চীৎকার করে উঠছিল সে আগের মত। কালা বউটির সেসব কিছুই কিন্তু কাণে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমুতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। একে কালা—তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা—চীৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই ছিল, যায় নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই—তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে বসেছিল। গলার ভিতর কিছু যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে; মনে হয়েছে কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত একটা মৃদু অথচ অত্যন্ত অস্বোয়াস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করছে; বুকের ভিতরে ঢেঁকির আঘাত পড়ছে এমনিভাবে হৃদ্‌পিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই।—ডাক্তারের ওই সূচ ফুটিয়ে চিকিৎসায় ফল হবে এমন আশা করে নাই, বসেছিল কখন ছেলেটার হয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা করে। এক একবার ছেলেটা নড়েছে—আর শশী চমকে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে তার টুঁটিটা কে চেপে ধরলে যেন। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে তার জল পড়েছে বহুবার।

আনুর মা ব্যস্ত হয়ে উঠল—ঝুঁকে পড়ল নাতির উপর। শশী উপুর হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চীৎকার করে কেঁদে আনুর মা শিশুটির বুকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে—মনে হল তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মুখের ঘোমটা খসে গেছে। শশী অকস্মাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল—ওঃ—ওঃ—ওঃ! ওই চীৎকারে জাগল বউটি। তার বধির কাণের নিদ্রাস্তব্ধ স্নায়ুতন্ত্রীতেও ঘা দিয়েছে শশীর চীৎকার। বউটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলে—শাশুড়ী শিশুর উপর উপুড় হয়ে পড়েছে। কুৎসিত শশীর কান্নায় ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল; কাণেও যাচ্ছিল এই চীৎকারের স্পর্শ—অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে গুহামুখের শব্দধ্বনির মত। সেও উপুড় হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শে মাধ্যমে বুঝলে—স্থির দৃষ্টিতে ছেলের নিস্পন্দ দেহের দিকে, মুখের দিকে চেয়ে বুঝলে—তারপর—ছেলের দেহটা ছিনিয়ে নিলে একটা চীৎকার ক'রে। বোবার শোকার্ত চীৎকার; তার মধ্যে কথা নাই—শুধু একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ—একখানি কণ্ঠস্বর—। কার্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশী; শশীর মনে পড়ল সেই তারা খসে পড়ার কথা—হঠাৎ আকাশ চিরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুদূরে গিয়ে নিভে যায়। চোখ সইতে পারে না—মন প্রাণ কেমন করে ওঠে—কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমনি! এমন কান্না আর হয় না। সে কখনও শোনেনি।

শশীর আর সহ্য হ'ল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দুপাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরেট মাটির ঢিবির মত। হঠাৎ চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো আলো। জানালার মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকল—ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারেরই বাড়ী; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল।—কে? শশী? ডাক্তারেরও চিনতে ভুল হয় নাই। অনেক রোগীরই মরবার আশঙ্কা আছে, তাদেরও আপনারজনেরা আসতে পারে—কিন্তু ডাক্তার এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা ক'রে বিনিদ্র হয়ে বসে ছিল। আরও সে জানত শশীই আসবে ডাকতে।

—একবার আসুন। মরে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না—কেমন অবস্থা।

শশী বললে—আপনি যান—আমি ভটচায মশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুষ্প নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে যা—ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভটচায বাড়ীতে নাই। মায়ের মন্দির হতে ফেরেন নাই আজ। শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জঙ্গল—থমথম করছে চারদিক, চিঁ—চিঁ—ঝি—ঝি করে ডাকছে—ঝি ঝি পোকা আরও কত কীটপতঙ্গ—চ্যা চ্যা শব্দে ডাকছে পেঁচা। রাত্রি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চণ্ডীতলায়। মন্দিরের অন্ধকার বারান্দায় ভটচায বসে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে—ভটচায মশায়। ঠাকুর মশায়।

—তারা—তারা মা! ভটচায চঞ্চল হয়ে উঠলেন—কে? শশী?

—আজ্ঞে মায়ের পুষ্প নিয়ে চলুন একবার।

ভটচায উঠলেন। পুষ্প নিলেন। তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। জীবনে বোধ হয় এমন কষ্ট কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন—ভয় কি? কোন ভয় নাই! কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হ'ল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে চারখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি করে শব্দ দুজনেরই কাণে আসছিল—বুকের ভিতরে ধক—ধক—শব্দ উঠছে।

* * * * *

বোবা মেয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভটচায বেরিয়ে এলেন। শশীও বেরিয়ে এল। আনুর মা—ডাক্তারকে কিছু বললে না, ভটচাযকে ডাকলে না—ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আনুর মা বললে—খোকার গতির কি হবে বাবা? তুমি—

শশী পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার বললে—তুই যা শশী—তা ভিন্ন—।

ভটচাযের গলা দিয়ে বের হল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাহ করে না—মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়।

আনুর মা বললে—নিয়ে আমি যাব। কিন্তু গর্ত করতে আমি তো পারব না।

ভটচায দাঁড়ালেন—এগিয়ে চললেন—দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মুঠোর মধ্যে তিনি কচলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাফুলে—দু-তিনটে বেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে—দাঁড়ান ভটচায মশায়। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভটচায দাঁড়ালেন না। ডাক্তার গতি দ্রুততর করলে।

রাত্রি শেষে হিমতীক্ষ্ম বাতাস বইতে সুরু করেছে। পাশেই একটা বাড়ীতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথাও কতকগুলো কুকুর একসঙ্গে চীৎকার ক'রে কাঁদছে।

মা কাঁদছে। কুকুর কাঁদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলে। এগ্নলো তাকে তত পীড়িত করছে না—কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না।

ভটচায পিছন থেকে ডাকলে—দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার—ভটচাযকে অতিক্রম করে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টানছিল—ষ্টেথিসকোপের রবারের নল দুটো। একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে। কি হবে ডাক্তারী ক'রে? বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হল—ও কান্না যেন কখনও থামবে না— চারদিকে কান্না। মানুষ মরছে! মরবে! আর বোধ হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরশো পঞ্চাশেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। চীৎকার করতে ইচ্ছে হ'ল ডাক্তারের—ভুয়ো—ভুয়ো সব ভুয়ো! সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনার ডিসপেনসারীর দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যেই সে চেয়ারে বসে পড়ল।

চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না নয়—ঝিঁঝিঁর ডাক।

ডাক্তার টর্চ জ্বাললে; পোকাটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়েছে আলমারীর উপর। Poison! বিষ! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হ'ল আলমারীর দিকে।

—ডাক্তারবাবু!

ভটচায ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টর্চটা নিভিয়ে দিলে।

ভটচায আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এলো না। ভটচায একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলার পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন কিছুক্ষণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবী প্রতিমা। শীতার্ত শেষ রাত্রিতে মূর্তি থেকে হিম বের হচ্ছে। কঠিন। মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভটচায যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল বলির খাঁড়াখানা নিয়ে—। শিউরে উঠলেন ভটচায। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাঁড়াখানা আরও শক্ত ক'রে ধরলেন—নিজের গলাতেই—

* * * * *

পরদিন সকাল বেলা।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ কি রাত্রিই গেছে কাল। এখনও বিষের আলমারীর দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে বসে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নসুরামের স্ত্রী, পঞ্চু বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

—আনু ঠাকুরের ছেলেটিও মরেছে কাল। একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি জাগরণের অবসাদে অবসন্ন ডাক্তারের কাণের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সংগে সংগে অবসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগে—ভেসে উঠছে সেই ছবি।

—ডাক্তারবাবু!

ব্যোমকেশ বাবুর ভাইপো। কুড়িটি টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে সে বললে—ওষুদের দাম। আর—

ডাক্তার অবসন্ন দৃষ্টি তুলে চাইলে তার দিকে।

—এবেলা যাবেন বারোটার পর।

—বারোটার পর?

—হ্যাঁ। আজ স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্ত্যয়নটা।

—বেশ।

ব্যোমকেশ বাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে—চণ্ডীতলায় পুজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই?

—দিন।

ব্যোমকেশের ভাইপো বললে—ভটচায মশায় কেমন হয়ে গেছেন। কি যে নম নম ক'রে পুজো করলেন! বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়লেন—আমার মনে হ'ল যা—তা বলছেন। মধ্যে মধ্যে খুক-খুক করে হাসছেন।

গোঁ গোঁ শব্দ উঠল।

ছেলেরা চীৎকার করে উঠল—ওরে বাবারে—কতরে! কতরে!

ব্যোমকেশের ভাইপোর কথাটা জমল না। সে উঠল, বললে—ওবেলাতেই দেখে ওষুদ দেবেন।

ডাক্তারের মুখেও বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে সে প্রেসক্রিপসন লিখতে আরম্ভ করলে।

এরোপ্লেনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। গর্জন বাড়ছে। সে শব্দ ছাপিয়ে উঠল কান্নার শব্দ। তারস্বরে কাঁদছে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

—কে?—কে রে? কে গেল? বাইরে রোগীরা গবেষণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না। যে কান্না কাল রাত্রে শুনেছে—তারপর—?

কান্না এগিয়ে আসছে।

—কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? —কি হ'ল রে? অ-ডোম বউ?

—ওগো—আমার মরদ—

—কে—শশী?

—হ্যাঁ গো! গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে—গলায় দড়ি লাগিয়ে —থানায় খবর দিতে যেছি গো!—

শশীর স্ত্রীও থেমে গেল—আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ পঁচিশখানা উড়ো জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে?!! এরোপ্লেনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।



ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'যোগেশ কাব্যে'র রচয়িতা ঈশানচন্দ্রের নামের সহিত বাঙালী পাঠক নিতান্ত অপরিচিত নহেন। তিনি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তাঁহার জন্ম হয়।

ঈশানচন্দ্রের জীবনকথা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না; এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, তিনি অনেক দিন হুগলী কলেক্টরীতে এবং শেষ জীবনে হাইকোর্টে কর্ম করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ঈশানচন্দ্র কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। সে-যুগের প্রায় সকল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **চিত্ত-মুকুর।** (পদ্য গ্রন্থ) সন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। পৃঃ ১৪৭।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও উৎসর্গ-পত্রের এই অংশ হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ঈশানচন্দ্রের লিখিতঃ—"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয়।...অগ্রজ বলিয়া 'চিত্ত-মুকুর' আপনারই অর্চনার উপকরণ;...কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে......।"

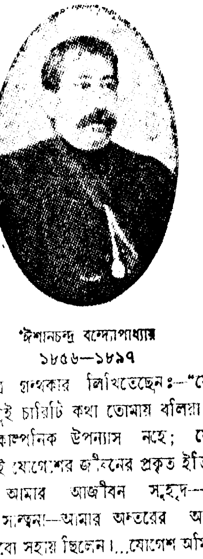
গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশঃ—"ইহার অনেকগুলি কবিতা বন্ধুবর্গের অনুরোধ ইতিপূর্বে এডুকেশন গেজেট ও বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।...চিত্তমুকুর তাহার প্রথম উদ্যম।"

২। **বাসন্তী।** (গীতিকাব্য) ইং ১৮৮০। পৃঃ ১৬২।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রকাশক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেনঃ—"গ্রন্থকারের যে সকল কবিতা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন, বান্ধব ও আর্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া বাসন্তী প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট নিতান্ত অপরিচিত না হইতেও পারেন। তাঁহার 'চিত্ত-মুকুর' ও পূর্বোক্ত সাময়িকপত্রস্থ কাবতাগুলি বোধ হয় সাধারণের নিকট নিতান্ত অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বসন্তকালে প্রকাশ করিবার মানস ছিল বলিয়া বাসন্তী নাম দেওয়া হয়, কিন্তু কার্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়িল।... পাইকপাড়া ১০ই শ্রাবণ ১২৮৭।"

৩। **যোগেশ কাব্য।** ইং ১৮৮১। পৃঃ ১৪২।

গ্রন্থখানি "সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"কে উৎসর্গীকৃত।



'ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৫৬—১৮৯৭

উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিতেছেনঃ—"যোগেশ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা তোমায় বলিয়া দিই। যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে; যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারের সান্ত্বনা—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কাব্যে সহায় ছিলেন।...যোগেশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলাম, জানি না তোমার কিরূপ লাগিবে, কিন্তু তুমি আমার 'চিত্ত-মুকুর' ও 'বাসন্তী' আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলে। পদ্মপুকুর, খিদিরপুর। ২৫এ ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।

৪। **চিন্তা।** (গীতি-কাব্য) ইং ১৮৮৭। পৃঃ ১৭২।

পুস্তকের "আনুষঙ্গিক কথায়" প্রকাশঃ—"চিন্তার প্রায় সকল কবিতাই পূর্বে বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বান্ধব, ভারতী, নবজীবন, প্রচার, পাক্ষিক সমালোচক, কল্পনা, সাধারণী, সময় প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপ্রকাশিত দুই একটি কবিতাও ইহাতে আছে। সকল কবিতারই কিছু কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়াছি।...হুগলী, চৈত্র ১২৯৩।"

নির্বাচিত কাব্য সংগ্রহ

ঈশানচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ হইতে নির্বাচিত করিয়া যাহা কাব্য-সম্পদে গ্রাহ্য বিবেচিত হইয়াছে, এরূপ একটি রচনা-সংগ্রহ 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্রকাশিত রচনা

১৩১৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ "কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ঈশানচন্দ্রের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

> **"কবি ঈশানচন্দ্রের তিনখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থের আমরা সন্ধান পাইয়াছি। একখানির নাম 'অনন্ত', একখানির নাম 'দেবীতীর্থ' এবং একখানি কতগুলি কবিতার সমষ্টি।.........**
>
> **১। অনন্ত—'অনন্ত' [নয় সর্গে সমাপ্ত] একখানি খণ্ড কাব্য এবং ইহার নায়কের নাম 'অনন্ত'। কর্ম্মফল-পীড়িত জীবের যাতনা দেখিয়া অনন্তের মহাপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অনন্ত দেখিলেন, বিশ্বের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দুঃখ, কষ্ট, যাতনা অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবকুলের শান্তির জন্য অনন্তের প্রাণ 'বাল্মীকির জয়ে' বিশ্বামিত্রের মত নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিতে চাহিল।...**
>
> **২। দেবীতীর্থ—গ্রন্থখানি দশ সর্গে সম্পূর্ণ। 'অনন্তে'র সর্গের মত ইহার সর্গগুলি ছোট ছোট নয়। এখানি একখানি মহা-কাব্যেরই মত এবং ইহার বর্ণনীয় বিষয়ও মনুষ্য-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ বিশ্লেষণে কবির উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক। কবি যোগেশের অনুরূপ করিয়াই এ কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন।**
>
> **কিন্তু কবি ইহাতে 'যোগেশ' অপেক্ষা এক সোপান অগ্রসর হইয়াছেন। যোগেশ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত উপেক্ষা করিয়া উদ্দাম হৃদয়-স্রোতে শুধু নিজের হৃদয়-বৃত্তি অনুসরণ করিয়া অকূলে ভাসিয়াছে, ইহাতে কবি বুঝাইতে**

চাহিয়াছেন, 'স্বাতন্ত্র্যে আনন্দ নাই।' বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

'কর্ত্তব্যই জীবধর্ম্ম অকর্ত্তব্য পাপ।"

(৩) কবিতাবলী—ইহাতে চতুর্ব্বিংশতিটি কবিতা সন্নিবেশিত।

১। পূর্ণিমা, ২। মালঞ্চের আক্ষেপ, ৩। কোরক-গীতি, ৪। জগত, ৫। আমি তোর এত কি সুন্দর? ৬। দুইখানি ছবি, ৭। গান, ৮। তিনখানি ছবি, ৯। বিভা, ১০। তুমি কি রমণী?, ১১। প্রতিমা, ১২। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ, ১৩। বঙ্কিমচন্দ্র, ১৪। কারে দিব বঁধু এ ভালবাসা, ১৫। আবাহন, ১৬। গৌরগীতি, ১৭। বিশ্বাস, ১৮। সত্যযুগ, ১৯। দিশেহারা, ২০। বর্ষশেষে, ২১। মৃতপতির কর্ম্মস্থল ও বন্ধুদর্শনে, ২২। তরুণীবক্ষে, ২৩। মহামন্ত্র, ২৪। বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম।" *

'পূর্ণিমা' প্রকাশ

১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্দ্রেরই "উৎসাহে ও উদ্যোগে" হুগলী বাঁশবেড়িয়া হইতে 'পূর্ণিমা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার "সূচনা"য় ঈশানচন্দ্র লিখিয়াছিলেনঃ—

সকলেরি জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে যাহা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। বালকে খেলা করে, প্রৌঢ়ে শাস্ত্র আলোচনা করেন, বৃদ্ধে হরিনাম করেন, কিন্তু যুবায় কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে; সাধারণে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরাজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ্য উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক বিস্তর আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন পাঠ করিলেও নভেল বা উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হয় না। ইংরাজের নভেল বা উপন্যাস পাঠে ইংরাজের সামাজিক গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের স্বজাতির এ সকল কথাও ত অবশ্য জ্ঞাতব্য; তাহার আলোচনার উপায় কি? পুরাণে অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও অতি সুন্দর আদর্শ চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকের চক্ষে সে সকল অত্যদ্ভুত অলৌকিক "আজগুবি" ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাহায় শিক্ষার উপযোগী শ্রদ্ধা হয় না, সুতরাং সে সকল পাঠে স্পৃহাও হয় না। যদি বা কখন স্পৃহা হয়, তবে শ্রদ্ধার অভাবে তাহার যথোচিত মর্ম্মগ্রহ হয় না। এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরা অগত্যা হয়, অবসর অপব্যয় করেন, নয় ইংরাজী নভেল বা উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। স্বদেশের জ্ঞাতব্য কথা তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেহ কেহ ইংরাজী ভাষার সাময়িক পত্রিকাদি বা বিজ্ঞান দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সময়ের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ কঠিন অধ্যয়নে কয়জনের অনুরাগ দেখা যায়? পাঠাবস্থায় যুবকদিগের স্বাধীন চিন্তা বা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন তাহাতে সখ করিয়া বা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য গুরুতর অধ্যয়নে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কালেজের সংকীর্ণ শিক্ষাবশতঃ দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দূরে থাকুক, Nineteenth Century, Fortnightly বা Saturday Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত গুরুতর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম করিতে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কুলাইয়া উঠে না। আমরা অবশ্য সকল শিক্ষিত যুবকের কথা বলিতেছি না। সাধারণের কথাই বলিতেছি। যাঁহাদের প্রতিভা আছে তাঁহারা অল্প বয়সেই বিস্তর গুরুতর কার্য করিয়া থকেন। প্রতিভা কিন্তু অতি বিরল। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি প্রতিভাসম্পন্ন কোন যুবক থাকেন, তাঁহাদের উপরোক্ত কথায় অভিমান করিবার কারণ নাই। আমরা সাধারণের একজন—সাধারণের কথাই বলিতেছি। বস্তুতঃ শিক্ষিত সাধারণ যুবকবর্গের জন্যই দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া আবশ্যক। পত্রিকার উদ্দেশ্য যে কেবল শিক্ষা প্রদান তাহা নহে। লেখক মাত্রেই কিছু এমন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহেন যে তিনি পাঠক মাত্রেরই গুরুস্থানীয় হইবার উপযুক্ত পাত্র। লেখক তাঁহার নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন, পাঠক তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে গ্রহণ করিবেন, ভুলভ্রান্তি থাকে তাহার আলোচনা করিবেন। অধিকন্তু যদি পাঠক সহৃদয় হয়েন তবে লেখকের সে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিবেন। ফলতঃ আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য তাহাই। আমরা সকল বিষয়েরই অনুশীলন করিব, সে অনুশীলনে লেখকের আত্মোন্নতির ত আছেই, পক্ষান্তরে যদি অন্যের সেরূপ অনুশীলন বৃত্তি তাহার দ্বারায় কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হয় তাহাতেও ব্যক্তিগত ও সমাজগত মংগল আছে। আমরা জানি এবং যাঁহারা বংগভাষার বর্ত্তমান পরিপুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাও জানেন যে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে আধুনিক নব্যভারত ও সাহিত্য পর্য্যন্ত পত্রিকার প্রচারে কতশত ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও বংগভাষার প্রতি মতি গতি ফিরিয়াছে—বাংগালা গ্রন্থ পাঠে স্পৃহা হইতেছে—বংগভাষায় রচনা করিতে সাধ হইতেছে—সর্ব্বাধিক সুখের কথা—বংগভাষাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে অভ্যাস হইতেছে। পত্রিকার সৌভাগ্য যত হউক না হউক, বংগভাষার প্রচুর মংগল সাধিত হইতেছে সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির মংগল বই আর কি বলিব। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে পূর্ব্বগামী পত্রিকার সম্পাদকেরা কিছু আর লোকের হাতে ধরিয়া তাঁহাদের প্রতিগতি পরিবর্ত্তন করেন নাই বা তাঁহাদের হাত ধরিয়া তাঁদের লেখক করিয়া দেন নাই। সম্পাদকেরা আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও যত্নে যতদূর সম্ভব ভাষার উন্নতিপক্ষে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, দশটা ভাল কথা—দশটা উচ্চভাব বংগভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা দেখিয়া শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি বংগভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল যে চেষ্টা করিলে নির্জীব অসার বংগভাষায়ও, মহৎ চিন্তা বা মধুর ভাব প্রকাশ করা যায়। মাতৃভাষা সহজেই বাংগালীর হৃদয়ের ভাষা। ইংরাজী ভাষায় যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পরভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ করেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। বংগভাষার স্ফূর্ত্তির অভাবেই লোকে ইংরাজিতে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ ঘটনায় বংগভাষায় তাঁহাদের অনুরাগ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? দিন দিন মহৎ ভাবগুলি দেশীয় ভাষায় সজ্জিত হইয়া পরিচিত মূর্ত্তিতে পাঠকের চক্ষে পতিত হওয়ায়, ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও পৌরাণিক কথা শিক্ষিত যুবকেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় জটিল ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবহেলা না করিয়া সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিলেন। বিষয়গুলি ইংরাজী ধরণে পরিলক্ষিত পরিচালিত ও পরিব্যক্ত হওয়ায় দেশীয় মূর্ত্তি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেও, ইংরাজীশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাদের মূল অবয়ব নিতান্ত অপরিচিত থাকিল না। তখন পাঠক স্বদেশের ও স্বজাতির মহত্ত্ব হৃদয়ংগম করিতে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ভাষার বর্তমান উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ইহাতে কতদূর শুভ ফল ফলিয়াছে তাহা পরলোকগত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংগলা রচনার সংগে আধুনিক রচনার একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়ংগম হইবে। অপর দেশের ভাষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা প্রচারে যেরূপ শুভ ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও লিপিশক্তি সকলই অপ্রচুর। আমরা কার্য্যে ব্রতী হইলাম তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কতক অবসর ক্ষেপন করা, কতক বা স্বাধীন চিন্তার চালনা করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য যাঁহারা আভাঙ্গা কালেজি গোরা তাঁহাদের মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতেছি যে, এরূপ কালেজি গোরাদের নিকটেই আমাদের আশা ভরসা বিস্তর। তাঁহাদের যে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অধ্যবসায় আছে, তাহার পরিচয় তাঁহারা সেনেট গৃহে বারম্বার দিয়াছেন। বংগদেশের বর্তমান অবস্থায় তাঁহাদিগকেই চিহ্নিত বা (Covenanted) ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেন্টের গুরুতর রাজকার্য্যের ভার যেরূপ চিহ্নিত (Covenanted) কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে—আমাদের ভাষার গুরুতর কার্য সেইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকবর্গের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের আশা ভরসা। এক্ষণে তাঁহাদিগকে এ কার্যক্ষেত্রে সৌখিন সৈন্যরূপে (Volunteer) পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের আশা ফলবতী হয়। আমরা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা ও যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের

---

*এই সকল কবিতায় অধিকাংশই ঈশানচন্দ্র জীবদ্দশায় 'পূর্ণিমা'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন।
—ব্র না ব

এই প্রার্থনা তাঁহারা যেন আমাদিগকে "দেশীয়" বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

পূর্ণিমায় সকল বিষয়েরই আলোচনা হইবে। যে কোন বিষয়ের রচনা উপাদেয় হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণের অশুভকর ও অরুচিজনক বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। রচনাদি নির্বাচনের জন্য ইহার সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সমিতি কর্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হইবে। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণিমায় প্রকাশ করিবার জন্য রচনাদি প্রেরণ করিলে সমিতির অভিলাষ ও উদ্যম সকলি সফল হইবে।

'পূর্ণিমা'র প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই ঈশানচন্দ্রের লিখিত "পূর্ণিমা" নামে একটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

পূর্ণিমা

১

(আমি) পারি না বহিতে, এ রূপের ভার,
(আমার) আকুল হইল দেহ।
(আমি) খুঁজিয়া বেড়াই, প্রণয়ী আমার,
দেখা যে দিল না কেহ।
(আমার) বুকের ভিতরে, সুখের পাথারে,
ছুটিছে প্রেমের বান।
(দেখ) দু কূল ভাসায়ে, উঠিছে উথলি,
আমার আকুল প্রাণ।
(আমি) বলি বলি করি, বলা যে গেল না,
সাধের মরম কথা!
(আমি) পারি না ভাসিতে, এ রূপ রাশিতে,
লইয়া সুখের ব্যথা।
(আমি) ভেসে ভেসে যাই, কূল নাহি পাই,
তবু যে হ'ল না দেখা!
(আমি) এমন করিয়া, অকূলে পড়িয়া,
ভাসিতে পারি না একা।

২

(ওহে) কে আছ ভুবনে, প্রণয়ী তেমন,
কর হে হৃদয় দান!
(আমার) রূপের সাগর মথিত করিয়া,
কর হে পীযূষ পান।
(আমি) নয়ন ভরিয়া, যৌবন ঢালিব,
ঢালিব রূপের বান।
(আমি) শ্রবণ ভরিয়া, ঢালিব সঙ্গীত,
হৃদয় ভরিয়া প্রাণ।
(আমি) জগত ঘুরিয়া, হৃদয় ভরিয়া
রেখেছি প্রকৃতি শোভা।
নিতি নব নব, সুষমা দেখাব
প্রেমিক-মানস-লোভা।
নিশির নির্জ্জনে, বিশ্ব কারু সনে,
কহে কি নিগূঢ় কথা।
(আমি) পেয়েছি সন্ধান, হৃদয়ে করিয়া,
লইয়া যাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে আপনা সঁপিব,
চাহি না হে প্রতিদান।

াঁৰ) তোমাতে মজিয়া, তোমায়ে ভজিয়া,
জুড়া'ব আমার প্রাণ।
(তুমি) বলিবে কেবলি, সুখের কামনা,
সরা'য়ে মনের বাধ।
াঁমি) নয়নে বদনে, হৃদয়ে পাড়িয়া,
মিটা'ব মনের সাধ।
ি) নাহি মিটে ক্ষুধা, বলিবে সে কথা,
ক্ষোভ না রাখিবে বুকে।
াঁমি) গলিয়া গলিয়া, যাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।
এ রূপ যৌবন, এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।
এস প্রাণবঁধু হৃদয়ে ধরিয়া
কর হে বারেক ত্রাণ।

৪

দিবসের কাযে, সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।
নি) চিনিতে পারিনে, হৃদয় তাহার
দিবসে কুটিল গতি।
নিরজন বুকে, প্রাণ একা থাকে,
স্বরূপ দেখিতে পাই।
তাই নিশি হ'লে, আসি ধীরে ধীরে
প্রণয়ী খুঁজিয়া যাই।
মনের মতন, মেলে না যে জন,
অভাজেরা সবি প্রাণ।
এ রূপে যৌবন এত আকিঞ্চন,
তাহে কি কুলায় স্থান।
(আমি) আধ আধ সাধ, পারি না মিটাতে
খুঁজিয়া বেড়াই ভরা।
ওহে পরিপূর্ণ, লুকা'য়ে কোথায়,
আইস নিকটে ত্বরা।

'পূর্ণিমা'য় ঈশানচন্দ্রের অনেকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কয়েকটি গদ্য রচনার উল্লেখ করিতেছি:—

১।	সম্বন্ধ নির্ণয়	১৩০০ সাল
২।	কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা)	১৩০০-০১ সাল
৩।	শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী	১৩০০ সাল
৪।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩০১ সাল
৫।	বোম্বাই ভ্রমণ	১৩০২ সাল
৬।	মানব জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি?	১৩০৪ সাল

ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত "সুধাময়ী" নামে একটি উপন্যাসও ১৩০১, ১৩০২ ও ১৩০৪ সালে আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা 'পূর্ণিমা'য় মুদ্রিত হয়।

মৃত্যু

ঈশানচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে হুগলী, বাঁশবেড়িয়ার 'পূর্ণিমা' পত্র এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ঈশানচন্দ্র ইহজগতে আর নাই। সেই ভীষণ ভূমিকম্পের রাত্রিতে ঈশান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, শুক্রবার, ঈশান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার বেয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঈশানের অকালমৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত, তাঁহারই উৎসাহে এবং উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে অবসন্ন। তাঁহার প্রতিকৃতি এই সংখ্যার পূর্ণিমায় দেওয়া হইল।"—'পূর্ণিমা', আষাঢ় ১৩০৪, পৃ ১২৪।

ঈশানচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা কাব্য-জগতে যখন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব, ঈশান-চন্দ্র তখনই সাহিত্যিক সমাজে কবি-খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে খ্যাতি এক-দিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের চাপে স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যের

দরবারে তিনি **কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ** পেশ করিয়া গিয়াছেন. সেগুলি হইতেই তাঁহার প্রতিভা ও কবি-কীর্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার করা সম্ভব। ঈশানচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন না। যে-কারণে তিনি মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্য-প্রেরণার মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করিয়া 'যোগেশ কাব্য'খানি একটা অন্তর্গূঢ় জ্বালায় জর্জরিত। সক্ষম রচনা বলিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা ধরাইয়া দেয়। সেই বেদনা ও জ্বালা পরিমাণে অধিক বলিয়াই ঈশানচন্দ্রের কবি-প্রতিভা চরম সার্থকতা লাভ করে নাই; যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষদগ্রন্থাবলীভুক্ত 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালায় ঈশানচন্দ্রের কবিতার একটি সঙ্কলন বাহির হইয়াছে. তাহা হইতেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। আমরা এখানে দুই-একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন দিতেছি।

সন্তান দর্শনে

১

এই জীবনের ওই প্রথম বিকাশ!
ওই কান্না ওই হাসি, ওই আনন্দের রাশি,
অমিয়া মাখান ওই আধ আধ ভাষ,
এ জীবনে একদিন হইত প্রকাশ!
শৈশবে সবাই হায়, ওই সন্তানের প্রায়
এ ভীষণ জীবনের সুন্দর মঞ্জরি!
ভাসে রে কালের তটে আপনা পাসরি!

২

ওই কি জীবন? হায় কতই বিভেদ!
ভাবিলে কাঁদে রে মন, মানবের কি জীবন,
কোথা ফুটে—কোথা টুটে—কতই প্রভেদ!
কি যে হয় ওই মুখ, কি যে হয় ওই বুক,
কোথা থাকে ওই সুখ যৌবন বিকাশে!
কি লয়ে সংসারে পশি কি থাকে বয়সে!

৭

বৃথা ক্ষোভ! এ সংসারে এমনি জীবন!
প্রকৃত সুখের যাহা, স্বপন কিম্বা মোহ তাহা,
সংসারীর সে কামনা দুখের কারণ।
নিকৃষ্ট অবোধ জন, কিম্বা শ্রেষ্ঠ কবিমন
সে কল্পিত সুখ সুধু করে অন্বেষণ!
নহে এ সংসার কিন্তু তাদের কারণ।

৮

সুখশূন্যে মরুপ্রায় তবে কি সংসার!
জীবন কি কিছু নয়, সুধু কি যন্ত্রণাময়,
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার?
এই দেহপিণ্ড লয়ে, এ অনন্ত দুখ সয়ে?
পার্থিব জীবন কি রে বিড়ম্বনা সার?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাহি পুরস্কার?
('বাসন্তী')

একদিন

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণতলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় পড়েছে ঢলি,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥
কাতর বদনখানি
মুদিত নয়ন দু'টি
গেছে কিছু খুলে'।
দুই প্রান্তে অশ্রুজল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবীপদমূলে॥
দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষাণ-মূরতি।
এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়,
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি॥
সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত
তাহে দু'নয়ন।
পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন॥
সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।
পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে॥
অনাবৃত নেত্র-পথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।
স্বপনের চন্দ্র মত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে॥
অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?
একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাহে ঘোর তপস্যায়
সদা নিমগন।
কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের দ্বার ঠেলি,
হেরিনু গোপনে।
দেখিনু নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে॥
অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।
'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার॥
শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।
শিহরি উঠিল দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল॥ ('চিন্তা')

স্তোত্র

দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জালে
বিরাজ আমার।
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি এই শরীরের ত্বকে
সতত প্রচার॥
শব্দ শক্তিরূপে তুমি শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।
জ্ঞানরূপে চিত্তে মম ঢালিয়া অমৃত ধারা
তুমি বিদ্যমান॥
দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা,
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেই রূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান॥
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার॥ ('চিন্তা')



বিপদ আর কাকে বলে !



শ্রী আশাপূর্ণা দেবী

পশুপতি বাড়ি ফিরিতেছে। রোজই ফেরে—পাঁচটা পাঁচিশে তাহার ছুটি হয়, তিন তলায় অফিস, সিঁড়ি ভাঙিতেই লাগে পাঁচ মিনিট। ঘাম মুছিয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ট্রাম লাইনটুকু আসিতেও প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া যায়, অবশেষে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কোন প্রকারে নিজেকে ঠেলিয়া দিয়া ট্রামের ভিতর মাত্র একখানি পা রাখিবার মত স্থান সংগ্রহ করা। বাস্ আর কিছু করিবার নাই। পাঁচ সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াও মোটের মাথায় সাতটার মধ্যে সে নিজের রাজত্বে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে।

স্বাধীন সাম্রাজ্য। হাস্যমুখী স্ত্রী, বাধ্য ছেলেমেয়ে, পশুপতি নিজে স্ফূর্তিবাজ লোক—সুখের সংসার পশুপতির। কিন্তু আজ আর পশুপতির মনে সুখ নাই। সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরিবার তাগাদাও নাই। ব্ল্যাক আউটের রাস্তার মত মুখ করিয়া—খড় বোঝাই গরুর গাড়ির গতিভঙ্গীতে এসপ্ল্যানেড হইতে হাঁটা মারিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

লড়াই করিয়া ইণ্ডি কয়েক জায়গা দখলের স্পৃহা আজ তাহার নাই। আজ তাহার মন খারাপ।

অবশ্য সব কার্যের মত—পশুপতির মন খারাপেরও একটা কারণ আছে, কারণটা এই যে, পশুপতি আজ হাত দেখাইয়াছে। হাত দেখানো বাতিক তাহার কস্মিনকালেও ছিল না—যাহাকে বলে 'দশচক্র।"

শিরিষ সিকদার নামে যে ছোকরা ক্যাস্ ডিপার্টমেণ্টে নূতন ভর্তি হইয়াছে—কথায় কথায় হঠাৎ জানা গেল ছোকরা নাকি পামিস্ট। আর যায় কোথা? ঘরশুদ্ধ লোক তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে আর কি। টিফিনে অনেকের খাওয়াই হয় নাই আজ।

জিনিসটা এমনি মজার—এক মুহূর্তে পঁয়ষট্টি টাকা ওজনের নেহাৎ কেরাণীটি একেবারে ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িল। ইহার জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সকলেই একবার আপন আপন অ-দৃষ্টের উপর চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া লইতে চায়।

পশুপতি অবশ্য দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল—এই সব বোগাস ব্যাপারে কোনকালেই তাহার আস্থা নাই, কিন্তু মাটি করিল শিরিষ নিজে। 'খপ' করিয়া পশুপতির হাতখানা টানিয়া লইয়া কহিল—দেখি গুপ্ত মশাই আপনার লাকটা? এখন তো আপনার পোয়াবারো, এই তো সেদিন কুড়িটা টাকা ইনক্রীমেণ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু হাত দেখার পর যাহা বলিল, সেটা ঠিক সৌভাগ্যের পরিচয় নয়। বার বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে কহিল—তাইতো—মুস্কিল করলে দেখছি—

খুব ভাঁওতা দিচ্ছেন যে? মুস্কিল আবার কি মশাই?

—মুস্কিল এই—একটা পাপগ্রহের দৃষ্টি এসে পড়ছে—শিগগিরই কোনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—আচ্ছা, লম্বা ফর্সা বেশ হাসিখুসি—মানে—বাইরে থেকে দেখতে যাকে বলে প্রফুল্ল স্বভাবা কোনো স্ত্রীলোককে চেনেন?

—কেন বলুন তো? সন্দিগ্ধ স্বরে প্রতি-প্রশ্ন করে পশুপতি।

বর্ণনা শুনিয়া চট করিয়া অনিলার কথাই মনে পড়িয়া যায়, তবে কি তাহারই কোনো বিপদ? ইদানীং তাহার শরীরটাও যেন তেমনি ভাল নাই। এই তো কবে একদিন যেন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া রাত্রে ভাতই খাইল না। যদিও পশুপতির এ সব হাত দেখা-দেখিতে বিশ্বাস নাই—তবু খামোকা অনিলার কথাই বা বলিল কেন শিরিষ?

শিরিষ কিন্তু বলিল অন্য কথা। বলিল—এই ধরণের কোনো স্ত্রীলোক আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে।

—ক্ষতি?

—ক্ষতি বা প্রতারণা যাই বলুন। মানে আর কি পরম আত্মীয় সেজে তলে তলে ধীরে ধীরে অনিষ্ট চিন্তা করছে। এই সবই তো বিপদ কি না।

শত্রু যদি বন্ধুর ছদ্মবেশে অনিষ্ট চিন্তা করতে থাকে—তাকে এড়ানো সহজ নয়। যাই হোক আপনার পরিচিত যদি কেউ এ রকম থাকে—'থাকে' কেন আছেই তার থেকে সাবধানে থাকবেন।

পশুপতি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে—আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব পরিচিত জনসমুদ্রের ভিতর এলোপাথাড়ি হাবুডুবু খাইয়াও কাহাকেও খুঁজিয়া মেলে না যে?

ছোট খুড়ি আছেন বটে লম্বা ফর্সা—কিন্তু জীবনে কি তাহাকে হাসিতে দেখিয়াছে পশুপতি? রাঙা মাসী ফর্সা বটে কিন্তু বামনের পরবর্তী স্টেজ মাত্র। মাসী পিসি খুড়ি জ্যেঠি, দিদি বৌদি কাহাকেও ঠিক ধরা যায় না। কাহারও সহিত কালে ভদ্রে দেখা হয় কাহারও সহিত হয় না। তবে? অনিলা তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে? অনিলা তাহাকে প্রতারণা করিবে? অসম্ভব! ভুল। অনেক কষ্টে গলা ভিজাইয়া বলে—কি রকম অনিষ্ট?

—ডেফিনিটলি কি করে বলি এত অল্প সময়ের মধ্যে? শারীরিক মানসিক আর্থিক যে কোনো—মানে ফন্দি খুঁজছে সে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই পশুপতির। শুধু সেই থেকে ভাবনা সুরু করিয়াছে। অনিলা—হাঁ অনিলা ভিন্ন আর কে? তাহার ক্ষতি করিবার ফন্দি খুঁজিতেছে?

কি করিবে? স্ত্রীরা স্বামীর কী ক্ষতি করিতে পারে? কোন্ ধরণের অনিষ্ট? কিরূপে প্রতারণা? সংসারের টাকা লইয়া বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? কিন্তু কেন? তাহাদের অবস্থা যে পশুপতির চাইতে দশ গুণ ভালো। তবে? পশুপতিকে লুকাইয়া—আর কাহাকেও? ছিঃ এই আট বছর ঘর করার পর? অসম্ভব কি? হয় তো বরাবরই—পশুপতি মূর্খ, সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে গদ গদ।



........বিপ্‌নের শ্যালার দিনরাত্তির এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

আচ্ছা এ ধরণের স্ত্রীরা তো স্বামীকে বিষ খাওয়াইতেও পশ্চাৎপদ হয় না? কতই তো দৃষ্টান্ত আছে।

দূর ছাই ও সব হাত দেখা ফেকা স[illegible] বাজে, কিছু নয়। কিন্তু নয়ই বা কেন? সকলের বিষয়ই তো ঠিক ঠিক বলিয়াছে ছোকরা।

অনিলার ব্যবহারটাও সব সময়ই কিছু আর পতিব্রতার মত নয়।

এই তো সেদিন পশুপতিকে না বলিয়া—বিপিন বাবুর শ্যালার সঙ্গে সিনেমায় গেল—অবশ্য বিপিনের স্ত্রীও সঙ্গে ছিল। কিন্তু যাইবার দরকারটাই বা কি? অত সিনেমার ঝোঁক কেন? এটা তো ভালো নয়। সাজ-গোজটাও একটু যেন বেশী বেশী না? এই যে পশুপতির দিদিরা—কখনো শাড়ির সঙ্গে একখানা সেমিজ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। আর অনিলার? ব্লাউস পেটিকোট সেমিজ বডিস। শাড়িরই বা বাহার কত। স্নো সাবানেও মাসের মাস কম খরচ হয় না।

এই সব খরচ জোগায় পশুপতি আর অনিলা হয়তো তাহার অনুপস্থিতিতে—

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ চমক ভাঙিল। নিজের দরজা ছাড়িয়া বিপিনবাবুর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়া লাভই বা কি? গৃহ তো তাহার সসর্প গৃহের সঙ্গে তুলনীয়। তবু বাড়ি ভিন্ন যখন পথ নাই—ইতস্ততঃ করিতেছে কড়া নাড়িবে কিনা, দরজা আপনিই খুলিয়া গেল। কে একজন বাহির হইতেছে—অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না।

পশুপতি সন্দিগ্ধভাবে সরিয়া দাঁড়াইল—ভিতর হইতে অনিলার গলা—কথা থাকলো কিন্তু? ঠিক তো? ভুলে যাবে না?

এবং কপাটটা ভেজাইবার উপক্রম করিতে না করিতে পশুপতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সশব্দ প্রবেশে থতমত খাইয়া বলে—তুমি? কখন এলে? এত দেরি করলে যে?

—সুবিধেই করে দিলাম—বলিয়া গম্ভীরভাবে উপরে উঠিয়া যায় পশুপতি।

কথাটার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার কথা নয়—অনিলা সরল মনে উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে—হ্যাঁ গা দেরি হল কেন বললে না? সেই থেকে ভেবে মরছি—

আর থাক যথেষ্ট হয়েছে—খুব দরদ দেখিয়েছ। তবু যদি না—বলিয়া পশুপতি গজ্ গজ্ করিতে করিতে সাবান তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

অনিলা অবাক। ব্যাপার কি লোকটার? চাকরি গিয়াছে না কি? না সাহেবের ঝাঁটা খাইয়া আসিয়াছে? থাক মন ভালো হইলে আপনিই কথা বলিবে, বেশী প্রশ্নে কাজ নাই।

পশুপতি ভাবে—দেখেছ অগ্রাহ্য? অম্লান বদনে আপনার কাজ করা হচ্ছে। স্বামী গুরুজন—রাগ দেখিয়া ভয়ের লেশ নাই। অথচ কথা না কহিয়া পশুপতির পেট ফাঁপিতেছে। কাজেই দেওয়ালকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে হয়—"ভেবে মরছিলাম—" ভাবনার বহর কত! আড্ডার চোটে মোড়ের মাথা থেকে তো কাণ পাতা দায় হয়ে ওঠে। বিপ্‌নের শ্যালার দিন রাত্তির এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

—ও আবার কি? দিদির ছেলে মণ্টু না? চিনতে পারলে না?

—মণ্টু? দিল্লী থেকে উড়ে এল হঠাৎ?

—উড়ে আসবে কেন রেলে চড়েই এসেছে। দিদিকে জামাইবাবুকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে বলে চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। তাই বলে দিলাম—কাল সকলে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

পশুপতি ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে বলে—কই আগে তো আসবার কথা শুনিনি?

—তবে আমি মিছে কথা বলেছি। মরণ আর কি! কুসঙ্গীর সঙ্গে জুটে নেশা ভাঙ করে এলে না কি? বলিয়া বিরক্তি ভরে উঠিয়া যায় অনিলা।

পশুপতির গা ডোল হইয়া আসে। এই তো—সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়? স্বচ্ছন্দে তাহার মরণ টাকিয়া গেল অনিলা? কই এত বছর বিবাহ হইয়াছে কোনদিন অনিলার মুখে এ সব কথা শোনা গিয়াছে? ভাল মানুষি করিয়া থাকে—আজ ধরা পড়িয়া বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। হাঁ, মণ্টু না ঘণ্টা, নির্ঘাৎ সেই বিপ্‌নের শ্যালা—হয়তো সিনেমা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেল! তোর 'পাশ' আছে তোর গোষ্ঠিবর্গকে লইয়া যা না বাপু? পরের বৌয়ের জন্য এত মাথা ব্যথা কিসের? আচ্ছা খুকীটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তো সন্দেহ মেটে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে—অনিলা পশুপতির জন্য গরম লুচি ভাজিতেছে। খুকী আসিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা, বিকেল বেলা মণ্টুদা এসেছিল না? বাবা বলে কি, ও বাড়ির শ্যামল মামা—আমাকে বললে—"মিথ্যেবাদী

শয়তান"—এমন কান মলে দিয়েছে—উঃ জ্বালা করছে।

অনিলা কিছুক্ষণ মেয়েরই দিকে সাধু ভাষায় যাহাকে 'রোষ কষায়িত নেত্র' বলে সেই দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—বলেছে এই কথা? মেরেছে তোকে? বটে? রোসো।

পশুপতি ছাদে বেড়াইতেছে—মাথার রক্তটা কেমন চড়িয়া গিয়াছে। মেয়েটাকে না মারিলেই হইত—যদি বলিয়া দেয়? অনিলা? হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যদি ভয়ংকর কিছু প্রতিহিংসা লইতে চায়? অনিলার হাতেই তো পশুপতির 'মরণ কাঠি জীয়ন কাঠি'—আচ্ছা তাই কি সম্ভব? পশুপতির কি মাথা খারাপ হইয়াছে? দিব্য লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে—পেটের মধ্যে তাগাদাও আসিতেছে দিব্য—সকালেই না অনিলা বলিয়াছিল আজ মাংস রাঁধিবে? লুচি আর মাংস?

অজ্ঞাতসারে পশুপতি রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়? কিন্তু ও কি? ভগবানই যে পশুপতিকে পাগল করিবার ভার লইয়াছেন—অনিলা পশুপতির দুধের বাটিতে কি মিশাইতেছে? সাদা সাদা গুঁড়া? হায় ঈশ্বর!

কিম্বা ধন্য ঈশ্বর! এই তো পশুপতির জীবন লীলা শেষ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উঃ নারী জাতিকে কি বিধাতা এমন করিয়া গড়িয়াছেন? অমৃতে গরল—মিছরির ছুরি?

ছেলেবেলায় পড়া গিরিশ ঘোষের নাটকের ভাষা পশুপতির মনের মধ্যে কিলবিল্ করিয়া ওঠে।

বজ্রনির্ঘোষে ভয়ানক একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও গলার স্বর সহজে বাহির হয় না, কণ্ঠতালু সব শুকাইয়া গিয়াছে যেন। অনেক কষ্টে যাহা বাহির হয় তাহা এই—দুধে কি মেশানো হচ্ছে?

অনিলা চকিতে পিছন পানে চাহিয়া মিশ্রির গুঁড়ার শিশিটা ঠুকিয়া মাটিতে বসাইয়া কহিল—বিষ।

বলা বাহুল্য দুধে না মেশাক উক্ত বস্তুটি কণ্ঠস্বরে মিশাইতে কার্পণ্য করে নাই।

—হুঁ।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। পশুপতি কড়িবরগার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বিছানায় পড়িয়া। ঘুম আসে নাই—আসিবার কথাও নয়—পেট রীতিমত যুদ্ধ সুরু করিয়াছে।

অথচ অনিলা মুখের কথাটি মাত্র না শুধাইয়া নিজে খাইয়া দাইয়া পাশের ঘরে মেয়েছেলেদের কাছে শুইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও আন্দাজী বোঝা গেল নিবারণ খাওয়া সারিয়া রান্নাঘর ধোওয়া সুরু করিয়াছে।

পেটের অগ্নির প্রকোপে মনের আগুন ঈষৎ যেন কমিয়া আসিতেছিল—হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। আজ পর্যন্ত কোন সতী স্ত্রী স্বামীর উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া অক্লেশে ঘুমায়? অথচ এই বিষধর সর্প লইয়া পশুপতি নিঃশঙ্কচিত্তে এতকাল কাটাইয়া আসিল?

যাক নিদ্রা সর্ব সন্তাপহারিণী, এক সময় দেখা দিবেনই।

—হয়তো দেয়ালের কাছে, পিতলের ঢাকা চাপা দেওয়া অনিলার পরিপাটি হাতের গুছাইয়া রাখা আহার্য বস্তুগুলো চোখে পড়িলে ইতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু রঙিন শেড্ দেওয়া আলোর কল্যাণে ঘরের মাঝখানটা ছাড়া সহজে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

সকালে ঘুম ভাঙিতেই পশুপতির কানে গেল অনিলা নিবারণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে—বটে সব পড়ে আছে? হাত দেওয়া হয়নি? আচ্ছা। যা জিগ্যেস করে আয় বাড়ির ভাত রুচবে—না বাজারের খাবার এনে সেবা হবে?

নিবারণকে অবশ্য প্রশ্ন করিতে হইল না—আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না—বলিয়া সদ্য নিদ্রোত্থিত পশুপতি চটিটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

পড়বি তো পড় সামনেই বিপিনের শ্যালা শ্যামল।

—এই যে পশুপতিবাবু, ভালই হল, অনিলাদিকে বলে দেবেন—দিদি বলেছেন—

হঠাৎ পশুপতি মারমুখ হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া ভ্যাঙচাইয়া ওঠে—'অনিলাদিকে বলে দেবেন' ভারী আমার সাতকালের দিদি পেয়েছেন—চব্বিশ ঘন্টা আমার বাড়িতে তোমার কি দরকার হ্যা ছোকরা? যাও যাও—

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকাইয়া চলিয়া গেল, বোধ করি ভাবিল পশুপতি হঠাৎ গাঁজা ধরিয়াছে। সে দিদির বাড়ি থাকিয়া এম এস-সি পড়ে, বরাবর আসা যাওয়া আছে—ভাল ছেলে—পশুপতিও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসে—হঠাৎ এ কি?

অস্নাত অভুক্ত পশুপতিকে দেখিয়া অফিসের অনেকেই বিস্মিত হইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। পশুপতি কাহাকেও একটা বাজে জবাব দিল; কাহাকেও দিল না। শিরিষ সিকদারকে আর একবার নিরালায় লইয়া বসিতে হইবে। ধর—অনিলাকে বশে আনিতে কোনো রত্ন ধারণ বা কবচ টবচ—কত কি তো ছাই পাঁশ থাকে।

টিফিনের সময়টা আসিলে হয়।

কিন্তু পশুপতির আজ নিতান্তই অদৃষ্ট খারাপ, উঠি উঠি করিতেছে—উপরওয়ালার তলব আসিল। না আসিবে কেন তাহাকে যে এখন শনিতে ঘিরিয়াছে। শিরিষ সিকদারকে নিরালায় পাওয়ার আশা ঘুচিল।

টিফিন রুমে আসিবার অবসর মিলিতে এদিকে আড্ডা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পশুপতির নাম লইয়া হাসাহাসি হইতেছে মানে?

শিরিষ সিকদার—ইয়ার ছোকরাটা বলে কি?—দেখেছেন আজ পশুপতিবাবুর মুখখানি? 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' একেবারে। যাকে বলে শ্রীমুখমণ্ডল। খুব ব্লাফ দিয়ে দিয়েছি কাল। আপনার মুখে ওনার গিন্নির বর্ণনা শুনে দিলাম ঠুকে এক লম্বর। আহা মুখ শুকিয়ে আমসি। উনি আবার সেদিন বলছিলেন—'আমি মশাই কারুর ভাঁওতায় ভুলি না'—সেই যে যেদিন ইনসিওরের সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন? এদিকে তো এক কথায়—

অমূল্য বোস্ কহিল—আরে মশাই আপনি একেবারে যে মোক্ষম কথা বলে বসলেন—

—নির্ঘাত গিন্নির সঙ্গে কোঁদল হয়েছে।

—তা' একটু হওয়া ভালো, প্রেম গাঢ় হয়। যখন তখন গিন্নির বড়াই—আর কি কথায় এমন ভাব দেখাতে চান—ওনাদের এই বয়সেও যে রকম নিবিড় প্রেম, এমন আর একালের নব দম্পতির মধ্যেও নেই।

—আজ তো কই টিফিন করতে এলো না ভদ্রলোক?

—বাড়ি থেকে ভাতও খেয়ে আসেনি বোধ হয়। যাক গে মশাই রহস্যটা ভেঙে দেবেন—একদিনেই রোগা হয়ে গেছে ভদ্রলোক।

পশুপতি স্তম্ভিত। মাটিতে শিকড় গাড়িয়া গেছে তাহার, শিরিষ সিকদারের উপর রাগ করিবার মত জোরালো অবস্থাও নাই মনের।

শুধু—অনিলাকে কি বলিয়া শান্ত করা যাইবে—শ্যামলকে মুখ দেখানো যাইবে কেমন করিয়া, এই দুশ্চিন্তাটা যেন মাথা হইতে সর্বশরীরে পাক দিতে থাকে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক মুসাবিদা করিয়া সন্ধির মন্ত্র রচনা করিতে হয়। ধরো—এমনও তো বলা যায় পশুপতি কাল একটা অভিনয় পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু এমনি বোকা অনিলা—ভালো কথা—ব্লাউসের জন্য ছিটের কাপড়ের কথা বলিতেছিল না সেদিন? স্নো সাবানও যেন অনেকদিন কেনা হয় নাই। কপালের চুল পাতলা হইয়া আসিতেছে বলিয়া সেদিন আক্ষেপ করিতেছিল না অনিলা? কি নেওয়া যায়? বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল? জবাকুসুম? লক্ষ্মীবিলাস? মহাভৃঙ্গরাজ?

কিন্তু এত করিবার আর প্রয়োজন ছিল না। পাঁচ সাতটা প্যাকেট হাতে 'বেহাত' অবস্থায় কড়ানাড়ার পরিবর্তে জুতার আগা দিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে নিবারণ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং একটি গাল হাসিয়া কহিল—আপনি এখন এলেন বাবু? মা এই মাত্তর চলে গেলেন।

—চলে গেলেন? কোথায়?

—আজ্ঞে, কেন? দিল্লীতে। টেরেন ফেল হবার ভয়ে টেক্সিখানাকে যা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় করিয়েছে—এতক্ষণে হাওড়া ইষ্টিশান পৌঁছে গেল। বাবার কি কথা ছিল না বাবু?

ভৃত্যের কাছে মান খোওয়ানোর ভয়ে পশুপতি কষ্টে শ্বাস লইয়া সহজভাবে বলে—কথা ছিল—বৈকি, কথা ছিল। তবে আজই—কার সঙ্গে গেল।

মাসীমা মেসোমশাই মণ্টু দাদাবাবু এখেনেই সব খাওয়া দাওয়া করলেন কি না।



গৃহস্থালী

ফটোশিল্পী—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

আমার তো ওবেলার ভাত তরকারি আছে, এতেই চলে যাবে—আপনি কি খাবেন বাবু? পাঁউরুটি এনে দেব?

—দরকার নেই বেরো। আমার খাওয়া দাওয়ার কথা কিছু বলে যায়নি তো?

—আজ্ঞে, তাতো কিছু বললেন না—শুধু এই পত্তরটুক দিয়ে গেলেন।

কিন্তু পত্তরটুকুতে আছে কি?

বদ্ধ পাগলের সঙ্গে ঘর করা না কি সহজ মানুষের কর্ম নয়, অনিলার তো নয়ই, এতে তাকে জেলেই দাও আর ফাঁসিই দাও।

নাও ঠ্যালা। বিপদ আর কাকে বলে? পশুপতিরই যে গলায় ফাঁসি লাগাইতে সাধ যাইতেছে। শিরিষ আর তামাসা করিল কই? গণনাটা তো নির্ভুলই হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

এই যে—হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা—সোজা বিপদ সেটা? আর ছুটির জোগাড়? সেই বা সহজ কিসে? তাছাড়া সরকারী 'ভ্রমণ কমাও' নীতির অবমাননা তো আছেই।

এত বিপদে ফেলিল কে?

ভারতীয় সমাজ ও চিত্রকলা

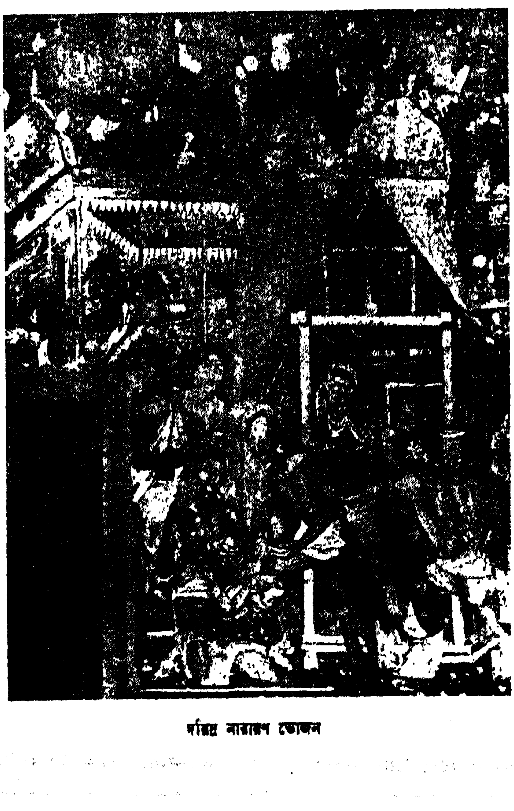
শ্রীভবানী চরন লাহা

দু'হাজার বছরেরও বেশী যে অতীতের পরিমাপ ভারতের সেই সুদীর্ঘ অতীতকালের সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রথা ও রীতি-নীতি ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে যতখানি প্রতিভাত হয়েছে তার তুলনা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল। কেবল চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও গুপ্ত যুগ থেকে সুরু করে পরবর্তী কালের সমাজজীবনের ছবি সমসাময়িক সাহিত্য ও কলাশিল্পের সমবেত পটভূমিকায় প্রায় সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে বলা যায়।

প্রাক্ মোহেনজোদারো

ইতিহাসের জন্ম হবার বহু পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থূল চিত্রকলার সাহায্যে আমরা সুদূর অতীতের আদিম সমাজ-পদ্ধতির মূল তথ্য মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারি। চিত্রগুলি স্থূল পদ্ধতিতে আঁকা হলেও কোন কোনটির জীবন্তভাব সত্যই বিস্ময় উদ্রেক করে। রায়গড় জেলার অন্তর্গত সিঙ্গনপুরের পাথরে আঁকা চিত্র এবং মির্জাপুর ও হোসেঙ্গাবাদ জেলার গুহাগাত্রে অঙ্কিত অনুরূপ চিত্র থেকে —যেগুলির তারিখ সম্বন্ধে বিস্ময়কর মতভেদ দেখা যায়— আমরা জানতে পারি যে তখন খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল শিকার এবং নৃত্যকলা, সম্ভবতঃ ধর্মসংক্রান্ত ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। শিকার ও নৃত্যানুষ্ঠান উভয়ের মধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের নির্দেশ মেলে।

তারপর আমরা এলাম ইতিহাসের সূচনাকালীন সিন্ধু তীরের সভ্যতার যুগে। মোহেন-জোদারো এবং অন্যান্য স্থানে জ্যামিতিক ধাঁচে অথবা প্রাকৃতিক আকল্পে চিত্রিত যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির অঙ্কন কার্য কে করেছে জানবার উপায় নেই, তবে এই সুন্দর শিল্পকার্যে মেয়েদের হাত ছিল ধরে নিলে বিশেষ ভুল করা হবে না। মনে রাখতে হবে যে আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কণ প্রধানতঃ মেয়েদেরই একচেটিয়া ব্যাপার। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাটা আরো বেশী খাটে, উদাহরণ-স্বরূপ এদেশের আল্পনার উল্লেখ করা যায়।



দরিদ্র নারায়ণ ভোজন

অজন্তা

সেরগুজা স্টেটের রামগড় পাহাড়ের যোগি-মারা গুহার প্রাচীরচিত্রের ভগ্নাংশগুলি ডাঃ ব্লক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু স্যার জন মার্শালের মতে ওগুলি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর অন্তর্গত। এই ভগ্নাংশগুলির কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক আমলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে সব চিত্রের অস্তিত্ব আছে আমরা তার সন্ধান পাই অজন্তায়।

অজন্তায় সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রাচীর-চিত্রগুলি আছে ৯নং ও ১০নং গুহায়, এগুলি আঁকা সুরু হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে। সাত আট শতাব্দী ধরে আঁকা অজন্তার প্রাচীরচিত্রগুলিতে সমসাময়িক সভ্যতার বহু বিচিত্র বিবরণ অজস্র পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে ১, ২, ১৬ এবং ১৭নং গুহায় গুপ্ত যুগে অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই চিত্রগুলি সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। এই সব চিত্র তৎকালীন সমাজ-জীবন ও আচার ব্যব-হারের অপূর্ব নিদর্শন। চিত্র-গুলি ধর্ম বিষয়ক এবং বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের জীবনকথা ও জাতকে বর্ণিত তাঁর পূর্বজন্মগুলির কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত, কিন্তু চিত্রের সংযুতি সম্পর্কে শিল্পীদের উপলব্ধি ছিল অসাধারণ এবং কল্পনার সাহায্যে সমসাময়িক জীবনের ছবি তাঁরা এই পবিত্র কাহি-নীতে ঢুকিয়ে খাপ খাইয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তরের জীবন

এই চিত্রগুলিতে নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তোরণ-দ্বার সমন্বিত নগরী ও পল্লী অঞ্চল, রাজপ্রাসাদ ও দরিদ্র পল্লীবাসীর কুটীর সমভাবে চিত্রে স্থান পেয়েছে। এমনিভাবেই আঁকা হয়েছে নগর ও গ্রাম্যজীবনের চিত্র। রাজা ও রাণীদের আঁকা হয়েছে রাজসভার জাঁকজমক ও সমারোহ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত গৌরবের সঙ্গে। রাজার অভিষেক, প্রজাদের কাছে রাজার দর্শনদান, বয়স্কদের সঙ্গে পরামর্শ অথবা বিচারকার্য পরিচালনা, সহচরীপরিবৃতা রাণী অথবা রাজা ও রাণী উভয়ে, নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত ভৃত্যবর্গ, প্রসাধন দৃশ্য, নিভৃত পারিবারিক জীবনের ছবি, নাগরিকের জীবনযাত্রা, পল্লীজীবন, গো-মহিষাদির সঙ্গে মাঠে অথবা কুটীরে রন্ধনরত কৃষক—সমস্তই চিত্রে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিরাট শোভাযাত্রা এবং নৃত্যগীত সমন্বিত আনন্দোৎসবের চিত্রও আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও বাদ পড়েন নি।

সে-যুগের তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় রাজ-রাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সিল্ক অথবা মসলিনের অঙ্গলগ্নীকৃত সূক্ষ্ম শাড়ী এবং ওড়নায়, গোপন করার চেয়ে যা রূপ প্রকাশ করে বেশী। নারী এবং পুরুষদেরও মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তরাদির বহু ও বিচিত্র অলংকার ধারণের মধ্যে যে অলংকার-প্রীতি দেখা যায় তাও এই সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। নর্তকীদের পরিধানে প্রলম্বিত রঙীন বেশ থেকে রঙীন ডুরে কাপড়ের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ মেলে। পুরুষের পরিষ্কার দেখা যায় ধুতি, সন্ন্যাসীর আলখাল্লা জাতীয় ঢোলা জামা এবং বিদেশীদের নিজ নিজ বিশিষ্ট পরিচ্ছদ।



রাজার নগর পরিদর্শন



সংগীত ও নৃত্যোৎসব

যেরকম যত্ন ও মমতার সঙ্গে শিল্পীরা তরুলতা এবং প্রাণীদের চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে পশুপাখী ও প্রকৃতির প্রতি সেকালের পুরুষ ও নারীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

চলাচলের জন্য ব্যবহৃত রথ, নৌকা, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি যান-বাহন, এই সকল পশু ধরার ব্যবস্থা এবং সংগীতযন্ত্র ও বাসন পত্রাদির ছবিও দেখা যায়। শান্তির সময়ের চিত্রের প্রাধান্য থাকলেও বিরাটভাবে স্থল-যুদ্ধ এবং সমুদ্র যুদ্ধের চিত্রও আঁকা হয়েছে। মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মহত্তম থেকে হীনতম,—প্রেম ভক্তি দয়া মায়া কাম ক্রোধ লোভ শোক চুরি-ডাকাতির স্পৃহা এবং লুঠতরাজের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি ইত্যাদি চিত্রগুলিতে যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে পরবর্তীকালের ভারতীয় চিত্রকলায় আর কোনদিন তা হয় নি।

সাহিত্যে চিত্রকলার কথা

প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা সমসাময়িক সমাজে কিরূপ ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছে দেখান হল। সংস্কৃত সাহিত্যেও চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ থেকে জোরালো প্রমাণ মেলে যে প্রাচীন যুগে সমাজের সঙ্গে চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আমাদের বর্তমান যুগে যার কোন অস্তিত্ব নেই। কণ্বের আশ্রমস্থিত আম্র-কাননে প্রেয়সী শকুন্তলার স্মৃতি অবলম্বন করে স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র হাতে দুষ্মন্ত—কালিদাসের শকুন্তলা নাটের এই দৃশ্য মানসপটে কল্পনার তুলিতে কে না এঁকেছে? সংস্কৃত সাহিত্য থেকে,—বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে শকুন্তলা, রঘুবংশ ও রত্নাবলীর নাম করলেই যথেষ্ট হবে, আমরা জানতে পারি যে রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ ও

প্রিমিয়ার গ্লাসওয়ার্স ষ্টোর্স

P 48 Sch. No. XLV, C.I.T.
রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বপ্রকার কাঁচের জিনিষ
ও
কর্কের
ষ্টকিষ্ট ও সাপ্লায়ার

মফঃস্বল অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

প্রিমিয়ার গ্লাসওয়ার্স ষ্টোর্স

শরৎ লক্ষ্মীর আগমনে

বাংলার ঘরে ঘরে আবার কল্যাণ-শ্রীতে ভরিয়া উঠুক, সকল দুঃখ-দৈন্য দূর হউক—ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের সময় বাজারে প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া যায় না—তাই জনসাধারণের শুভেচ্ছায় ও সহযোগিতার বিনিময়ে আমরা যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরাসরি আমদানী করিয়া **সামান্য মুনাফায় সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছি।**

মাল চলাচলের সুব্যবস্থা না থাকায় মাল প্রেরণে বিলম্ব হইলেও মফঃস্বল গ্রাহকবর্গের সুবিধা ও স্বার্থরক্ষার্থে আমরা সকল সময়ই সচেষ্ট রহিয়াছি।

❋

আপনাদের সেবা ও সন্তুষ্ট করাই আমাদের চরম লক্ষ্য

শারদীয়া ষ্টোর্স

কমিশন এজেন্টস এবং জেনারেল অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (রাজাকাটরা), কলিকাতা।



আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁপানির কষ্ট যখন বাড়ে, তখন রাত কাটে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। **এ্যাজমলীন** এই রকম কষ্টের সময় অদ্ভুত কাজ করে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লক্ষ লক্ষ লোক **এ্যাজমলীন** খেয়ে চিরদিনের মত রোগমুক্ত হয়েছেন। হাঁপানি ছাড়া যে কোন রকম কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি কঠিন অসুখও **এ্যাজমলীন** সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে দেয়। এই ঔষধ ব্যবহার করে নিজেকে আজই রোগমুক্ত করুন।

বিনামূল্যে—আপনি ইচ্ছা করিলে প্রস্তুতকারকের নিকট ডাক খরচা বাবদ ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া বিনামূল্যে পরীক্ষার জন্য নমুনা নিতে পারেন।

সর্বত্র পাওয়া যায়।

এ্যাজমলীন

প্রস্তুতকারক : জি, ডি এণ্ড কোং
৮৮, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার এজেণ্ট—রাইমার এণ্ড কোং
১১৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।

নারী মূর্তিচিত্র অঙ্কন করতেন। এইসব চিত্রে প্রায়শঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থান পেত। সেযুগে চিত্রকলায় দক্ষতা উচুঁদরের অভিলষিত গুণ বলে পরিগণিত হত এবং সমাজের সকল স্তরের পুরুষ ও নারী চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার চর্চা করতেন। স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে উষা তার প্রতি অনুরাগিণী হলে তার সহচরী চিত্রলেখা কল্পনা থেকে অনিরুদ্ধের মূর্তি এঁকেছিল। নরনারীর কাহিনী গড়ে তুলবার উপায় হিসাবে চিত্রকে কাহিনীর মধ্যে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান দেওয়ার এই ধরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। প্রকৃত-পক্ষে বিরহী ও বিরহিণীকে সান্ত্বনা দেবার এবং তরুণ তরুণীর মনে প্রেম সঞ্চার করবার উপায় হিসাবে মূর্তিচিত্রকে কাজে লাগানো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ভাসের স্বপ্ন-বাসবদত্তায় উদয়ন ও বাসবদত্তার অনুপস্থিতিতেই তাদের মাতাপিতা দুজনের চিত্রের পরিণয় সম্পন্ন করেছিলেন।

বাৎসায়নের কামসূত্রে চৌষট্টি কলার মধ্যে সংগীত ও নৃত্যকলার সঙ্গে চিত্রকলাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকের এই কলায় দখল থাকা প্রয়োজন। বাৎসায়নের নাগরিক হল ফ্যাসন দুরস্ত মানুষ অর্থাৎ সহরের সভ্য লোক, বিশেষতঃ ঘষামাজা গিল্টিকরা যুবক। এই রকম একটি যুবকের ঘরে কি কি দ্রব্য থাকা উচিত তার বর্ণনায় রং, তুলি ও অঙ্কণের জন্য একটি কাষ্ঠ ফলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের কলাবোধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুরুষ ও নারী কেবল নিজের আনন্দের জন্যই চিত্রকলার চর্চা করতেন (বিনোদ), অপরপক্ষে গণিকারা, যাদের বাৎসায়ন এবং অন্যান্য কামদর্শী গ্রন্থকার চৌষট্টি কলা আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছেন, দামোদর গুপ্তের মন্তব্য অনুসারে তারা নিছক পুরুষের মন ভুলাবার জন্য নৃত্যগীত প্রভৃতি অন্যান্য কলায় পারদর্শিতা দেখাবার মত একই উদ্দেশ্যে চিত্রকলা শিক্ষা করত।

চিত্রশালা

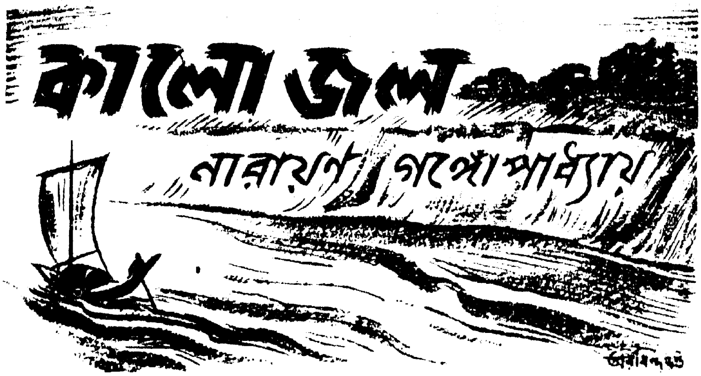
সেকালের সমাজে চিত্রশালা অথবা ছবির গ্যালারির স্থান কি ছিল এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগের চিত্রশালার উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে, লঙ্কা নগরীর বর্ণনায় রাবণের চিত্রশালার কথা আছে। পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে রাজার এবং রাণীদেরও নিজ নিজ চিত্রশালা থাকত। ধনী নগরবাসীরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখতেন। মৃচ্ছকটিকে বারবণিতাদের ঐশ্বর্য ও প্রাসাদোপম হর্ম্যের বর্ণনা আছে। চিত্রকলায় এদের দক্ষতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখা গর্বের বিষয় মনে করত। বিশেষ ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষেও চিত্রশালা থাকার কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন, শয়ন-চিত্রশালা এবং জল-মণ্ডপের চিত্রশালা।

জনসাধারণের জন্য নির্মিত চিত্রশালাগুলি পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিরামস্থান ছিল। অভিসারিকারা এবং সম্ভবতঃ বারবণিতারাও সেখানে যাতায়াত করত। অপরাহ্নে চিত্রশালা খোলা হলে নাগরিকেরা সপরিবারে সেখানে বেড়াতে যেতেন,—এজন্য শরৎকাল ছিল প্রশস্ত সময়। চিত্রশালার মনোরম পরিবেশে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দর্শকদের সুশ্রী আবেষ্টনীতে সাজানো সুন্দর সুন্দর চিত্র-দর্শনের আনন্দ গন্ধধূপের সুবাস ভেসে এসে আরও বাড়িয়ে দিত।

চিত্রশালায় নানারকম চিত্র থাকত। শৃঙ্গার রসের চিত্র, জলক্রীড়া অথবা রাসলীলা ইত্যাদি ক্রীড়াকৌতুকের চিত্র, শিকার দৃশ্য, দেবতা ও উপদেবতা, রাজা ও রাণী, বীর ও বীরাঙ্গনাদের জীবনের দৃশ্য, পশুপাখী এবং সুদর্শন লতাপাতা ও ফুলের চিত্রে চিত্রশালার দেয়াল সজ্জিত থাকত। বাসগৃহে যুদ্ধ বা হত্যালীলার চিত্র বিষ্ণুধর্মোত্তরে নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু এসব চিত্র সাধারণ চিত্রশালা, সভাগৃহ এবং মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চলত।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে চিত্রশালা-ভবনের অর্থাৎ চিত্রশালা যে গৃহে অবস্থিত সেই গৃহের বর্ণনা পাওয়া যায়। নারদশিল্পশাস্ত্র নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে চিত্রশালা ভবনের বিবরণ পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে চিত্রশালার জন্যই সুন্দর স্বতন্ত্র গৃহ থাকত। চিত্রশালা ভবনের বাইরেটা হত বিমান অথবা মন্দিরের মত, বিশাল স্তম্ভ ও বিস্তীর্ণ চত্বর থাকত এবং সমস্ত অংশ ফুল ও অন্যান্য আলঙ্কারিক চিত্রে সজ্জিত করা হত। একটি বৃহৎ বহিঃ-কক্ষ বা প্রবেশ-কক্ষের মধ্য দিয়ে ভিতরের চিত্রশালায় প্রবেশ করতে হত। ভবভূতি থেকে জানা যায় চিত্রশালা কক্ষে বাতায়ন থাকত। ভবভূতি তাঁর উত্তররামচরিতের একটি স্মরণীয় দৃশ্যে চিত্রশালাকে অমর করে গিয়েছেন। রাম ও সীতা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে চিত্রশালার দেওয়ালে অঙ্কিত নিজেদেরই জীবনের চিত্র দর্শন করছেন। রাম নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটি দৃশ্য বর্ণনা করছেন। চিত্রদর্শন শেষ হবার পর সীতা ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাম তাকে সাদরে অনুনয় জানালেন বাতায়নের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করতে, যেখানে মৃদু বাতাস তাঁর গায়ে লাগবে।

চিত্রকলার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে যতই জানবার চেষ্টা করা যায় ভারতের সেই গৌরবময় অতীতে কলাশিল্প সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পেয়ে আমরা তত বেশী শ্রদ্ধা অনুভব করি এবং সেই সঙ্গে এই ভেবে ক্ষোভও বেড়ে যায় যে একদিন যে সমাজে উচ্চকলার প্রতি সার্বজনীন অনুরাগ দেখা যেত সেই সমাজের এতদূর অবনতি ঘটেছে যে ও বিষয়ে প্রায় কারুরই কিছুমাত্র দরদ দেখা যায় না।



লম্বা কালো চেহারার মানুষটা। নাক দুটো একটু চাপা বলে গলার স্বর খানিকটা অনুনাসিক হয়ে বেরিয়ে আসে। সমস্ত শরীরটায় বাড়তি কিছু নেই, যেন রাশি রাশি পেশীর সমষ্টি। পূর্ব বাংলাতেও আজকাল অসম্ভব ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার অত্যাচারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। তাই বাহান্ন বছর বয়সেই জীর্ণতা দেখা দিয়েছে শীতলের দেহে। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে লজ্জায় শীতলের মাথা নত হয়ে আসে। বায়াত্তর বছরেও কী চেহারা ছিল তার, আর কী শক্তি। ভোলার ঝড়ে যদি সে ঘর চাপা পড়ে না মরত, তা হলে আরো দশ বারো বছর সে যে আরো বে-ওজর বেঁচে থাকতে পারত তাতে আর সন্দেহ কী।

নৌকার হাল ধরে এলোমেলোভাবে কত কী ভেবে চলে শীতল। আড়িয়াল খাঁর শাদা জলে পশ্চিমের রাশি রাশি বাতাস বৃষ্টি-বিন্দুর মতো জলের কণা উড়িয়ে দিচ্ছে—যেন সৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণিপাক। হালকা একটুকরো মেঘে নদীর এদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাঁকের ওপারে খর রৌদ্রে ঝলমল করছে জল, খালের মুখে কচুরিপানার সবুজ ছোপ—নদীটা যেন বহুরূপী। পলি-মাটির জমিতে বৈশাখী মেঘের রঙ ধরা পরি-পুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

এই পথ—কতদিনের চেনা পথ। ফরিদপুর থেকে, মাদারীপুর থেকে কতবার সে সোয়ারী নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। কতবার বৈশাখী ঝড় আর জলের রাক্ষস উল্লাস তার নৌকা-খানাকে নাচিয়েছে খেলার খেয়ালে। চোখের সামনে স্টিমারের ঢেউ লেগে নৌকো ডুবে গেছে, শুনেছে দূরের অন্ধকারে ডাকাতের আক্রমণে অসহায় নৌকোযাত্রীর আর্তনাদ। তবু কী চমৎকার গেছে সে দিনগুলো। পুজোর সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালীর সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকায় ঝমঝম করে করতাল বেজেছে—উঠেছে উদ্দাম চীৎকার। গ্রামের হরিসভা থেকে কীর্তনের সুর এসেছে, গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের মেয়েরা 'জলসই' করতে এসেছে গাঙের ঘাটে। কিন্তু এই তিন বছরে কোথা থেকে কী হয়ে গেল সমস্ত।

—ও মাঝি, আর কয় বাঁক?

ঘুম থেকে উঠে একটা বিড়ি ধরিয়েছে সোয়ারী তারাপদ। উৎসুক ব্যাকুল চোখ বাইরে নদীর দিকে মেলে দিয়ে বলছে, সন্ধ্যের আগে পৌঁছে দিতে হবে যে।

মেঘের ছায়াটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—যেন একটা বিরাট পাখী সূর্যের ওপর থেকে ডানার আড়াল সরিয়ে নিয়ে ভেসে গেল দিগন্তের দিকে। শীতলের পাকধরা চুল-গুলো চিকচিক করে উঠল, ঘর্মসিক্ত চওড়া কপাল জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে।

—ভাটায় বড় জোর টান দিয়েছে বাবু। পালের ওপর তো চলছি। বাতাস ঠিক থাকলে সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারব। কথায় মন মানতে চায় না, পথ কি সোজা নাকি। —নইলে গুণ টেনে চলনা বাপু। —তারাপদ অধৈর্য হয়ে উঠেছে; সাঁঝের ভেতর না পৌঁছুলে আমার চলবে না।

—গুণ টানার এখন দরকার হবে না বাবু।—শীতল হাসল।—বাতাস পড়ে গেলে টানব তখন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসবার জো কোথায় তারাপদর। মনটা যদি পাখী হত তা হলে কখন হাওয়ার আগে উড়ে যেত সে। মানুষ না হতে পারলে দেশে ফিরব না—উত্তেজিত তারাপদ নাটকীয় ধরণে আস্ফালন করে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তাই বলে সম্পূর্ণ নাটকীয় নয়, অভিমান এবং অপমান-বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সে দিন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তার।

ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

চুলোয়।

—বালাই ষাটষাট। কবে আসবে?

—তোমরা মরলে।

এবার আর ষাট ষাট বলেনি অরুণা। হয় তো নিজের মৃত্যুই কামনা করেছিল, এ অপমান আর লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকেই ষোলো আনা দায়ী ভেবেছিল হয়তো। তাই ময়লা শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার পথে কাঁটা হব না বেশিদিন, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো দোষ করেনি।

তারাপদ সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সমস্ত মাথাটা যেন বিস্ফোরকে পূর্ণ হয়ে আছে, জবাব দিতে গেলেই যেন ভয়ংকর একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। নিরুত্তরে সুটকেশটা হাতে করে সে নৌকায় এসে উঠেছিল।

হুঁকো হাতে শ্বশুর জানকী চক্রবর্তী বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বিষণ্ণ হেসে বলেছিলেন, ঘরে বসে তাস পাশায় সময় না কাটিয়ে চাকরী বাকরীর চেষ্টা করাই ভালো। পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবাজী।

তখন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে, লগির



— কত কী ভেবে চলে শীতল।

খোঁচায় চক্রবর্তী বাড়ীর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মুখ বার করে কঠিন তিক্ত গলায় তারাপদ জবাব দিয়েছিল, হাঁ, আপনার আধসের চালের সাশ্রয় করে দিয়ে গেলাম।

জানকী চক্রবর্তী কী জবাব দিয়েছিলেন তা শোনা যায়নি। শুধু চোখে পড়েছিল, ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তারপরে তারাপদ চলে গেল পশ্চিমে। শুধু পশ্চিম নয়, পশ্চিম ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। দিল্লী, লাহোর, লয়ালপুরে। আত্মীয় নেই, পরিচিত নেই, সহায় সম্বল কিছু নেই। শ্যামশ্রীহীন রুক্ষ কঠিন মাটি, আগুনের পিণ্ডের মতো সূর্য, উত্তপ্ত লুয়ের ঝাপটা, পাঞ্জাবের শহরে দুর্গন্ধ নোংরা গলি। কত-দিন কেটে গেছে অনাহারে।। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুসময় এল। একটা পশমের কারখানায় ছোট মতো একটা চাকরী জুটেছিল—এই পাঁচ বছরে মাইনে দাঁড়িয়েছে দেড়শো টাকায়। আজ অন্তত তারাপদ কারো মুখাপেক্ষী নয়, অন্তত অরুণাকে কাছে নিয়ে গিয়ে দুটি খেতে দেবার মতো সংগতি তার হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছে বাংলা দেশের শ্যামল মাটি, নদীর গেরুয়া জল, স্নিগ্ধ আকাশ। তাই এক মাসের ছুটিতে দেশে ফিরছে তারাপদ। জলে স্থলে বাংলার স্নেহ গভীর স্পর্শ যেন তাকে আকুল করে দিয়েছে।

আর ক্রমাগত অরুণার কথা মনে পড়ছে, জেগে উঠছে একটা অতি তীব্র অনুতাপ বোধ। এতটা করবার কী দরকার ছিল। তা ছাড়া অরুণা কোনো দোষ করেনি। কোনোদিন একটি কথা বলেনি সে। শ্বশুরের অন্নে দিন যাপনের গ্লানিকে তারাপদর জীবনে যথাসম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টাই বরং সে করেছে। তবু কেন অরুণাকেই সে আঘাত করল সব চাইতে বেশি, কেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেও সে তাদের খোঁজ নেয়নি? কী যেন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল, অপমানিত পৌরুষের কোন্ কেন্দ্রবিন্দুতে ঘা লেগেছিল একটা। আজ তার জন্যে সে অনুতপ্ত, ক্ষতিপূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করবে।

ও মাঝি, সাঁঝের আগে কি কিছুতেই পৌঁছোনো যাবে না? হাওয়াতো তেমন জোর ঠেকছে না। নইলে গুণই নাও না।

শীতল আবার হাসল।

—ব্যস্ত হবেন না বাবু, গুণের সময় হয়নি এখনো।

পাড়ের দিকে একবার তাকাল শীতল। খাড়া পাড় প্রায় আট দশ হাত ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো—থেকে থেকে ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাংগাড়—খানিকটা ঘোলা জল ঘুরপাক খেয়ে উঠছে ঘূর্ণীর মতো। আড়িয়াল খাঁর শ্রান্তিহীন ভাঙন। এদিকের একটা গ্রাম প্রায় অর্ধেকের বেশি নদীর জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, দু তিনটে পত্রহীন শুকনো নারকেল গাছ এখনো জলের মাঝখানে তির্যক রেখায় দাঁড়িয়ে স্রোতের টানে থর থর করে কাঁপছে। উঁচু পাড়ের এখানে ওখানে খাঁড়ির মতো হয়ে নদীর জল ঢুকে গেছে—মাটির গায়ে অজস্র ফাটল, কাঁটা গাছ আর হিজলের ঘন সারি দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। ওখানে গুণ নিয়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু তারা-পদর তাগিদ অত্যন্ত বেশি, বড় বেশি স্বার্থপর মানুষের মন।



ক্রমাগত অরুণা ও মেয়েটার কথাই মনে পড়ছে।

তারাপদর দোষ নেই অবশ্য। বহুদিন পরে সে ফিরছে—দূরপ্রবাসীর এই স্বার্থব্যাকুল মনোভাব অপরিচিত বা অস্বাভাবিক নয় শীতলের কাছে। আজ পঁচিশ বছরের ওপরে সে মাঝিগিরি করছে, মানুষের এই দুর্বল ব্যগ্রতা বিরক্তি জাগায় না তার—সহানুভূতিই আকর্ষণ করে বরং।

কিন্তু এই নদী—এই গ্রামগুলো। তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পরে গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। চরের ওপরে ওই বাড়িগুলো থেকে কীর্তনের সুর এসেছে কতদিন, এসেছে রয়ানী গানের উত্তাল কণ্ঠ। কিন্তু দু বছরের মধ্যেই সব আশ্চর্যভাবে নীরব আর নিঃসাড় হয়ে গেছে। মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি মাত্র।

হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে পালের মুখটা বদলে দিলে শীতল।

—কদিন পরে দেশে আসছেন বাবু?

কদ্দিন? সে অনেক দিন হল বই কি—পাঁচ বছর।

—দেশের কিছুই জানেন না বুঝি?

—নাঃ।—তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, না, বিশেষ কিছুই—! এদিকে খুব দুর্ভিক্ষ গেছে না মাঝি? কাগজে যেন দেখছিলাম। আচ্ছা, মধু গাঁয়ের কোনো খবর জানো তুমি?

না, শীতল জানে না। না জানলেও কিছু অনুমান করা কঠিন নয় তার পক্ষে। কিন্তু কী হবে সে কথা তারাপদকে বলে। দুঃসংবাদ দিয়ে তার লাভ কী। তা ছাড়া তারাপদ হয়তো বড়লোক। হয়তো তার আত্মীয়স্বজন সুখে-স্বাচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে চলেছে। দেশের সব লোকই তো আর না খেয়ে মরেনি। কত মানুষ তো এই ফাঁকে দস্তুর মতো রাজা বাদশা বনে গেল।

অন্যমনস্কের মতো তারাপদ আবার বললে, গুণটা টেনে গেলে—

শীতল সে কথার জবাব দিল না।

বাঁকের পর বাঁক। পথ যেন আর ফুরোয় না।। ভাঁটার টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসছে, পালের বাতাস মন্দা। শুধু খাড়া পাড়ের গায়ে নদীর অচেতন হিংসা আঘাত করে যাচ্ছে, ঝুপঝাপ শব্দে অবিশ্রাম ভাঙন। ঘোলা জলে এক রাশ ফেনা ফুটে উঠছে, তারপরেই ছিন্ন মালা থেকে ছড়ানো রাশি রাশি ফুলের মতো খরস্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তারাপদর নৌকোর ওপর একটা কাক বারকয়েক অকারণে চক্র দিয়ে কা কা করে উড়ে চলে গেল।

অসীম বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলল তারাপদ। মাঝিটার যেন গরজ নেই কিছু, গুণ টেনে গেলে এতক্ষণ—! কিন্তু বলে বলে হয়রাণ হয়ে হয়ে গেল সে। এত স্বার্থপর হয় মানুষ। একটুখানি গা ঘামালে এমন কি ক্ষতি হতে পারত লোকটার; পাঁচ বছর পরে সে দেশে ফিরছে অথচ যেন কোনো তাগিদ নেই, এতটুকু সমবেদনা নেই তার জন্যে।

অরুণা কী করছে এখন! হয়তো বিকেল বেলায় গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে খিড়কির ঘাট থেকে ঘরে ফিরছে। বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে জানকী চক্রবর্তী পাশার আসরে মেতে উঠেছেন। বড়শালা এইমাত্র হুইল আর তিনটে মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। মেয়েটা হয়তো দাদুর কোলের কাছে বসে তাঁর গুড়গুড়ির নলটা নিয়ে খেলা করছে।

বুকের ভেতরে চনচন করে উঠল, মনটা আর বাঁধন মানতে চায় না। নদীতে আজ কি আর জোয়ার আসবে না? অথবা এই পাঁচ বছরে

বদলে গেছে সমস্ত, শুধু ভাটাই আসে আজকাল, জোয়ারের টান বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে!

—ও মাঝি?

—আর দেরী নেই কর্তা। সামনের বাঁক ঘুরলেই খাল ধরব।

সামনের বাঁক সামনের বাঁক। তারাপদর ইচ্ছে করল মাঝিটাকে কষে একটা চড় বসিয়ে দেয়। লোকটা যেন ইয়ার্কী করছে তার সঙ্গে। ওদিকের রোদের রঙ রাঙা হয়ে উঠেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, পূবের আকাশে কে যেন হালকা তুলি দিয়ে ছায়ায় রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা আসছে। অথচ—

সামনের বাঁক। সামনে তো যতটা চোখ যায় ধূ ধূ করছে সোজা নদী, তারপর ওই দিকচক্রবালে—যেখানে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না, ওখানে ওইটেই বাঁক নাকি। তাই হয় তো হবে। কিন্তু ওখানে যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা লেগে যাবে। তারাপদ বিরক্ত ও হতাশ মনে আর একটা বিড়ির জন্যে সার্টের পকেটে হাত ঢোকালে, কিন্তু সময় বুঝে বিড়িগুলোও ফুরিয়ে গেছে সব।

ক্লান্তি আর বিরক্তিতে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে। উজ্জ্বল নীল আকাশ। রাজহাঁসের পাখার মতো মেঘের রঙ। হাল ধরে শীতল বসে আছে স্থির। নদীর জল বয়ে চলেছে কলকল করে। ওই আকাশটার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ জুড়ে এল, তারাপদ আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠুন বাবু, এই তো ঘাট।

এক লাফে তারাপদ উঠে বসল। এতক্ষণে তা হলে পথ সত্যিই ফুরিয়েছে। যেন বিশ্বাস হতে চায়না সহজে ঃ মধু গাঁয়ের চক্কোত্তি বাড়ির ঘাট!

—হাঁ বাবু।

—তা হলে—সার্টটা গায়ে চড়িয়ে লাফিয়ে তারাপদ নেমে পড়ল—হাঁটু পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল কাদায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললে, আমি এগোই, তুমি জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এসো।

তারাপদ যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে গেল। এই তো চক্রবর্তী বাড়ি। সন্ধ্যার অন্ধকারে সব যেন থমথম করছে। সুপুরী গাছের ঘন ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে আছে ম্লান আর নিরানন্দ অন্ধকার। এই সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে একটাও আলো জ্বলে না কেন! চণ্ডীমণ্ডপটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার অন্ধকার কোণ থেকে একটা তক্ষক আকস্মিকভাবে তারাপদকে অভ্যর্থনা করে উঠল ঃ ঠক্-কো ঠক্-কো—ঠক্ ক'-অ'-অ'—

বাড়ি ভুল হয়নি তো! না, কেমন করে হবে? এই তো সামনে বড় গাব গাছটা, ওই তো পশ্চিমের ঘর—তবে?

—অনন্ত দা, অনন্ত দা! ও ভুনি। এই সন্ধ্যে বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সমস্ত?

পশ্চিমের ঘরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। কাঁপা বিরক্ত গলায় কে বললে, এখন আবার কে ডাকাডাকি করে। আমার জ্বর এসেছে, বেরোতে পারব না।

—আমি তারাপদ।

—কে, কে?

—তারাপদ।

—তারাপদ!—একটা আর্ত প্রতিধ্বনি, পরক্ষণেই আবার নিঝুম মেরে গেল সমস্ত। দ্রুত হুড়কো খোলার একটা শব্দ হল, একটা মাটির প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল বড় শালা অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। নিরাভরণ হাত, ছিন্ন শাড়ীর অন্তরালে একটা কংকালসার দেহ, প্রতিমা নয়, প্রেতিনী। দরজার গোড়ায় অনন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, গায়ে একটা কাঁথা—প্রদীপের আলোয় তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তারাপদর চোখে পড়ল।

—এতদিন পরে এলে ভাই! কেন এলে?



জলে স্থলে বাংলার স্নেহ

একটা বুক ফাটা কান্নায় প্রতিমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে নিবে গেল। বাড়ির পেছনে গাব গাছ থেকে প্যাঁচা ডাকতে লাগল ঃ নিম্ নিম্ নিম্—

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শুনে গেল তারাপদ। কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রী করে দিয়েছে। আর অরুণা! পেটের ভাত আর পরণের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।

আশ্চর্য, তারাপদ তবু সোজা দাঁড়িয়েই রইল। মাটিতে পড়ে গেল না, মাটিতেই বা তার অবলম্বন কোথায়। শুধু পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর পেছনে শীতলের ছায়া মূর্তিটা অনুভব করে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—তুই যা মাঝি। সিধে আর তোকে দিতে পারব না।

—ভাড়া তো আট টাকা ঠিক হয়েছিল বাবু। আমার কাছে খুচরো নেই।

—থাক্, ওই দশ টাকাই তুই নিয়ে যা।

সমস্ত নাটকটার নীরব এবং একমাত্র দর্শক শীতল নিঃশব্দে অভিশপ্ত চক্রবর্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সে আরো দেখেছে দু চারবার। কিন্তু আজ যেন বুকের মধ্যে বড় বেশি দোলা লাগল, বড় বেশি করে মনের সামনে ভাসতে লাগল তারাপদর বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি—যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শীতলও তো এক মাসের মধ্যে দেশে যায়নি, তার পরিবার পরিজন—!

অন্ধকার গাব গাছটার তলা দিয়ে আসতে আসতে সে শুনতে পেল মাথার ওপরে অলক্ষণে প্যাঁচাটা তখনো কঁকিয়ে চলেছে নিম্ নিম্ নিম্। আর কী নিবি, নেবার আছেই বা কী। অহেতুক বিদ্বেষে একটা মাটির চাঙড় কুড়িয়ে নিয়ে সে প্যাঁচাটার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলে, ঝটপট শব্দে একটা ছোট কাল পাখী খাল পার হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল। পেছন থেকে তখনো কান্নার সুর আসছে। এতদিন পরে কেন এলে ভাই, কেন এলে?

আর মনে পড়ে গেল পলাশপুরের দত্ত বাড়ির ছোট বউকে। স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল শীতলের নৌকোতেই। বয়স অল্প, স্বামীর অসুখের সংবাদেও তার কাঁচ কোমল সুন্দর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপটা গাঢ় হয়ে পড়েনি। আশার আনন্দে তখনো উচ্ছল, মাথায় টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা, গায়ে রাশি রাশি গয়না। অসুখ মানুষের হয়, আবার সারেও তো। মাঝে মাঝে খুশি মনে ছোট ছোট শাদা আঙুল দিয়ে খালের জল নিয়ে খেলা করেছিল, পান খেয়ে আরো রঙীন করেছিল রঙীন ঠোঁট দুটি—একেবারেই ছেলেমানুষ! তারপর বাড়ির ঘাটে যখন নৌকো ভিড়েছিল, তখন দেখেছিল সামনের ভিটা বাড়িতে একটা চিতা জ্বলছে, তার স্বামীর চিতা।

লগির খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে চক্রবর্তী বাড়ির ঘাট থেকে বের করে নিয়ে এল। বাজারের নীচে রান্নাবান্না করে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দেবে শেষ রাতে। সারা গায়ে অসীম ক্লান্তি এসে বাসা বেঁধেছে যেন। মাত্র বায়ান্ন বছর বয়েস, এর ভেতরেই এত বুড়ো হয়ে গেল শীতল। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে—

খালের দু বাঁক উজানে নামতেই মধু গাঁয়ের বাজার। আলো নেই, মানুষ নেই, চক্রবর্তী বাড়ির মতোই ঝিম মেরে পড়ে আছে। খোঁজ করতে গেলে বাজারে হয়তো কিছুই মিলবে না। চাল নয়, তেল নয়, একটুখানি নুনের ভাবনা ভাবা তো পাগলামি মাত্র। আর এই বাজার! পাঁচ বছর আগেও শীতল একে দেখেছে, আলোয় ঝলমল করত, হঠাৎ দেখলে ভুল হত শহরের বাজার বলে। সেদিন আর এদিন।

সঙ্গে যা ছিল তাই দিয়েই চালে ডালে পেঁয়াজে খানিকটা খিচুড়ি রাঁধলে শীতল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা দুটো গ্রাস মুখে দিয়েই আর সে খেতে পারল না। অনিচ্ছুক শরীর, অনিচ্ছুক মন। কেবলই যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাপদর বিহ্বল মুখখানা।

এক পেট জল খেয়ে হাঁড়িটাকে সে ঢেকে রাখল। ভোরবেলা নৌকো ছাড়বার আগে খেয়ে নিলেই চলবে। ক্লান্তির জন্যেই বোধ হয় এত খারাপ লাগছে তার। একটু ঘুমিয়ে নিলেই



..........দুজন লোক দাঁড়িয়ে

সব ঠিক হয়ে যাবে। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

খালের ওপরে বাজারটা নিস্তব্ধ। শুধু নৌকোর তলা দিয়ে কলকল করছে কালো জল—মাথার ওপর দিয়ে পাখা মেলে উড়ে চলেছে রাত্রির পাখী। বাতাসটা ঠাণ্ডা নয়—খানিকটা উত্তপ্ত বাষ্পের মতো, যেন কারো নিঃশ্বাসের মতো গরম। পূর্ব বাংলার শ্মশানে যেন প্রেতের উষ্ণ নিঃশ্বাস। শীতলের গায়ের মধ্যে ছম ছম করতে লাগল।

তবু ভালো, বাজারে এখনো মানুষ আছে, বেঁচেও আছে। একটি কোমল কিশোরী কণ্ঠে 'মনসা-মঙ্গলের' কয়েকটি পংক্তি ভেসে এল কানে :

"বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও
ত্রিভুবন রক্ষা করো ত্রিভুবনের মাও"—

গলার স্বরে করুণ কাতরতা। যেন এই বাজারটা, এই গ্রামটা, সমস্ত দেশটাই অসহায় সুরে কেঁদে উঠছে, বাঁচাও আমাদের, বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও। কিন্তু ত্রিভুবন কি সত্য সত্যই রক্ষা পাবে? আকাশের নীচে এই জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করে সে প্রার্থনা কি গিয়ে পৌঁছুবে দেবতার কাণে। কে বলবে।



পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে

অনেক রাত্রে একটা লণ্ঠনের আলো পড়ল চোখের ওপর। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে।

—ও মাঝি, ও মাঝি, ভাড়া যাবে?

আঃ, কে বিরক্ত করে এত রাত্রে। এখন সে কোথাও ভাড়া যেতে পারবে না। তারও মানুষের শরীর, তারও তো সুখদুঃখ আছে।

—না, ভাড়া যাব না।

—ও মাঝি, শোনো শোনো। বড় জরুরি। ভাড়া ডবল দেব। বিপদে পড়ে গেছি, উদ্ধার করে দাও একটুখানি। আর শুয়ে থাকা চলল না। অসীম বিরক্তিভরে একটা হাই তুলে শীতল উঠে বসল, কে?

লণ্ঠন হাতে দু জন লোক দাঁড়িয়ে। যে কথা বলছে তার গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। ডান হাতে তিনটে আংটি, বাহুতে সোণার তাবিজ, গলায় বেনিয়ানের ভিতরে সোণার এক ছড়া হার চিকচিক করছে। বড়লোক এবং মহাজন নিঃসন্দেহ।

—কী হয়েছে বাবু?

—কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বেশি নয়, বস্তা দশেক।

কিন্তু আমার নৌকো তো মালের নয় বাবু, শোয়ারীর।

জানিরে বাপু, জানি।—লোকটা বিরক্ত ভ্রূভঙ্গি করলে : সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। বড় নৌকোয় নেবার যদি উপায় থাকত, তা হলে কি এক মাল্লাই নৌকোর মাঝিদের তোয়াজ করি না তিনগুণ ভাড়া দিই! যত সব অকর্মা ছোকরারা জোট বেঁধেছে, গাঁয়ের থেকে চাল ডাল কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই ক্যাঁক করে এসে ধরে। আইনও নাকি হালে কী সব হয়েছে। পয়সা দিয়ে ব্যবসা করব, তবু এসব কিরে বাবা।

—তা আমি কী করব বাবু।

—বেশি কিছু করতে হবে না।—লোকটা এদিকে ওদিকে তাকাল একবার : বস্তা দশেক মাল নিয়ে রাতারাতি বল্লভপুরের মথুরো দাসের গোলায় পৌঁছে দেবে। আমিই মথুরো দাস, বুঝেছ। সঙ্গেই থাকব তোমার। খুশি করে ভাড়া দিয়ে দেব, কোন ভয় নেই।

একটা অকারণ নিষেধ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ অন্যায়, এ অত্যন্ত অন্যায়।

—না বাবু, পারব না।

—আরে বাপু, কত তোষামোদ করব আর। ওই যে কথায় বলে, মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে'—এত হয়েছে তাই। আর দর বাড়াসনে, গা তোল দয়া করে।

—দেবেন কত?

—দশ টাকা।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না।

—কুড়ি টাকা! বলিস্ কিরে! —মথুরো দাস চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে তুলল : কুড়ি টাকায় তো একখানা নৌকোই কেনা যায়।

—তবে তাই কিনুনগে না।—শীতল আবার শুয়ে পড়বার উপক্রম করল।



খড়্গের মত তীব্র খরধারায়

আহা মাঝি, শোন শোন।—মথুরো দাসের গলায় ব্যাকুলতার আমেজ লাগল : নে ওই পনেরো টাকাই পাবি, আর দিক করিস নে বাপধন। বড় বিপদেই পড়েছি, নইলে—

—কুড়ি টাকার কমে পারব না। যদি রাজী থাকেন তো মাল আনুন কর্তা।

—আঁঃ, এ যে ভদ্দরলোকের এক কথা। তবু তো ভাগিাস ভদ্দর লোক নোস। আচ্ছা যা, তাই হবে। বাগে পেয়েছিস কিনা। হুঁঃ, যত সব—

অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনেটুনে শীতল উঠে দাঁড়াল। বাগে পেয়েছে। সে আর পেয়েছে কতটুকু? তার চাইতে অনেক বেশি পেয়েছে মথুরো দাস। শুধু একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশ ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরো দাসের কড়ির পাহাড়। আড়িয়াল খাঁ ভেঙে চলেছে দুর্নিবার ভাবে, গ্রামের পরে গ্রাম, নীড়ের পরে নীড়, দুর্ভিক্ষে শ্মশান হয়ে চলেছে সমস্ত। আর সেই


বেণী রচনায়
অতুলনীয়
লক্ষ্মীবিলাস
এম, এস, বসু এণ্ড কোং লিঃ

জনহীন চড়ায় একটা ভাঙা নৌকো উবুড় হয়ে আছে। তা থাক, মথুরা দাসের নৌকোর অভাব হবে না কোনো দিন।

তারাপদ কী করছে এখন? চকিতের জন্যে শীতলের মনে পড়ল: তারাপদ কী করছে এখন? অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে এখনো কি সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কত আশা করেই না এসেছিল লোকটা। দেশে ফিরবার জন্যে কত ব্যস্ততা, কত তাগিদ, কতদিন যে সে আপনার জনের মুখ দেখেনি। নাঃ, এমন জানলে কিছুতেই ভাড়া নিতনা শীতল।

—আর কত মাল চাপাবেন বাবু? আমার নৌকো যে ডুবে যাবে।

—যাবে না বাপু, যাবে না। মোটে দশটা তো বস্তা। দু কোশ রাস্তা যাবি, কুড়ি টাকা কবুল করেছি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—কেউ জিগেস্ করলে—হাঁ, যা বলে দিয়েছি মনে আছে তো?

একবার ইচ্ছা হল টান মেরে বস্তাগুলোকে জলে ফেলে দেয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে শীতল নৌকো খুলে দিলে। অন্ধকারে জল বয়ে চলেছে তরল খড়্গের মতো তীক্ষ্ম খর ধারায়। দুপাশের বন জঙ্গল আর বেত কাঁটায় লগির আগা আঁকড়ে ধরে কচুরির জাঙ্গাল পথ আটকে নৌকোটাকে বাধা দেয় বারে বারে, যেন যেতে দেবে না। দূরে কোথায় কারা চীৎকার করে কাঁদছে—মড়াকান্না নিশ্চয়। মৃত্যুর এমন সমারোহের মাঝখানে লোকের এখনো কাঁদবার মতো কণ্ঠ যে অবশিষ্ট আছে এইটেই আশ্চর্য।

আকাশে অনেকগুলো জ্বলজ্বলে তারা একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে জলটা ঝিলমিল করছে যেন বাঘের থাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যুগ্র গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো। একটা রক্তাক্ত হিংস্র হাসির আভায় দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল—শেষ প্রহরের খণ্ড চাঁদ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্ময়করভাবে কুটিল আর হিংসাতুর হয়ে উঠেছে; রাত্রিটা যেন উঠে এসেছে শ্মশানের কোল থেকে, যেন রাশি রাশি চিতার ধোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এই অন্ধকার। আর এই রাত্রিতে মথুরা দাস চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে—চুরি করে নিয়ে চলেছে মানুষের মুখের গ্রাস। সমস্ত পরিপার্শ্ব—সমস্ত পটভূমিই তার অনুকূলে।

—নৌকো কার? কোথায় যাবে?

বড়গলায় প্রশ্ন এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিনটে টর্চের ঝাঁঝালো আলো এসে পড়ল শীতলের চোখে মুখে—কী আছে নৌকোয়?

নৌকোর ভেতরে ততক্ষণ একটা চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে মথুরা দাস। ফিসফিস করে ভীরু গলায় বললে, মাঝি, ও মাঝি?

—কী আছে নৌকোতে? থামাও, ভিড়াও নৌকো।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলে শীতল।

—শোয়ারী আছে বাবু, ভেদবমি ধরেছে। ভয়ানক বিপদ। তাড়াতাড়ি পেঁৗছুতে না পারলে—

—ভেদ-বমি! টর্চের আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল: মিথ্যে বলছ না তো? মাল-পত্তর নেই তো কিছু? চাল-টাল?

—এসে দেখুন না বাবু।

—আচ্ছা, যাও যাও। বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না।

—আজ্ঞে না।

জোরে জোরে আরো কয়েকটা খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল। খালের জলে বাঘের থাবা ঝক ঝক করছে—শেষ প্রহরের লালাভ ম্লানতায় সে থাবার নখগুলো যেন রক্তাক্ত। দিগন্তে চাঁদের রক্ত-হাসি। অন্ধকারটা যেন চিতার ধোঁয়ায় ঘনীভূত।

নিরাপদ জায়গায় এসে মথুরা দাসও হাসতে সুরু করে দিলে। দাঁতগুলো জ্বলে উঠলো উল্লাসে।

—বেড়ে, বেড়ে বলেছিস মাঝি। ভেদ-বমির রুগী! হি-হি-হি! এখন বাকীটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যেতে পারলে—হি-হি-হি।

শীতলের মনের মধ্যে বার বার করে একটা তীব্র ধিক্কার বেজে উঠছে, বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না। মথুরার হাসির শব্দে হঠাৎ যেন তার চমক ভেঙে গেল। অবচেতন জিঘাংসার একটা প্রেরণা হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল: কথা ক্ষণেও ফলে, অক্ষণেও ফলে। সত্যি সত্যিই কি এই মুহূর্তে ভেদ-বমি দেখা দিতে পারে না মথুরার?

খালের জলে অতি তীব্র জোয়ার এসেছে। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আড়িয়াল খাঁর প্রশস্ত প্রসারিত স্রোত নয়—অবিশ্রান্ত পাড় ভেঙে চলা শ্মশানের উদাস রিক্ততাও নয়। রাত্রির অন্ধকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্রগতিতে লুকোতে চলেছে নিজের নিরাপদ বিবরে।



ধার ঘেঁষার বিপদ!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীর অনেক কিছুই সার বলে' মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা অসার, সারমেয়র মতন। আড্ডাঘরের এককোণে আরাম-চেয়ারে এলায়িত হয়ে সবেমাত্র বিশ্বসংসার বিস্মৃত হতে চলেছি, চোখের পাতা প্রায় বুজে এসেছে,·কি আসেনি, এমন সময়ে ভূঁইফোড় দৈত্যের ন্যায় দীপেন আমার সামনে আবির্ভূত হোলো।

"বনস্পতিকে দেখেচ ?" খোঁজ করল সে —একটু খাপ্ছাড়াভাবেই।

"নাঃ। চারধার সাফ্। কোনো ভয় নেই।" আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

"এসেছিল কি আসেনি ?" দীপেন তথাপি জিজ্ঞাসু।

"আমি তাকে চোখেও দেখিনি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।" আমি জানালাম।

দীপেন বসে পড়ল।

"তাহলে তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।" বল্ল সেঃ "অন্ততঃ একবারটির জন্যও সে এখানে আসবে। রোজই তো আসে—তাই না ? "

আমি একদৃষ্টে দীপেনের দিকে তাকাই।

"তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে ?" আরাম চেয়ারের আওতায় যাও বা একটু ঘুম্‌ঘুম্ এসেছিল ওর কথার ঝট্‌কায় সে আমেজ এক ঝাপটে কেটে যায়। ষোলো আনা সজাগ হয়ে উঠতে হয়ঃ "য়্যাঁ ?—তুমি কার খোঁজ করছিলে ? বনস্পতির না ?"

"হ্যাঁ।" গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়ল। "বনস্পতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।"

আমি ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হই। ওর কথার মর্ম আমার মর্মে ঢোকে না, আমার নিরেট মাথায় ঠেকে ঠেকে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যি বলতে, ওর কথার কোনো অর্থ হয় বলে' আমার ধারণা হয় না।

"তুমি দেখা করতে চাও—বনস্পতির সঙ্গে? এই কথাই বল্লে না ?" আমি ওর বিবৃতির ছিন্নসূত্রগুলি আমার মানসপটে পরের পর সাজাই। শ্রুতি আর স্মৃতি আর সেই সূত্রদের জোড়াতাড়া দিয়ে পরম্পরায় সাজিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বার করার চেষ্টা করি। রহস্যটা পরিষ্কার করতে চাই।

"তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও—সত্যি কি ?"

"ঠিক যে চাই তা নয়—" দীপেন শুদ্ধিপত্র সংযোগ করেঃ "তবে তার সঙ্গে আমার দেখা না করলে নয়।"

"কেন ?" স্পষ্টবাক্যে আমি জানতে চাই।

"বল্‌লে পরে বুঝবে।" দীপেন বলেঃ "কদিন আগে গোটা পঁচিশেক টাকার আমার দরকার পড়েছিল হঠাৎ। অর্থোদ্ধারের মানসে এই আড্ডায় এলাম। বন্ধুবৎসল কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই যদি। কিন্তু বনস্পতি ছাড়া তখন কেউ এখানে ছিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই আমায় হাতড়াতে হোলো।"

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা। সেকালের বীরকেশরীদের যেমন হরিণ শিকার করে' আনন্দ ছিল, দীপেনের তেমনি এই ঋণ-স্বীকার। এক রকমের মৃগয়াই বই কি।

এবং এই মৃগয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশ্বমেধ। দীপেনের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়।—"পরশুদিন শনিবার ছিল বুঝি ?" আমি প্রশ্ন করি।

দীপেন তানা-নানা করে। পরশুর শনিত্বকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়, করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু কাজটা নিতান্তই ক্যালেণ্ডারবিরুদ্ধ বলে' তেমন সুষ্ঠুরূপে পারে না।

"কি রকম ? কিছু সুবিধা হোলো মাঠে ?" আমার পুনরপি প্রশ্ন। মৃগয়ার টাকাগুলো গয়ায় গেল কিনা আমার জ্ঞাতব্য।

দীপেন এ-জেরাটাকেও এড়িয়ে যায়—"ও কথা আর বোলো না।"

সে কথা বলবার নয় তা জানি। দীপেন যে ঘোড়াকে ধর্তব্যের বাইরে জ্ঞান করে সেই ঘোড়াই হাসতে হাসতে জিতে যায়, যাদের বাজে মনে করে তারা হেঁটে গেলেও বাজি মারে, আর দীপেন যাদের ওপর বাজি ধরে তারা চার পা মায় লেজ তুলে দৌড়েও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থও হয় না—শেষ পর্যন্ত সেই 'অল্‌সো র‍্যান্' হয়ে পড়ে। এবং মুখেই 'অল্‌সো র‍্যান্', আসলে তাদের রান্ করাতো নয়, শুধু হয়রাণ করা, দীপেনের মতো হতভাগ্যদের নাজেহাল করা নাহক। নির্ঘাৎ জেতার ঘোড়াও যে কি করে' ডিগ্‌বাজি খায় সে এক রহস্য—দীপেনের কাছে এবং আমাদের কাছেও। অতএব, কথাটা অকথ্যই বাস্তবিক।

এই অকথ্যতার জন্য কতোবার ওকে আমরা বলেছি, দীপেন, টাকাগুলো ঘোড়ার পশ্চাতে এমন অপব্যয় না করে' আর কোথাও ওড়াও। আমাদের কথা বলছিনে—তবে মেয়েদের পেছনে ওড়ালেও তো পারো! দীপেনের জবাব, চেনা মেয়েরা নাকি ওড়াবার মতো নয়, তাদের জন্য খরচান্ত করা যায় না। আমরা বলি, না হয় অচেনা অর্ধচেনাদের জন্যেই করলে, ঘোড়ারাও তোমার কিছু চেনা নয় তো? ঘোড়াদের জন্যে তুমি বহুৎ করেছ কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পেয়েছ কি?—ওর এক-চতুর্থাংশও যদি মেয়েদের যজ্ঞে দিতে যোগ্য ফল পেতেই। ঘোড়াদের কাছ থেকে তুমি কোনো সদ্ব্যবহার লাভ করোনি—এত টাকা ঢেলেও এতদিনে একটা ঘোড়াকে উইন্-প্লেস্ কোথাও পাওনি, কিন্তু মেয়েদের বেলা তার অন্যথা দেখতে। নেহাৎ তাকে উইন্ করতে না পারো (তোমার বরাত!) তবে প্লেসে তাকে পেতে নিশ্চয়। সিনেমায় কি রেস্তরাঁয়

সে না এসে যেত না। হৃদয় না পাও, এমন নির্দয়তা পেতে না।

এর জবাবে দীপেন মুখখানা যেন কি রকম করেছে। বিষাক্ত পৃথিবীতে বিষণ্ণ প্রতিভারা যেমন করে' থাকে। সামান্য মানুষেরা না বুঝলে বা একান্তই ভুল বুঝে দোষ করলে মহাপুরুষদের যেমন করা দস্তুর। কিম্বা হয়তো,—শেলীকে আমি কখনো চোখে দেখিনি,—শেলীর মতই মুখখানা করেছে হয়ত। সেই দৃশ্য শেলের মত আমাদের বুকে বেজেছে।

তার ভাবখানা ভাষান্তরে হয়ত এইঃ বৎসগণ, তোমরা পাঁড় বেকুব! দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? অশ্বতৃষ্ণা কি অন্য সুধায় মেটবার?



অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল।

আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অশ্বাহত দীপেনের দিকে তাকাতে পারিনি। ঘোড়ার চাট্ ঘোড়াতেই সইতে পারে। আর—আর পারে দীপেন। ও আমাদের কম্মো না।

তবে দীপেনের চাট্ মাঝে মধ্যে যে আমাদের সইতে হয় না তা নয়।

একদিনের কথা বলি। আমার নিজের কথা। মনে আছে এখনো। বর্ষাকাল, কোনো এক রাস্তার মোড়, টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। এক মাসিক পত্রিকায় গল্প বেচে কড়কড়ে দশটি মুদ্রা নিয়ে ফিরছি—ওই সম্বল। দীপেন এসে পাকড়ালোঃ "ভাই ভারী বিপদ, গোটা দশেক টাকা আমায় দিতে পারো? ধার চাচ্ছি।" ওর চোখমুখ উদাস, চুল উসকু খুসকু, বৈরাগ্যের চেহারা।

"পাঁচ টাকা দিতে পারি।" আমি বল্লাম। এবং দুখানা নোটের থেকে একজনকে ছাড়িয়ে এনে দীপেনের হাতে সমর্পণ করলাম।

দীপেন নোটখানাকে আলগোছে নিয়ে পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে' তার মধ্যে রাখল। অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল। বৈরাগ্যবন্ত খলু, ভাগ্যবন্ত—সন্দেহ কি? কিন্তু এই দৃশ্য দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে; "য়্যাঁ, এত টাকা? তোমার আবার টাকার দরকার?"

"বাঃ, কাল শনিবার না? জানোনা বুঝি?" সে জবাব দিয়েছে।

তখনো শনিবারের রহস্য, আরো অনেক রহস্যের মত আমার অজানা। হিউম্যান্ রেস্ আর হর্স্‌রেসের মাঝখানে দীপেন যে একটা মস্ত বড় যোগসূত্র সেকথা পরে অবশ্যি জেনেছিলাম।

জেনেছিলাম পুরাকালীন অশ্বমেধের আধুনিক ডেমোক্রাটিক সংস্করণ কী। সেকালের বীরত্বের বিশ্বব্যাপী পরাকাষ্ঠাদের এককালীন মাঠময় রূপান্তর দেখতেও বাকী ছিল না। শনিবারের আগে দীপেনকে দেখেছি—সমুজ্জ্বল দীপ্তি—এবং শনিবারের পরেও দেখেছি—অশ্ববল্গীকষায় সেবনের পূর্বে ও পরে। কিন্তু পরে আর সেই আগের দীপেনকে দেখতে পাইনি। তার বদলে আমার সম্মুখে ভাষান্তরিত (এবং ভাবান্তরিত) দি পেন্-কেই প্রকটিত হতে দেখা গেছে যেন।

তার বেদনায় আমরা ব্যথিত ছিলাম না তা নয়। আমরা, বন্ধুবান্ধবরা, আমাদের সাধ্যমত তার অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে তো কার্পণ্য করি নি, কিন্তু দীপেন অশ্বমেধ করছে কি অশ্বরা দীপেনমেধ করছে, আমাদের পক্ষে তা ঠিক করা একটু কঠিনই ছিল বোধ হয়। অবশেষে একালের অশ্বমেধকে আমাদের রাজসূয় বলেই ভ্রম হয়েছে—দীপেন তো ছার, এমন কি, এ রাজাদেরও শুইয়ে দেয়, এমনি ব্যাপার।

দীপেনকে শোয়ানোর একটা গল্প শুনেছিলাম। দীপেনের কাছ থেকেই। এক শনিবার ঘোড়াদের নিকটে বিড়ম্বনা লাভ করে' মাঠের দুঃখ ঘাটে ভুলবার সে মনস্থ করল—সটান লেকে গিয়ে জলাঞ্জলি যাবে এই বাসনা। কিন্তু জলপথ তো ঐ একটি নয়—দুঃখ ভোলানোর আরো অনেক জলযোগ আছে। রকমফের করে' দুঃখ টুঃখ ভুলে'—ভুলতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ীর পথও দীর্ঘতর আর টলায়মান হয়ে পড়েছে দীপেনের। অগত্যা করে কি? কোথায় শোয়? পাহারোলার হাতে না পড়ে রাতটা কাটায় কি করে? হঠাৎ সামনে ঘোড়াদের একটা জলাধার দেখতে পেয়ে তার মধ্যেই কুঁকড়ে সুঁকড়ে কোনোরকমে শুয়েছে সেঁধিয়ে।

তারপরে যে-ঘটনার কথা সে বলে, সেটা স্বপ্ন বলেই আমার মনে হয়। অনেক ভালো ভালো গল্প শেষটায় স্বপ্ন হয়ে যায় দেখা গেছে। দীপেনের উক্তিতে অনেক রাত্রে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর দুটো ঘোড়া সেখানে নাকি জল খেতে এসেছিল। তাকে সেখানে দেখে তারা যা আশ্চর্য হ'ল তা আর কহতব্য নয়। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, "দেখেচ এই লোকটার দশা? চিনতে পারছ একে? আমরা যখন টালীগঞ্জের মাঠে দৌড়াতাম তখন এই লোকটা আমাদের কতই না উৎসাহ দিয়েছে! নাম ধরে ধরে আমাদের কতো না ডাকাডাকি! হায়, আবার যে আমাদের এই ভাবে পুনর্মিলন হবে কে জানত? অদৃষ্টের পরিহাস দেখ! আজকে আমরা এই ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে বাঁধা, আর সেই লোকটা কিনা এইখানে!"

দীপেন বলে, "দেখেচ, ঘোড়ারা কখনো ভোলে না। হারিয়ে দেয়, হারিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখে। তোমার মেয়েদের চেয়ে ভালো।"

কিন্তু আমার ধারণায়, ও দুটি ঘোড়া নয়, রাত্রের ওঁরা। অশ্বজাতীয়া, তবে অন্যরূপা, দীপেনের নাইট্‌মেয়ার্।

"তা, হাতড়ে পেলে কিছু?" আমি জিজ্ঞেস করি, "বনস্পতির কাছ থেকে?"

"পেলাম।" অধোবদনে বল্লে দীপেনঃ "তিনটে বাজতে যখন দশ মিনিট তখন চেয়েছিলাম, আর পাঁচটা বেজে যখন কুড়ি, তখন পেলাম টাকাটা।"

"অনেক বলতে হোলো বুঝি?"

"আমি? না, আমি না। আমাকে কিছু বলতে হয়নি—ঐ টাকাটা একবার মুখ ফুটে চাওয়া ছাড়া"—দীপেন সকাতরে জানায়ঃ "—একটা কথাও আমায় বলতে হয়নি।"

"খুব বক্‌লে বুঝি তোমাকে? তোমার এই অশ্বরোগের জন্যেই বোধ হয়?"

"বক্‌লে বলে' বক্‌ল। যেমন বকুনি তেমনি বুকনি—তেমনি আবার বর্ণনা। তবে ঘোড়াটোড়ার ধার দিয়েই না। বনজঙ্গলের ব্যাপার সব।"

আমি বুঝতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতি-রসিক। বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় সে আত্মহারা।



দীপেনের নাইট্‌মেয়ার—

গাছপালা ঝিলজঙ্গল বন-বাদাড় তার অন্তরঙ্গ। এমন কি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মুখর। ওর বনস্পতি নাম ডাক এই কারণেই। ওকে শোনা মানে বনমর্মর শোনা।

"তোমায় এখানে একলাটি পেয়ে খুব বুঝি বলে' নিল? ওর সব বন্য-অভিযান-কাহিনীই বুঝি—?"

"শুধুই কি বন্য অভিযান? কতো কী!

বনের লাবণ্য পর্যন্ত। আর বল্ল বলে' বল্ল। সে কী কথা—আর কথার কী তোড়রে বাবা! যেমন করে' তুবড়ি ফাটে তেম্‌নি যেন কথারা তার ভেতর থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে ছুটে বেরুতে লাগল। প্রথম কথাতেই টাকাটা দিতে রাজি হয়েছিল বলে' শেষ পর্যন্ত সব আমায় সইতে হোলো। কি করব?"

বেচারার প্রতি আমার মায়া হয়। আমি বুঝতে পারি।...বনস্পতির প্রাকৃতিক রস কিছু কিছু আমাকেও চাখতে হয়েছে। ওর অনেক গাছপালা, আমার মধ্যে শেকড় গাড়তে না পারলেও, তাদের শাখা-প্রশাখা আমার নাক-কানের মধ্যে বিস্তার করতে দ্বিধা করেনি। স্বভাবতঃই দীপেনের প্রতি আমার সহানুভূতি না হয়ে পারে না। এমন কি, কবেকার আমার সেই পাঁচ টাকার শোকও আমি ভুলতে পারি।

আমি বলি, "আহা!" এবং আরো বলি ঃ "তাহলে তো ঐ পঁচিশ টাকা তুমি উপার্জ্জন করেছ বল্‌তে হবে। কায়ক্লেশেই উপার্জ্জন করেছ। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কাজ দিয়েছ, তোমার কান দিয়ে কাজ দিয়েছ—তার বদলে ওটা তোমার হকের পাওনা। ওই রোজকার রোজগার।"

"কাজ? কেবল কাজ? এমন কষ্টকর কাজ আমি জীবনে করিনি। পঁচিশ টাকা উপায় করতে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা কখনো আমার পোহাতে হয়নি। এর বদলে খনির গর্ভে সেঁধিয়ে কয়লা কেটে আনতে হলেও আমার ঢের বেশি আরাম ছিল।" দীপেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে।

"তাহলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আশ্চর্য লাগে।

বিস্ময়ের বিষয় বাস্তবিক্। অশ্বমেধের জন্যই ওর গর্দভমেধ হলেও, দীপেন এক গাধাকে বারম্বার বধ করে না। পাত্ররা জবাব দেয় বলে' নয়, একবারের পাত্রকে দুবার জবাই করতে ওর কোথায় যেন বাধে। চক্ষুলজ্জাতেই কি না কে জানে। একবার ধার করলে আর সে ধার মাড়ানো ওর স্বভাব নয়। পারৎপক্ষে তাকে ভুলে যাওয়াই ওর অভ্যাস। এক হিসেবে সেটা ভালো—হতভাগ্যদেরও ভুলতে সময় দেওয়া হয়। সময়ের মত শোকঘ্ন আর কী আছে?

এক এক সময়ে আমি ভেবেছি যে, ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌সোওলারাই মরে' বুঝি দীপেন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচার করে' দেখেছি—না, তাতো না। তাদের বারম্বার—দীপেনের একবার; তাদের একজনকেই পুনঃ পুনঃ, দীপেনের প্রত্যেক জনকে একান্তে; তাদের স্যাক্‌রা জাতীয় ঠুক্‌ঠাক্—আর ওর কামার-সুলভ এক ঘা। বিবেচনা করলে দুজনের ধর্মই আলাদা। তাদের অর্থকামের নিবৃত্তি নেই, কিন্তু দীপেনের একেবারে মোক্ষম্।

তবে কি ও স্বভাব বদ্‌লেছে? আবার ও বনস্পতিকে তাহলে খোঁজে কেন?

শুভ শারদীয়োৎসবে—
আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ!

অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার

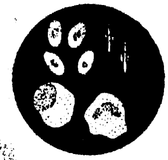


হেনেক্স

"১০ সি, সি, পানীয় এমপিউল"

"মুরগীর শাবক হইতে প্রস্তুত ঘনীভূত নির্য্যাস"

বিশেষ করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। সুমিষ্ট গন্ধের জন্য ইহা সহজেই পান করা যায়, প্রতিটি এমপিউলে ৫০ গ্রাম কাঁচা চিকেনের সমতুল্য নির্য্যাস আছে।



হিমোলেক্স

"১০ সি, সি, পানীয় এমপিউল"

Haemoglobin. 2 c.c., Liver Ext...2 c.c., Red Bone Marrow Ext. 2 c.c., তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন বি ও ই সমন্বয়ে প্রস্তুত।

সকল প্রকার রক্তাল্পতায়, বিশেষ করিয়া প্রসবের পূর্ব্বে এবং পরে ও কঠিন রোগ ভোগান্তে ব্যবহৃত হয়।

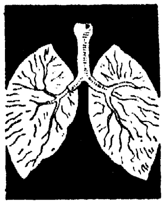


লিভেক্স

"৫ সি, সি, পানীয় এমপিউল"

Liver Ext...3 c.c., Red Bone Marrow Ext. 2 c.c এবং ভিটামিন বি, লৌহ, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ সংযোগে প্রস্তুত।

রক্তহীনতায়, শরীরের ওজন হ্রাসে এবং জীবনী-শক্তি হীনতায় ব্যবহার্য্য।



নিউমোটোন

"৪ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"

সর্দ্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ব্রঙ্কাইটিসের বহু-পরিক্ষিত ও পুরাতন প্রতিষেধক।

উৎকৃষ্ট বিদেশীয় রসায়নিক দ্রব্যাদি এবং এশিয়া মহাদেশীয় গাছ-গাছড়ার সমন্বয়ে প্রস্তুত।



ফিভারিনা

"কার্টিম সংযোগে ৪ আউন্স শিশি"

ম্যালেরিয়া, সবিরাম জ্বর ইত্যাদির উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক। কুইনাইন, এ্যালকলয়েড ইত্যাদি নানাবিধ রসায়নিক সমষ্টি দ্বারা ইহা প্রস্তুত।



ভাইটা-অশোকা

"৪ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"

অশোক ছাল এবং অন্যান্য এশিয়া মহাদেশীয় গাছ গাছড়া, Vitamin B, E, ও Alcohol 20% সংযোগে প্রস্তুত। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ ও জরায়ু রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক। সাধারণতঃ প্রসবান্তে ইহা সেবনীয়।

সর্ব্বাবস্থায় ইহা একটী অব্যর্থ জরায়ুর টনিক।



লিভারোন

"কার্টিম সংযোগে ৪ আউন্স শিশি"

লবণ, Bile Salts ও গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত। সর্ব্বপ্রকার যকৃত দোষ ও মেদবৃদ্ধি নিবারক এবং মুখের দুর্গন্ধ নাশক।



ওয়াইনো

"১০ আউন্স নামাঙ্কিত বোতল"

ইহা পোর্টওয়াইন, আঙ্গুরের নির্য্যাস, সর্ব্বপ্রকার Glycerophosphates, Lecithin, Strychnine, Alcohol 18% সমন্বয়ে প্রস্তুত। যে কোন প্রকারের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, অনিদ্রা, পুরুষত্বহীনতা, কঠিন রোগ ভোগান্তের পর, সন্তান প্রসবের আগে এবং পরে, ইহা একটি অতুলনীয় ওয়াইন টনিক।

বেঙ্গল ড্রাগস এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লি:

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস • স্থাপিত ১৯৩২

১১ রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীট • কলিকাতা



রূপান্তর

এম, নুরুল মোমেন

প্রথম দৃশ্য।

[রিজিয়ার পাঠ-গৃহ। দুইটি শেল্‌ফে সজ্জিত বই। বাম পার্শ্বে একখানা জল-চৌকির উপর একটি বীণা। দক্ষিণ পার্শ্বে ঈজেলের উপর একখানি বোর্ড, তাতে সপ্তরঙা প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন অংকিত। রিজিয়ার বাম হস্তে রঙের প্যালেট, ডান হাতের তুলি দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নের উপর শেষ-স্পর্শ দিচ্ছে। তির্যক ভংগীতে দর্শকদিগের দিকে অর্ধ পিছন ফিরে দাঁড়ান, শুধু মুখের profile দেখা যাচ্ছে, চেনা যায় না। এই দৃশ্যে রিজিয়া কখনও দর্শকের মুখোমুখি হয়নি, তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেল।]

জাহাংগীর। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি কি?

রিজিয়া। আসুন, খোস-আমদেদ, সুস্বাগতম্।

[জাহাংগীরের প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। একি? ছবি আঁকার আকাঙ্ক্ষা কবে আশ্রয় কর'ল?

রিজিয়া। আশ্রয় করে নি, তবে বর্তমানে ঐ স্পৃহাটার পৃষ্ঠে চেপে তাকে মনের লাইনে চালাতে চেষ্টা পাচ্ছি, তার গতি-রেখা ধরা পড়েছে আমার এই ছবিতে, এই দেখুন।

জাহাংগীর। এ যে সপ্তরঙে প্রকাণ্ড এক জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকেছ, দেখছি। মনে হচ্ছে রামধনুকে বেঁকিয়ে তুমি প্রশ্নে পরিণত করেছ? এ প্রশ্ন কার স্বরূপকে রূপায়িত করল?

রিজিয়া। আধুনিকার!

জাহাংগীর। আধুনিকার? হে শ্যালিকা সুন্দরী, তোমার কথা ঐ জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতই আমার বুদ্ধিকে বক দেখাচ্ছে। বুঝতে টীকা প্রয়োজন।

রিজিয়া। না, টীকায় সব ভেস্তে যাবে। জীবনের বসন্ত দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, টীকা চলবে না। এই আলেখ্য দর্শন করুন। কি দেখছেন?

জাহাংগীর। দেখ্‌ছি কবিতাগুচ্ছ।

রিজিয়া। ও শুধু কবিতা নয়, ওগুলি হচ্ছে ঐ জিজ্ঞাসারূপী রামধনুর সপ্তরঙ— Vibgyor—পড়ি, শুনুন :

ল্যাভেণ্ডার নীল বেগুনী
মনে তোলে যে সুরধুনী
চোখে ভাষা হাল্‌কা ফিকা,
সেই হ'ল কি আধুনিকা?

জাহাংগীর। বলা কঠিন। অনুবর্তিনীর রূপ দেখি ত?

রিজিয়া। বেশ,—

মন সাঁতারে আকাশ নীলে,
প্রাণ হরে যে গাঙের চিলে,
সবুজ প্রাণের মঞ্জুলিকা।
বলব তারেই আধুনিকা?

জাহাংগীর। বলতে ইচ্ছে হয় কিন্তু। বলতে না চাও, এগিয়ে যাও।

চরিত্র

রিজিয়া
জাহাংগীর· রিজিয়ার ভগ্নীপতি
আহমদ—রিজিয়ার বড় ভাই, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
জহির—রশিদের হিন্দুস্থানী চাকর
কোরাল—রশিদের P. A. (Personal Assistant)
রশিদ—রিজিয়ার স্বামী, বিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়র।

Lady of the Park?

রিজিয়া। আচ্ছা, যাচ্ছি :

হ্রস্ব বাস ও দীর্ঘ বাণী,
পাঠে ছন্দে জাফরাণী,
কমপ্লেক্স-কুজ্‌ঝটিকা
রূপ পেল কি আধুনিকা?

জাহাংগীর। মুস্কিলে ফেললে! শেষ রঙটা দর্শন করি আগে—

রিজিয়া। দেখুন,—

কমলা বনে প্রজাপতি
চরণ লঘু ক্ষিপ্রগতি
রক্তলাল অগ্নিশিখা
চিনতে পেলে আধুনিকা?

জাহাংগীর। বেশ পেলাম না। আজও না হয় ওঁরা তোমার ঐ জিজ্ঞাসার সপ্তবর্ণে সুপ্ত হয়ে থাকুন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রিজিয়া বেগম তোমার মানস-মৃগ যেভাবে প্রগতি বিচার খুঁজে ফিরছে তাতে সে কস্তুরী শুধু তোমার নিজ দেহে আবিষ্কৃত হবে না ত? (হাস্য)

রিজিয়া। (সহাস্যে) হবেই ত! জানেন, নতুন-পুরাতনের ভাবধারা খুব নিবিড়রূপে পরিপাক করেছি! যে গ্রেডের আধুনিকা সাজতে বলেন, তাই ব'নে যেতে পারি : একেবারে made to order.

জাহাংগীর। কিন্তু পর্দায় পালিত জীব তুমি, কত দূর চলনসই হবে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মুস্কিল।

রিজিয়া। কেন? আমার বোনকে নিয়ে ত বিলেতও ঘুরেছেন? আপনাদের বিবাহের পূর্বে তিনিও ত জেনানায় বন্দিনী ছিলেন।

জাহাংগীর। তা' বটে। তোমার বোন ত সবাইকে অবাক করেছে। তরল-রঙ্গীন আবহাওয়ার ভিতর তার মানসিক উজ্জ্বলতা ও সরস গাম্ভীর্য তাকে এক মহীয়সী মূর্তি

কেরামতি। বহুত দিমাকওয়ার আদমি। ওই আতেহে।

[কোরালের প্রবেশ]

আহমদ। নমস্কার কোরালবাবু।

কোরাল। আদাব আরজ্ মিস্টার—মিস্টার—মিস্টার—

আহমদ। আবু আহমদ।

কোরাল। Yea. আবু আহমদ।

আহমদ। মিস্টার রশিদ ভিতরে আছেন?

কোরাল। (ইংরেজি ভঙ্গি সহকারে) Yes, as surely as you are here.

আহমদ। তবে বাইরে যে আউট লেখা আছে. যদি লোকে চলে যায়?

কোরাল। আপনি যান নি ত?

আহমদ। না।

কোরাল। তা হ'লেই হ'ল। 'No vacancy' লেখাটা দেখেছেন ত? চাকরির চেষ্টায় যদি কেউ আসেন, তাঁদের 'thus far and no further' ক'রে দ্যায় ওই 'আউট'। ও ডিঙিয়ে (ভাবাবেশে) সত্যিকার দর্শন-দরদীরা এগিয়ে এলেই জেনে যাবেন আসল হদিস। বুদ্ধি খরচ ক'রে আমিই করিয়েছি, সাহেব।

আহমদ। মানবচরিত্র অধ্যয়ন আপনার সার্থক, কোরালবাবু। যাক, মিস্টার রশিদকে একটু সংবাদ দেবেন? আমি দেখা করতে চাই।

কোরাল। আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

আহমদ। রশিদ পাকা জহুরি, বেশ মাই-ডিয়ার লোক একটি জুটিয়েছে দেখছি।

[কোরালের পুনঃ প্রবেশ, সঙ্গে রশিদ]

রশিদ। আহমদ কি মনে করে?

আহমদ। এলাম তোমার খোস-খবরি নিতে। জীবনকে ত জৌলুসময় করার যোগাড় করেছ! দেখি, তারই কিঞ্চিৎ ভাগ যদি নিতে পারি, ছোটবেলার বন্ধু তুমি।

কোরাল। আমি মেয়েদের ইণ্টারভিয়ুর ফাইল-গুলি নিয়ে আসছি স্যার। কিছু আবেদন-পত্র এখনও দেখা হয় নি।

রশিদ। আচ্ছা যান।

[কোরালের প্রস্থান]

বুঝলে আহমদ? লোহার কারবারে জানানা মহলে লোকের প্রয়োজন তাই—

আহমদ। লৌহবলয়ে বন্ধন করতে চেষ্টা করছ জানানাকে, আর অজানাকে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্দী করার স্বপ্ন দেখছ, না?

রশিদ। কি রকমে?

আহমদ। তোমার বিজ্ঞাপন দিয়ে। (দৃঢ়স্বরে) সত্যি বল কি চাও তুমি? ভালবাসার রোমান্স, না বিয়ে? কোন্‌টা?

রশিদ। কোনটাই না।

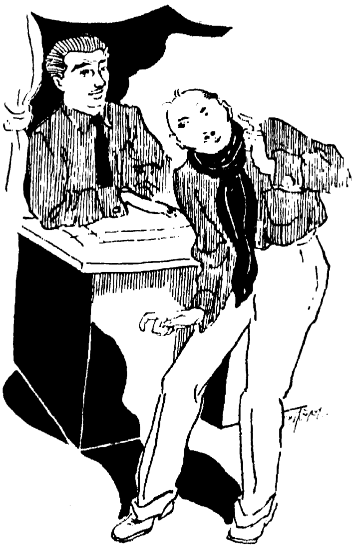
আহমদ। আলবৎ, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।

রশিদ। দেখ আহমদভাই, বিয়ে আমি আর করব না। যে পরিপূর্ণ জীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছি ওদের মেয়েদের মধ্যে, তার এক কণা দিয়েও এখানে কেউ আমাকে সার্থক করতে পারবে না।

আহমদ। (স-শ্লেষে) তাই অতি-আধুনিকা সেক্রেটারী নিযুক্ত করে সাগরপারের নির্দোষ নারী-সঙ্গস্পৃহাটাকে সাবলীল রাখতে চাও? নয় কি? (স-নিশ্বাসে) যাক্, রিজিয়া সম্বন্ধে তোমার শেষ মত জানতে চাই।

রশিদ। (দ্বিধাভরে) তার স্ত্রীত্ব ত অস্বীকার করছি না, তবে পর্দার অন্ধকারে যে মানুষ, সঙ্গিনী হিসাবে সে অনেকটা অচল—

আহমদ। রশিদ, তুমি রিজিয়াকে দেখ নি পর্যন্ত। শুধু 'আখ্‌ত্' হয়েছিল, বিলাত যাওয়ার তাড়াহুড়োয় শুভ-দৃষ্টিটা পর্যন্ত হয় নি। (মিনতিভরে) তুমি একবার নিজেই যাচাই করে দেখ না আধুনিক সাহিত্য ও



দেখুন ত স্যার, এইটাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

জীবন সম্বন্ধে সে কিরূপ সজ্ঞান? She can play the girl of to-morrow if you choose so, তার সম্পূর্ণ শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে সেইভাবে—

রশিদ। Well, one of the earth is worth a dozen girls of theory.

আহমদ। রিজিয়া বলে, "খোদা সহজেই না দিলেন যদি, তবে জবরদস্তির বিড়ম্বনা থেকেও তিনি রক্ষা করুন।" তাই তোমার রক্ষা। নইলে, (কঠিনস্বরে) তোমার পক্ষীরাজ মনটার বল্‌গা টেনে খুশিমত চালাতে পারি, তা' জান?

রশিদ। হাঁ, তা জানি, কাবিনের সর্ত দিয়ে।

আহমদ। Fine, স্মরণশক্তিটা প্রখরই রেখেছ, দেখছি। আসি তা'হলে। কি বলব? (ভঙ্গি-সহকারে) Ta-Ta না Cheerio.

[হাস্য ও প্রস্থান]

কোরাল। (নেপথ্যে) আসতে পারি, স্যার?

রশিদ। আসুন।

[কোরালের প্রবেশ]

কোরাল। ইণ্টারভিয়ুর বাকি কাজ আজই শেষ করে দেয়া যাক।

রশিদ। আজ থাক। আমার মনটা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখুন ইণ্টারভিয়ুর তারিখ দু'সপ্তাহ পরে দিন।

[স্টেজ ত্রিশ সেকেণ্ড অন্ধকার থাকলো, কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তাই প্রকাশ করতে। আলোবিকাশের পর দেখা গেল রশিদ ও কোরাল ফাইল দেখছে। রশিদ কলিং বেল টিপ্‌লে।]

জহির। হুজুর।

[জহিরের প্রবেশ]

রশিদ। দরখাস্‌ত্ করণেওয়ালি আওর কোই বাকি হ্যায়?

জহির। জি নহি।

রশিদ। আচ্ছা, তোম্ যাও।

[জহিরের প্রস্থান]

কোরাল। সবার ইণ্টারভিয়ু ত শেষ হয়ে গেল। এখন মন কিছু স্থির করতে পারলেন, স্যার?

রশিদ। এই ত আপনাদের সব মেয়ে! এতগুলি বি-এ, এম-এ! কিন্তু মনে হয় মানসিক তীক্ষ্ণতা ও জীবনের প্রাচুর্য এদের মধ্যে তেমন marked নয়। আপনিও ত আধুনিকার একটা তালিকা দিয়েছিলেন? কেউ ত তেমন উতরাতে পারলেন না। বৃথাই আপনার নাম পরিবর্তন করেছিলাম, কোরালবাবু। আপনার পছন্দ দেখছি সেই মান্ধাতার আমলেই পড়ে আছে।

কোরাল। বলেন কি স্যার। মেয়েদের যেসব টাইপ ইনভারসিটি জীবনে বন্দনা পেয়েছেন, তারা সবাই আমার লিস্টে বন্দিনী ছিলেন।

রশিদ। নারীপ্রগতি, মানে 'নয়ী রোশনী'র খোঁজ রেখেছিলেন বহুকাল?

কোরাল। হ্যাঁ,—
টাক-প্রশস্তিই বাদ সাধল।

রশিদ। (সহাস্যে) সে কি রকম?

কোরাল। দেখুন ত স্যার, এই টাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

[মস্তক নত করণ ও ঘুরিয়ে দেখান]

রশিদ। না। দেখি দেখি ভাব হয় বটে, কিন্তু দেখা যায় না।

কোরাল। যায় না ত? কিন্তু প্রগতিপরায়ণারা বলতেন, এই টাকটা নাকি আর্শির মত। বায়না ধরতেন, "মাথাটা একটু নীচু করুন না! খোঁপাটা ঠিক করে নিই।" কিম্বা কেউ ধাঁ করে মাথা নুইয়ে তাঁর মুখের সম্মুখে নিয়ে সন্তুষ্টভাবে বলতেন, "বাঃ, লিপ-পেণ্টটা লেপটে যায় নি।" এইরূপ চলন্ত ড্রেসিং টেবিলরূপী হয়ে তাঁদের সমাজে আমার পূর্বেকার সচ্ছল গতি হয়ে উঠল, সময় বিশেষে, Spanish Tango ও সময় বিশেষে বাঁয়বেশী নৃত্য।

[দুটো নাচেরই আভাস হস্তের সামান্য ভঙ্গীতে প্রকাশিত হ'ল]

যে আমাতে তারা পেত ইনট্রেস্ট, সেই আমি হয়ে উঠলাম ইনট্রেস্টিং।

রশিদ। (হেসে) শেষে পালিয়ে বাঁচলেন?

কোরাল। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

রশিদ। যাক্, এখন দেখুন ত লিস্ট্‌টা। কে কিরূপ নম্বর পেলেন?

[উভয়ের নিজ নিজ ফাইল দর্শন]

কোরাল। এই ত, Top করছেন মিস্ চিত্রাঙ্গদা সেন।

রশিদ। বাপরে! নামটা কি জবরজঙ্গ। ওই নাম বহন করে আধুনিকার মাপকাঠিতে কারও ঊর্ধ্বগামী হওয়া অসম্ভব।

কোরাল। না স্যার, অমন কথা বলবেন না। কলেজে উনি ছিলেন মিস্ চিত্রা, তন্বী তরুণী। ছেলেদের মুখে শুনেছি, ওঁর চ'য়ের উচ্চারণের উপর নির্ভর করত বহু



তবে কেন এমন মনে হচ্ছিল বলতে পারেন?

ছেলের আধুনিকতা। ডাক্তার সুসুনিগের নাম ত জানেন? ওঁর 'চ'টা তাঁর নামের দ্বিতীয় স'য়ের উচ্চারণে—

[কঠিন উচ্চারণকে আয়ত্তে করার চেষ্টা-ভঙ্গীতে।

সিট্টা—

shrug করে—]

হ'ল না

উচ্চতর ভাবে]

স্বি-ট্টা

[মাথা নেড়ে]

উঁহু—

[প্রবল-প্রচেষ্টায়]

স্বী-ট্ট্যা

[ভয়ানকভাবে খুসি হয়ে]

এই! এমন একটি শব্দ হত। তাঁর নামের সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য চলত ছাত্রদের মধ্যে Phoneticsএর কসরৎ। সেই যে সি-সি-স্বীট্ট্যা এখন হয়েছেন চিত্রা-ঙ্গ-দা, কেন জানেন?

রশিদ। (সহাস্যে) না, কেন?

কোরাল। সেই তন্বঙ্গী শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ভিটামিন পুষ্ট হয়েছেন। কাজেই, পূর্বেকার অঙ্গদা জড়িত হয়ে নামটি দেহের ব্যালেন্স রক্ষা করছে, স্যার! (হাস্য)

রশিদ। আপনার সি-সি-স্বীট্ট্যা top করেছেন বটে, কিন্তু টপকাতে পারেন নি? কুড়িতে এগার নম্বর পেয়েছেন, বার ছিল qualifying mark, তাই নয় কি?

কোরাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[ফাইলে ডুবন্ত অবস্থায়]

রশিদ। ওঁর পরে হচ্ছেন—মিস্—মিস্—

[নাম বুঝতে অপারগ, বানানে উদ্ধার-প্রচেষ্টা—]

T-O-W-E-I, টাওয়াই! টাওয়াই টাম্বার প্যালিটে!—

[পুনরায় উচ্চারণ—]

Miss Towei Tumber Palitte—

[মনের মত হল না; মাথা নেড়ে]

নাঃ, নামটার acoustics ভুলে গেলাম যেন! শুনেছিলাম ত candidate-এর কাছ থেকে, দেখুন ত উদ্ধার চলে কিনা?

কোরাল। [বানান করে] P-A-L-I-T-T-E: প্যালিটে! [চিন্তাযুক্তভাবে] কোন্ মেয়েটি? —which girl? —[হঠাৎ] ওহ্ হো! উনি মিস্ টইটুম্বুর পালিত!

রশিদ। টইটুম্বুর পালিত! Gosh! নামটা কি outrageously modern! টইটুম্বুর—tiptop! আচ্ছা, উনি পালিত লিখতে শেষে E দিয়েছেন কেন?

কোরাল। ওটা বুঝলেন না স্যার,? ডান্টে—গ্যেটে—প্যালিটে—সম গোষ্ঠী বলে মনে হয় না কি? ছোট্ট একটা E কিন্তু দেখুন দিচ্ছে কিরূপ একটা continental touch? আবার পুরাণ পন্থায় চলতে চান, সো ভি আচ্ছা, পালিত কন্যাকে স্ত্রিয়াং 'ঈপ' করে শেষের E-টাই ঈ-কারের সামিল করুন।

রশিদ। [হেসে] তা' কেমন করে হয়? পালিতের স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ' হবে ত? পালিতা?

কোরাল। না, না, স্যার! [প্রচণ্ডভাবে জিভ কাট্‌ল] পালিত—রক্ষিত, একই অর্থ। আ'কার যুক্ত হলে লিঙ্গ পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু 'স্ত্রী' থাকে না। রক্ষিতকে try করে দেখুন না। বড় disconcerting!

[উভয়ের মন-খোলা হাসি]

রশিদ। আ-চ্ছা এর পর কে কে স্থান পেয়েছেন?

কোরাল। মিস্ রোকেয়া খাতুন ও মিস্ জিনিদ্ এলক্রেড, এন, সি।

রশিদ। এন, সি আবার কি?

কোরাল। কেন? নেটিভ খৃষ্টান।

রশিদ। ও, তা হলে একেবারে Cosmopolitan Collection হয়েছে দেখ্‌ছি।

কোরাল। হ্যাঁ, স্যার। আর মিস রোকেয়া হ'ল সেই বব্‌ড্ চুল মেয়েটি। ওঁর নম্বরটা কিছু বেশী হওয়া উচিত ছিল। যা হোক বব্‌ড্ চুল ত?

রশিদ। কোরালবাবু, বব্‌ড্-চুল দেখে কিছু আশাও হয়েছিল, মনে করেছিলাম এতদিনে মুস্‌লিম মেয়েরা বুঝি অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করল। ও খোদা! বললেন, মাথায় উকুন হয়েছিল বলে অম্নি করে বব্‌ড্ কেটে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। Phooh! নম্বর ঘ্যাঁচ করে কেটে দিচ্ছিলাম আর কি? কিন্তু আধুনিকার awful frankness-এর জন্যই অত নম্বর পেয়ে গেলেন। সব হোপলেস্।

কোরাল। তা'হলে কি ঠিক হ'ল?

রশিদ। কেউ নিযুক্ত হ'ল না।

কোরাল। Then I continue to play the role of the secretary and the P.A—the beauty and the beast—
রশিদ। Well said, Coral Babu. The beauty and the beast. [হাস্য]

[জহিরের প্রবেশ]

জহির। হুজুর, একঠো মিসি-বাবা আয়ী—
রশিদ। মিসিবাবা কিরে? গাউন পরে এসেছেন?
জহির। জি নাহি, বহুত খাবসুরত আওর জুতোকা হিল বহুত উঁচা।
রশিদ। ক্যা, এহি দোয়াত কা মাফিক--
জহির। উওহ্ ত উছকা আধাই হোয়েগা, হুজুর।
রশিদ। [স্মিত মুখে কোরালকে] দেখুন ত আশা-প্রদ মনে হচ্ছে—
কোরাল। এই যাচ্ছি।

[কোরালের হাস্য ও প্রস্থান]

রশিদ। জহির মিয়া?
জহির। জি হুজুর।
রশিদ। আনেকো ওকত্ তোমনে দেখা? কেয়ছা আয়ী?
জহির। জি হা হুজুর দেখা, বহুত ঠাঁট ছে আয়ী।
রশিদ। হুম।

[একখানা Visiting Card নিয়ে কোরালের প্রবেশ]

কোরাল। এই কার্ড দিয়েছেন, উনিও একজন candidate.
রশিদ। দেখি, [কার্ড নিয়ে প'ড়ে] এ কি নাম লিখেছেন? Lady of the Park? মানে কিছু বুঝলেন?
কোরাল। না ত!
রশিদ। দেখতে সুন্দর?
কোরাল। Exquisitely, তুলনা হয় না।
রশিদ। বেশ ডাকুন।

[কোরালের প্রস্থান]

রশিদ। জহির!
জহির। হুজুর।
রশিদ। মেম সাহাব কোন 'বার্তাচিত' করেছে তোমার সংগে—
জহির। জি হুজুর, থোড়া বহুত কিয়া। পুছা, "তোমার সাহেব কা সাদি হইচে—"
রশিদ। সে কি, প্রথমেই বিয়ের কথা? তা' কি বল্লে তুমি?
জহির। বোলা, নেহি হুয়া।
রশিদ। 'নেহি হুয়া'! হয় নাই বললে কেন?
জহির। ক্যা জানে, মনসে বোল্‌া কহনা ঠিক নেহি হোগা—
রশিদ। তুমি ত দেখি গোড়ায়ই গেরো ফেলবার বন্দোবস্ত করেছ।

[নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করে]

এই যে আসছেন, হ্যাঁ সুন্দরীই বটে—

[কোরালের পশ্চাতে Lady of the Park-এর প্রবেশ]

L of P. Good morning.
রশিদ। Good morning. [হস্ত প্রসারিত করে] এই নিন হাত, shake করতে কোন আপত্তি নেই ত?
L of P. Not at all.

[হাত এগিয়ে দিল করমর্দনের জন্য, রশিদের হাতে হাত রয়েই গেল]

রশিদ। How do you do?
L of P. How do you do?
রশিদ। আচ্ছা, এবার বসুন—
L of P. হাতটা ছেড়ে দিলে বসতে পারি। [হাস্য]
রশিদ। Oh, I see হাতখানা আমার হাতে বন্দী হয়ে আছে দেখছি, মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পরিচয়।

[হস্তমোচন, বসতে বসতে]

আপনাকে দেখেছি কিম্বা কোন আলাপ



রসিদের স্কন্ধে হাত রাখলো।

হয়েছে বলে ত মনে হয় না। তবে কেন এমন মনে হচ্ছিল বলতে পারেন?
L of P. হ্যাঁ, পারি। আচ্ছা ধরুন, আপনি ঘুমের ঘোরে খাট থেকে আছাড় খেলেন। স্বপ্নে 'Time and Space'এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই ত? কোল বালিস নিয়ে উলটানো থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া, এই যে মুহূর্তটি, এরই অনুভূতি নিয়ে আপনার মস্তিষ্ক প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন তৈরী করে ফেলল; স্বপ্নটা হ'ল হয়ত বর্ষব্যাপী বৃহৎ একটা adventure-এর। তার শেষের পতনটা দেখলেন বিমান থেকে হ'ল। এই সম্পূর্ণ এড্‌ভেঞ্চারের অনুভূতি ওই একটা মুহূর্তের ভিতর রূপ পেল ত?
রশিদ। হ্যাঁ, তা পেল।
L of P. তা হলে দেখছেন, মুহূর্ত ক্ষণিক হলেও তার পিছনে অনুভূতি থাকতে পারে যুগযুগান্তরের—ঠিক সিনেমার flash back-এর মত—
রশিদ। [মোহিতভাবে] সূক্ষ্ম-বিচার শক্তি আপনার চমৎকার দেখছি—
L of P. না চমৎকার কিছুই না। নানা চিন্তায়, নানা কল্পনায় সেক্রেটারীর একটা স্বরূপ আপনি মানস-চক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন ত? আমাকে দেখে সেটা অনেকটা visualised হয়ে গেল, তাই এত পরিচিত লাগছিল।
রশিদ। হবেও বা। কিন্তু তার অতীত মনে হচ্ছিল কিছু। আপনার নামটা ত এখনও জানতে পারি নি—
L of P. ওই Lady of the Park. দেখুন Emille Zola-র লেখা পড়ার পূর্বেও আমার মনে হ'ত যে নামটা মানুষকে অনেকটা প্রেজুডিস করে দেয়। কাজেই পরিচয়ের প্রথমেই নাম দিয়ে একটা অনুকূল Balance Sheet খোলা আমি সমীচীন মনে করি না। পার্ক সার্কাসএ থাকি শুধু তাই প্রকাশ করছে ঐ কার্ডটা—
রশিদ। আপনি ত দরখাস্তও করেন নি?
L of P. দরখাস্তের নির্ঘাত আত্মস্তুতির জঞ্জাল ঠেলে, পাঁচ মিনিটে আমার সত্যিকার রূপ উদ্ধার চলত কি? বরঞ্চ এই হঠাৎ পরিচয়ের back ground-এ কথার ফাঁকে, আমার একটা হাল্কা মিঠে ছবি রূপায়িত হওয়া সম্ভব, নয় কি?
রশিদ। রাইট ও! আপনার পড়াশুনো ভালই দেখছি—
L of P. আপনার বিচার শক্তি প্রশংসার্হ।
রশিদ। কোরালবাবু।
কোরাল। আজ্ঞে স্যার।
L of P. ও ও'র নাম বুঝি প্রবাল বাবু?
রশিদ। হ্যাঁ, আমার P.A., ওর আসল নাম জানলেন কি করে?
L of P. বা-রে! প্রবালের handy ইংরেজী কোরাল রয়েছে যে,—আর আপনার পাশ্চাত্য প্রীতি কারও অবিদিত নেই।
রশিদ। You are really brilliant [হাস্য] ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু নাম পরিবর্তন করেও ত ও'কে মডার্ন করা গেল না।
L of P. না না বলেন কি? আমার সম্মুখে গিয়ে এত নিখুঁতভাবে bow করলেন, যে আমার লকেটটা তাঁর মাথার স্থান বিশেষে সোনালী আভায় ঝলসে ওঠায় মনে হ'ল, "হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত—"

[তিনজনেরই ছোট হাসি]

রশিদ। বিউটি! নিন কোরালবাবু, You are reclaimed. আপনার টাকটারও শেষ পর্যন্ত গতি হতে চলল। একে সেক্রেটারী রাখলে আপনার পালাতে হবে না, ত?
কোরাল। না স্যার, একে ত আমাদের ভালই লাগচে, লাগচে না কি?
রশিদ। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ

১নং কে, জে,

পরিমল নস্য

মাদ্রাজী কড়া "র" নস্য

গোল্ডেন স্পেশাল কড়া "র" নস্য

"আর, বি"

রোজ ও জেসমীন নস্য

গুণে, গন্ধে, বিশুদ্ধতায় অতুলনীয়

মহীশূরের সুবিখ্যাত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মার্কা

সুগন্ধি পারিজাত ধূপ

অতুলনীয়, সুমধুর গন্ধ-সৌরভে তৃপ্তিদায়ক

পাইকারী ও খুচরা ভিঃ পিঃতে পাইবার

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সুশীলকুমার পাল

এণ্ড ব্রাদার

নস্য, ধূপ ও মনিহারীদ্রব্য

পাইকারী বিক্রেতা—

ব্রাঞ্চ—৬৯।৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেড অফিস—

১৩-৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

এ, কে, নাগের

অনন্তশক্তি

সালসা

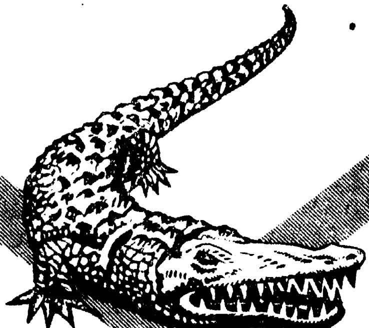
বাত, বেদনা ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

বাজারে প্রচলিত সালসাসমূহের মধ্যে বহু-পরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শরীরস্থ দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। যাঁহারা দীর্ঘদিন বাত বেদনায় ভুগিয়া চলৎশক্তিহীন হইয়াছেন বা মেহঘটিত দীর্ঘদিনের বাত, হাত-পা ফোলা, গাঁট কন্ কন্ করা যত রকম উপসর্গ থাকুক—ইহা ধন্বন্তরির মত কার্য্যকরী। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক, ক্ষুধা-বৃদ্ধিকর ও বলকারক ঔষধ। রুগ্ন ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরম বন্ধু। সকল ঋতুতে গ্রহণীয়।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট ও ষ্টকিষ্ট চাই

অফিস—৬০/১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই মার্কাটীর উপর নজর রাখবেন



একবার জুড়লে আর ছাড়েনা

গ্রিপেক্স্ অফিস পেষ্ট ও লিক্উইড গাম্ ব্যবহার করে যাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় জেনে খুশী হবেন যে এই গঁদের প্রস্তুত-কারকেরা এখন নানাবিধ অফিস্ ষ্টেশনারী তৈরী করতে সুরু করে-ছেন। এঁদের তৈরী ফাউণ্টেন পেনের কালি, অফিস্ ফাইল ইত্যাদির উপর কুমীর-মার্কাটিই এঁদের বিখ্যাত গঁদের সমতুল্য উৎকৃষ্টতার পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ।

গন্ধহীন-তাড়াতাড়ি জোড়ে

গ্রিপেক্স্

সুপিরিয়র ব্রাণ্ড

আফিস পেষ্ট এবং লিকুইড গাম

গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

সি ৬ ক্লাইভ বিল্ডিং, কলিকাতা টেলিফোন ক্যালকাটা ৪৫৫৯

ফ্যাক্টরী : ১২, ডাফার রোড, লিলুয়া।

কোরাল। আর আপনারও যখন লাগছে, স্যার—

রশিদ। Lady of the Park আপনি নিযুক্ত হলেন।

L of P. Thank you.

রশিদ। জহির, তোমার মিসিবাবাকে শেষ পর্যন্ত রাখা গেল। ভাল ক'রে খেদমত করবে, বুঝেছ?

জহির। জি হাঁ, হুজুর! মেমসাহাব বহত আচ্ছা হ্যায়—

উ'চা হিল, দরাজ দিল,
আচ্ছে ঠাট, মিঠি বাত,
থোড়া হো ত উনিশ বিশ
সব মেটাতা বক্‌শিশ।

রশিদ। ও ব্যাটা প্রায়ই শ্লোক আওড়ায় মিস্ পার্ক।

L of P. আপনি Woodhouse-এর Jeeves-এর একটি ভারতীয় সংস্করণ জুটিয়েছেন দেখছি। [হাস্য]

রশিদ। [সহাস্যে] Jeeves. There you are. ও আমার প্রায়ই তাই। ওর শ্লোকের শেষের অংশের মানে—আপনার কাছে বকশিস আশা করছে—

L of P. আজ্ঞে না, মানে বকশিশ ভাল রকম আগেই পেয়ে গেছে। I am English in that sense. [হাস্য]

রশিদ। [সস্মিত] তাই ত দেখ্‌ছি, প্রথমে tip দেয়াটা ইংরেজী মতে যে অতীব কার্যকরী, তা' আপনিই দেখালেন। ও আপনার সম্বন্ধে, তাই, সু-কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

কোরাল। স্যার বিজ্ঞাপনের শেষাংশে দৃষ্টি আকর্ষণ অবান্তর হবে কি?

[মস্তক কণ্ডুয়ন]

রশিদ। তা,—তা থাক্। নিযুক্ত যখন হয়েই গেছেন—তখন—

L of P. বিজ্ঞাপনের শেষাংশে? ও, ঐ গানের কথা—বেশ, তা'হলে মিষ্টার রশিদ অনুমতি দেবেন কি?

রশিদ। বিলক্ষণ, অনুমতি দেব না? নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

L of P. **গান**

আজকে তুমি পেলে দেখা
পথের বাঁকে,
হে প্রিয় মোর, দেখলে তাকে,
চিনলে না কে?
কণ্ঠ ভরা গান যা ছিল
অঞ্জলি তার নিবেদিল,
রক্তরাগে রাঙিয়ে নিল
সুন্দর তার কল্পনাকে।

[সকলের প্রস্থান]

[ষ্টেজ এক মিনিট খালি পড়ে থাকল, তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই বোঝানর জন্য।]

রশিদ। Miss Park, তোমাকে আমি Lady of the Park-এর পরিবর্তে 'মিলেডি' কিম্বা আরও ছোট করে 'মিলি' বলে ডাকব। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

L of P. না, ডাকায় আমার আপত্তি থাকবে কেন? 'মিলেডি'—অর্থাৎ My Lady ত? তা'হলে সে হল আপনার নিজস্ব কল্পনা-সুন্দরী। আপনার সেক্রেটারী সম্বন্ধে যে কল্পনা তা' যদি আমাতে মূর্তিমতী হয়ে থাকে, তবে আপনার 'মিলেডি' ডাক নিশ্চয়ই আমাকে সার্থক করবে।

রশিদ। না, না, আমি তোমাকে দিতে চাই যে সহজরূপ, তাকে তুমি করতে চাও অপরূপ। পড়েছ, 'শা-জাহান':

"জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে
এইখানে
অনন্তের কানে"—

এ সেই নাম, এ সেই ডাক।

L of P. [সস্মিত] আপনি প্রথমদিন যে প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন, তাতে ত এরূপ ডাকের অবকাশ ছিল না।

রশিদ। কিন্তু ডাকটা যে আমার জীবনে সত্য হয়ে উঠবে তা কি আমিই বুঝতে পেরেছিলাম?

L of P. কেন বুঝতে পারবেন না? আমার সংস্পর্শে, জ্যোৎস্নার তলে ভাঙ্গা ঢেউগুলি,

Carbon Compound-এর না হয়ে ও আপনার কাছে হীরক বলে মনে হয় নি কি? গভীর রাতে ঝিঁঝিঁর ডাক Rolls Royce Machine-এর revetting-এর মত আপনার কাছে মিষ্টি লেগেছে, জলে ডোবা ঘাসের ও সিক্ত ধুলোর মিষ্টি গন্ধ, পেট্রল ও মবিলের সুখদ ঘ্রাণের মত আপনার প্রাণে আবেশ ঢেলেছে। কল ও কল্পনা একছা হয়েছে আপনার মনে। ওরূপ একটা ডাক আসি আসি করছে আপনার জীবনে, এতেও কি তা' বুঝতে পারেন নি?

রশিদ। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মিলি।

L of P. ঠাট্টা নয় মিষ্টার রশিদ! [দৃঢ় বিদ্রূপের স্বরে] তবে অনুভূতিটা একটু দ্রুত হয়ে গেল—বিসদৃশ অল্প সময়ের মধ্যে কিনা? তাই—

রশিদ। তুমি কি বলতে চাও যে সত্বর এসেছে বলে এ সত্যিকার নয়—

L of P. সত্যিকার বলেই ত ভয় বেশী। যে ডাক দ্রুত আসে, জীবনে নিত্য নরনারী সান্নিধ্যে, তার ত একাধিকবারই আসবার কথা।

রশিদ। তুমি কি মনে কর আমি সেই পদার্থ?

L of P. লীলাময় পুরুষেরা ত জানি একই মাটির তৈরী।

রশিদ। [গম্ভীরভাবে] Miss Park, যথেষ্ট হয়েছে, বাস্। আপনি আমার মধ্যে আর কোন দুর্বলতা দেখতে পাবেন না—

L of P. আপনি রেগে গেলেন মিষ্টার রশিদ? [গাঢ় স্বরে] আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, অনেক ঠেকে এ কথা বলছি, যদি জানতেন—

রশিদ। খুব জানি। গুটি কাটার সময় থেকে, ফুলে ফুলে উড়ে ফেরার সময় পর্যন্ত, প্রজাপতির বিচিত্র জীবনের ইতিহাস আমার অজানা নাই—

L of P. [স-খেদে] আপনি অযথা রূঢ় ব্যবহার করছেন—

রশিদ। তাই, আপনার—আপনাদের প্রাপ্য—

L of P. [উষ্ণ হয়ে] আপনি না বিলেতের শিক্ষার বাহাদুরি করেন? একটি মেয়ের মন অনেকটা জানতে পেরে, তারই উপর অযথা ক্লেশ দে'য়ার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে আজও আপনি শেখেন নি! এম্নি করে আমাকে দগ্ধাচ্ছেন—কী করেছি আপনার!

রশিদ। [গাঢ় স্বরে] মিলি।

L of P. বলুন।

রশিদ। দেখছি, আমার ভুল হয়েছিল। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি, যে রঙের খেলা আমার আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করেছে তার ছোঁয়া তোমারও লেগেছে। নয় কি?

L of P. কিন্তু আমাদের, আধুনিক আধুনিকাদের মনে এর অরুণিমা ত ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা।

রশিদ। হোক ক্ষণস্থায়ী, তবু ত প্রকাশ করবে, জীবনে অন্ততঃ একবার চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার দৃষ্টি বদল হয়ে জীবনটাকে রঙগীন করেছিল:

"নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশী মম,
উতলা পাগল সম।
যারে বাঁধি ধ'রে, তার মাঝে আর
রাগিনী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না॥"

তোমার মুখের বাণীতে, আমার বাঞ্ছিত রাগিণী ক্ষণেকের জন্যও যদি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তবে সেই ক্ষণটাই, আমার জীবনে হবে, অনন্ত।

L of P. বেশত, বাণী না হয় প্রকাশ করল: আপনার মনে যে রঙের পরশ তা' আমাকেও ছুঁয়েছে। কিছু যাবে আসবে তাতে?

রশিদ। সে খতিয়ান আমি করব না। এই জানাটাই আজ আমার চরম বিত্ত। জীবনে হয়ত তুমি অনেক দান করেছ, কিন্তু আজই তোমার সব চাইতে বড় কাঙ্গালী-বিদায় হয়ে গেল, মিলি।

[রশিদ ও L of Pর প্রস্থান]

[কোরালের প্রবেশ, একটু পরে রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। বলুন ত? আজ কোন্ কবিতা আবৃত্তি করতে মন চায়?

কোরাল। স্যার, এই:

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।"

রশিদ। দ্যত্, বলা ত হয়েই গেছে, জীবনের সঙ্গিনী হতে সে ত রাজিই হয়েছে। শুনুন মনের কথা:

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।"

কোরালবাবু, সত্যিকার দরদীর দেখা পেলাম এতদিনে।

কোরাল। মিনায় মরূদ্যান আঁকা একটা সোনার সিগ্রেট-কেস কিনেছেন উনি, পরশু।

রশিদ। হ্যাঁ, ও উপহার দেবে ও জীবন সাহারায় যে মরূদ্যান সৃজনের সাহায্য করেছে তাকে—

কোরাল। অর্থাৎ আপনাকে, স্যার। কিন্তু আজও ত আপনার কাছে দেখছি না সেটা?

রশিদ। [মায়াস্নিগ্ধ স্বরে] আপনি বড্ড বে-সবুর। তার প্রথম দানের লজ্জাটাকে জয় করে নেয়ার সময়ও ত দিতে হবে তাকে?

কোরাল। আচ্ছা, মিস পার্কের সব সংবাদ পেয়েছেন কি?

রশিদ। না, তবে ও বলেছে, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় এরূপ কিছু তার জীবনে নেই। বিবাহের পূর্বে সে সব প্রকাশ করবে, কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কেবল।

কোরাল। আশ্চর্য মেয়ে, স্যার!

রশিদ। আর দেখুন, চমৎকার চিন্তাশক্তি। বলে, বিবাহ যদি না হয়, তবে তার নামের ও পরিচয়ের গলি বেয়ে দুর্নাম আর তাকে পেঁছতে পারবে না। তার এই জীবন নাট্যের যবনিকা যদি এ'খানেই পড়ে তবে একে বড় জোর একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে; স্বপ্নের নায়িকার মত সে থাকবে স্পর্শাতীত।

কোরাল। স্যার, আধুনিকার সঙ্গে নাকি গভীর চিন্তার সংগত হয় না, এ'র বেলায় কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

রশিদ। তাই ত বলি,

"শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত—"

[আহমদের প্রবেশ, রশিদ হঠাৎ থেমে গেল]

আহমদ, হঠাৎ যে! কী ব্যাপার?

আহমদ। রশিদ তোমার হৃদয়ের নাচনীটা একটু সংযত কর ত! ওদিকে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় আর কি? হৃদয়ের এই তাণ্ডব নর্তনের উৎস কিহে? — কোরালবাবু কিছু বলতে পারেন?

কোরাল। আহমদ সাহেব, তবে শুনুন,

[সুর করে]

"সূর্য তখন পাটে নামে
রাজার কুমার ভাবছে একা
স্বপন পুরীর রাজ কন্যা
এমন সময় দিলেন দেখা।"

[কবিতা আবৃত্তির ঢঙে]

অভিসারে চুপে চুপে
অতি-আধুনিকা রূপে!

[দ্রুত কথার মত] কথা পাকাপাকি হয়ে গেল, আসছে মাসে বিবাহ।

রশিদ। আঃ কোরালবাবু, কী যা'তা' বলে যাচ্ছেন—

আহমদ। কে এই রাজকন্যা? তোমার সেক্রেটারী নয় ত?

রশিদ। বেশ ধর, তাই যদি হয়—

আহমদ। তা'হলে বলব ক'মাস পূর্বে রোমান্স ও বিয়ের কথা বলা আমার ভুল হয় নি।

রশিদ। হ্যাঁ ভুল হয়েছিল। বিয়ে করার কথা

আমার তখন মনে হয় নি। এ এল, দেখল, জয় করল।

আহমদ। [স-শ্লেষে] Congratulation—জয়স্তু। রশিদ, বাস্তবিকই তুমি খোদার অভিনব সৃষ্টি!

[পকেট থেকে কেস বের ক'রে নিজে একটা সিগ্রেট ঠোঁটস্থ করে স-সিগ্রেট কেস, রশিদের দিকে হস্তপ্রসারণ]

একটা নেবে কি?

রশিদ। [কেস হাতে নিয়ে সাশ্চর্যে] এ-কি! এ সিগ্রেট-কেস তুমি কোথায় পেলে?

আহমদ। কেন? সোনার বলে মনে হচ্ছে আমি চুরি করেছি—

রশিদ। না। তা' বলছিনে, তবে—

আহমদ। শোন রশিদ, একজনের জীবন সাহারায় মরূদ্যান সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছি এ আমার তারই উপহার। উপরে মিনায় মরূদ্যান দেখছ না?

[Lady of the Parkএর প্রবেশ]

L of P. মিস্টার রশিদ, আপনার একখানা পত্র এসেছে, এই নিন।

[পত্র প্রদান, হঠাৎ আবু আহমদকে দেখে]

আরে! মিস্টার আবু আহমদ যে! রশিদ সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, তাত জানতাম না। বেশ হ'ল। মিস্টার আবু আহমদ, Allenburyতে নতুন মডেলের একখানা Vauxhall গাড়ি এসেছে—

[চেয়ারের পিছনে গিয়ে, আপনজনের মত, স্কন্ধে হাত দিলে, আবু আহমদ মুখ তুলে চাইলে]

(আব্দারের সুরে) চলুন না! দেখবেন অখন—

আহমদ। আজ আমার ত সময় হবে না, লক্ষ্মীটি! পরে না হয় একদিন তাতে তোমার সঙ্গে লেক বেড়িয়ে আসব। কেমন? রশিদ, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।

রশিদ। আহমদ, আমি আজ ক্লান্ত। আজ না হয় আমাকে একটু রেহাই দাও।

আহমদ। আচ্ছা, বেশ, তাহ'লে আমি আসি। Good day to you all.

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. মিস্টার রশিদ, সত্বর করুন, আজকের বিরাট প্রোগ্রামটা rush in করে যেতে হবে যে!

রশিদ। মিলি! আজকে আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। তোমাদের কাছে আমি জোড়-হাতে ক্ষমা চাই—

L of P. বেশ ত, তাই থাকুন। আমি মিস্টার আহমদকে একটা লিফ্‌ট্‌ দিতে বলে দিই; বাড়ি চলে যাই তার সঙ্গে।

[প্রস্থানের উদ্যোগ]

রশিদ। শোন, মিলি, মিলি!

[L of Pএর প্রস্থান]

চলে গেল। যাক্‌। খোদা! জীবনটাকে নানা-সূত্রে কী যে এলোমেলো করে দিয়েছ, তার গ্রন্থিমোচনই আর হ'ল না। কোরালবাবু!

কোরাল। বলুন, স্যার! (নিঃশ্বাস পড়ল)

রশিদ। কি বন্ধু, সমব্যথীর বেদনা বুকে বাজল?

কোরাল। হ্যাঁ, বাজলই ত। যুগদেবতা দেখ্‌ছি মানসীকে আর নিরালা রাখলে না, ভস্ম করে আধুনিকারূপে ছড়িয়ে দিলে সারা বিশ্বে:

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

রশিদ। দেখুন, ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন গিয়ে, যাওয়ার আগে শুনে যায় যেন।

কোরাল। এই যাচ্ছি, স্যার।

[কোরালের প্রস্থান]

রশিদ। কে পত্র লিখলে?

[পত্র খুলে ফেলল, পিছন হতে অদৃশ্যভাবে এসে L of P চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়াল]

রিজিয়া! রিজিয়া আবার কি লিখলে?

[উচ্চ কণ্ঠে পাঠ]

পরম আরাধ্য আমার!

আমার এ সম্বোধন আপনার মনকে আলোড়িত করার স্পর্ধা নিয়ে করা হয় নাই। পত্র লেখার প্রধান কারণ, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় রায় আমি আপনার নিজ মুখ হতে শুনতে চাই। আমাকে একটা বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে বলে আপনার কোন দ্বিধা বা লজ্জার প্রয়োজন নাই। কারণ, ওরূপ বঞ্চিতা আমি জীবনে আরও হয়েছি, অতি শৈশবে মা হারিয়ে-ছিলাম। পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে,

সেই ভয়ে আব্বা আমাকে বিয়ে দিতে চান নি। বড়ভাই আপনাকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর কথার ভিতরে আমি আপনাকে কল্পনায় সৃষ্টি করে ফেললাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আব্বা আজ নেই, তিনি আমার যথেষ্ট সংস্থান করে গেছেন, সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ জীবন! এ টেনে নিয়ে চলার প্রস্তাবনা মনকে স্বতঃই অসাড় করে আনতে চায়। সেই অসীম ক্লান্তিকে জয় করার শক্তি খোদা দিন, এইটুকু আশিস্ চাই।

ইতি—রিজিয়া।

[ধীরে L of P রশিদের স্কন্ধে হাত রাখল, হঠাৎ রশিদ ফিরে তাকাল]

L of P. একি! আপনার চোখে জল!

রশিদ। তুমি কখন এসে পিছনে দাঁড়ালে, মিলি! (সনিঃশ্বাসে) পড়েছ চিঠিটা?

L of P. হ্যাঁ, সবটাই পড়েছি. কী সুন্দর! বিয়ে করেছেন তাত জানি না, কেন ত্যাগ করতে চান? অসুন্দর বলে?

রশিদ। না।

L of P. তবে?

রশিদ। মনে করেছিলাম, আধুনিকা ছাড়া আমার জীবনে চলবে না, তাই—

L of P. আর এখন কি মনে করছেন?

রশিদ। মনে করি, তোমাকে ছাড়া চলবে না। মিলি, তোমাকে পাওয়ার মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—

L of P. আমাকে ভালবাসাটা মোহ বলছেন কেন?

রশিদ। নইলে আমি জানি তুমি আহমদকে ভালবাস। বাস না কি?

L of P. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাসি—

রশিদ। তবুও দেখ, তোমাকে ত্যাগ করার সংকল্প করতে পারি না। রিজিয়ার অমন চিঠিটাও আমার মনের দুয়োরে আঘাত করতে পারল না—

L of P. (উষ্মায়) আপনি বিলেত ঘুরেছেন। এখানেও আধুনিকতা নিয়ে আছেন। আপনার ত জানা উচিত, ভালবাসার পাত্র সব সময়ে প্রণয়াস্পদই হবে এমন কোন মানে নেই— আপনিও দেখছি সেই চিরন্তন পুরুষ— আপনি আমাকে রেহাই দিন।

রশিদ। (বেদনাসিক্ত স্বরে) মিলি, অপরাধ আমিই করেছি। যেভাবে সুখী হও তেমনি করে নিষ্পেষিত, নিপীড়িত কর। একটু শান্তি, একটু নিস্তার আমাকে কেউ দিও না।

[হঠাৎ উত্থান করে]

(স্থিরকণ্ঠে) তুমি আহমদের সঙ্গে যেয়ো মিলি! আমি বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করি গিয়ে, উঃ।

[প্রস্থানোদ্যত]

জহির!

[জহিরের প্রবেশ]

জহির। হুজুর।

রশিদ। তোম্ মিসি বাবাকা হেয়া ঠায়রো। ময় যাতা।

[রশিদের প্রস্থান, আহমদের ভিন্ন দিক হতে প্রবেশ]

আহমদ। আমি ফিরে এলাম। Lady of the Park আমার সঙ্গে নাকি যাবেন?

L of P. হ্যাঁ মিস্টার আহমদ। জহির।

জহির। জি!

L of P. তুমি এখন যাও।

জহির। আচ্ছা, যাতা হুঁ।

[জহিরের প্রস্থান। আহমদ চতুর্দিকে চেয়ে দেখল, পরে]

আহমদ। Congratulation! Rezia.

L of P. আস্তে বড়ভাই, শুনে ফেলবে কেউ। আপনি আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলেছেন।

আহমদ। মুস্কিল কিসের আবার! Lady of the Parkএর পার্ট চমৎকার করে যাচ্ছিস—

L of P. যথাসর্বস্ব পণ থাকলে ওরূপ হয়। কিন্তু আর না, ছাই—

আহমদ। কি হ'ল?

L of P. না, বড়ভাই, মাঝে মাঝে খামাখা ওঁর মনে কষ্ট দিচ্ছি—

আহমদ। তা' ও যেরূপ একটা কুষ্মাণ্ড, ওর কিছু শাস্তি হওয়া দরকার।

L of P. না, না। অত দরকার নাই, সত্যি বলছি কষ্ট দিতে আমার বড্ড ইয়ে-ইয়ে লাগে।

আহমদ। ই-য়ে কি? মায়া?

L of P. আজ্ঞে হ্যাঁ।

আহমদ। ওরে বাবা, এর মধ্যেই—

L of P. জি হাঁ, ভাবী এলে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, মায়া লাগতে ক'দিন লাগে? না, সত্যি বলছি, ও ভারি ভাল লোক। আপনি ও আব্বা ঠিক চিনেছিলেন। এত সান্নিধ্য, এত ভালবাসা, কিন্তু একদিনও একটু অন্যায় ব্যবহার করেন নি। অথচ আপনি আর আমি, বেচারার মনে কষ্ট দিয়েই চলেছি—

আহমদ। আর একটু দিয়ে ওকে শায়েস্তা কর—

L of P. না, আর অভিনয় নয়। ওর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছে, তাতে করে Lady of the Parkএর সঙ্গে আপনার রিজিয়াও ভেসে না যায়, আমার সেই ভয়—

আহমদ। তোকে খুব ভালবেসেছে, ভয় কি?

L of P. (মুখ দুলিয়ে) উনি যখন জানতে পারবেন যে রিজিয়াই ওরূপ করেছে, তখন বুঝি মনে সত্যিকার কষ্ট পাবেন না?

আহমদ। ওরে বাপরে, পাবেন, পাবেন! বেশ ত, যত শীগগির পারিস যবনিকা টেনে দে না।

L of P. তাহলে আপনি এখন যান। ওকে

বড্ড কষ্ট দিয়েছি আজ। একটু মানিয়ে না আসলে—বুঝলেন না?

আহমদ। হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তুই মানাতে থাক্, আমি তা'হলে চলি।

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. খোদা! আমার জীবনে সমস্যা সমাধানের যে উপায় করে দিয়েছ, তা' শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রেখো। আমার স্বামীর সংসার এতদিন করতে যে অবকাশ দিয়েছ, তার জন্য তোমার দরগায় লক্ষ-কোটি সুক্রিয়া। ঐ উনি আসছেন।

[রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। কি, তুমি যাওনি আহমদের সংগে?

L of P. না।

রশিদ। কেন?

L of P. আপনি ওভাবে চলে গেলেন কেন? ঐ কথাগুলি ওভাবে বলে আমাকে ব্যথা দিয়ে গেলেন কেন? আপনি কি আমার মনের কথা জানেন না?

রশিদ। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এসো। হাতে হাত দাও। হ্যাঁ, এবার চাও, চোখে চোখে—বলত, সত্যিই তুমি আমার?

L of P. হ্যাঁ, আমি একমাত্র তোমার! তুমি জান না আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তোমাকে ঘিরে আছে, আমার আশা, আমার স্বপ্ন সবই তোমাতে ওতপ্রোত। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

রশিদ। (কোমলস্বরে) মিলি, লক্ষ্মীটি, বড্ড দুঃখ দিয়েছি তোমাকে।

L of P. আচ্ছা, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না ত?

রশিদ। কি বলো?

L of P. রিজিয়ার অনুরোধ কি রাখবে না?

রশিদ। অনুরোধ? মানে গিয়ে বলে আসব—তার সম্বন্ধে আমি নির্বিকার। তা পারব না।

L of P. এটুকু অনুগ্রহ না করলে, লক্ষ্মীটি, তার দুঃখ আমাদের সারা জীবনের শান্তিতে ছায়াপাত করবে যে,—এ তোমার করতেই হবে।

রশিদ। বড় কঠিন কাজ।

L of P. কিছুই কঠিন নয়, আমার পরিচয় তাদেরকে দিও না, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, কোন অসুবিধা হবে না।

রশিদ। আচ্ছা, তাই হবে।

[স্টেজ এক মিনিট শূন্য রইল, কিছু সময় অতিবাহিত করছে তাই প্রকাশের জন্য, রশিদ ও L of P-র প্রবেশ]

রশিদ। মিলি, না গেলেই ভাল হত; চল ফিরে যাই।

L of P. কেন ফিরে যাবে? সে সংবাদ পেয়েছে আজকে তুমি যাবে, তার আশাটুকু তুমি চুরমার করে দিতে চাও?

রশিদ। গেলে ত আরও বেশী চুরমার হয়ে যাবে।

L of P. না, ছিঃ! চল।

রশিদ। মিলি, দেখ, আমি বড় দুর্বল, জানি

না, কি করে বসব। ও বড় দুঃখিনী। বড় আশা করে আব্বা, মানে রিজিয়ার বাবা, ওকে দান করেছিলেন। ওর ভাইকে রেখে আমাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ দিচ্ছি এইভাবে। কি একটা নেশা চাপল, মনে করলাম সে গ্রহণযোগ্য না।

L of P. বেশ ত, তাকেই গ্রহণ করুন, আমি আপনার পথ থেকে সরে যাই—

রশিদ। রাগ করো না, মিলি। তোমার ভালবাসা কিরূপ একনিষ্ঠ হবে আমার জানা নেই, কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, তার যে প্রেম, সে একমুখী ও একান্ত। কাল রাত থেকে মনটা নানা চিন্তায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সব আকর্ষণ আমার মনের কোণে ঝাপসা হয়ে উঠছে,—পিতৃ-মাতৃহীনা অসহায়াকে আমি নিতান্ত কাপুরুষের মত ত্যাগ করছি—

L of P. বেশ ত, তাকে গ্রহণ কর না!

রশিদ। সে হয় না, মিলি। আমি তোমাতে তন্ময় হয়ে গেছি, ভবিষ্যৎকে অতল সাগর-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। দুঃখকে আর আমল দেব না—

"অতীত যা তা দুঃখের স্মৃতি
ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর
দিল পিয়ারা সাকী গো আজ
পেয়ালা ভরে ঘুচাও মোর।"

তোমার অক্টোপাসের কঠিন বন্ধনে আমাকে ধরে রাখ। না, না, যাব না—আমি যাব না।

L of P. আমাকে অপমান করো, মনে নেব না। কিন্তু তুমি চল—

রশিদ। আমি পারব না।

L of P. কেন পারবে না?

রশিদ। অনাথা, এতিম! দেখে যদি ভালবেসে ফেলি? তার কথা, যদি তার পত্রের মত, আমার মনে ঝঙ্কার তোলে? তবে?

L of P. তবে তাকে গ্রহণ করবে। সত্যি বলছি, তোমার মধ্যে আমি ভালবাসায় বিলীন হয়ে গেছি, তুমি যাকে গ্রহণ করবে তার মাঝেই যদি রূপ নিতে না পারি, তবে বলত আমার ভালবাসার সার্থকতা কোথায়?

রশিদ। তুমি উদার, আমি তোমার অযোগ্য।

L of P. তুমি আমার সর্বরূপে যোগ্য।

['সর্ব'-র উপর জোর দিলে]

তৃতীয় দৃশ্য।

[আবু আহমদের বৈঠকখানা]

রশিদ। এই ত বাড়ি।

L of P. এত মিস্টার আহমদের বাড়ি?

রশিদ। হ্যাঁ, রিজিয়া আহমদের বোন।

L of P. আগে বলনি কেন? আমাকে ত ভারি অপ্রস্তুত করলে! এখন বল ত কি করি?

রশিদ। আমি কি জানতাম, তুমি আহমদের বন্ধু হয়েও এটুকু জান না?

L of P. (ব্যস্তভাব দেখিয়ে) না, মিস্টার আহমদকে আমার দেখা দে'য়া অসম্ভব। এরূপ জানলে আর আসতাম না। দেখ, আমি চলে যাই—তুমি রিজিয়ার সংগে দেখা করো। সত্যি যদি তোমার মন চায় তাকে, মনের গতি ফিরিয়ো না। আর যদি মন সে না আটকে রাখতে পারে, তবে আমাকে খুঁজো, আমি দেখা দেব। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা করো—হে বন্ধু বিদায়!

[L of P-এর প্রস্থান]

রশিদ। যেয়ো না, মিলি। শোন—শোন—

[দ্বারের বাইরে উঁকি দিয়ে]

কই, এই বেরিয়েই গেল কোথা? হঠাৎ উধাও? আশ্চর্য!

[আহমদকে দেখে]

এই যে, আহমদভাই—

আহমদ। কি খুঁজছো রশিদ?

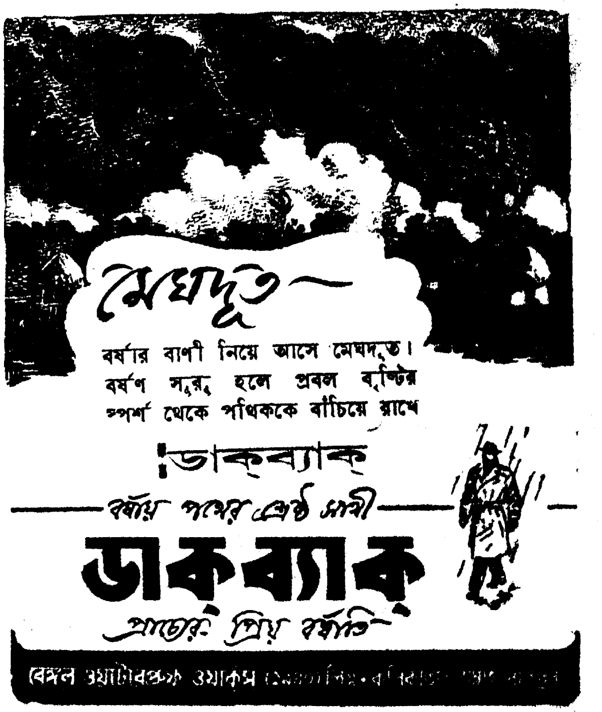
রশিদ। কিছু না, মানে, মানে, একটা বিড়াল—এই—সংগে এসেছিল, এইদিকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল—

আহমদ। ওই যে আঙিনার দরজাটা খোলা? ও দিয়ে ভিতরে গেছে বোধ হয়—দেখে আসব কি?

সূচনা

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের যে সব কারখানায় মোটর গাড়ী হয়, তাহারা কিন্তু মোটরের সকল অংশগুলিই নিজেরা তৈরী করে না। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট যে সব কারখানা যে বিশেষ অংশটি তৈয়ার করিতে পারদর্শী, তাহারা সে-ই বিশেষ অংশটি তৈরী করিয়া বড় কারখানাগুলিকে সরবরাহ করে। যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পে অগ্রণী সকল দেশেই প্রথমে ঐ ধরণের ছোট ছোট কারখানাগুলিই গড়িয়া উঠে। এই হিসাবে ৪০-১নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—ঠিকানার ভারতে প্রথম স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়াসার নির্মাণকারক মেসার্স স্বামী এণ্ড কোং দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সূচনা করিয়াছেন বলা যায়। কেননা স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়াসার প্রত্যেক যন্ত্রেরই অপরিহার্য অংশ। যন্ত্রের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষিতা না ঘুচিলে আমাদের শিল্পোন্নতি পদে পদে ব্যাহত হইবে। কাজেই আজ হউক, আর কাল হউক দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবেই। সেদিন মেসার্স স্বামী এণ্ড কোংর যথার্থ সমাদর হইবে। তাহারা মোটর গাড়ী, লরি, রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী, ট্রাম, বয়লারের সেফটি ভালভ, সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, পাট কল, কাপড়ের কল ও গেঞ্জীর কল প্রভৃতিতে ব্যবহার্য স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়াসার সকল উপযুক্ত ধাতুতে নির্দিষ্ট শক্তি পরিমাপে প্রস্তুত করেন। তাহারা পুরাতন স্প্রিংএর পাত রি-টেম্পার এবং সম্পূর্ণে স্প্রিংকে অধিকতর ভার বহনক্ষম করেন। ব্যায়াম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তাহারা তৈরী করেন। নির্মিত দ্রব্যের উৎকর্ষের জন্যই এতদিন পর্যন্ত তাহারা বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে।

৩৩



রশিদ। না, না, থাক।

আহমদ। (গুরুগম্ভীরভাবে) সত্যি, রশিদ, আমি মনে করিনি তুমি আসবে। রিজিয়া কিন্তু বলেছিল তার ডাক যদি সত্যিকার হয়ে থাকে, তবে তুমি আসবে। তুমি এসে ভালই করেছ! নিজে যা-হয় বোঝাপড়া করে যাও, আমার কর্তব্য থেকে আমি রেহাই পাই। চল, ভিতরে চল। আব্বা 'আখত্' করতে গেছেন, আমি 'রস্মুমত'টা, শুভদৃষ্টিটা চুকিয়ে দিই; তারপর তোমার জ্ঞান বিবেচনায় যা কর্তব্য বোঝ, তাই করো।

রশিদ। বেশ, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দৃশ্য পরিবর্তন, অন্দরমহল, রিজিয়া ওড়না ঘেরাও হয়ে একটু ঘুরে কৌচের পর আসীন]

[উভয়ের প্রস্থান]

আহমদ। রিজিয়া, ওদিকে ফিরে বসে আছ কেন? রশিদ এসেছে, দেখ।

রশিদ। (গলা পরিষ্কার করে) দেখুন—মানে—দেখ—আমি—অর্থাৎ ডেকে তুমি, আমাকে বড় ঈশে ফেলেছ—আমার যা বলার, তা' বলার নয়—আমি তোমাদের কাছে ঋণী। তা' চিরদিনই মানবো। তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমার মত হতভাগ্য ক্ষমার পাত্র। তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আজ যদিও আমার দুঃখের, কিন্তু জীবনে সব ওলোটপালোট হয়ে গেল, তোমাকে আর গ্রহণও করতে পারলাম না। তবে রিজিয়া, তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে বলেই এসেছি, আমার দিকে তাকাও। দৃষ্টিতে দৃষ্টি না পড়লে মানুষকে চেনা যায় না। হ্যাঁ—চাও, দেখ, মুখ আর একটু ঘোরাও—হাঁ—হাঁ—একি?—আঁ—রিজিয়া! তুমিই মিলি? Lady of the Park?

রিজিয়া। হ্যাঁ। আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমি ক্ষমার পাত্রী।

রশিদ। ক্ষমা কেন? তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। ক'দিন থেকে মিস্ মিলি ও রিজিয়া নিয়ে মন যে দ্বিধায় শতধা হয়ে যাচ্ছিল, তাতে দিনে আমার আয়ুর দশ বৎসর করে কমিয়ে দিয়ে গেছে। সেই মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ, তুমি আমার Guardian angel.

আহমদ। (ঠাট্টার সুরে) রশিদ, তুমি কিছু দ্রুত এগুচ্ছো, আমি বড়ভাই, একটু বেরিয়ে গিয়ে নিই, কেমন?

[তিনজনের হাস্য ও আহমদের প্রস্থান-অভিমুখে জাহাঙ্গীরের প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র, আমি ভগ্নীপতি, কল্পনার ডিমগুলি শাবকপ্রসূ হওয়ার সময়ই তো আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। নয় কি, রিজিয়া বেগম?

রিজিয়া। বেশ তো! আসুন জলসার জৌলুস বাড়ান।

জাহাঙ্গীর। না হে। এখনি কেটে না পড়লে কাঁটা হ'য়ে পড়ব যে! আসি তা'হলে। রিজিয়া, প্রার্থনা করি তুমি চির-বিজয়িনী হও।

[আহমদ ও জাহাঙ্গীরের প্রস্থান]

রিজিয়া। কিন্তু অভিনয় করে তোমার মন ভুলিয়েছি যে! সে আমার ভারি লজ্জার কথা।

রশিদ। সেটাই ত ঠিক করেছ রিজি। তুমি আমাকে জিতে নিয়েছ। সত্যিই তুমি আমাকে সব দিকে রক্ষা করেছ। খোদা তোমাকে রাজরাণী করুন!

রিজিয়া। রাজরাণী ত করেছেনই রাজামশাই! কিন্তু রাজত্বশাসনটা যেন এবার থেকে benevolent despotism হয়। কথায় কথায় রাগ আর গোস্বা। যে ভাই এত ক'রল, তাকে একটা সিগ্রেটকেসও দিতে পারব না?

রশিদ। থাক্ থাক্ হয়েছে। এবার কিন্তু রাণীর কথা দিতে হবে রাজত্বে যেন অরাজকতা না হয়।

রিজিয়া। যো হুকুম!

রশিদ। সত্যি আমি অবাক মান্‌লি, তুমি কি করে গতিস্বচ্ছলভাবে আধুনিকার মত সর্বত্র চলাচল করতে পারলে?

রিজিয়া। কেন পারব না? তুমিই ত সঙ্গে ছিলে—You had been a real husband!

রশিদ। I see. কাছে এসো না! আর একটু—হ্যাঁ।

রিজিয়া। এতদিনের পরিচয়েও তোমার মিলির সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করনি, আর এখন এত কাঙালপনা কেন?

রশিদ। সে ত ছিল পর, তুমি ত বউ! (সহাস্যে) The real wife, I mean.

রিজিয়া। ঈ-স্!

রশিদ। হ্যাঁ সত্যি, আশ্চর্য এই বন্ধন, মনে হচ্ছে যুগযুগান্তর হ'তে তুমি—

রিজিয়া। প্রণয়ী থেকে বঁধুতে রূপান্তরিত হয়ে আসছ, কেমন? (হাস্য)

রশিদ। জি, না, রূপান্তরিত না। মৌলিক, অকৃত্রিম প্রেয়সী।

রিজিয়া। উহু! বউকে ভালবাসলে সে যখন হ'ল প্রেয়সী, আর প্রণয়ীকে গ্রহণ করলে সে যখন রূপেতে হ'ল বউ। বঁধুরূপী হতে বহুরূপী হতে হ'ল ত? সেই হ'ল রূপান্তরের মায়াকাঠির স্পর্শ। সেই মায়া-কাঠি নারীর জাগরণ আনতে পারে, যদি নরের হাতে তাই হয়ে ওঠে জীয়নকাঠি।

গান।

রূপান্তর,
রাজার মেয়ে বন্দী ছিল
সাত মহলা পুরে
রাজার ছেলে বাজায় বাঁশী
ঘুম ভাঙানো সুরে
সুরের রেশে ভ'রলো পুরী
উথ্‌লে নিরন্তর;
রূপান্তর।
পায়ে ছিল সোনার কাঠি
রূপার কাঠি শিরে,
এক নিমেষে বদলে দিল
পেল গো প্রাণ ফিরে,
ঝরলো ক'নের আঁখির ভাষা
জীবন্ত মন্তর;
হলো, রূপান্তর।

সোভিয়েট বিজ্ঞান ও ভারত তত্ত্ব

ডক্টর শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্তমান দ্বিতীয় জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের একটি অঙ্ক হইতেছে নাৎসী জার্মাণীর সোভিয়েট-রুষের উপর আকস্মিক আক্রমণ! এই দেশের সহিত সোভিয়েট-রুষের অনাক্রমণমূলক সন্ধিও ছিল, কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রুষ প্রতিপদে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হয়। নাৎসী সেনা-নায়কেরা দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, "চারি সপ্তাহে রুষ-বাহিনীকে পরাজিত করিব ও আর বাকী ছয় সপ্তাহে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব।" কিন্তু জার্মাণ ঝটিকা বাহিনীর কার্য-তৎপরতা ও রণকুশলতা সত্ত্বেও মাসের পর মাস গেল, সোভিয়েট বাহিনী পরাজিত হইয়াও ধ্বংস হইল না বরং আজ প্রতি-আক্রমণ দ্বারা জার্মাণ সৈন্যদলকে রুষের সীমানা হইতে বিদূরিত করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় রুষের পশ্চাৎ অপসরণ দেখিয়া সোভিয়েট বন্ধুরা মুহ্যমান হইয়াছিলেন, শত্রুরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "আপদ গেল, বাঁচা গেল।" তাহারা বলিতে লাগিল, "ছি, এই সোভিয়েটের বাহাদুরী? চাষার দল যুদ্ধবিদ্যার কি বুঝিবে এবং যুদ্ধসম্ভারও কি প্রস্তুত করিতে জানিবে।" এতদ্দ্বারা তাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছিল, সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ দ্বারা একটা জাতি মহান ও শক্তিশালী হইতে পারে না, হিটলার প্রবর্তিত পদ্ধতি দ্বারাই জগতে একটা জাতি প্রতিভাশালী হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে, তাহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ জগতে চাষী ও মজুরের সাম্যবাদের সমর্থনকারী অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির তরফদারী করার লোকের সংখ্যা বেশী। বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে, যেখানে সুদূর অতীত হইতে লোকে যথেচ্ছাচারী শাসনে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং যথায় বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্য স্বাভাবিক ও ঈশ্বর প্রদত্ত বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তথায় সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ হৃদয়ঙ্গম করিবার লোক বিরল! আসল কথা এই, বিগত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পর, রুষ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যখন জার্মাণীও অস্ট্রিয়াতে সোস্যালিস্ট বিপ্লব হইল, পরে রুষের চারি পার্শ্বের দেশসমূহে কৃষক বিদ্রোহ (১৯২৫ খৃঃ "সবুজ বিপ্লব") হইয়া ওই সব দেশে জমিদারী প্রথা অন্তর্হিত হইল, পরে তুর্কীতে কামাল আতা-তুর্ক খেলাফৎ ও সুলতানাৎ রাষ্ট্র-পদ্ধতি অপসারিত করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী সম্মত সাম্যবাদীর রাষ্ট্রের পত্তন করিলেন, যখন জাপান, চীন ও ভারতে শ্রমিক ও কৃষকসমূহ স্বাধিকার লাভের জন্য অস্থির হইল, তখন বনিয়াদী স্বার্থের লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্রই অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। একি বংশ মর্যাদা, ধন ও পদের সম্মান থাকিবে না, পাদরী মোল্লা-পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, কেবল চাষী মজুরেরাই সমাজে উচ্চপদ পাইবে, এ যে জগতে নূতন বিপ্লব! এইজন্যই সোভিয়েট-রুষকে নানাদিক হইতে বিধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চলে; কিন্তু জগতে কল্যাণকামীরা যখন তাঁহাদের পুণ্য অভিসন্ধিতে অকৃতকার্য হইলেন, তখন সোভিয়েট-রুষকে তাহারা একঘরে করিলেন। ইতিমধ্যে জার্মাণীতে হিটলারের উদয় হয়। অবশ্য এই উদয় আকস্মিক নয়, জার্মাণীর দেশী এবং তৎসঙ্গে বিদেশী ধনীরা ইহার জন্য অনেক দিন হইতেই ধুনী জ্বালাইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে হিটলারের উদয় হয় এবং জার্মাণীতে মার্ক্সবাদী দলসমূহকে বিধ্বংস করা হয়। হিটলার ক্ষমতা পাইয়া বলিয়াছিল—"আমাকে চারি বৎসর সময় দাও, তাহা না হইলে মার্ক্সবাদ বোলশেভিকবাদ জার্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবে।" এই সব ইতিহাসের কথা, ইহার ফলে ধনতান্ত্রিক জগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তৎপর, হিটলারীয় দল নিজেদের খাঁটি "আর্য" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল, স্বস্তিকলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিল। ইহাতে ভারতের গোঁড়া হিন্দুর দল আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আর কি, কল্কি অবতার জগতে প্রকট হইয়াছে, জার্মাণীতে হিন্দু ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজিতেছে, হিটলার হিন্দু ধর্ম প্রচার করিতেছে (শেষোক্ত উক্তিগুলি লেখক স্বকর্ণে শুনিয়াছেন)। আসল কথা এই, হিটলারের যেসব সামাজিক বিধান এবং ইহুদীদের প্রতি যেসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তাহা হিন্দুর বর্ণাশ্রম এবং শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থারই অনুরূপ। গৌতমশ্রুতি ও মনুতে শূদ্রের প্রতি যে ব্যবস্থা আছে তাহা ইহুদীদের প্রতি হিটলারীয় আচরণের সঙ্গে মিলে। এইজন্যই বর্ণাশ্রমীদের এত উল্লাস, গোলামের জাতি গোলামিকেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে।

যাহাই হউক হিটলারের অভ্যুদয় এবং শেষে ইংলণ্ডের সহিত তাহার যুদ্ধ এদেশের লোকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জার্মাণী ভারতের যুদ্ধ করিতেছে, এই ধারণা অনেকের মনে উদয় হয়। যে হিটলারের শত্রু ও এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্র তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা স্বভাবতঃ অনেকের মনে জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে সোভিয়েট রুষের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব অনেকের মনে উদয় হয়। একেই এই দেশের বনিয়াদী স্বার্থের তরফদারীরা সোভিয়েট-রুষের প্রতি কখন খুসী ছিল না, তৎপুরে এই যুদ্ধে অশ্রুতপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া রুষের প্রতি এই শ্রেণীর ভারতীয়দের মন বিক্ষুব্ধ হয়। 'রুষ জাহান্নামে যাউক' এই ইচ্ছাই তাহাদের 'অনিদিত মনের' পর্দায় নিহিত থাকে।

লেখক ১৯২৫ খৃঃ হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, এই দেশের শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন শ্রেণীর লোকেরা সোভিয়েট-রুষের ভাল দেখিতে চায় না, ভাল শুনিতে চায় না। পরাধীন, পদদলিত, বৈষম্যযুক্ত সমাজের লোকেরাই মুক্তির বার্তা শ্রবণ করিবে, তাহার পরিবর্তে তাহারাই এই বার্তার প্রতি বিরূপ! ইহার মনস্তত্ত্ব বুঝিতে গেলে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শূদ্র বেশী ব্রাহ্মণ্যবাদী ও গোঁড়া! পুনঃ শূদ্রের সামাজিকপদ যত নিম্নের দিকে যাইবে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আচারের গোঁড়ামি সে ততই করিবে। শূদ্র ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি করিলে মনে করে তাহার সম্মান এবং তজ্জন্য সামাজিক পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে। এইজন্যই সে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পুনঃ বিদেশের মুসলমানাপেক্ষা ভারতের মুসলমান বেশী গোঁড়া, আর ভারতের অন্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গলার মুসলমান বেশী গোঁড়া (শেষোক্ত অভিযোগটি লেখক তাঁহার সৈয়দ বংশীয় এক বিহারী বন্ধুর কাছ হইতে শুনিয়াছেন)।

এই মনস্তত্ত্বের অর্থ—নিম্নস্তরের হিন্দু মনে করে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত বাদীয় গোঁড়ামি ও ব্যবস্থা সনাতন এবং একমাত্র পন্থা, ইহাকে আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল ও সামাজিক পদোন্নতি হইবে। রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস তাহার কাছে অজ্ঞাত, সে যে অবস্থায় জন্মিয়াছে সেই অবস্থাকে শাশ্বত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। ইহার বাহিরে সে তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে অসমর্থ। শূদ্র জানে না কি ভীষণ শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সে পতিত হইয়াছে। তাহার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বিজেতা ও শাসক হইয়া মনুসংহিতা পুনঃ সংকলিত করিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া সে আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। এই জন্যই গোলাম মনোভাবপ্রসূত বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই শূদ্র জাতিগুলি ধর্মের দোহাই দিয়া

নিজেদের নিম্নাবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া আছে। এই বিষয়ে চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। তিনি পুরীতে কলির আচার বর্ণনকালে বলিয়াছিলেন, কলিতে "চণ্ডালিনী শূদ্র করিবেক একাদশী...ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ী—পারস্য পড়িবে" (জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' দ্রষ্টব্য)। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। দাস তাহার অবস্থার পূর্বাপর ভাবিতে অসমর্থ, ভারতে তাহার জন্য তাহার দলে স্পার্টাকুসের ন্যায় চক্ষুরুন্মীলনকারী লোকের উদয় হয় না, বরং গোলামি প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থা ও ইহা হিন্দু ধর্মের অনুশাসন বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করা হয়। ব্যবহারিক দুঃখকে মানিয়া লইবার পরামর্শ উপনিষদের সময় হইতেই নানাভাবে চলিতেছে। ইহা নাকি হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এবং এই উপায়েই নাকি হিন্দু জাতি আজও জীবন সংগ্রামে টিঁকিয়া আছে। ফলতঃ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মানবের মুক্তি, জাতির সার্বজনীন কল্যাণ, সমাজ-শরীরের সর্বাঙ্গীন মুক্তি প্রভৃতি কথা এই দেশে বিশেষভাবে লোকের কাছে গৃহীত ও আদৃত হয় না। শিক্ষিত লোকের মনোভাব এই; যে পদ্ধতিতে (Polity) সে অন্য লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজের আর্থিক উন্নতি করিয়াছে বা করিতেছে এবং তালুকমুলুক করিবার সুবিধা পাইতেছে, সে পদ্ধতি তাহার কাছে শ্রেয় ও প্রেয়। আর তাহার যে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে সে তাহার শত্রু এবং তজ্জন্য মানবের শত্রু।

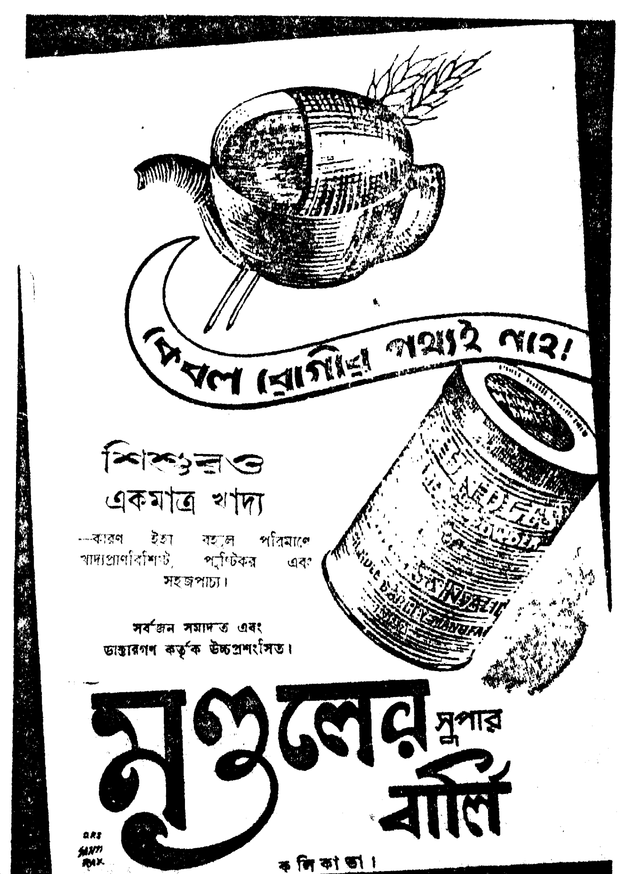
ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে নিজেকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ফলে যেসব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই দেশে প্রবর্তিত করে তাহার ফলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চাকরীজীবী ও ব্যবহারজীবী শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হয়। এই দলগুলি বঙ্গ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রূপ ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব ভারতে ইংরেজ শাসক নিজের তরফদারী করিবার একটা শ্রেণী সর্বপ্রথম হইতেই সৃষ্টি করে। ইউরোপের এবং বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডে ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারী প্রথা সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আমদানী করা হয়। এতদ্দ্বারা চিরস্থায়ী জমিদার শ্রেণীর উদয় হয়, তাহারাই ভূমির কর্ষক ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্তী হইয়া খাজনা আদায় করিবে, জমির উন্নতিকল্পে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা করিবে এবং তাহাদের খাজনা চিরস্থায়ী হারে নির্দিষ্ট থাকিবে, অন্য দিকে এই শ্রেণীর স্বীয় জমির কর্ষকের খাজনা অনির্দিষ্ট হারে থাকিবে ইত্যাদি সুখ সুবিধা দশসালার বন্দোবস্তে সংসাধিত করা হয়। পুনঃ, এই চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার অজুহাতে একটা অতি বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অনেক স্থলে এই মধ্য স্বত্বের স্তরের সংখ্যা সতের পর্যন্ত উঠিয়াছে! ফলতঃ পূর্ব ভারতের লোক একমাত্র কৃষিকর্মের অর্থনীতির (Agricultural Economy) উপর প্রায় দেড় শত বৎসর দণ্ডায়মান হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তৎপর, শ্রমশিল্প দ্বারা উৎপাদন প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় একটা চাকরীজীবী বৃহৎ শ্রেণী উদ্ভূত হইতেছে। ইহারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে। এই সব, জমির স্বত্বভোগী, ব্যবহারজীবী, ভেষজজীবী, চাকরীজীবী প্রভৃতি নানা প্রকারের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীসমূহ ভাবে, বাঃ এই রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই ত ঠিক। ইহাতে আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার একটা ব্যবস্থা আছে। তৎপর, পূর্বাপর ভাবিবার অবসর নাই বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়াই ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইহারা বলেন, এই ব্যবস্থাইত ভারতে শাশ্বত ও সনাতন। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির ঐতিহ্য কি আমরা ওই মস্কোর উদ্ভট মতসমূহ প্রবর্তনের দ্বারা হারাইব! ভারতে ওসব চলিবে না। এই সব লোক অন্য পক্ষে, স্বাধীনতা, স্বরাজ, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতির কথা বলেন এবং কেহ কেহ জাতীয় আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা স্বকার্য সাধনোদ্দেশ্যেই করা হয়। স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্থে, তাঁহারা নিজেদের স্বদেশী শাসকশ্রেণীরূপে প্রবর্তিত হওয়া এবং তদুপায়ে স্বীয় তালুকমুলুক বাড়াইবার ফন্দী বুঝেন। স্বাধীনতা অর্থে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ভাবেন, শূদ্র তাহার আরও বশ হইয়া "দেব ও দ্বিজে পরাভক্তি" প্রদর্শন করিবে; জমিদার ভাবেন, টাকার জোরে ভোট কিনিয়া আইন সভায় গিয়া আইন দ্বারা তাহার তালুককে অক্ষয় করিবেন ও বাড়াইবেন; মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা ভাবেন, তাঁহাদের মধ্যস্বত্ব ভোগকে জাতীয় অর্থনীতির দোহাই দিয়া আরও কায়েমী করিবেন; ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার ভাবেন, জাতীয়তা ভাবের প্রসারের সঙ্গে তাঁহাদের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইবেন। চাকরীজীবী ভাবেন, তাঁহার চাকরীর পদের বৃদ্ধি করাইবেন ইত্যাদি। ইহারা ইংরেজী শাসন প্রবর্তিত বর্তমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বাহিরে কিছু ভাবিতে পারেন না। স্বীয় শ্রেণীস্বার্থকে তাঁহারা বনিয়াদী স্বার্থ (Vested Interests) রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অস্তিত্ব কায়েমী করিতে চান। এই জন্যই যে উপায়ে তাঁহারা নির্মিত হইয়াছেন, সেই উপায়কেই তাঁহারা শাশ্বত ও সনাতন বলিয়া তারস্বরে নানা উপায়ে চীৎকার করেন। একবার মফঃস্বলের কয়েকজন জমিদার, উকিল ও ডাক্তার লেখকের কাছে আসিয়া বলেন—সমাজের যে যেমন আছে তাহা ঠিক থাকিবে, অথচ দেশ স্বাধীন হইবে—এইরূপ পন্থা প্রদর্শন করিয়া দিন। লেখক তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি অক্ষম। ইহাই হইতেছে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীদের মনোবৃত্তি। এই জন্যই ইঁহারা ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষ্টির প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। এই জন্যই, আজও ইঁহারা পুরাতন ভিক্টোরীয় যুগের মতসমূহকে শাশ্বত বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বলিয়া চালাইবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন।

এই মনোবৃত্তির জন্যই সোভিয়েট-রুষের প্রতি ইঁহাদের এত বিতৃষ্ণা! এইজন্যই সোভিয়েটের প্রতিপক্ষীয় কথাগুলি তাঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন; সোভিয়েট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা নাকি ব্যর্থ হইয়াছে, সোভিয়েট জমি সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম, তথায় ভূমি সমস্যার সহিত সোস্যালিষ্ট পরিকল্পনার সমবায় করায় সোস্যালিসম ব্যর্থ হইয়াছে, কার্ল মার্ক্স জমি সমস্যা বিষয়ে কিছু বলেন নাই, আর রুষে জমি সমস্যাই প্রধান সমস্যা, অতএব মার্ক্সের মত তথায় চলিতে পারে না, আবার মার্ক্সের অর্থনীতিক মতগুলি ভুল, কেন লোকে তাহা আর বিশ্বাস করে, সোভিয়েটে যথেচ্ছাচারী (Totalitarian) শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তথায় স্বেচ্ছাচারী নেপোলিয়নও প্রকট হইয়াছে ইত্যাদি সব বুলি, আমাদের দেশের সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের ও তাহাদের ভাড়াটিয়াদের দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এইসব শ্রেণী এখন গোঁড়া "ন্যাশনালিষ্ট" সাজিয়া হিন্দুর কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের রক্ষার নামে নানা উপায়ে কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন—এই জন্যই, মজুরের ধর্মঘটের পশ্চাতে ইহারা বৈদেশিক প্রচেষ্টা দেখেন, এই জন্যই "লাঙ্গল যার জমি তার" ধ্বনি, সামাজিক বিপ্লবের উপায় আর মানবের অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণকে ভারতীয় কৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। ভারতের গণ-শ্রেণীসমূহের মুক্তির প্রচেষ্টাকে বৈদেশিক প্রভাব ও জাতীয় আন্দোলনের শত্রু বলিয়া রটাইতেছেন। ইউরোপে খৃঃ ১৯১৯—১৯২৫ সাল পর্যন্ত তথাকার বুর্জোয়া ও তাহাদের তাঁবেদারদের মনেও এই ভীতি উৎপাদিত হইয়াছিল। রুষের ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিপ্লব সাধিত হওয়ায় এবং ইউরোপের সর্বত্রই কম্যুনিষ্ট-দল সংস্থাপিত হওয়ায় এই শ্রেণীদের মহাভয় সঞ্চার হয়। মধ্যযুগের জমিদারদের বংশধরদের আসন বিচ্যুত হইল, তাহাদের আর কেহ Gottes Gnades (ঈশ্বরের দয়াপ্রাপ্ত পুরুষ) বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে না, কারখানার মালিকদের ভয় হয়, যেহেতু শ্রমিকেরা বিনা রোজগারে লাভের (unearned increment) বখরা চায় আবার কম্যুনিষ্টেরা তাহা দখল করিতে চায়, কৃষক প্রজারা জমির মালিক হইতে চায় ইত্যাদি দেখিয়া তাহারাও দিশাহারা হয়। তাহারাও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে এবং ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে—"বিশ্ব-বিপ্লব" (World-Revolution) আসিল। চারিদিকে রব উঠিল—এসিয়ার বর্বরতা রুষের মধ্য দিয়া ইউরোপ গ্রাস করিতে আসিতেছে। এমনকি একজন জার্মাণ মনীষী ভীত হইয়া Downfall of the occident নামে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন! তিনি বলিলেন, প্রতীচ্য ইউরোপের পতন হইতেছে। এই প্রকারে ভয়ে অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকল হয়, ইহার মধ্যে একটি হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হয়। খৃঃ ১৯২০ সালে সুইডেনের একজন লেখক এবম্প্রকারে ভীত হইয়া কাগজে লিখিলেন, "বিশ্ব-বিপ্লব আসিতেছে, তাহাকে আর রোখা যায় না, রুষ বোলশেভিকরা এই কর্মের জন্য নানাপ্রকারের চর লাগাইয়াছে, ভারতীয় কবি ঠাকুর ওই যে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও একজন বোলশেভিক চর।"

আমাদের দেশেও এইসব কারণে বনিয়াদী স্বার্থের দলের লোকেরা নানা উপায়ে সোভিয়েট-রুষের নিন্দা ও সোভিয়েট কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। সোভিয়েটকে তাঁহারা অস্বীকার করিয়া জার্মাণী-ইংলণ্ড-আমেরিকাপ্রসূত বুর্জোয়া কৃষ্টিকে একমাত্র সত্য ও পন্থা বলিয়া আঁকড়াইয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একদল নূতন ভাবুক সমুত্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া কৃষ্টির ভুল প্রদর্শন করিতেছেন এবং বলিতেছেন, ইহা

শ্রেণীস্বার্থ-বিজড়িত। বহু পূর্বেই রুশ বৈপ্লবিক ক্রপটকিন তাঁহার Mutual aid নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন, কি প্রকারে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা ডারউইনের মতবাদকে বিকৃত করিয়া নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক মতে পরিণত করিয়াছেন। এক্ষণে অনেকে দেখাইতেছেন, কি প্রকারে বুর্জোয়ারা ফিনল্যাণ্ড হইতে সমাজতাত্ত্বিক ওয়েস্টার মার্ককে আমদানী করিয়া তাহার দ্বারা লিখাইয়া লয় যে বর্তমানের বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলি মানব সমাজে শাশ্বত এবং স্বাভাবিক, এমনকি মানবের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যথা একস্ত্রী বিবাহ এবং তদুপরি যে পারিবারিক বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতি, তাহা মানব তাহার বানর পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে (ভারতের লোকেরা বানরের একস্ত্রী প্রভৃতির কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া চালান, বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির ওকালতী করা ত চাই!) তৎপরে মাক্কের মুণ্ডপাত তো তাহার আমল হইতে সভ্য দেশসমূহের স্কুল ও কলেজে বরাবরই করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, জীব বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে Germ-plasm-এর অপরিবর্তনীয়তা এবং তৎপ্রসূত জীবের মধ্যে Heredity শক্তির প্রাধান্য একমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রচারিত করা হইতেছে। পুনঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে যখন Colonial Inperialism (ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদ)এর উদয় হয়, তখন উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদের উপর নিজেদের শোষণ ও শাসন অচল করিবার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মতসমূহও সৃষ্ট করা হয়। উপরোক্ত Germ-plasmএর বৈশিষ্ট্য এবং Heredityর সাহায্য নর সমাজে প্রয়োগ করিয়া বলা হইল "শ্বেত জাতি" নাকি সর্বগুণের আকর, তাহারা অ-শ্বেত জাতিদের জগৎ হইতে বিতাড়িত করিবে, ইহারা নিম্নশ্রেণীর মানবরূপী জীব, তাহারা অন্ধকারে চিরাচ্ছন্ন অসভ্য, উন্নত হইবার "জাতিগত শক্তি" (Race-Capacity) তাহাদের নাই বা কমভাবে আছে। এইসব উদ্ভট মতগুলি জীবতত্ত্বের অংশস্বরূপ 'নর-তত্ত্ব' (Anthropology) নামক বিজ্ঞানের নামে চালান হইতে লাগিল। এইসব তথাকথিত নর-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ-তত্ত্বও সংস্থাপিত হইল। সেই সময় হইতে উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের মানব জাতি, White man's burden (শ্বেত-জাতির ভার বা দায়িত্ব), Control of the Tropics (গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের শাসন) প্রভৃতি নানামত জাহির হইয়া সর্বত্র পঠিত ও গৃহীত হইতে থাকে। এই প্রকারে সাম্রাজ্যবাদীদের শ্রেণী-স্বার্থ-প্রসূত মতগুলি সনাতন সত্য বলিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষালয়সমূহে পঠিত হয় এবং তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করিয়া কৃতার্থ হই!

ইতিমধ্যে বপ নামক একজন জার্মাণ পণ্ডিত আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতের আর্য ভাষাগুলির সহিত পশ্চিম এসিয়ার এবং ইউরোপের অনেকগুলি ক্লাসিকাল ও বর্তমানের ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। তৎপর, গ্রিম নামে আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত তথ্য আবিষ্কার করিলেন, কি প্রকারে ব্যঞ্জন বর্ণের পরিবর্তন হইয়া (Shifting of the Consonants) এই সব ভাষার পার্থক্য সংসাধিত হইয়াছে। ইহার পর, জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষার সহিত একজাতীয় ভাষাগুলির নামকরণ করিলেন—"ইণ্ডো-ইউরোপীয়" বা আর্য ভাষা। ইহাতে দুই দলের আপত্তি হয়, "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" নামটি জার্মাণদের অসহ্য হয়। তাহারা ইহার নাম রাখিলেন,—"ইণ্ডো-জার্মাণ"। আর এক জাতীয় ভাষার জন্য বাঙ্গালী কৃষকের সহিত ইংরেজ টমি আটকিনের এক রক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেক ইউরোপীয় এবং আংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ আপত্তিজনক হয়। শেষে, ম্যাক্সমূলার বলিলেন, আমি "আর্য" অর্থে একটা বিশিষ্ট জাতি বুঝি না, "আর্য" শব্দের সহিত মানবের চুলের বা চক্ষুর বা গাত্রের বর্ণের সম্পর্ক নেই। "আর্য" শব্দে এক শ্রেণীয় ভাষা বুঝি! ইহাতে নেটিববিদ্বেষীদের গাত্রদাহ নিবারিত হয়। কিন্তু জার্মাণ জাতীয় পণ্ডিতেরা ছাড়িবার পাত্র নন। যখন শতধাবিচ্ছিন্ন জার্মাণ রাষ্ট্রসমূহ পুনঃ পুনঃ ফ্রান্স দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হইতেছিল, তখন থেকেই জার্মাণ পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মাণ জাতিদের সমীকরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রশক্তিতে একীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা জার্মাণত্ব (Germandom) ভাব প্রচার করেন। এই সঙ্গে তাঁহারা "জাতিত্ব" (Race-theory) রূপ মতের উপর জোর দিতে থাকেন। পরে, জার্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা নিজেদের খাঁটি আর্য বলিয়া জাহির করিতে থাকেন এবং একদল বলেন, প্রাচীন আর্যেরা উত্তর ইউরোপে উদ্ভূত হইয়া প্রাচ্যে অভিযান করে। প্রাচ্যের প্রাচীন জার্মাণরাই নাকি হাকামিনিড যুগের ইরাণী ও বৈদিক আর্য ছিল! এই প্রকারের মনোভাব দেখিয়া একজন ফরাসী লেখক ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, "আর্য মতটা 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' মতে, এবং শেষে তাহা জার্মাণ মতে' পরিবর্তিত হয়। (L. Finst L'agonie et mort de Race দ্রষ্টব্য)। এই জার্মাণ পণ্ডিতদের উদ্ভটামীর ফলে ফ্রান্সে Celticism মতটির উদ্ভব হয়। ব্রোকার দলের নর-তাত্ত্বিকেরা বলিলেন, কেলটিক মূল জাতিই আসল আর্য, তাহারাই এসিয়া হইতে ইউরোপে আর্য ভাষা ও মৃত শরীরকে অগ্নিদাহ করিবার প্রথা আনিয়াছে। অতএব কেলটিকদের বংশধর




এ যে 'ঢাকেশ্বরী'র শাড়ী দেখছি!

বর্তমানের ফরাসীরাই আসল আর্য! ইহার পূর্বেই খৃঃ ১৮৭০ সালের ফ্রাঙেকা-জার্মাণ যুদ্ধের ফলে য়োকার-গুরু এবং নর-তত্ত্বের পিতামহ বৃদ্ধ কাতারফাগ বলিয়াছিলেন, প্রুসীয়েরা বর্বর ফিন জাতীয়, তরবারির সাহায্যে জার্মাণদের উপর রাজত্ব করিতেছে। (অবশ্য প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক ভিরসোর দ্বারা ইহার প্রত্যুত্তর দেন যে তাহারা খাঁটি জার্মাণ এবং তজ্জন্য খাঁটি আর্য!)। পুনঃ জার্মাণদের গোঁড়ামি এবং অনুদারতাতে বিরক্ত হইয়া ইটালীয় নর-তাত্ত্বিক সার্জি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন, জার্মাণরা মিশ্রিত জাতি। এবং একটা গোল মাথা, লম্বা ভ্রূ সরু নাক বিশিষ্ট জাতি এসিয়ার পামীর উপত্যকা হইতে নূতন প্রস্তর যুগে ইউরোপে আর্য ভাষা ও মৃতদেহকে অগ্নিদগ্ধ করিবার প্রথা আমদানী করে ("The Mediterranean Race" দ্রষ্টব্য)। এই কলহের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারাই "আর্য"। ফলতঃ কে আর্য তাহা একটা রাজনীতিক-ন্যাসনালিষ্ট কলহে পরিণত হয় (Ripley—"The Races of Europe" পুস্তকে Aryan controversy নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, জার্মাণীর নর-তাত্ত্বিক বা ভাষা তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক এই "জার্মাণ" মতে সায় দেন নাই বা এখনও দেন না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই উদ্ভট মতটাই ভারতে সত্য বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে! ইহা কি প্রকারে সংঘটিত হয় তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য।

যখন বিসমার্ক বলেন যে, প্রুসীয়রাই খাঁটি জার্মাণ এবং তজ্জন্য খাঁটি 'আর্য' তখন ইংরেজ নরতাত্ত্বিক বেড্ডো তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার শারীরিক আকৃতিই তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়! ইংরেজী Encyclopaedia Britannica, Vol. 12-1929 বলিতেছে, "That the migration of the Indo-Europeans was through Asia Minor is proved by the discovery in 1906-07 at a large mass of records dating from the fifteenth and fourtenth centuries B.C.

ইহার অর্থ, এসিয়ামাইনরে প্রাচীন মিটানীদের দেশ থেকে বৈদিক দেবতা, ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য দ্বয়ের উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষীরা প্রাচ্য হইতেই ইউরোপে আগমন করিয়াছিল। তৎপর, এই পুস্তক বলিতেছে,

"In Germany many scholars.... attribute to the Indo-Europeans all the characteristics of the idea' German. For this, however, there is no solid foundations." (Pp. 263-264).

ইহার অর্থ জার্মাণীর অনেক পণ্ডিত আদর্শ জার্মাণের শারীরিক লক্ষণগুলিকে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির উপর আরোপ করেন। তাহারা জার্মাণকেই 'আর্য' বলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য এই উক্তি বিগত প্রথম জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মোহ ইংলণ্ডের নরতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের পাইয়া বসিয়াছে। এইজন্যই, জার্মাণ "নর্ডিকবাদ" তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরেন এবং সেই বিষ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া উপনিবেশের শিক্ষালয়সমূহে প্রসার প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই উপায়েই আমরা বাল্যকাল হইতেই স্কুলে পাঠ করি যে, আর্য নামে একটা শ্বেত জাতি বিদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। আবার এক্ষণে একদল ভারতীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই শ্বেতকায় আর্যেরা নীল চক্ষু, কটা চুল উত্তর ইউরোপীয়দের জাতি ছিল! তাঁহারাও উক্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর দিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য তাঁহারাই জানেন। ইংরেজ পণ্ডিতেরা কি প্রকারে জার্মাণ nationalist-chauvinistদের সুরে সুর মিলান তাহা ঐতিহাসিক মুইর বলিতেছেন, জার্মাণেরা নিজেদের জাতের বড়াই করিয়া অনেক লিখেন, তন্মধ্যে ইংরেজ জাতিরও প্রশংসা ছিল এবং ইংলণ্ড nothing unflattered took it up ("Nationalism and Internationalism" দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ



রূপের উৎসে উৎসারিত হোক

কেশ পরিচর্য্যায়ঃ	ক্যাষ্টরল, ভৃঙ্গল, কোকনল্, তিলল্
কুন্তল গরিমায়ঃ	লাইজু (লাইম জুস গ্লিসারিণ), সিল্‌ট্রেস (শ্যাম্পু)
দশনকান্তির উৎকর্ষেঃ	নিম টুথপেষ্ট, মার্গোফিস (নিম টুথ পাউডার)
অঙ্গরাগের ঔজ্জ্বল্যেঃ	মার্গো সোপ, মলয় (চন্দন সাবান)
তনুদেহের রূপলাবণ্যেঃ	লাবনী স্নো, তুহিনা (বিউটি মিল্ক)
সৌন্দর্য প্রভাব উজ্জীবনেঃ	রেণুকা টয়লেট পাউডার
বেশবাসের আবেশ সৌরভেঃ	কান্তা (গন্ধসার), ল্যাভেণ্ডার

★



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

সাম্রাজ্যবাদীর দল উপনিবেশসমূহে শোষণ ও শাসন করিবার হেতু এই নর্ডিক মতবাদে পান; সেইজন্যই ইংরেজ নরতাত্ত্বিকেরা এই মত গ্রহণ করেন। পরে, সেই মতানুযায়ী যেসব তথ্য পুস্তকাকারে লিপিবন্ধ হইল তাহা ভারতে একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে থাকে।

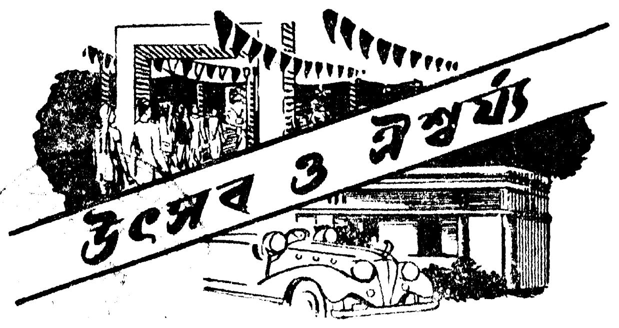
ইহার ফলে, বৈদিক জাতি অগ্রেই প্রাচ্য তত্ত্ব বিশারদদের দ্বারা শ্বেতকায় জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা নীল চক্ষু—কটা চুল—লাল দাড়ি বিশিষ্ট উত্তর ইউরোপীয় জাতিতে পরিবর্তিত হইলেন এবং বর্তমান হিন্দুরা আদিম অধিবাসীর সহিত উক্ত জাতির মিশ্রণের ফল বলিয়া নির্দেশ প্রদত্ত হইল। আর আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলিলেন, সাবাস! আমরা কিছু না হই, অন্ততঃ শাসক জাতির দোআঁশলা জাতি তো বটে!

এই নর্ডিক মতবাদ যে একটি ভীষণ সাম্রাজ্যবাদীয় মত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যখন জার্মাণীতে হিটলার ও নাৎসিদলের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং তাহারা বলিল জার্মাণেরাই আর্য এবং একমাত্র Herrenvoelk (শাসক জাতি) তখন সাম্রাজ্যবাদীয় ইংলণ্ডেরও মাথার টনক নড়িল। হাডেন ও হাক্সলী নামক বৈজ্ঞানিকেরা নর্ডিক জাতির অস্তিত্বই অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন বেশীর ভাগ ইংরেজের মাথার চুল কাল! (We Europeans P 118 দ্রষ্টব্য)। তৎপর গর্ডন চাইল্ড নামক বৈজ্ঞানিক আর্যদের নর্ডিক বলিয়া মানিয়া নিলেও নর্ডিক মতবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। ইনি বলেন,

"The apothessis of the Nordics has been linked with policies of imperialism and world domination". ("The Aryans" p. 164).

ইহার অর্থ, নর্ডিকদের দেবত্বে উন্নত করাকে সাম্রাজ্যবাদীয় এবং জগৎশাসন নীতির সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের পরে, "অপরম্ভ কিং ভবিষ্যতি"! সে সম্বন্ধে এখনই কৌতুহল জাগিতেছে।

এক্ষণে কথা এই, আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা ভারতের ইতিহাসে 'নর্ডিক' জাতির চিহ্ন খুঁজিতে এত ব্যস্ত কেন? ইংরেজ পণ্ডিত সিন্ধু উপত্যকায় নর্ডিক জাতির করোটি প্রাপ্ত হননি বলিয়া হতাশ হইয়াছেন। সিন্ধু সভ্যতার সহিত বেদের জাতির কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে মন্তব্য তিনি করিয়াছেন, এইটাই তাহার একটি মূল কারণ। কিন্তু "নর্ডিক করোটি" (Nordic Skull) বলিয়া কথা এ দেশেই কেবল শুনা যায়। পূর্বে উত্তর ইউরোপের নরতাত্ত্বিকেরা লম্বা মাথা সরু নাক দীর্ঘ শরীর নীল চক্ষু কটা চুল উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ সম্বলিত লোককে উক্ত মূল জাতীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু কেবল লম্বা মাথা ও সরু নাক বিশিষ্ট হইলেই নর্ডিক হয় না। যাহা হউক, নর্ডিক মতবাদী মার্সল সিন্ধু উপত্যকায় নর্ডিক পাইলেন না; অনেক জার্মাণ ও ইংরেজ পণ্ডিত বেদে নাকি নর্ডিক জাতির লক্ষণসমূহের উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যে বেদ পাঠ করিলে তাহা প্রাপ্ত হন না; রূপক কল্পনাকে টানিয়া-টুনিয়া সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া একদল লোক বেদে নর্ডিক জাতির অস্তিত্ব পান! বর্তমান ভারতে নর্ডিক না পাওয়া গেলে, সিন্ধু উপত্যকায় তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও ভারতে নর্ডিকদের আনয়ন করা চাই, তাহা না হইলে ভারতের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদীয় ব্যাখ্যা বিফল হইবে। এইজন্য শেষে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তে যেসব পার্বত্য জাতি আছে তাহাদের মধ্যে নীল চক্ষু ও কটা চুলের লোক আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই বৈদিক কৌমসংক্রান্ত জাতি অর্থাৎ বৈদিক কৌমদের জাতিরাই এই পার্বত্যাঞ্চলে এখনও বাস করিতেছে। (পাণিনি ও মনু এই বিষয়ে কি বলেন?)। যাহাদের প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতেরা "পিশাচ" ও "ব্রাত্য" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন; খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে আল-বেরুণী যাহাদের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, পশ্চিম পর্বতস্থিত লোকেরা ভারতীয় বা তাহাদের সম্পর্কীয় জাতি, ইহারা অতি বর্বর (Prolegomena to Indica দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে বেদে তাহাদের আনয়ন করা হইল। নর্ডিক দেবতাকে ভারতের ইতিহাসে আনিতেই



হইবে, সেই জন্য এই যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

এই প্রকারে দুষ্ট হয় নর্ডিক মতবাদ আশ্রয় করিয়া ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি, নরতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই জন্য আমরাও আমাদের ইতিহাসের কদর্থ পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত ভারতে নিগ্রুটো (ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো বা কাফ্রী) জাতির অস্তিত্বও খোঁজা হইতেছে। ইহাও সাম্রাজ্যবাদীয় মতের অন্যতম। বর্তমানের ভারত-বাসীদের জগতের সম্মুখে অতি নীচ করিয়া প্রদর্শন করাই হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য। ইহার কারণ ক্যাপিটালিষ্ট দেশসমূহে মূল জাতিত্বে (Race) বিশেষভাবে বিশ্বাস করা হয়। আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রে ইহা চরমে উঠিয়াছে; তথায় রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি Race-theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। শ্বেত জাতিকে তথায় দেবত্বে উন্নীত করা হইয়াছে এবং বর্ণ সাংকর্যকে ঘৃণা করা হয়। সুলটজে নামক ওই দেশের একজন জাতি-তাত্ত্বিক লেখক বর্ণ সাংকর্যের দোষ দেখাইয়া লিখিয়াছেন,

The Noble Hindu is dead, he died in the while-yellow-blac!. quagmire ("The Race or Mongrel")

ইহার অর্থ শ্বেতকায় প্রাচীন মহান হিন্দু রক্ত-সংমিশ্রণের কর্দমে ডুবিয়া মরিয়াছে। এইরূপে আর্যকে মারা হইল, এখনকার ভারতবাসী নীচ-রক্তসম্ভূত মিশ্রিত জাতি। যাহার ধমনীতে নিগ্রো জাতীয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে সে স্বাধীনতার কথা কহে কি? ফলতঃ সাম্রাজ্য-বাদীয় মতগুলি নর-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, ভাষা-তত্ত্ব প্রভৃতির আকারে এই দেশে প্রচারিত হইতেছে। আর ইহার বাহন হইতেছেন অনেক সরকারী ও অর্ধ-সরকারী ভারতীয় পণ্ডিতেরা। কেহ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" যুক্তি ধরিয়া বৈজ্ঞানিক আকারে লোকের সম্মুখে ধরিতে-ছেন, কেহ বনিয়াদী স্বার্থের রক্ষাকল্পে ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া জাহির করিতেছেন। তাঁহাদের আশা এই অজ্ঞতাপ্রধান দেশে এতদ্দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত, নবোত্থিত বুর্জোয়াতন্ত্র ভাবিতেছে, Race-theoryর দোহাই দিয়া নিজেদের পদ রক্ষা করিতে পারিবেন। এইসব দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে যে বিজ্ঞানে শ্রেণী লক্ষণ নাই। এইজন্যই শ্রেণী চেতনাযুক্ত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সোভিয়েট কৃষ্টির প্রতি এত বিরূপ।

এক্ষণে সোভিয়েট রুষে কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। তথায় সাম্যবাদীয় রাষ্ট্রের আওতায় মূল জাতি, বংশ-গরিমা, জীবাণুর পৈতৃক গুণ বহনকারী ক্ষমতা, শাসক জাতি, নীচ জাতি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীয় মত গৃহীত হয় না। মানব তাহার বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এই তথ্যই স্বীকৃত হয়। লেখকের জার্মাণ নর-তাত্ত্বিক অধ্যাপক ফন লুসান বলিয়া-ছেন বাতাবরণ (Environment) দ্বারাই একটা মূল জাতি (Race) উদ্ভূত হয়। কিন্তু ইঁহার নাৎসীভাবিত হিটলারীয় অধ্যাপক ফিসার নিজের গুরুর মত পরিত্যাগ করিয়া হিটলারীয় অনু-শাসনানুযায়ী বলেন, লুসান ইহার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেন নাই।

("Human Heredity by Fischer and Lent

অন্যপক্ষে রুষ-আমেরিকান অধ্যাপক সোরোকিন বলেন,

Numerous statistical, anthropometrical and experimental studies have shown that there is a series of correlation of various degrees between economic position (degree of poverty or wealth) and the bodily, biological, and mental characteristics of the population of the same age and, sex in the same society ("Contemporary Sociological Theories" P. 547).

ইহার অর্থ, একই সমাজে একই বয়স ও লিঙ্গের লোকদের মধ্যে দারিদ্র্য বা ধনানুসারে শারীরিক, জীবতাত্ত্বিক এবং মানসিক পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়, ইহা অনেক সংখ্যাশাস্ত্র, নর তাত্ত্বিক মাপযোখ এবং পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পক্ষপাতশূন্য কথা কে বলিতেছেন তাহা পাঠকই স্থির করিবেন।

পুনঃ লেনিনগ্রাডের বিখ্যাত অধ্যাপক পভলফ স্থাপিত Pavloff Instituteএ তাঁহার শিষ্যেরা যে সব জীবতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা Race-theoryর মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সোভিয়েট physiologist অধ্যাপক আনোখিন বলিতেছেন,—

We, in particular, already fifteen years ago, undertook a study of the "plastic" properties of the nervous system...... We proved that there are no absolutely unalterable nerve functions and that they are only relatively stable. It is interesting to note that these results of our long years of research were embodied by Prof. Eichen, a German scientist in exile in a book exposing the race-theory (published in Paris '36) ["Moscow News" June 25, '43.]

ইহার অর্থ, সোভিয়েট জীবতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, শরীরের স্নায়ুসমূহের কর্ম অপরিবর্তনীয় নহে। পরীক্ষার এই ফলটি প্রবাসী জার্মাণ বৈজ্ঞানিক আইখেন Race-theory (মূলজাতিতত্ত্ব) রূপ মতটি খণ্ডন করিবার সময়ে তাঁহার পুস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থলে, ইহাও দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য যে, যিনি জার্মাণ রাজনীতিক গোঁড়ামির প্রতিকল্পে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি আজ নির্বাসিত! এতদ্দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীয় মতের গোঁড়ামির বিপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, মানবের স্নায়ুমণ্ডলীর অপরিবর্তনীয়তা নাই এবং এতদ্দ্বারা ইহাও ইঙ্গিত হয় যে, একটা মূলজাতি বাতাবরণ দ্বারা অভিভূত হয়, তজ্জন্য অন্য হইতে পৃথক-কৃত হয়।

পুনঃ সোভিয়েট Academy of Sciencesএর (বিজ্ঞান-পরিষদ) অধিবেশনে স্লাভজাতিসমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উদাটসফ্ মহোদয় যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, উক্ত স্থানের প্রাচীন জাতিসমূহের বংশধরেরাই বর্তমানের স্লাভ জাতি। এই অনু-সন্ধানের বৈশিষ্ট্য এইঃ

"Reflected in the work of the session were the new methods of investigation applied by Soviet scientists and their new approach to problems of ethnogeny i.e. they trace the origin of modern peoples, and in particular the Slavs, through the involved process of interrelation, crossing and mutual cultural influences of ancient tribes. These methods recognize no artificial biological barriers between various peoples, which are raised by German misanthropic "science" that tries to divide mankind into 'superior' and 'inferior' races" ("Moscow News" Feb. 23, '44.)

এতদ্দ্বারা জার্মাণ নরতাত্ত্বিকদের শারীরিক উচ্চ ও নিম্নস্তরের জাতিসমূহের লক্ষণ দ্বারা পৃথক করিয়া কল্পনা করার পরিবর্তে বিভিন্ন কৌমের পারস্পরিক সম্বন্ধ, রক্ত-সংমিশ্রণ এবং কৃষ্টির পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা একটা 'জাতি' সৃষ্টি হয়, গবেষণার এই নূতন পন্থা সোভিয়েট নর-তাত্ত্বিকেরা উদ্ভব করিয়াছেন।

আবার, উপরোক্ত বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য অধ্যাপক স্ট্রুভে ককেসস এবং এসিয়ার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কৃত দ্রব্যসমূহের পরীক্ষা দ্বারা তথাকথিত "আর্য" এবং "আর্য" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তিনি নাৎসী জার্মাণদের আর্যত্বের দাবী বিষয়ে বলেনঃ

"Historical facts show that all these claims of the Fascist pseudo-scientists are an invention from beginning to end"

তৎপর, তিনি বলিতেছেনঃ

"This exposes the German fascist fabrication that the Aryans are a northern, or as the fascists put it, a "nordic race". The Aryans originate not in the north but in the south, more precisely in the southern part of the Caucasus. Also incorrect in the light of the latest scientific data, Academician Struve pointed out, is the claim made by the fascist falsifiers of history that the ancient Aryans were an Indo-European tribe ...... How did it happen that the name "Aryans" began to be applied to certain Indo-European tribes and how was German fascism able to concoct the fable about the "Aryan" race of masters, representing to-day by the Germans? The answer is very simple. History knows of a similar example when all of Greece came to be called after the small tribe of Hellenes. For the same reason ancient historians later began to call several Indo-European peoples neighbouring the tribes of Aryans by their name...... The fascists have been able for so long to keep up the hook of their 'Aryan' blood although the origin of the modern Germans in general has nothing to do with the ancient Aryans, only because we did not possess until recently sufficient facts about the latter, and their place in history ("Moscow News", May 28, '43.)

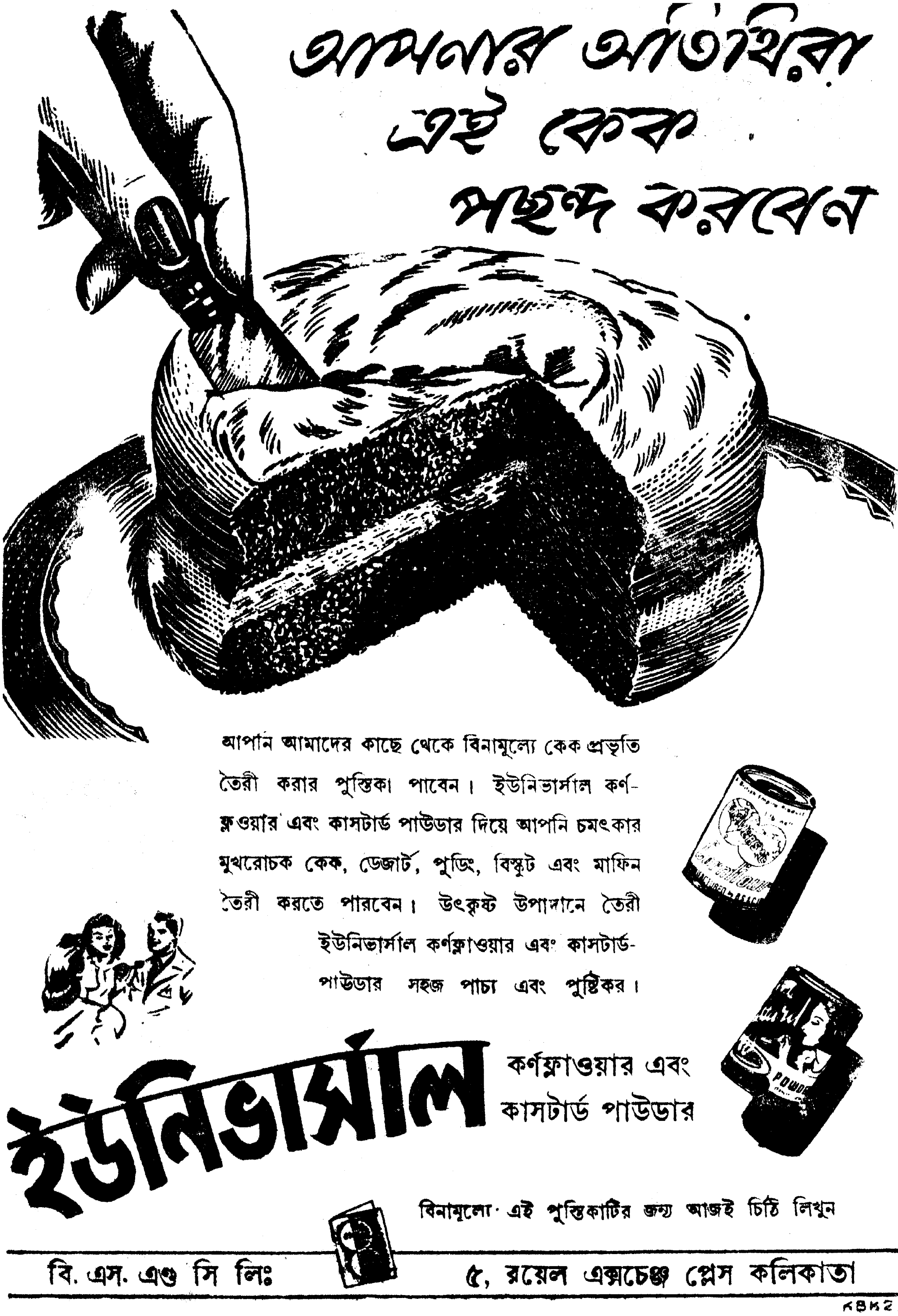
ইহার অর্থ, আকাডেমীসিয়ান স্টুভে বলিতেছেন, পূর্বোক্ত এসিয়া মাইনার প্রাচীন মিটানী জাতি সংশ্লিষ্ট ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের নামের সহিত সংযুক্ত সংস্কৃত ভাষার ন্যায় একটা ভাষা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহা জার্মাণ পণ্ডিত হুসিংএর মতে নর্ডিকদের ভারতের পথে যাইবার একটা আড্ডা মাত্র ছিল ("The dynasts were Indians, but Indians on their way to India"—'Voelkerschichten in

alten Iran' p. 210) তাহা দক্ষিণ ককেসস পর্বতমালার জয়যোতিক ভাষাযুক্ত। এই জাতি নিজেকে "আর্য" বলিত এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ 'আর-মেনিয়া', আর-মাভির, আরা-রাট প্রভৃতি নাম 'আর' মূল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আর, চতুপার্শ্বের ইন্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলি ক্রমে বিদেশী ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। ফাসিস্টেরা এতদিন ধরিয়া নিজেদের আর্য বলিয়া দাবি করিতেছিল যদিচ বর্তমানের জার্মাণদের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা এতদিন এই বিষয়ে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাই নাই বলিয়াই জার্মাণেরা এই ধাপ্পাবাজী করিতে পারিয়াছিল। এই স্থলে স্ট্রুভের যে অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আর্য শব্দের ভারতীয় উৎপত্তির দাবীকথা বিবেচিত হয় নাই। তিনি বলেন, প্রতিবেশী মিড ও পারসীকেরা এই আর্য নাম ধার করিয়া নেয়। অবশ্য ইহাও এইস্থলে স্বীকার্য যে অনেক জার্মাণ পণ্ডিত আছেন যাঁহারা উত্তর-ইউরোপের নর্ডিকদের আদিম অধিবাসী বলেন এবং আর্যভাষা বাহির হইতে তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। Feist—"Germanen und Indo-Germanen দ্রষ্টব্য) বলিয়া স্বীকার করেন। আবার বিশিষ্ট নরতাত্ত্বিকেরাও এই কথা বলেন (Sergi, Paudler প্রভৃতি)। কিন্তু অন্যদিকে নর্ডিকদের আদিমত্ব স্বীকার করিয়া হিসার প্রভৃতি আর্য ও নর্ডিককে এক করিতে চান। কিন্তু বেশীর ভাগ জাতিতাত্ত্বিকেরা আদিম আর্যভাষীদের হয় এসিয়া মাইনর না হয় মধ্য-এসিয়া-উদ্ভূত বলেন: (Keppers—"Die Indo-Germanische Frage in Anthropos Bk. 30, 35 দ্রষ্টব্য)

এতদ্ব্যতীত, সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মধ্য এসিয়ার নানাস্থানের ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষসমূহ আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার মধ্যে বিগত বৎসরের আবিষ্কারটি অতি মহার্ঘ। ফারখাড়ের ভূগর্ভ হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার তলায় আর একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা খৃঃ পূঃ ২-৩ হাজার বৎসরের আনাউ সহরের (আস্থাবাদের নিকট) সভ্যতার অনুরূপ (I. Mikhailov in "Soviet Union News" Vol. III No. 7)। আমেরিকার ডাঃ পাম্পেলী কার্ণেজীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আনাউতে একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পান। ইহাতে যেসব নর-করোটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা সার্জির মতে ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত, হাঁড়িতে (urn) পোরা কচি ছেলের শব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Carnegie publications No 73) এবম্প্রকারে সমাহিত শিশুর শব ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন দেশসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে; আর হিন্দুদের আজ পর্যন্ত শিশুর শব এই প্রকারেই সমাহিত করা হয়। এই প্রকারের হাঁড়ি সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আনাউ সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা গবেষণার বস্তু। পুনঃ সোভিয়েট পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, প্রাচীন ইরাণের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার রচনার সময় যাহা প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদেরা স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও প্রাচীন। এতদ্দ্বারা বেদের বয়সও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক, নরতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা প্রাচ্যের ইতিহাসের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এতদ্দ্বারা ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতে বাধ্য। ভবিষ্যতে ভারত তত্ত্বকে (Indology) সোভিয়েট আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে হইবে। তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের ভারতীয় তাঁবেদারেরা যাহারা ভারতের কৃষ্টির বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাদের মুখোস খুলিয়া পড়িতে বাধ্য। সোভিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রাচ্য দেশসমূহের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইতেছে এবং প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয়, ইরাণী প্রভৃতি সাহিত্য ভাষান্তরিত হইতেছে। এমন দিন আসিতেছে যখন ভারতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সোভিয়েট রুষে গিয়া বিজ্ঞান ও প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্যই সোভিয়েট বিজ্ঞান সাম্রাজ্যবাদীয় মত বিরহিত হইয়া প্রাচ্যের ও ভারততত্ত্ব বিষয়ে কি গবেষণা করিতেছে, কি তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিতেছে, তাহা অবগত হইয়া ভারতের কৃষ্টির যথার্থ ইতিহাস বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

তৎপর আছে সোভিয়েটের ফলিত বিজ্ঞানের কথা। আজকাল এদেশের শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করিতেছেন যে, সোভিয়েটের অদম্য উৎসাহের ও অফুরন্ত শক্তির পশ্চাতে আছে লেনিন-ষ্টালিন প্রবর্তিত Socialist Oroganized Planning। তথায় সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমবায় কৃষি (Kolhoz) প্রভৃতি দ্বারা রুষ আজ স্বীয় সঞ্চিত শক্তিদ্বারা শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। তথায় উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিষ্ট যথেচ্ছাচার নাই। ইঞ্জিনিয়ারীং ক্ষেত্রে অভিনব উপায়সমূহ গৃহীত হইতেছে। সভ্য জীবনের সর্ব বিভাগেই সংঘবদ্ধভাবে পরিকল্পনা দ্বারা কার্য সম্পাদন করা হইতেছে। এইজন্যই আজ এদেশের অনেক Technical ইঞ্জিনিয়ার এবং Industrialist সোভিয়েট organized planning-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আজ কোন ভারতবাসী যদি বলেন সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অকৃতকার্য হইয়াছে, যদি বলেন Kolhoz কৃষককে গোলামি প্রথায় প্রত্যাবর্তন করায় তাহা হইলে তিনি হয় অজ্ঞ না হয় ছলান্বেষী ব্যক্তি।

সোভিয়েটের সাফল্য দেখিয়া জগতের সকলেই মোহিত হইয়াছেন। সোভিয়েটের সোসালিষ্ট পরিকল্পনা কি তাহা জানিবার জন্য এদেশের নিরপেক্ষ লোকের কুতূহল হইয়াছে। সোভিয়েট কৃষ্টির গতি দেখিয়া আমাদের ধারণা সোভিয়েট বিজ্ঞান ভবিষ্যতে ভারতে প্রভাব বিস্তার করিবে, আর তাহা হইতে আমরা কি উপকার লাভ করিব তাহা এদেশের মনীষীদের অনুসন্ধানের বস্তু।


আপনার অতিথিরা এই কেক পছন্দ করবেন
আপনি আমাদের কাছে থেকে বিনামূল্যে কেক প্রভৃতি তৈরী করার পুস্তিকা পাবেন। ইউনিভার্সাল কর্ণ-ফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড পাউডার দিয়ে আপনি চমৎকার মুখরোচক কেক, ডেজার্ট, পুডিং, বিস্কুট এবং মাফিন তৈরী করতে পারবেন। উৎকৃষ্ট উপাদানে তৈরী ইউনিভার্সাল কর্ণফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড-পাউডার সহজ পাচ্য এবং পুষ্টিকর।
ইউনিভার্সাল
কর্ণফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড পাউডার
বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য আজই চিঠি লিখুন
বি. এস. এণ্ড সি লিঃ
৫, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

নিখিল বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, ...স!"—করিয়া শব্দ করিতে যাইবে, রতু ...হাকে সন্তর্পণে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত ...নিয়া লইল, বলিল—"ঘাড়ে পড়বেন নাকি?"

অতুল ঘুষি বাগাইয়া শুনিতেছিল, ...লিল—"তাকে ফলো করা দরকার তো!"

মোটা বঙ্কু একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি ...রবে নাকি ফলো?"

অনেকক্ষণ হইতে ইসারা-টিপ্পনি চলি-...তেছে, এবার শরীর এবং শক্তি লইয়া যুবতীর ...সামনে স্পষ্ট বিদ্রূপ, অতুল চটিয়া গেল, ...বলিল—"না, উনি ষণ্ডা-গুণ্ডার কথা বলছেন, ...ওর পেছনে ষণ্ডা-গুণ্ডা গোছেরই একজনকে পাঠান দরকার।"

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই যুবতীর দৃষ্টি একবার মোটা বঙ্কুর উপর গিয়া পড়িল, বঙ্কুর কাণ দুইটা হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার অতুলের পানে আড়ে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই যুবতী মিনতির স্বরে অতুলকে বলিল—"না তাকে ধরবার চেষ্টা করে আর চেঁচামেচি করবেন না; একটা গোলমাল হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়, পুলিস-কেস হ'লে আরও খারাপ।......আপনারা যাবেন কোন্ দিকে? অন্ততঃ ট্রাম-ষ্টপ পর্যন্ত যদি আমায় পৌঁছে দেন......"

রতু বলিল—"আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন......"

ওর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিখিল সেটাকে সম্পূর্ণ করিল—"আমরা কোথায় যাই সে তো পরের কথা, আগে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে......"

যুবতী অতুলকেই বলিতেছিল, উত্তরটা অতুলেরই দিবার কথা; ইহারা ওপর-পড়া হইয়া দিয়া ফেলায় নিখিলের পানে চাহিয়া বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিল—"ট্রাম ষ্টপ পর্যন্ত পৌঁছেই সটকান দেবেন?—বাঃ দিব্যি!......"

নিখিল একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করিল—"তাই বললাম?"

মোটা-বঙ্কুও সুযোগটা ছাড়িল না, অতুলের পানে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"তাই বললেন উনি?—পারেন কখনও বলতে? এই বুদ্ধি নিয়ে......"

রতু বলিল—"থামো তোমরা, উনি বিপদে পড়েছেন, আর এই সময় বুদ্ধি নিয়ে......"

যুবতীকে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ, আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন, ট্রামষ্টপ কেন, আগে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে আমরা নিজেদের গন্তব্যের কথা ভাবব।"

রমেন একটু গলাখাঁকারি দিল, মেয়ে দেখায় দেরি হইয়া যাওয়ার কথা বলিবে বুঝিয়া—রতু তাহাকে বাঁ হাতে একটু টিপিয়া মানা করিয়া দিল। যুবতী বলিল—"আমি যাব তিয়াত্তর নম্বর হরু বোসের গলিতে, গ্রে ষ্ট্রীটের ট্রাম থেকে নেমে......"

"হরু বোসের গলি!!"—সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রতু বলিল—"হরু বোসের গলি? বাঃ, আমরাও তো ঐ দিকেই যাচ্ছি...... আমাদের নম্বরটা কত হে রমেন?"

রমেন, নিখিল এবং অতুল এক সঙ্গে উত্তর করিল "তেরো।"

"বাঃ, তবে তো কোন কথাই নেই; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে......"

বঙ্কু প্রশ্ন করিল "আগে তিয়াত্তরটা পড়বে কি আগে তেরোটা?—যদি তিয়াত্তরটা পড়ে তো......"

অতুল বুদ্ধির সম্বন্ধে খোঁচা খাইয়া—মুখাইয়া ছিল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিল—"না, তিয়াত্তর তো চিরকালই তেরোর আগে, ধারাপাতে মুখস্থ করেন নি?......"

বঙ্কু উত্তর দিবার আগেই যুবতী বলিল—"না, উনি মীন্ করছেন, এটা যদি গলির উল্টো দিক হয়তো বড় নম্বরগুলোই আগে পড়বে কিনা। তার ব্যাপারও তাই, এই দিকটাই শেষ দিক গলির।"

অতুল কথাটা বলিয়াই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছিল, একটা ঘোট গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"তাহলে চল রতু, আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছে গুলতান কর। কেন?"

যুবতীকে মাঝে রাখিয়া এবং একেবারেই পাশে থাকিবার জন্য একরকম ঠেলাঠেলি করিতে করিতেই সকলে অগ্রসর হইল।

(৩)

বঙ্কু বলিল—"একটা রিকশা ধরে নিয়ে আসব না হয়?"

"সে আর জিগ্যেস করতে আছে?...... দু'মিনিট—এক্ষুণি নিয়ে আসছি এই মোড় থেকে"—বলিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি পা বাড়াইতেই যুবতী ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"না, না, এটুকু যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না, অভ্যেস আছে হাঁটা......"

এক রমেনের মাথায়ই উপকারের নেশা ঢোকে নাই, বরং সমস্ত ব্যাপারটি সে একটা দৈব উপদ্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"তা ভিন্ন ওঁর দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে? রিকশা আনতে-করতে......"

রতুর দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিল—"ওদিকে আমাদেরও......"

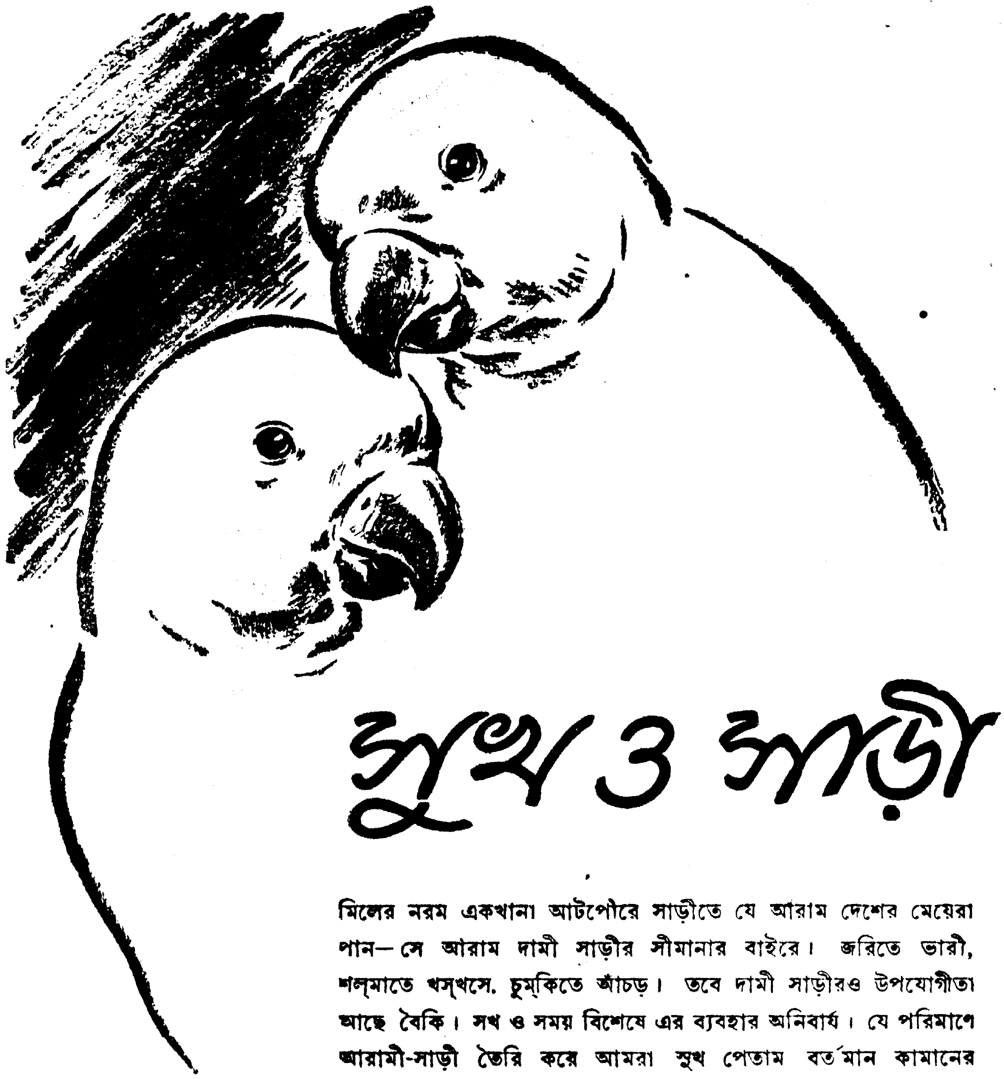
রতু চোখের ইসারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

নিখিল বলিল—"ওঁকে কিন্তু ভালো করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাওয়া দরকার, কে জানে কার কি রকম অভিসন্ধি আছে। আসেপাশে কেউ ওৎ পেতে আছে কিনা......"

আগলানোর মধ্যে কোন খুঁত ছিলই না, তাহার উপর আরও ভালো করিয়া আগলাইবার জন্য যে একটু ঠেলাঠেলি হইল তাহাতে কতকটা ভারসাম্য হারাইয়া অতুল যুবতীর প্রায় ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছিল, মোটা-বঙ্কু বেশ কড়া হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া—পিছনে টানিয়া লইল, ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতই



বঙ্কু বেশ কড়াহাতে তাহাকে পিছনে টানিয়া লইল



ক বা যাই হোক, একটা ঝাঁকানি লাগিল ফুলের। ওঁরা তিনজনে একটু আগাইয়া ড়ল।

অতুল রুখিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল "এর মানে?"

বঙ্কু বলিল—"ঘাড়ে ড়বে নাকি ভদ্র-হিলার?"

টের না পাইয়া হারা আরও একটু আগাইয়া গেছে। অতুল সইরূপ উগ্রভাবেই বলিল—"আলবৎ পড়ব, তোমার কি?—হোয়াট ইজ দ্যাট টু ইউ?"

এত রোগা লোকের মুখে এতটা বেপরোয়া উত্তর বঙ্কু আশা করে নাই, একটু থতমত খাইয়াই মুখের পানে চাহিয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, রমেন ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"ওকি, তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে, দেরি হয়ে যায় যে!"

যুবতী, নিখিল এবং রতুও ফিরিয়া তাকাইল, যুবতী দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভীত-ভাবে বলিল—"কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?"



তাহার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে মরণ-বাঁধনে জড়াইয়া ধরিল

অতুল বঙ্কুর পানে একটা কটাক্ষ হানিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল—না, বঙ্কুর চোখে একটা কি পোকা পড়ল, ভাই......"

বঙ্কু দাঁতে দাঁত পিষিয়া চাপা গলায় বলিল—"যে বলে তার চোখেই পোকা পড়ুক।"

তাড়াতাড়ি আসিয়া যখন নিজের নিজের জায়গা লইল চাপা আক্রোশে তখন দুই জনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গলি বহিয়া সকলে বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রমেনের মনটা অন্য দিকে, বাকি সবাইয়ের মধ্যে একটু উপকার করিবার জন্য, একটু কথা কহিবার জন্য, একটা কথার একটু উত্তর দিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। বদ্রূপগুলা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া উঠিতেছে, চাহনি আরও উৎকট। বিশেষ করিয়া নিখিল, অতুল আর মোটা বঙ্কুর মধ্যে। রতু অনেকটা সংযত, একটু কাণ্ডজ্ঞানও আছে; যখন খুব বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িবার মতো হইতেছে, দু'একটি কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে। ....কেমন হাসিতে হাসিতে সবাই একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল, এখন কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধটা ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। যুবতী একবার এর সঙ্গে একটু কথা কহিয়া, কি ওর দিকে একটু মিষ্ট, লজ্জিত দৃষ্টিপাত করিয়া, কি তাকে একটু সমর্থন করিয়া বিষটাকে যেন মাঝে মাঝে আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

শুধু উপকার আর কথা কওয়া লইয়াই নয়; যাহার যাহা লইয়া পরিচয় সে সেইটাকেই বড় করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াতেও গোলমাল, কথাকাটাকাটির সৃষ্টি হইতেছে।... নিখিল কলেজের কথা তুলিবার চেষ্টা করিল কয়েকবার, কলেজ ম্যাগাজিনে একটা পদ্য দিবার জন্য এডিটার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে—সে-কথাটাও। মোটা-বঙ্কু কলেজ বা কবিতার ধার ধারে না বিশেষ, রমেনের বাল্যবন্ধু, পাড়ার থিয়েটার—জিমনেসিয়ামের পাণ্ডা, সেই হিসাবে চলিয়াছে, কবিতার কথায় বলিল—"ওসব রাবিশ কবিতা-টবিতা এখন ধামাচাপা দিন মশাই, এখন দেশ চায় সোলজার—নার্ভ—সিনিউ মাসল"

নিজের দক্ষিণ হাতটা মুঠা করিয়া বাঁকাইয়া ধরিল।

কথাবার্তায় যুবতীর একটু পরিচয়ও পাওয়া গেছে, প্রশ্ন করিল—"মিস্ সেন কি বলেন?"

মিস্ সেন একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিল—"আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে আমায় জিগোস করাই বাহুল্য নয় কি?"

বিশেষ এমন হাসির কথা না হইলেও সবাই হাসিয়া উঠিল,—অবশ্য নিখিল ছাড়া।

অভ্যাসবশেই ডান হাতটা একটু শক্ত করিয়া বাঁকাইয়া বঙ্কু বলিল,—"একদিন আসুন না আমাদের জিমনেসিয়ামে আমাদের কাপ, মেডেল সব আপনাকে দেখাই। সেদিন ডক্টর মুখার্জি এসেছিলেন, সব দেখে-শুনে..."

অতুল হিংসায় একেবারে জ্বলিয়া খিঁচাইয়া বলিল—"আরে যাইতেছিল, একটু রেখে দাও তোমার জিমনেসিয়াম,—গুণ্ডামির আড্ডা একটা; সেবারে হাতীবাগানে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে আমার ও জিনিসটার ওপরই বিতেষ্টা ধরে গেছে..."

বঙ্কু দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা বড় করিয়া গলাটা বাড়াইয়া বলিল—"তোমার বিতেষ্টা ধরে গেছে!—এতবড় একজন এ্যাথলেট মিষ্টার পাম লীফ সিপয়?—আমি কালই গিয়ে তুলে দোব জিম্‌নেসিয়ামটা......"

অতুল আর বঙ্কুকে কিছু বলিল না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রমেনের পানে চাহিয়া বলিল—"রমেন, আমি এখান থেকেই ফিরলাম ভাই, দুঃখ করো না, এমন একজন অভদ্র যে- কম্প্যানিতে......"

বঙ্কু বাঁকিয়া দাঁড়াইল, গর্জন করিয়াই বলিল—"অভদ্র!!"

রতু দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া এ-ঝোঁকটাও সামলাইয়া লইল। আর ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা জানিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"মিস সেন কতটা দুঃখিত হচ্ছেন ভাবো দিকিন!!"

(৪)

দুঃখিতই হইয়াছে মিস সেন, একটু নিরাশও; একটা সুযোগ নষ্ট হইলে কে না হয়?—তবে সে-ভাবটা চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"না, না, এতে আর দুঃখের কি আছে? নিজের নিজের ব্যক্তিগত অভিমত......"

বঙ্কু আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, শরীরটাকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিল—"ব্যক্তিগত অভিমত! অভদ্র বললে সমস্ত কম্পানিটাকেই অভদ্র বলা হোল না? অথচ আপনি—একজন ভদ্রমহিলা সেই কম্পানিতে......"

অতুল আবার রুখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"খবরদার ওঁকে এর মধ্যে টানবে না বঙ্কু, লেডিদের আমি কতটা সম্ভ্রম করি তুমি জান না......"

রতু আবার অগ্রসর হইয়া আসিল, দুই-জনকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—"আঃ, থামো না ভাই; বেশ তো, সম্ভ্রম করো তো অমন করে আস্তিন গুটোচ্ছ কেন?......"

রমেনের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে; বিরক্ত এবং অধীরভাবে নাকটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, বলিল—"তার চেয়ে আমি বলি, অতুল যেমন যেতে চাইছিল ওকে যেতেই দাও না......"

অতুলের ভাব একেবারে বদলাইয়া গেল,—অভিমানে মুখটা গম্ভীর করিয়া রমেনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"তুমি এই কথা বললে রমেন?—তুমি—ইউ!"

রমেন থতমত খাইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, না, তুমি নিজে বললে, তাই......"

"বললে তো এই কথা?—নিজে ইন্‌ভাইট্ করে?"

"না না; মানে এদিকে এঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে......"

"মনে রেখো, আমার আর দোষ রইল না,—নিজেই ডেকে নিজেই তাড়ালে......"

"না, না, আমায় ভুল বুঝ না অতুল, এঁরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও একজন মেয়েছেলে কন্‌সারণ্ড্—তাই..."

"মাইণ্ড্, তোমার কাজেই যাচ্ছিলাম গুড্ বাই......"

মনে হইল যেন গলাটাও একটু ধরিয়া গেছে। ঘুরিয়া মাথার উপর হাতটা তুলিয়া আবার দুইবার "গুডবাই, গুডবাই" বলিয়া উল্টাদিকে পা বাড়াইতেই রতু ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"কি ছেলেমানষী হচ্ছে অতুল—মিস সেনের সামনে?..."

যেমন হয়, অভিমানটা বাড়িয়াই গেল। "তবে তুমি অতুল মিত্তিরকে চেন না ভাই।"—বলিয়া একটা ঝাকুনি দিয়াই হাতটা ছাড়াইয়া অতুল অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সকলে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর রতু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমাদের মার্জনা করবেন, মিস সেন।"

এবারেও মিস সেন একটু মিষ্ট হাসিয়াই বলিল,—"ওমা কি! এতে মার্জনার কি আছে? নিজের নিজের অভিরুচি..."

দলটা আবার অগ্রসর হইল।

গলি অপেক্ষা সদর রাস্তায় লোক চলাচল বেশি, অন্ধকার তো আছেই; এদিকে চার-জনেরই এমন করিয়া আগলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা যাহাতে মিস্ সেনের গায়ে অন্য কাহারও গাটি না লাগে। ব্ল্যাক আউটের রাস্তায় লোকে একটু ব্যস্ত বিব্রত হইয়াই চলে, কয়েকজনের সঙ্গে ছোটখাট একটু সংঘর্ষও হইয়া গেল। বেশি নয়, কথাকাটি পর্যন্তই, কেননা মোটা বঙ্কু সব ক্ষেত্রেই আগাইয়া দাঁড়াইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটা বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, তবু বিলম্ব হইতে লাগিল।

হয়ত নিখিলই শুরু করিল—"চোখ নেই মশাই? দেখছেন একজন মেয়েছেলে যাচ্ছেন.."

"যান না উনি, আমি তো তফাতে আছি।"

"যান না উনি মানে? আমি এগিয়ে না এলে আপনি তো ঘাড়ে পড়ছিলেন ওঁর।"

"ঘাড়ে পড়ব—পাগল না খ্যাপা?

"উলটে আমাকেই পাগল না খ্যাপা বলছেন?"

কি অন্যায়টা বলেছি? নাহক্ যেমন গায়ে প'ড়ে ঝগড়ার জোগাড়..."

নিজের দর বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মোটা বঙ্কু অন্ধকারে একটু আড়ালে থাকে, এই রকম মোক্ষম সময়টিতে আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বলিল—

"কি ঝগড়ার জোগাড়ের কথা হচ্ছে যেন? "আমি একটু শুনতে পাই?"

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। বলিল, "না, বলছিলাম—সন্দে রাতে যদি এতটা বেহুঁস হই যে একজন ভদ্রমহিলার ঘাড়ে পড়ি তো পাগল ভিন্ন কি বলবে লোকে আমায়?"...এই কথাই বলছিলাম ওকে।"

একটু হাসিবার চেষ্টাও করায় আর গোলমাল বাড়িল না।

কিন্তু অন্যদিকে গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। নিখিল ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। একবার সামান্য উপলক্ষ্যেই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল উত্তাপটা। নিখিল বলিল—"আঃ, এবার আপনিই যে ঘাড়ে এসে পড়বেন মশাই!"

বঙ্কু প্রশ্ন করিল, "কার?"

"আমার, আবার কার?"

"সরে দাঁড়ান আপনি, একটু গায়ে গা ঠেকলেই যদি মনে করেন ঘাড়ে পড়ছি তো..."

"সরে দাঁড়ান মানে? সবাইকে কি অতুল-বাবু পেয়েছেন নাকি? আমার ঘাড়ে একটা কর্তব্যের বোঝা আছে, যতক্ষণ না সে বোঝা নামছে ততক্ষণ নিখিল গাঙ্গুলী নিজের পোস্ট ছাড়বে না জানবেন। এই তার প্রিনসিপল্—এর জন্যে সে আত্মবলি দিতেও প্রস্তুত, আমি অতুলবাবুর মতন..."

বঙ্কু ঠোঁট কুঁচকাইয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে শুনিতেছিল, বলিল "শুধু ফাঁকা ভাষায় জোরে যদি এ-সব ডিউটি সারা যেত..."

নিখিল দাঁড়াইয়া পড়িল, অল্প পরিসর বুকটা চিতাইয়া বলিল—"অন্য রকম শক্তিরও অভাব নেই, যদি মনে করেন গুণ্ডাদের মতন আখড়ার মাটি মাখলেই..."

বঙ্কু একেবারে ঘুসি বাগাইয়া দাঁড়াইল, হুঙ্কার করিয়াই বলিল—"আর একবার বলুন তো ও-কথাটা..."

রতু, রমেন দুইজনেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের চলাচল বেশি, বেশ কয়েকজন



তুই কে? অতুল না নিখিল?

ঘিরিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসাবাদ, মন্তব্য প্রতিশ্রী;—বেশ খানিকটা গোলমালের পর যখন সবাই সরিয়া গেল, দেখা গেল অতুল আবার কখন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল—"আমায় ডাকছিলে তোমরা কেউ?

সকলেই অসময়ে যেন ভূত দেখিয়াছে এইভাবে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রমেন, রতু, নিখিল একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"তুমি! চলে গিয়েছিলে যে, আবার..."

অতুল একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, ইয়ে যাচ্ছিলাম—যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে যেন দুবার 'অতুল, অতুল' বলে ডাকলে—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবলাম, তারপর কোন বিপদ হয়েছে মনে করে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে আসছি..."

ঊর্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসার মত হাঁপাইতেছে না মনে পড়িয়া যাওয়ায় তখনই সেটা আরম্ভ করিয়া দিল। মিস সেন একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইল যেন "খুক্‌-খুক্‌" করিয়া দুইবার চাপা হাসির শব্দ হইল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জোর কাশির শব্দ আরম্ভ হওয়ায় সে সন্দেহটা আর বাড়িবার অবসর রহিল না।

কিন্তু গোলমালটা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একে নিখিলই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প'র অতুল গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল—চাপা রাগে মোটা বঙ্কু ফোঁস ফোঁস করিতেছিল, মনের ভাবটা আর চাপিতে পারিল না, বলিল—"বঙ্কার একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে বদনাম আছেই—পেটের কথা চেপে রাখতে পারে না,—তুমি যদি সত্যিই চলে যেতে অতুল তো এতক্ষণ বোধ হয় মাইল খানেক তফাতে থাকতে—নিখিলবাবু বার দুয়েক তোমার নাম করেছেন কি না করেছেন অতদূরে তার আওয়াজটা..."

অতুল গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল—"যাই নি তো আমি চলে—গোঁয়ার-গোবিন্দের হাতে ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে..."

মাথায় যে আগুনটা ধোঁয়াইতেছিল, একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—বঙ্কু হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"জিব টেনে বের করে নোব!"

একেবারে মাথার উপর ঘুসি তুলিয়া ধরিল। এবারে আর রতু, রমেন আসিয়া পড়িতে পারিল না; তাহার আগেই "কি করছেন, কি করছেন, ছিঃ!"—বলিয়া বারণ করিবার অছিলাতেই নিখিল মাঝখানে পড়িয়া বঙ্কুর বুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে প্রায় পড়-পড় হইয়াই নেহাৎ জিমন্যাস্টিকের জোরে কোন মতে সামলাইয়া লইল। তাহার পরই সামনে একটা লম্ফ দিয়া দুইজনকে এক সাপটে তাহার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে মরণ-বাঁধনে জড়াইয়া ধরিল।

হাত পা চালানর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ভয়টা লাগিয়া থাকে বলিয়া কলিকাতার রাস্তার

মারামারি স্থায়ী হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই যে যার কাজ ভালভাবেই সারিয়া লয়। ...ওইটুকুর মধ্যেই জায়গাটায় ভিড় জমিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারও হইয়া গেল। রহিল মাত্র দুইজন, তাহার মধ্যে একজন রমেন। তাহার সঙ্গী বসিয়া পড়িয়া দু' হাতে মুখটা চাপিয়া গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল, রমেন বলিল—"ওঠ্, পুলিস এসে পড়বে এক্ষুনি—ওদিকেও দেরি হয়ে গেল।—তুই কে?—অতুল, না, নিখিল?—সে ছুঁড়িটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না; কোথা থেকে কালসাপিনী এসে জুটল এক..."

পরদিন সন্ধ্যার পর সেই বকুল শাখার আড়ালে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। মলিনার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়া সুকুমার বলিল—"এই নাও তোমার শাড়ি, ব্লাউস আর ভ্যানিটি ব্যাগ; আর এই ছাতা... ক'জন এসেছিল দেখতে ?"

মলিনা চাপা গলায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, এবার যেদিন থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করবে তোমায় মেডেল দোব আমি।...এসেছিল দু'জন; আহা সে যদি অবস্থা দেখতে! একজন লজ্জায় তো মুখ তুলতেই পারলে না; অতদূর থেকে এসে দুটি প্রশ্ন—"কি নাম, আর কি পড়; যেন কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে, আর একজন বাঁ হাতে গালটা চেপে মাঝে মাঝে শুধু গ্যাঙিয়েই কাটিয়ে দিলে। হ্যাঁগা, মার খাওয়ালে কি করে? আহা..."

হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

সুকুমার বলিল—"ঐতেই হেসে সারা হচ্ছ, সব ইতিহাসটা শুনলে তো পাড়ার লোক জড় করে ফেলবে।"

মলিনা জিদ ধরিয়া বসিল—"না, শুনতে হবেই আমায়।"

একটু কি ভাবিয়া বলিল—"এক কাজ করো, ; খুড়িমা-টুড়িমা সবার সামনেই কর গল্পটা, তুমিই মেয়ে সেজেছিলে আর আমায় দেখার কথা বাদ দিয়ে...হ্যাঁ, তাই করো..."

"পাগল হয়েছ? এত তাড়াতাড়ি করা চলে এ গল্প? একজন আব্যর এসে গ্যাঙাচ্ছিল বলছ......তবে বলব'খন একদিন—শীগ্গিরই ......শুধু খুড়িমা থাকবেন না......"

"কবে ?"

সুকুমার স্মিত-দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল মলিনার পানে, বলিল—"বিয়ে হয়ে গেলে একদিন।"

মলিনা একটি চটুল হাসিতে ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল—"তবে তো খুবই শীগ্গির!—বসে থাক সে আশায়—অন্ততঃ দশটা জায়গা থেকে দেখে না গেলে আমি রাজিই হব না, দেখো; খান দশেক নমুনা আমি দেখব এখনও......মিলিয়ে নিয়ো......"

হাসি চাপিবার জন্য আবার আঁচল মুখে গুঁজিয়া দিল।

নীচে বাড়ীর ও-কোণ হইতে খুড়িমার গলা শোনা গেল—"মলু, সাবান, তোয়ালে এখানে ফেলে রেখেই যে গা ধুতে চলে গেলি? কি ভুলো মন বাপু মেয়ের!......"

ততঃ কিম্?

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

যুদ্ধের মোড় ফিরিয়াছে। যে বিরাট দানবের ছায়ায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া নিদারুণ আশঙ্কা ও আশার ক্ষীণতম আলোকরেখার জন্য আকুল প্রতীক্ষা ও উদ্বেগে অধীর হইয়াছিল, সে আজ আহত। আজ আশা করিবার হেতু হইয়াছে যে হয়তো তার বক্ষে শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, তার পতন সুনিশ্চিত।

মোড় ফিরিলেও যুদ্ধের সমাপ্তি একেবারে আসন্ন, এ আশা এখনও করা যায় না। হয়তো এখনো সময় লাগিবে। তার পর কি হইবে? এই কথা লইয়া আজ চিন্তা ও গবেষণার অন্ত নাই। সেই সমস্যা লইয়া পৃথিবীর ধুরন্ধরগণের ব্যক্তিগত মতামত বিস্তর শোনা যাইতেছে, কনফারেন্সের পর কনফারেন্স বসিতেছে। মতামতের বৈচিত্র্যের আর অবধি নাই। ইহা শুধু স্বাভাবিক নয়, ইহা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু এই সব মতামতের ভিতর আজ যে সব সুর প্রধান হইয়া বাজিতেছে, তাতে দুশ্চিন্তার অবসর আছে।

পরিশ্রান্ত পৃথিবী আজ কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি। যুদ্ধের পর আসিবে চিরশান্তির যুগ, হইবে সর্বজাতির সুখ ও সমৃদ্ধি, এই আশা লইয়া অনেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রশ্ন এই যে, তাহা হইবে কি?

যুদ্ধোত্তর জগতের সমস্যাগুলি তিন দিক হইতে বিবেচনা করা যায়—রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া আমি রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কথাই আলোচনা করিব।

যুদ্ধোত্তর রাজনীতি।

যুদ্ধের আরম্ভে যেসব কথা হইয়াছিল তাতে বলা হইয়াছিল, এ যুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ কোনও রাজ্যের দেশগত অধিকার প্রসারের কামনা করেন না। ইউরোপে—ইঁহারা ইউরোপের কথাই বরাবর ভাবিয়া থাকেন—প্রত্যেক ছোট বা বড় রাষ্ট্রের নিজ নিজ ভৌগোলিক সংস্থান বহাল থাকিবে, কেহ কাহারও দেশ কাড়িয়া লইবে না, ইহাই ছিল মিত্রপক্ষের নায়কদের প্রতিশ্রুতি এবং জার্মাণীর প্রতি ইঁহাদের প্রধান অভিযোগ ইহাই ছিল যে, জার্মাণী বাহুবলে পররাষ্ট্র গ্রাস করিয়া দস্যুবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে এবং ইউরোপে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া শক্তিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। এই দস্যুবৃত্তি ও এই গণতন্ত্র-বিরোধিতার বিরুদ্ধেই ইংলণ্ড ফ্রান্স করিয়াছিলেন অভিযান।

অবশ্য যে পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সে রাজ্য গণতান্ত্রিক কখনও ছিল না এবং সে স্বয়ং এক বৎসর পূর্বে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূমি গ্রাস করিয়াছিল জার্মাণীর সঙ্গে মিতালি করিয়া। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ও হৃতসর্বস্ব চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বনাশে ইঁহারা শুধু তোষণ-প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুই করেন নাই। তবু যুদ্ধটা প্রথমে হইয়াছিল দস্যুবৃত্তির দ্বারা পররাষ্ট্র অপহরণের বিরুদ্ধেই এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সত্যসত্যই তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে গণতন্ত্রের অবসান শঙ্কায়ই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমে একটির পর একটি গণতান্ত্রিক ছোট রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া মিত্রপক্ষের আশ্রয়ে আসিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে সংগ্রামটা দাঁড়াইল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমবায়ের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত শক্তির।

তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা আসিয়া দলে ভিড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সুস্পষ্টভাবে লেখা হইয়া গেল আটলাণ্টিক সনন্দে।

আজ সেই রাজনৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে কি? আশঙ্কা হয় যে, অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও বুঝি-বা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

একটা মোটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যুদ্ধটা ছিল মিলিত শক্তিবৃন্দের United Nationsএর—তার ভিতর ছিলেন সবাই, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি। তাঁদের সম্মিলিত বৈঠকে সব কথার আলোচনা হইত।—এখন আর সে কথা বড় শোনা যায় না। এখন বৈঠকে বসেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও মাঝে মাঝে চীন। শুধু সংগ্রাম পরিচালনা নয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধানও করেন তাঁরাই। আর সকলকে মাঝে মাঝে ডাকা হয়, কেবল এই ত্রিশক্তি চতুঃশক্তির সিদ্ধান্তে সহায়তা করিবার জন্য।

তার পর কথা শোনা যায় যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার ভার লইতে হইবে এই ত্রিশক্তি বা চতুঃশক্তির নির্দেশচালিত সৈন্য-সামন্তাদির। কোনও ছোটখাট রাষ্ট্রের তাতে দায়ও থাকিবে না, অধিকারও থাকিবে না।

হয়তো ইহা প্রয়োজন, হয়তো এমনি একটা পুলিশ বাহিনী সর্বদা সজাগ না থাকিলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণ করা যাইবে না। কিন্তু ইহাতে যে ভবিষ্য বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন বহু রাষ্ট্রের নয়—রাষ্ট্র-সমবায়েরও নয়—এই ত্রিশক্তির World hegemony-র। ইঁহারাই হইবেন নাবালক রাষ্ট্র-গণের শক্তিমান গার্জিয়ান বা অভিভাবক। এই অভিভাবকত্বের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রগণের কতটুকু স্বাধীনতা থাকিবে? তাহাদের অবস্থা হইবে রক্ষণাধীন রাষ্ট্রের মত। ক্রমে তাহাদিগের অবস্থা দাঁড়াইবে আমাদের দেশীয় রাজন্যগণের মত।

একথা সকলেই হয়তো স্বীকার করিবেন যে, নিছক যুক্তির দিক হইতে আজকার পৃথিবীতে এতগুলি খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র স্বাধীন



রাষ্ট্রের কোনও স্থান নাই। বিশ্বের ভিতর নিরন্তর আদান-প্রদান,' দেশে-দেশে সংযোগের ক্ষেত্র যেরূপে নিবিড় ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমা ভাঙিয়া সমস্ত পৃথিবীকে একীকৃত করিতে পারিলেই মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল হইবে। কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাস, জাতীয়তার তীব্র শক্তি, দেশে দেশে স্বার্থসংঘাত এইরূপে একীকরণের পরিপন্থী। তাই সমন্বয়ের পথ খুঁজিতে হয় দেশের সীমা বজায় রাখিয়া।

এই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জার্মাণীর ভূতপূর্ব প্রতিনিধি হের ষ্ট্রেসেমান লীগ অফ নেশনসে একাধিকবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র মিলিয়া United States of Europe প্রতিষ্ঠার। বলা বাহুল্য, সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু প্রতি দেশের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা যদি মানবকল্যাণের অনুকূল না হয়, তবে এই সর্বজাতীয় সমবায় বা ফেডারেশনই এ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। এই ফেডারেশন নীতি গ্রহণ করিয়া আমেরিকা সমৃদ্ধ ও শক্তিমান, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিও এই নীতিতে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এই নীতির আধুনিকতম পরীক্ষা সাফল্য ও গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। নামে ফেডারেশন না হইয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্য এই নীতির মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াই একটা প্রকাণ্ড বিশ্বশক্তি হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর জগৎকে এই ফেডারেশনের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলেই মানবের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং টেনিসনের "Parliament of Man and the Federation of the World"এর স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

কিন্তু কি আটলাণ্টিক চার্টার, কি যুদ্ধোত্তর জগৎ সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণা কোথাও এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার কোনও চেষ্টাই দেখা যায় না। যে পথে পৃথিবীর ধুরন্ধরদের দৃষ্টি—সে ত্রিশক্তির hegemony।

আশঙ্কা হয় যে, যদি এই পরিকল্পনাই শান্তি-সভায় জয়যুক্ত হয়, তবে তাহাতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে শুধু নূতন অশান্তি ও নূতনতর বিশ্বসংগ্রামের বীজবপন। ইহার ফলে এই চতুঃশক্তির বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির ক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা চাপা আগুনের মত জ্বলিতে জ্বলিতে কবে যে আবার একটা বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে পর্যবসিত হইবে কে জানে?

বিশ্ব-সমবায়ের আদর্শ গ্রহণে অনেক বাধাই আছে, তার মধ্যে একটা প্রধান অন্তরায় ফ্যাসিস্তশাসিত দেশগুলি লইয়া—বিশেষতঃ, জার্মাণী ও জাপানকে লইয়া।

যুদ্ধের আরম্ভে হয়তো ভুল বিশ্বাসের বশে—নেভিল চেম্বারলেন জার্মাণ জনসাধারণকে নাৎসিগণ হইতে পৃথক্ জ্ঞানে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, সেকথা যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আর কাহারও মুখে এখন শোনা যায় না। শোনা যায় একটা তীব্র প্রতিহিংসার অথবা প্রচণ্ড সন্দিগ্ধ সাবধানতার সুর। জার্মাণীর বিষদাঁত জন্মের মত ভাঙিয়া না দিলে সে আবার শীঘ্রই একটা তীব্রতর সংগ্রাম বাধাইবে, এই আশঙ্কা লইয়াই আজকাল আলোচনা চলিতেছে—বিষদাঁত কিসে ঠিক ভাঙা যাইবে? এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়, কিন্তু তার প্রতিকারের যেসব উপায়ের কথা শোনা যাইতেছে, সেই পথই প্রশস্ত পথ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে।



মা

শিল্পী—হাসান আলী, শান্তিনিকেতন

জার্মাণী ও জাপান এই যুদ্ধে বিশ্বের যত বড় দারুণ অমঙ্গল করিয়াছে, সেকথা কে না অনুভব করে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, জার্মাণ ও জাপানী উভয় জাতিই অদ্ভুতকর্মা। জার্মাণী শুধু হিটলার হিমলারের দেশ নয়, তাহা কাণ্ট ও হেগেলের দেশ, গ্যেটে, শিলার ও মানের দেশ, লাইবনিট্জ, আইনষ্টাইন, বৌর প্রভৃতির দেশ, মোট্সার্ট বাখ্ বিটোফেনের দেশ, মার্কস ও এঙ্গেলসের দেশ। অপূর্ব ধীশক্তির বলে জার্মাণ জাতি যুগে যুগে জগৎকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও ললিতকলায় অশেষ অবদান দিয়াছে। অধুনা বিপথে চালিত হউক, কিন্তু শক্তি ও শৌর্য তাদের বিস্ময়ের বস্তু।

এমন একটা জাতিকে যে কোনও শক্তি বা শক্তি-সমবায়ের পদানত করিয়া রাখিয়া চিরদিন তাহাদিগকে শান্তির পথে রাখিতে পারিবে, এ আশা দুরাশা। এ চেষ্টা আজই প্রথম নয়, আর দুইবার হইয়াছে। নেপোলিয়ান ভাবিয়াছিলেন জার্মাণীকে চিরতরে নির্বীর্য করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু ১৮৭০ সালে দেখা গেল তাঁর সে চেষ্টা

ব্যর্থ হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর আর একবার এই চেষ্টা হইয়াছিল, সে চেষ্টা আরও বেশী ব্যর্থ হইয়াছে। ভার্সাই-সন্ধির সর্তগুলি সমগ্র জার্মাণ জাতির ভিতর ধূমায়িত হইয়াই তার পঁচিশ বৎসর পরে এই বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছে।

এত বড় না হইলেও ইহার সমশ্রেণীর আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় Boer জাতির সঙ্গে সেখানকার ইংরেজ উপনিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল Disraeliর আমলে। আবার তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া শেষ বুয়র-যুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। প্রচণ্ড বৃটিশ শক্তির সমবেত পরাক্রমে অবশেষে বহুক্লেশে এই ক্ষুদ্র জাতি পরাভূত ও পদানত হইয়াছিল। যদি সেই পরাজয়টাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইয়া ইংলণ্ড তাহাদিগকে শাসন করিতেন, তবে এতদিন আবার কি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিত, কে জানে? ক্রুগার, ক্রঞ্জি, বোথা, স্মাটসের জাতি যে চিরদিন এ পরাজয় মাথা পাতিয়া লইত না, আজও মাঝে মাঝে Hertzog-এর আস্ফালনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড পরাজিতকে পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সমবায়, বোয়ার জাতি ইংরেজ ঔপনিবেশিকের মতই স্বাধীনতালাভ করিল। এই নীতির ফল এই যে, ভূতপূর্ব বোয়ার সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্ আজ ইংরেজের একটি প্রধান মন্ত্রদাতা ও সুহৃৎ, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরাজের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

ছোট হইলেও এ দৃষ্টান্ত বড়'র ক্ষেত্রেও হয়তো সমান খাটে। বোয়ারের বিষদাঁত ভাঙ্গা পড়িয়াছিল ফেডারেশনে। জার্মাণী কি জাপানেরও ফেডারেশনেই শুধু আসিতে পারে সেই তৃপ্তি, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হইবে। নতুবা পদানত পরিভূত জার্মাণীকে যতই নিরস্ত্র কর, তাহার ভিতর ধূমায়িত বহ্নিকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ-আমেরিকান পুলিশ বাহিনীর সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, হিট্‌লারের গেষ্টাপোকে ধ্বংস করিয়া আবার এক নূতন গেষ্টাপো সৃষ্টি করিতে হইবে। অশান্তি অনেকদিন দমন করিয়া রাখা যাইতে পারে, চিরদিনের তরে তাহা ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

একথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিধিনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইলে লীগ অফ নেশনস্ কেবলমাত্র যন্ত্রিতন্ত্রের উপর যতখানি আস্থা লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, ততখানি আস্থা তার উপর রাখা চলিবে না। হয়তো একটা প্রবল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্বও অপরিহার্য—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে এক নূতন রাষ্ট্র গঠনের উপর—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এক বৃহৎ রাষ্ট্র-সমবায় যেখানে প্রত্যেক জাতি সমান সম্মান ও সমান স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতের মত জাতি যারা আজ পরাধীন ও পদানত, তাহাদিগকেও এই রাষ্ট্র সমবায়ে সমান অধিকার দিতে হইবে। নতুবা বিশ্বের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

পুলিশ বাহিনী দিয়া জোর করিয়া যে শান্তিরক্ষা হইবে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র।

এ সংগ্রামের সূত্রপাত হইতেই অনেক হোমরাচোমরা লোক বলিয়াছেন যে, ইহা জগতে গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নাৎসী-ফ্যাসিস্ত-জাপ শক্তিতন্ত্রে সংগ্রামের বীজ থাকে—সুতরাং শক্তিবাদের উচ্ছেদ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শান্তির জন্য প্রয়োজন এবং ইহাতেই জগতের মঙ্গল, এই কথাটাই বার বার বলা হইয়াছে।

একথা নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃত গণতন্ত্র জগতে কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই। প্রাচীন রোম বা এথেন্সে ছিল জনসাধারণের শাসন-ব্যাপারে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপের অধিকার, কিন্তু সেখানেও প্রকৃত অধিকার ছিল মুষ্টিমেয় নেতার হাতে। আধুনিক গণতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রে। ইহাতে সাধারণের সাক্ষাৎ অধিকার নাই, আছে শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। প্রতিনিধিরা অধিকাংশের মতানুসারে যাহাদিগকে পোষণ করেন, তারাই করে শাসন। ইহারই নাম গণতন্ত্র।

প্রকৃত গণতন্ত্র বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সত্যসত্যই জনগণকে শাসনাধিকার দিতে গেলে রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের পরিচালন ক্ষমতা স্থানীয় জনগণকে দিয়া কেবল রাষ্ট্রের সমূহ হিতানুষ্ঠান মাত্র রাখিতে হয় প্রতিনিধিগঠিত রাষ্ট্রসভায়। এই আদর্শে রচিত হইয়াছে সোভিয়েট রাষ্ট্রগঠন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলেই যে যুদ্ধ ও হিংসার মূলোচ্ছেদ হইবে, একথা বলা চলে না। একথা সত্য যে, আজকাল যুদ্ধ সৃষ্টি করে মুষ্টিমেয় লোক তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হিংসা ও সন্দেহ আশ্রয় করিয়া; জনগণ চায় শান্তি। কিন্তু একথাও সত্য যে, জনসাধারণের খুব বড় একটা অংশ রাষ্ট্রশাসনের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। ভাবনাচিন্তার ভার, কাজের ভার নেতার হাতে দিয়া বিনা প্রশ্নে তাকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জনগণের এত বেশী যে, যে কোনও দুষ্ট শক্তিমান ব্যক্তি তাহাদিগকে নাচাইয়া মাতাইয়া তাহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারে। জার্মাণীর জনসাধারণকে দেখিতে দেখিতে ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে হিট্‌লার যে সংগ্রামে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা নিছক শক্তিপ্রয়োগ বা গেষ্টাপোর প্রয়োগের ফল নয়, জনসাধারণের সত্যসত্যই হিট্‌লারকে অনুমোদনের ফল। কেন তারা অনুমোদন করে, তাহা হিটলারের মাইন কাম্পফ্ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশেও নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া যে কোনও দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত না আছে এমন নয়। একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে কোনও দেশেই জনসাধারণের ভিতর এতখানি বুদ্ধি-বিদ্যার প্রাচুর্য নাই, যাতে তারা প্রত্যেক জাতীয় ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার করিয়া সুসিদ্ধান্তে আসিতে পারে। আর জনসাধারণের পোষকতা পায় স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ নেতার চেয়ে যারা মাতাইতে পারে, তারাই বেশী। যা-কিছু একটা ধূয়া ধরিয়া লোককে মাতাইতে পারিলে জনশক্তি তোমার পিছনে দাঁড়াইবে, যিনি শুধু বুঝাইয়া যুক্তি দিয়া লোকের কাছে আবেদন করিবেন, তিনি সে পোষকতা পাইবেন না। একথা সব দেশেই অল্প-বিস্তর সত্য।

কর্মকুশলতায় গণতন্ত্র যে ফ্যাসিজমের কাছে মাথা তুলিতে পারে না, তাহা একরকম স্বতঃসিদ্ধ এবং বর্তমান যুদ্ধে তাহা সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। আজ যে মিত্রশক্তি ক্রমে অধিক তৎপরতা লাভ করিয়াছেন, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, যুদ্ধের চাপে গণতান্ত্রিক দেশগুলি অল্পাধিক পরিমাণে দেশনায়কদের দিয়াছেন ডিক্টেটারের মত অব্যাহত ক্ষমতা। নতুবা প্রত্যেকটি বিষয় পার্লামেন্টের বিচার-বিতর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে আজও যুদ্ধের মোড় ফিরিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু শুধু যুদ্ধায়োজনে নয়, শান্তির সময়ে দেশের হিতসাধনেও ডিক্টেটারী শাসন অসাধারণ শক্তি ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে এবং প্রধানতঃ সেই কর্মকুশলতার জোরেই ফ্যাসিজম্ জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। রাশিয়ায় যে অদ্ভুত অভ্যুদয় দশ বৎসরে হইয়াছিল এবং তার পরও সমান বেগে চলিয়াছে, তাহা ঠিক গণ-নিয়োজিত নয়, গণ-হিতব্রত ডিক্টেটার পরিচালিত।

সুতরাং গণতন্ত্র নামে শুধু ভোটতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যে মানব-কল্যাণের দিক দিয়া শেষ কথা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পক্ষান্তরে প্লেটোর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বহু মনীষীই একথা মনে করেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালন এমন একটা দুরূহ কার্য, যাহা সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞই ঠিক করিতে পারে, অশিক্ষিত জনসাধারণের অজ্ঞ হস্তক্ষেপ যতটা ভাল করে, মন্দও হয়তো তার চেয়ে কম করে

না। তাই প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে শাসনের ভার দিয়াছিলেন বিশেষভাবে শিক্ষিত বিচক্ষণ পণ্ডিত গার্জিয়ানদের হাতে। এই মতবাদের তলায় যে একটা নিভাঁজ সত্য আছে, সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু এই সন্দেহ হয় যে, পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ কর্মকুশল হইলেও স্বার্থের টানে তাঁর জনকল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কাজেই, তাঁর রাশ টানিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে এবং সে কাজ করিবে জনসাধারণ।

ভবিষ্য রাষ্ট্রনীতির পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন—কিন্তু সে গবেষণা হইবে কি?—করিবে কে?

ডেমোক্রেসী বলিয়া যাঁরা সব চেয়ে বেশী হৈ-চৈ করেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ডেমোক্রেসী চান না, চান জনগণের নাম করিয়া নিজের মত ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা। তাই ধীরবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়াছে একদিকে অন্ধ আবেগ ও অপর দিকে প্রোপাগাণ্ডা। যা-কিছু একটা প্রোগ্রাম লইয়া জোর প্রোপাগাণ্ডা করিলেই জনগণের সমর্থন পাওয়া যাইবে, এই ভরসায় বেশীর ভাগ জননায়ক গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হন। জনগণের সমর্থন পাইয়া তাঁরাই দেশের সব চেয়ে বেশী মঙ্গল করিতে পারিবেন, একথা অনেকে মনে করেন, অনেকে হয়তো মনে করেন শুধু নিজের গণ-গোষ্ঠী জাতির মঙ্গলসাধন। ডেমোক্রেসীতে প্রকৃত বিশ্বাসী জগতে বিরল। অথচ অধিকাংশ দেশেই ডেমোক্রেসীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতে সাহস কাহারও নাই।

ডেমোক্রেসী বা প্রতিনিধিমূলক শাসন রাষ্ট্রগঠনের শেষ কথা নয়। বর্তমান যুগে অতীতের অভিজ্ঞতামূলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও পরিকল্পনা আবশ্যক হইয়াছে। সেদিকে ভবিষ্য রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি পড়িবে কি?

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিতন্ত্রই ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু তার পর সোস্যালিজ্‌মের উত্তরোত্তর প্রসারের সঙ্গে আর একটা মতবাদ ক্রমে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। প্রতিনিধিমূলক শাসনই শেষ কথা নয়। শাসনের যন্ত্র গঠনের চেয়ে শাসনের নীতি ও প্রকৃতির উপর সোস্যালিজ্‌ম্‌ বেশী জোর দেয়। রাষ্ট্রনীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, যাতে অসাম্য দূর হইয়া সকলের সমানভাবে আরামে বাঁচিবার অধিকার, কাজ করিবার অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার সুনির্দিষ্ট হইবে। নির্ধনকে শুধু ভোটের অধিকার দিলেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কেননা তার মরণ-বাঁচনের সোনার কাঠিটি আছে ধনীর হাতে। এই সোনার কাঠি ধনীর হাত হইতে কাড়িয়া না লইলে গণতন্ত্রের কোনও সার্থকতা থাকে না।

মালদারী অর্থনীতি যে রাজ্যে চলে, সেখানে মালদারের শক্তি ডেমোক্রেসীর উপর যে কত প্রচণ্ড প্রভাব প্রয়োগ করে তার দৃষ্টান্ত আছে বহু। তার উপর আর একটা বিপদ এই যে, সকলেরই প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে বড়লোক হইবার মালদার হইবার। যার সুযোগ ও সুবিধা আছে, তার সে সুবিধার ব্যবহার করিয়া নিজের অর্থশক্তি বৃদ্ধির একটা লালসা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। মালদারী সমাজে এই লালসাকে দোষের বলা যায় না। কেননা, যেখানে 'চাচা আপন বাঁচা'ই একমাত্র নীতি, সেখানে নিজের ও নিজের আত্মীয়-পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি স্থায়ী করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় ও বৃদ্ধি ছাড়া অন্য উপায় নাই।

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে, শিশুদিগের পুষ্টি ও শিক্ষার ভার নেয় রাষ্ট্র প্রত্যেক লোক কাজ করিয়া অনায়াসে আপনার জীবন-মরণ ও আরামের উপায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তবে সঞ্চয়ের এ তীব্র কামনার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে না, এ প্রবৃত্তিও পরিপুষ্ট হইতে পারে না। ক্ষমতা পাইলে তাহার অপ-ব্যবহার করে লোকে প্রধানতঃ নিজের দু'পয়সা করিবার জন্য, সে দু'পয়সা করিবার সুযোগ যদি না থাকে, তবে ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করিয়া দশকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষমতার অপ-ব্যবহারের খুব বড় একটা হেতু চলিয়া যাইবে। নির্বাচিত প্রতিনিধি অন্ততঃ অর্থ-লোভে বা আর্থিক সুযোগ সুবিধার লোভে বিপথে যাইবেন না।

তাই সোস্যালিজম্ যদিও চায় যে শাসনকার্য জনগণের সম্মতি লইয়া এবং তাদের প্রতিনিধির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, কিন্তু ইহা আরও চায় যে ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মূলসূত্র মানিয়া লইতে হইবে। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, তাহা উৎপাদনের উপায় যে ভূমি কারখানা প্রভৃতি, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। সকল উৎপাদন-ক্রিয়া ও সম্পদ্ বিতরণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ্ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যাহাতে সকলে তাহার সমান সুবিধা পায়। পক্ষান্তরে, সোস্যালিজম্ বলে যে বসিয়া খাইবার অধিকার কাহারও থাকিবে না, খাইতে পাইবে সবাই, কিন্তু সবারই খাটিতে হইবে। রাষ্ট্র-নিরূপিত এক ব্যবস্থার দ্বারায় দেশের সমগ্র শ্রমশক্তি নিয়োজিত হইবে এমনভাবে সম্পদ্ সৃষ্টি ও বণ্টনে যাহাতে সর্বসাধারণের সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার হয়। সোস্যালিজমে এই সব মূলসূত্র গত পঞ্চাশ ষাট বৎসর হইল অল্পাধিক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধনিকতন্ত্র উগ্রভাবেই চলিয়াছে, কিন্তু শ্রমিক ও জনসাধারণের হিত-সাধনের নীতি অল্পে অল্পে শাসনকার্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ফ্যাসিস্ত ইতালী ও নাৎসী জার্মাণী সোস্যালিজমের অনেক নীতি তাদের নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের সমুদয় শ্রমশক্তি ও সম্পদ সৃষ্টি শক্তির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিয়াছিল ষ্টেট এবং সে সব নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমস্ত দেশবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রায় সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছিল রাষ্ট্র। শুধু তাদের এই সংহত শক্তি সোস্যালিজম্ নীতি অনুযায়ী নিয়োজিত না করিয়া দেশের একচ্ছত্র নেতার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল।

একমাত্র রাশিয়ায় সোস্যালিষ্ট নীতির প্রকৃত পরীক্ষা হইয়াছে। জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেখানে দেশের সমস্ত সম্পদ্ ও শ্রমশক্তির সংহতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালী ও জার্মাণীতে যাহা হয় নাই, তাহা এখানে হইয়াছে। এই বিশাল কার্য কোনও স্বেচ্ছাচারী নেতার একার হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইহার প্রত্যেক অংশ নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে সেই অংশে নিযুক্ত শ্রমিকদের সোভিয়েট বা সমিতির উপর।

এইখানেই সোভিয়েট নীতির বৈশিষ্ট্য। শাসনাধিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা বিতরণ করা হইয়াছে শ্রমিক জন-সাধারণের উপর। এ কাজ অনায়াসে হয় নাই। একদিনেও সম্পন্ন হয় নাই। অনেক ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মূলনীতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে রাশিয়ার এমন একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যার ফলে নিপুণ বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিরূপিত এক বিরাট রাষ্ট্রব্যাপী প্রচেষ্টা আদ্যোপান্ত শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তার ফলে ক্ষেত্রে বা কারখানায় যারা কাজ করে, তারা একথা অনুভব করে না যে, তারা পরের কাজ করিতেছে। তারা নিজেরা শুধু নিজেদের সকলের কাজ করিতেছে, সে কাজের যা ফল তার সম্পূর্ণ উপকার তারাই পাইবে, একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অনুসারে যাতে লাভের কমি-বেশী হইবে না।

প্রথমে কাজটা ঠিক জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় নাই। ডিক্টেটার পরিচালিত শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল অনেকটা। কিন্তু জোর করিয়া কাজ করাইবার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল একটা প্রচণ্ড সর্বব্যাপী শিক্ষার আয়োজন। বিদ্যালয়ের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ নিরক্ষর শ্রমিকদের সকলকেই নানাভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও কর্মনীতিতে অক্লান্ত অশ্রান্ত-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তার ফলে ডিক্টেটারীর স্থলে উচ্চতম রাষ্ট্র পরিষদেও প্রতিনিধিমূলক শাসন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছে।

এমনি করিয়া সমগ্র জাতিটাকে শিক্ষা দিয়া কাজ করাইয়া যে অপূর্ব সংহতি সৃষ্টি হইয়াছিল তার সম্পূর্ণ সফলতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার প্ল্যান প্রায় পনেরো বৎসর সম্পূর্ণ-রূপে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য, তার বিরাট শিল্পগঠনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তার ভিতর যুদ্ধায়োজনের স্থান সামান্যই ছিল। সেই বিপুল শক্তি যুদ্ধায়োজনে নিয়োজিত হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধের প্রাক্কালে। তাই যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে রাশিয়া হিট্লারের প্রতিরোধে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যত দিন গেল, আয়োজন যত পরিপূর্ণ হইল, সমরোপকরণ হাতে আনিয়া দিল ইংলণ্ড ও আমেরিকা, তখন আর রাশিয়াকে ঠেকাইবার শক্তি হিট্লারের হইল না। শান্তিময় সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণ সাধনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি যেমন সফলতা লাভ করিয়াছে, ঠিক তেমনি সফলতা লাভ করিয়াছে সে সংগ্রামে।

অনেক বিচক্ষণ বিদেশী রাশিয়ার এই সর্বাঙ্গীণ সফলতার হেতু অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার প্রধান মূলে এই যে, রাশিয়ায় কেহ মনে করে না যে পরের জন্য খাটিতেছে—দেশে যা-কিছু আয়োজন, সব তারা মনে করে তাদের নিজেদের কাজ। প্রত্যেক সৈনিক মনে করে যে যুদ্ধটাও তাদের নিজেদের যুদ্ধ। যা-কিছু রাশিয়ার শ্রমিক করে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রত্যেক রাশিয়ান পায়। আবার কারখানায়, চাষের ক্ষেতে, শাসনকার্যে সর্বত্র পরিচালনের ক্ষমতাও ন্যস্ত আছে কোনও উপরওয়ালার হাতে নয়, তাদেরই সোভিয়েটের হাতে। এই পরিপূর্ণ আত্মীয়তাবোধের উপর তাদের যে দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটি নিরতিশয় সত্য বস্তু।

রাশিয়ার এই সাফল্যের দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। তাদের শিল্প-প্রচেষ্টা যতই বৃহৎ ও অতিকায় হউক, তার ভিতর রাশিয়ার তুলনায় শ্রমিকের আত্মীয়তাবোধের যে যথেষ্ট অভাব আছে, সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই সে সব দেশেও একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, শ্রমিককে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য এখনকার চেয়ে অধিক পর্যাপ্ত আয়োজন করিতে হইবে। ক্যাপিটালিজমের খাঁচা বহাল রাখিয়া শ্রমিকের মঙ্গলসাধনের জন্য কত দূর কি করা যায়, তার সম্বন্ধে নানা গবেষণা হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বেভারিজ প্ল্যান তার একটি ফল।

বেভারিজ প্ল্যান অতিশয় সুচিন্তিত এবং অনেক বিষয়ে দেশের জনসাধারণের হিতসাধনের পরিকল্পনা অনেকটা অগ্রসর। কিন্তু হাজার হইলেও ইহা সোস্যালিজমের পথে একটি বিশ্রামাগার মাত্র। সামাজিক মঙ্গলসাধন প্রচেষ্টায় ইহাকেই শেষ কথা বলিয়া মনে করা যায় না। ইহার ভালমন্দ লইয়া অনেক বিচার-বিবেচনা হইতেছে—ইহার উপকারিতা ঠিক কতখানি হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট পদ্ধতির সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সফল পরীক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ না লইয়া তার অর্ধপথে দাঁড়াইয়া একটা নূতন পরিকল্পনার চেষ্টার পক্ষে অপর কোনও যুক্তিই নাই। কেবল-মাত্র ইংলণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে সংঘর্ষ যথাসম্ভব নিবারণের চেষ্টাই ইহার একমাত্র হেতু ও যুক্তি।

সে যাহাই হউক, আজকার দিনে একথা অবিসম্বাদিত যে, কেবলমাত্র প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না। স্বাধীনতা, জাতীয় সুখসমৃদ্ধি ও সমবায় শক্তি সাধন, সব কাজের জন্য প্রয়োজন এমন একটা সংগঠনের, যাহা



ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের

সেবায় নিযুক্ত . . .

এ-যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হয়েছে তেমনি আবার এ-দেশের শিল্প-পতিরা বুঝতেও শিখেছেন যে তাঁদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এপর্যন্ত আমদানী করা মালের উপর কতখানি নির্ভর করে এসেছে। আজ নানা প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বহু মূল-উপাদানের আমদানি এক রকম বন্ধ, অথচ চাহিদা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ।

সোয়াইকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুবিধ মূল-উপকরণ তৈরি হয়। বিশেষ করে ওলিইক এবং ক্রিসলিক এ্যাসিড জাতীয় কেমিক্যালগুলি তৈরি করার ব্যাপারে এঁরাই এদেশে পথ প্রদর্শক। তা'ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভিজ্জ তৈল, রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ সোয়াইকাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যোগাচ্ছেন ; এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লুব্রিক্যাণ্ট ও কোল-টার বাইপ্রডাক্টের প্রস্তুতকারক হিসাবেও সোয়াইকা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

সোয়াইকা অয়েল মিল্‌স্—'কুকুর' মার্কা বিবিধ উদ্ভিজ্জ তৈল ও ডিসিনফেক্‌ট্যাণ্টের জন্য খ্যাত।

সোয়াইকা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মিনারেল কোং লিমিটেড—খনিজ মাশিক, রাসায়নিক প্রস্তুতকারক ও বিবিধ খনিজ পদার্থ এবং রাসায়নিকের পাইকারী বিক্রেতা ও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা ফার্টিলাইজার লিমিটেড—নানাপ্রকার খৈল ও সবুজ সারের বীজ সরবরাহকারী।

সোয়াইকা স্ট্যাণ্ড অয়েল অ্যাণ্ড ভার্নিস কোং লিমিটেড—স্ট্যাণ্ড অয়েল ও বার্নিশ প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা এক্‌স্‌পোর্ট অ্যাণ্ড ইম্‌পোর্ট লিমিটেড—মাল আমদানি ও রপ্তানিকারক।

সোয়াইকা অয়েল অ্যাণ্ড প্রোডিউস্ কোং লিমিটেড—গ্রীজ, লুব্রিক্যাণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা মিনারেল ক্রাসিং মিলস অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড—খনিজ পদার্থ চূর্ণ ও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড—মিল ও কারখানার মাল সরবরাহকারী।

সোয়াইকা ব্রিক্ ওয়ার্কস্—ইট প্রস্তুতকারক ও গৃহনির্মাণের মালমশলা সরবরাহকারী।

সোয়াইকা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ

হেড অফিস : "পোলক হাউস" ২৮এ, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "প্যাডলক"—কলিকাতা। ফোন : কলিঃ—৬১৭১-৭২।

কারখানা : লিলুয়া ও বারাণসী। শাখা সমূহ :- বোম্বাই, বারাণসী, কারউই, এবং জব্বলপুর।

SWK 10

সোভিয়েট শাসনের অনুরূপে সেই সংগঠনের কয়েকটি মূল সূত্র ধরা যাইতে পারে।

১ম। দেশের সকল উপাদান ও শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুনিয়ত প্রণালীতে সর্বাধিক সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২য়। এই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার উপকারিতা কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষে নিবদ্ধ থাকিবে না, সর্বসাধারণ ইহাতে সমান অধিকারী হইবে।

৩য়। এই সমগ্র ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের কাজ বিশেষজ্ঞেরা করিবে, কিন্তু ইহার নিয়ন্ত্রণের কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

৪র্থ। এই সংহতির অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য অতন্দ্রিতভাবে শিক্ষার কাজ চালাইতে হইবে, যাহাতে প্রথমে ইহা শাসনমূলক বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরিশেষে প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তাবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই ব্যবস্থাই রাষ্ট্রগঠনের নবতম ও সফলতম সূত্র, যাহা সোভিয়েট রাশিয়ায় পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশভেদে, অবস্থাভেদে এই মূলসূত্রের প্রয়োগে প্রভেদ অবশ্যই হইবে, কিন্তু এই মূলসূত্রই জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

কিন্তু ত্রিশক্তির নানা সম্মেলনে যেসব আলোচনা হইতেছে, তাহাতে এমন কোনও আশাই হয় না যে, যুদ্ধোত্তর জগৎ এই সব নীতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন। তাঁহাদের কল্পনার সীমা Atlantic Charterএর Four Freedoms এবং Beveridge Plan, Keynes Plan প্রভৃতি। এ সবগুলিরই মূল ভিত্তি মালদারী ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা যাহা অস্বীকার করিয়াই সোভিয়েট অসামান্য সফলতা লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর ভারত।

বিশ্বের বিরাট ক্ষেত্র ছাড়িয়া ভারতের দিকে চাহিলে নৈরাশ্য আরও গভীর হইয়া পড়ে।

ভারতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের এক চিন্তা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ; আর অর্থনৈতিক নেতাদের একমাত্র পরিকল্পনা, মালদারী ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সহায়তায় পশ্চিমের সমকক্ষ বৃহৎ শিল্পগঠন। ইহার অধিক চিন্তার কথা বিশেষ শোনা যায় না।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনা কত দূরে আছে জানি না। ক্রীপস্ প্রস্তাবের সময় ভারতকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যতখানি আগ্রহ ইংলণ্ডের ছিল, তার সুযোগ গ্রহণ করা আমাদের নেতৃবৃন্দ অসম্মানকর মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ রাজাগোপালাচারিয়ার মারফৎ সেই প্রস্তাবেরই সংস্কৃত সংস্করণ বিষয়ে ইংলণ্ডের তার কাছাকাছি আগ্রহও দেখা যায় না।

সুযোগ যে হারানো হইয়াছে, সেকথা দুঃখের বিষয় ; কিন্তু ইংলণ্ড যে আজ আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দান করিতে আগ্রহশীল নন, তাহা ততটা দুঃখের নয়। কেননা, স্বাধীনতা দান করিবার জিনিষ নয়, তাহা অর্জন করিতে হয়।

তার চেয়ে গভীরতর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের যে সকল নেতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, তাঁদের দৃষ্টির ক্ষেত্র এত অপরিসর ও বর্তমানকালের অবস্থার অনুপাতে এত অনগ্রসর।

শাসনতন্ত্র হইবে প্রতিনিধিমূলক, ইংলণ্ডের কোনও আধিপত্য থাকিবে না ইহার অতিরিক্ত কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর কিছু বলিবার নাই। তাঁদের বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়াইয়াছেন তাঁদের দৃষ্টি বুঝি



অভাবের অবসান

গত দুবৎসরের কঠিন পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। বন্যায়, রোগে, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা বেঁচে আছি। দুর্দশার যে অবসান ঘটেছে তা' নয়, এখনো চলছে অগ্নিপরীক্ষা, তবে আগুনের তাপ ক্রমেই কমে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মত—যুদ্ধ শেষ হতে আর বিশেষ দেরি নেই। খাদ্য-সমস্যাও কিছু পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও ক্রমবর্ধমান। চারদিকেই যেন সম্ভাবনার, সুদিনের ইংগিত। এরই প্রতীকরূপে আনন্দময়ীর আগমন। হাতে তাঁর বরাভয়, অসীম করুণা তাঁর দৃষ্টিতে। মনে হয় সকল অভাবের এইবার অবসান হবে।



সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস কলিকাতা

আরও সংকুচিত। জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ ধার করিয়া সন্তুষ্ট—শুধু তাঁরা চান পাকিস্থানকে তফাৎ করিয়া লইতে। আর কতক লোক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন মাইনরিটির রক্ষা-কবচের জন্যে।

এ সকল দাওয়া দাবীর খুঁটিনাটির বিচার আমি করিতে চাই না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের অভিজ্ঞতা এই যে, মাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা প্রতিনিধিতন্ত্রের দ্বারা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার জন্য চাই আরও এমন কতকগুলি ব্যবস্থা যাহাতে প্রত্যেকে দেশের সকল সুবিধা ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত অংশ পায় এবং সেই ব্যবস্থা নিশ্চয় করিবার জন্য চাই এমন একটা শাসন পদ্ধতি যাহাতে শাসনের কাজ ভাঙিয়া নিষ্কেন্দ্রীকৃত করিয়া সকলকে অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষভাবে শাসনের কাজের অধিকার দেওয়া হয়। পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতার দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে প্রতিনিধিবাদকে শেষ কথা ধরিয়া আমরা যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতেছি ইহা পরিতাপের বিষয়।

আবার দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টায় যে বোম্বাই প্ল্যান ভারত সরকারে পেশ করা হইয়াছে তাহাও ঠিক এমনি অসাময়িক। বড় বড় কারখানা গড়িয়া প্রচুর মূলধন লইয়া ষ্টেটের সাহায্যে দেশের যত কিছু শিল্পজাত গড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহা পরিপূর্ণরূপে বাস্তব করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। এ কাজ অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু কে করিবে? কি প্রণালীতে ইহা করা হইবে? ইহার দ্বারা দেশের যে সম্পদ বৃদ্ধি হইবে তাহার সুযোগ সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের কি ব্যবস্থা হইবে একথা যে আগে হইতে ভাবিবার কথা সে কথা ইঁহারা ভাবিয়াছেন মনে হয় না। তা ছাড়া এ প্ল্যান রচিত হইয়াছে মূলতঃ যুদ্ধের পূর্বের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির মূলে। তার কতটুকু যুদ্ধোত্তর জগতে থাকিবে সে কথাও ভাবিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত দিন চলিয়াছে এই নীতিতে যে যার যত শক্তি আছে মাল সৃষ্টি করিবে আর তারপর বিপুল আয়োজন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে সেই মাল কেনাইবার ব্যবস্থা করিবে। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশকেই এইরূপে বিদেশী মালের dumping নিবারণের জন্য ও স্বদেশীয় শিল্পের রক্ষার জন্য রক্ষণনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহা হইতে হইয়াছে প্রচুর অনিষ্ট ও প্রচুর সঙ্ঘর্ষ। ইহাতে যে সব দেশ শিল্পে আগে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারা সমস্ত বাজার প্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে; তাদের বিপুল ধনশক্তির সামনে ছোটখাট অনগ্রসর দেশের মাথা তুলিবার পথ নাই। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসাম্যের পাশে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দেশে দেশে বিস্তর হিংসা বিদ্বেষ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং বর্তমান যুদ্ধের এটা একটা প্রকাণ্ড হেতু। হিটলার স্বদেশে আসর জমাইয়াছিলেন এই Plutocratদের প্রতি বিদ্বেষের ধুয়া তুলিয়া।

যুদ্ধের পরে ঠিক এই ব্যবস্থা থাকিবে না। কি হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনার অবধি নাই—আজও কোনও স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। কিন্তু অটলাণ্টিক চার্টারের একটি সূত্র এ বিষয়ে একটা দিক নির্দেশ করিতেছে যেটা ভারত বা চীনের পক্ষে চিন্তার বিষয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সকল দেশের সকল কাঁচা মাল পাইবার সমান অধিকার অন্য সকল দেশের হইবে। ভারত, ব্রহ্ম বা চীনের মত দেশে অনেক অব্যবহৃত কাঁচা মাল রহিয়াছে, সেগুলি সেই দেশের ভবিষ্যতের আশা। ভারত যে খুব দ্রুত তার শিল্প শক্তি সংহত করিয়া ইংলণ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সেই কাঁচা মালের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এখানে সমান ভাগের সুযোগ পাইবে শুধু অগ্রসর শিল্প-শক্তিমান দেশ, কাঁচা মালের দেশ শুধু কাঁচা মালই জোগাইতে থাকিবে। এ নীতি ভারতের পক্ষে ভয়াবহ।

কিন্তু জগতে আর্থিক সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই আন্তর্জাতিক নীতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। শিল্পজাত প্রস্তুত করিবার অব্যাহত স্বাধীনতা ও তারপর সেই শিল্প যেন তেন প্রকারেণ দেশ বিদেশে কাটাইবার অনিয়ত চেষ্টা উঠাইয়া মালের উৎপাদন ও দেশে দেশে আদান প্রদান একটা সুনিয়ত ব্যবস্থা অনুসারে করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক দেশ বাহির হইতে পাইতে পারে ঠিক যাহা তার প্রয়োজন ও যাহা সে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না এবং বিনিময়ে সে অপর দেশকে দিতে পারে যে সব কাঁচা মাল ও শিল্পজাত সে নিজে সৃষ্টি করে এবং যাহা তাহার প্রয়োজনের অধিক।

যুদ্ধের পূর্বে এই নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনও একটা সুনিয়ত পদ্ধতি ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকটা আজেমৌজে হিসাবের উপর করিতেন অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি। ইহা ঠিক সুষ্ঠুভাবে ও সুনিয়তভাবে হইতে পারিয়াছিল শুধু রাশিয়ায় যেখানে বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের একচাটিয়া।

বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে এই সমস্ত লেন দেনের চুক্তি একটু ব্যাপকভাবে হইয়াছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল দেশেই বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ সব ব্যবস্থা খুব কার্যকরীও হইয়াছে।

অটলাণ্টিক সনদের ইঙ্গিত এই যে, কাঁচা মাল সম্বন্ধে লেনদেনের চুক্তি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়মিত হইবে, কিন্তু ঠিক কি প্রণালীতে হইবে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। আর শিল্পজাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আটলাণ্টিক সনদ একেবারে নীরব।

তথাপি ভবিষ্যৎ জগতে শিল্পজাত কি কাঁচা মাল উভয় বস্তুর বাণিজ্যে যে পূর্বেকার মত অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে কিনা এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহা নিয়মিত করার চেষ্টা হইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা যুদ্ধের পূর্বে যেমন অনেকটা হইয়াছে যুদ্ধের পরেও তেমনি ষ্টেটের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শক্তিমান মালদারেরা শুধু তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য international curtel প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগতকে তাঁদের অধীন করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা আছে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এ সব সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এবং কেবলমাত্র ন্যায়নীতিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া সেগুলিকে মালদারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির হেতু না করিয়া সর্বজাতির হিতানুষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইবে। এক কথায় কৃষি, শিল্প, খনিজ-উদ্ধার প্রভৃতি সকল কার্যই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে সর্বদেশবাসীর হিতার্থে যাহাতে নিয়োজিত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাশিয়ার পাঁচসনা পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। তাঁহারা কেবলমাত্র দেশের সর্ববিধ সম্পদ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার দ্বারা বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ইহাও হিসাব করিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার তখনকার যে লোক-সংখ্যা ছিল এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে যে লোক-সংখ্যা হইবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক রাশিয়ানের খাওয়া-পরা ও আরামের জন্য কত কি প্রয়োজন হইবে এবং প্রত্যেকের জন্য কাজ জোগাইবার জন্য কি ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। এতখানি হিসাব করিয়া তাঁদের প্ল্যান রচিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ

জনসংঘ বা সোভিয়েটগুলির অপরিশ্রান্ত চেষ্টায় ইহা কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল। তাই সোভিয়েট প্ল্যান ও সোভিয়েটের সকল বৃহৎ প্রচেষ্টা এত অসামান্য সফলামণ্ডিত হইয়াছিল।

যুদ্ধোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় যদি আমরা কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়া বসিয়া থাকি, আধুনিক রাষ্ট্রঘটিত ও অর্থনীতিঘটিত তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়া পরিকল্পনা করিতে অগ্রসর না হই, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দিক হইতে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, বর্তমান জগতে অনধীনতার (Independence) কোনও মানে বা স্থান নাই। কোনও দেশই অপর দেশের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে, অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের যে আনলার্য নির্ভরের সম্পর্ক, তাহা যেন কি রাষ্ট্রীয়, কি অর্থনৈতিক অধীনতার সম্পর্ক না হইয়া সমান সমান রাষ্ট্রের সমবায়ের সম্বন্ধ হয়। এই দিক হইতে যুদ্ধোত্তর জগতের পরিকল্পনায় ভারতের যদি কোনও স্থান থাকে, তবে ভারতকে প্রবলভাবে প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন সর্ববিধ hegemony'র কল্পনার প্রতিরোধ করিতে হইবে, সর্বজগতের সমন্বয়ে রাষ্ট্র-সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

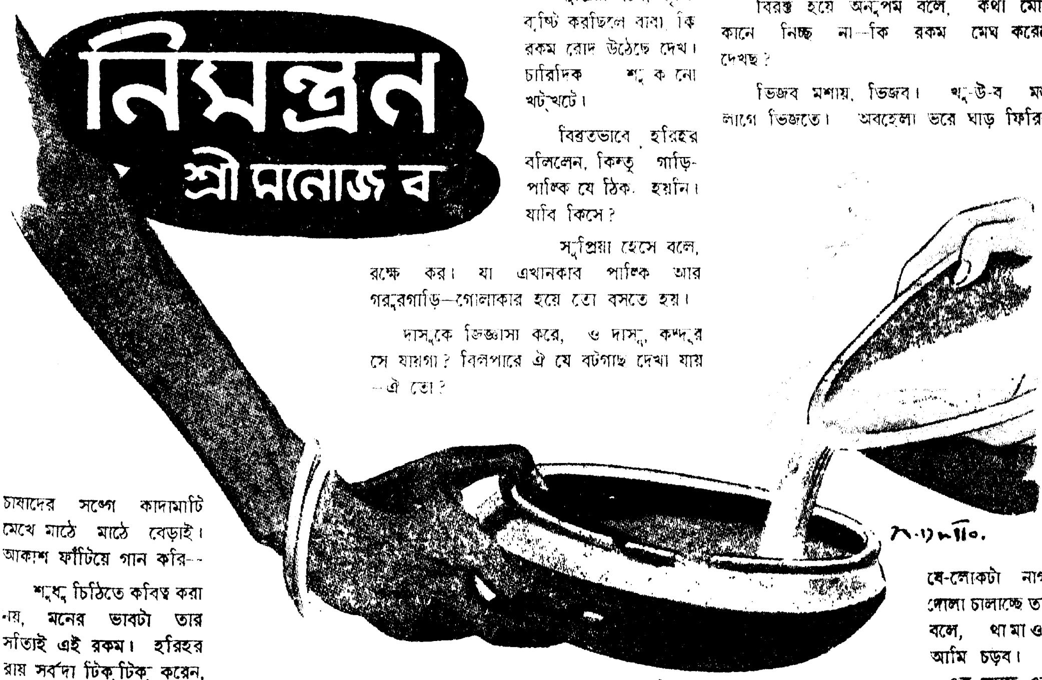
কেবলমাত্র প্রতিনিধিতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না, দৃষ্টি রাখিতে হইবে দেশের সর্বসাধারণের সমান অধিকারলাভের দিকে। আর্থিক ব্যবস্থায়, কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থায় যেমন ভূয়িষ্ঠ সৃষ্টির আয়োজন করিতে হইবে, তেমনি সেই সৃষ্ট সম্পদের সুযোগ যাহাতে সর্বদেশবাসীর সমান ভোগে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইজন্য সমস্ত শাসন যন্ত্রের পরিচালনার ভার স্তরে স্তরে জনসঙ্ঘের হাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং সেই সব জন-প্রতিষ্ঠানকে intensively শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সে ভার সৌষ্ঠবের সহিত বহন করিতে উপযুক্ত করিতে হইবে। যে শাসন-ব্যবস্থা হইবে তাহাতে এসব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে, যাহাতে সেই নীতির ফলে অসহায় ভারত আর একটা নূতন শোষণযন্ত্রের চাপে না পড়ে।

সর্বশেষে নীতি বা পদ্ধতির আবিষ্কারে আমাদের অতিমাত্র মৌলিকতার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আদর্শ সঞ্চয় করিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা হইয়াছে, ঠিক তাহাই যে অবিকল এদেশেও হইবে, এমন হইতে পারে না। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই সব বিদেশী আদর্শ ভাঙিয়া-গাড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু অনেকের এমন একটা মোহ আছে যে, আমরা এমন একটা কিছু করিব, যাহা জগতে কেহ কোথাও করে নাই, যার সম্বন্ধে কোথাও কাহারও অভিজ্ঞতা নাই। এই "নূতন কিছু করা"র অতিমাত্র মোহ এবং বিদেশী সকল আদর্শ ও অনুষ্ঠানের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ বর্জন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগের আলোচনা করিতে হইবে সকল দেশের সকল অনুষ্ঠানের এবং পৃথিবীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

নিমন্ত্রন

শ্রী মনোজ ব



কলকাতা শহরে তিন তিনটে বাড়ি। তবু এসে আছে এই অজ পাড়াগাঁয়ে। অঘটন ঘটেছে, কোন দিন কেউ যা স্বপ্নেও ভাবেনি। জাপানীরা বর্মামুলুক নিয়ে নিয়েছে, সেই আতঙ্কে শহর প্রায় খালি। ভদ্রলোকেরা গাঁয়ে এসে জুটেছেন।

ছেলেবয়সে সুপ্রিয়া দু-একবার এসেছে, তারপর অনেকদিন— প্রায় বছর পনের পরে এই এল। ভারি ভাল লেগেছে। অনুপমকে হপ্তায় হপ্তায় চিঠি দেয়, তাকে লিখেছে, সবুজ গাছপালা, মাঠভরা ধান, শান্ত ঘর-গৃহস্থালী—তুমি এসো একবার, এ-ছবি কোন দিন ভুলতে পারবে না! দোতলার ঘরে থাকতে এক মিনিটও মন চায় না। ইচ্ছে করে চাষাদের সঙ্গে কাদামাটি মেখে মাঠে মাঠে বেড়াই। আকাশ ফাটিয়ে গান করি—

শুধু চিঠিতে কবিত্ব করা নয়, মনের ভাবটা তার সত্যিই এই রকম। হরিহর রায় সর্বদা টিক্‌টিক্ করেন, কিন্তু আদুরে মেয়েকে সামলাতে পারেন না। এই যেমন আজ ধরে পড়েছে— বাঁকাবড়শি গ্রামে রথের মেলা হয়, খুব নামডাক, তিন দিন ধরে হৈ-হল্লা চলে—সুপ্রিয়া যাবে সেই মেলা দেখতে।

মেয়েছেলে যাবে ছোটলোকের ভিড়ের মধ্যে—ছি-ছি! এ অঞ্চলে ও-সব রেওয়াজ নেই, নিন্দে রটে যাবে। হরিহর কড়া সুরে মানা করলেন। সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঠোঁট দুটো চেপে অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করে। মা-মরা মেয়ে — মনটা নরম হয়ে গেল হরিহরের। বলেন, বৃষ্টি-বাদলার সময় যে মা, অসুখ করে বসবে — সেইজন্য বলি। নইলে লোকে কি বলল, আর না বলল, কি যায় আসে? এখানকার মানুষ নই তো আমরা!

রথের ছুটিতে অনুপম এল। সুখবর নিয়ে এসেছে। না—কোন রকম উপদ্রব হয়নি কলকাতায়। মানুষ-জন ফিরে আসছে, রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। তিনটে বাড়ির মধ্যে একটায় ভাড়াটে জুটে গেছে। কম ভাড়া অবশ্য—তাহলেও জুটেছে তো! হরিহর সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

চঞ্চল-পায়ে সুপ্রিয়া এসে ডাকল, বাবা—ও বাবা—

হরিহর বলেন, আয় দেখ বাবাজি, এই এক মুশ্কিল। পাগলী মা ক্ষেপে উঠেছে, মেলায় যাবে।

সুপ্রিয়া বলে, বৃষ্টি বৃষ্টি করছিলে বাবা, কি রকম রোদ উঠেছে দেখ। চারিদিক শুকনো খট্‌খটে।

বিব্রতভাবে হরিহর বলিলেন, কিন্তু গাড়ি-পাল্কি যে ঠিক হয়নি। যাবি কিসে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে, রক্ষে কর। যা এখানকার পাল্কি আর গরুরগাড়ি—গোলাকার হয়ে তো বসতে হয়।

দাসুকে জিজ্ঞাসা করে, ও দাসু, কদ্দুর সে যায়গা? বিলপারে ঐ যে বটগাছ দেখা যায়—ঐ তো?

বটগাছ ছাড়িয়ে আরও এক কোশ হবে দিদিমণি।

হোকগে। হেঁটে যাব — হাঁটিতে আমি খুব পারি। উড়ে চলে যাব দেখিস।

শেষ পর্যন্ত হরিহরকে মত দিতে হয়। অনুপমকে বললেন, তুমি এসেছ — রক্ষে পেয়েছি বাবা। তুমিও যাও—দেখে এসোগে। মেলাটা ভাল। মেয়েকে বললেন, বেলাবেলি ফিরবি কিন্তু—

যাব আর আসব বাবা—

বাপকে নিশ্চিন্ত করে দুটিতে রওনা হল। দাসু টোর কাটছিল। কিন্তু না—দরকার নেই। কত লোক যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে চিনে যেতে পারবে।

হরিহর মুখ টিপে হেসে দাসুকে বারণ করলেন।

মেলায় এসে সুপ্রিয়া মশগুল হয়ে গেল। মাটির পুতুল, রকমারি বাঁশী, চিত্রবিচিত্র হাঁড়ি সরা আনারস আর ডেয়োফল—কিনছে তো কিনছেই। কি কর্মে লাগবে এই সমস্ত আর কে-ই বা নিয়ে যাবে—

অনুপম বলে, ফেরা যাক—

নাগরদোলা ঘুরছে বন্‌বন্ করে, বাজনা বাজছে। বাইশ বছরের মেয়ে ছোট্ট খুকীটির মতো ছুটল সেদিকে। ভিড় জমেছে, জুতো-পরা সুশ্রী সুবেশ মেয়েটার কাণ্ড দেখে মানুষ-জন তাজ্জব হয়ে গেছে।

বিরক্ত হয়ে অনুপম বলে, কথা মোটে কানে নিচ্ছ না—কি রকম মেঘ করেছে দেখছ?

ভিজব মশায়, ভিজব। খু-উ-ব মজা লাগে ভিজতে। অবহেলা ভরে ঘাড় ফিরিয়ে যে-লোকটা নাগর-দোলা চালাচ্ছে তাকে বলে, থামাও— আমি চড়ব।

এক লাফে একটা খোপে উঠে বসল। অনুপমকেও ডাকে, এসো—এসো না—

অনুপম বলে, পাগল হয়নি তো আমি!

বটে! তড়াক্ করে নেমে সুপ্রিয়া তার হাত ধরে ফেলল। উঠতে হবে—হবেই—

টপ্‌টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল। সেই সঙ্গে বাতাস, বড় বাদামগাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি—মুষল-ধারে বৃষ্টি। মেলার জন্য অস্থায়ী চালা বাঁধা হয়েছে। যেখানে দশজনের জায়গা, পঞ্চাশজন মাথা ঢুকিয়েছে সেখানে। রশি-খানেক দূরে চাষীপাড়া, কলাবনের আড়ালে ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। এরা ছুটল, সেদিকে।

এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। টিনের আটচালা, দুটো গোলা পাশাপাশি। বাহিরের দিককার দাওয়ায় তারা উঠেছে। মাটির দেয়াল দিয়ে অন্তঃপুর আলাদা করা। খানিকটা জায়গায় দেয়াল নেই, বর্ষা এসে পড়ায় দেয়াল দেবার অবকাশ হয়নি হয়তো, সেখানটা সুপারিপাতার বেড়া দেওয়া। সম্পন্ন গৃহস্থ—মেয়েদের সূর্যের অগোচর না হোক, মানুষের চোখের আড়ালে রাখবেই।

কাপড়চোপড় ভিজে জব্‌জবে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাড়ির কর্তা দ্বারিক সর্দার গামছা হাতে ছুটতে ছুটতে এল। জলচৌকিটা ঝেড়ে দিয়ে বলে, এসো মা, জলটা আগে মোছ। কি করা যায়! আমাদের ঘরের কাপড় দিই কেমন করে?

সুপ্রিয়া বলে, একটুখানি ভিজেছে। ও গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাবে।

দ্বারিকের তবু সোয়াস্তি নেই। শীত করছে, আগুন পোহাবে মা? আনব আগুনের মালসা?

সুপ্রিয়া হেসে তাড়া দেয়, আপনি ঘরে যান দিকি। কিচ্ছু লাগবে না আমাদের।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিটা একটু কমে, এরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখনই আবার চেপে আসে। মেঘান্ধকার বিদ্যুৎ-চমক টিনের চালে জল পড়ার আওয়াজ — চারদিক তোলপাড় করে তুলেছে।

বুড়োর ছেলে কার্তিক জল ছপ্‌ছপ্ করতে করতে উঠোন পার হয়ে এসে খবর দেয়, রান্নার যোগাড় হয়ে গেছে। আসুন।

রান্না? ভালো রে ভালো—রান্না এখন কে করতে যাচ্ছে?

উপোস করে থাকবেন? সে হবে না।

অনুপম বললে, বৃষ্টি থামলেই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করোগে ওদিকে—

হঠাৎ দ্বারিক বেরিয়ে আসে। যেন আগের সে মানুষ নয়। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—নামো দাওয়া থেকে—

অনুপম অবাক হয়ে বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে?

ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। ভিটেয় উপোস করে পড়ে থেকে অকল্যাণ ঘটাবে?

যে রকম মেজাজ, মুখে যা বলছে—কাজেও ঠিক তাই করবে। সুপ্রিয়া ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। কার্তিকের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি। এক্ষুনি গিয়ে চাপাব।

অনুপম কিন্তু নির্বিকার। ইতিমধ্যে মাদুরের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, আর পা নাচাচ্ছে।

সুপ্রিয়া বলে, স্ফূর্তি যে গায়ে ধরে না!

তোমার রান্না ভাত খাব আজকে। ভাত বেড়ে, ব্যঞ্জন সাজিয়ে আমায় ডাক দেবে, তার আগে নড়েও বসছি না।

সুপ্রিয়া বিপন্ন ভাবে বলে, আচ্ছা বলো তো—এ সব কি জানি, না করেছি কোন দিন? রান্না ঘরে উঁকি মেরেও দেখতে দেন না বাবা।

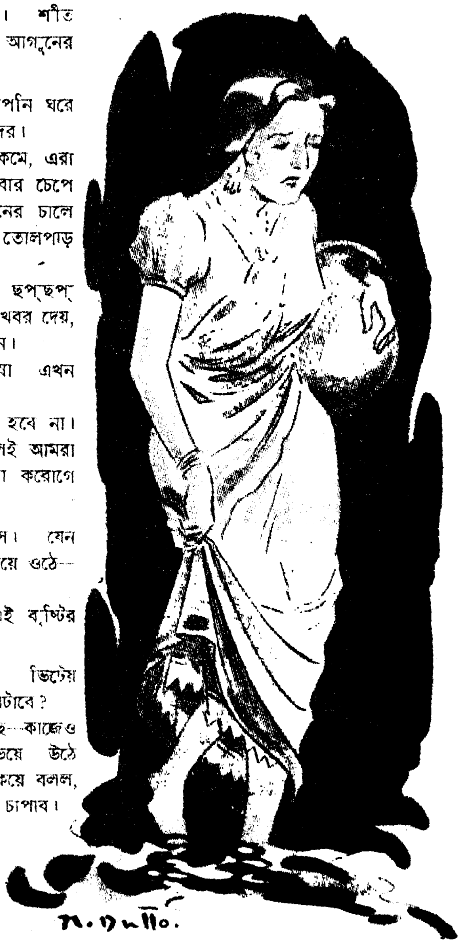
অনুপম বুক ঠুকে বলে, এই আমার কিন্তু সমস্ত জানা। হোস্টেলে যত পিকনিক হোত, রান্নার ভার আমার উপর—

ওঠো তবে—

বদনাম রটে যাবে যে—বলবে, বউমুখো। আর তোমাকে কি বলবে জানো? গতরশোকা বউ—বরকে দিয়ে রাঁধাচ্ছে।

পা নাচাতে নাচাতে এবার গুনগুনিয়ে গান ধরল অনুপম।

দ্বারিক আবার এল, হাতে লণ্ঠন আর প্রকাণ্ড আয়তনের এক কলসি। বলে, চলো মা, ঘাট দেখিয়ে দিচ্ছি। তালের খেটে—বড্ড পিছল, কলসি নিয়ে সাবধান হয়ে উঠতে হবে।



সুপ্রিয়া শীতে হি হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

অসহায় ভাবে সুপ্রিয়া বলে, ও-বাবা! অত বড় কলসি টানতে পারব না তো। জলটা কেউ আপনারা তুলে দিন।

দ্বারিক বলে, পোড়া কপাল! ব্রাহ্মণ-সেবার জল আনব, সে কপাল করে এসেছি কি মা? জল-চল জাত হলে তোমায় কষ্ট দিতাম না।

অনুপম উঠে বলে, আমি — আমি এনে দিচ্ছি। অসুখ থেকে উঠেছে কিনা দেহটা ভারি দুর্বল—

সুপ্রিয়া এক ঝাঁকিতে কাঁধে তুলল কলসি। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুপমকে আড়াল করে বলে, আলো তুলে ধরুন কর্তা, দেখা যাচ্ছে না।

উঠান জলে ভর্তি। জুতো খুলে শাড়ির আঁচল দো-ফেরতা কোমরে জড়িয়ে সুপ্রিয়া শীতে হি-হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

ভাত চেপেছে, টগবগ করে ফুটছে, সেই সময় অন্ধকারে অনুপম এসে উঠল। বলে, অত বড় অসুখ থেকে উঠলে, পেরে উঠবে না। মাছটা আমি রাঁধব।

ঘাড় দুলিয়ে সুপ্রিয়া বলে, পারব — খুব পারব গো। কাজে ভণ্ডুল দিও না বলছি। আগে ছিল অভিমান, এখন এই একটা রাতের গৃহিণীপনায় সত্যি সত্যি তার খুব আমোদ লাগছে। খুন্তি উঁচিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যাও বলছি, যাও—

ঘরের ভিতর কার্তিকের বউ যামিনী আর বোন পুঁটির মধ্যে খুব হাসাহাসি হচ্ছে তখন। যামিনী পুঁটিকে টানতে টানতে বেড়ার ধারে নিয়ে এসেছে। বলে, শোন দিদি, কি বলছে শোন। বর রাঁধতে এসে দাঁড়িয়েছে—বউটার নাকি বড্ড অসুখ। তিনটে কুমীরে খেয়ে উঠতে পারে না—অসুখে তিনি মরে যাচ্ছেন। হি—হি—হি—

মর্ পোড়ারমুখী, হেসেই খুন হলি। চঞ্চল বউটার গাল টিপে দিয়ে পুঁটি নিজের কাজে গেল।

সেই বেড়ার ধার থেকে যামিনী নড়ল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুপ্রিয়ার কাণ্ড-কারখানা। আবার ননদের কাছে ছুটে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। বলে, ধিঙ্গি মাগী রান্না করছে দেখে যাও। জুতো পরে গট্‌মট্ করে বেড়ায়—ইদিকে বেড়ি ধরতেও জানে না। মুখে আঁচল দিয়ে সে হাসে। হাসির বেগ ঠেকাতে পারে না।

চুপ কর্—শুনলে কি মনে করবে, চুপ্ চুপ্! বলতে বলতে পুঁটিও হেসে ফেলে। সে-ও কিছু কিছু দেখেছে। তারপর বউকে যুক্তি দেয়, পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ফেলছে—আহা, মুখে দেবে কি করে! ওখানে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিগে যা—

যামিনী জিজ্ঞাসা করে, যাব দিদি? দোষ হবে না?

পুরুষমানুষ তো কেউ নেই ওদিকে—যাই তাহলে? যামিনী ছুটল।

পুঁটি সামাল করে দেয়। চালের নিচে াসনে কিন্তু—খবরদার! ভাত মরে যাবে।

গোলগাল কালো বউটা ঝুম্‌ঝুম্‌ পালং-াতা মল বাজিয়ে রান্নার জায়গার খানিকটা



যাবি নিশ্চয় যাবি। তুই তোর বর তোর শ্বশুর—তোদের বাড়ি সুন্দ যাস কলকাতায়

দূরে এসে দাঁড়ায়। চুপ্‌চাপ দেখে, আর মুখ টিপে টিপে হাসে। তারপর বলে উঠল, কি করছেন? মাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে, গন্ধ বেরুচ্ছে। জল ঢালুন শিগ্‌গির—

সন্ত্রস্ত হয়ে সুপ্রিয়া হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিল।

ঘটিশুদ্ধ ঢাললেন? নাঃ—রান্নার কিচ্ছু জানেন না। মুখে বলে বা কি করব, হাত ধরে দেখিয়ে দিলেও আপনার হবে না।

সুপ্রিয়া হেসে বলে, তা দেখিয়ে দিয়ে যাও না ভাই হাতটা ধরে—

বেশ লাগে বউটিকে। কথায় কথায় হাসে, আর ভঙ্গিটি এমন—যেন কত বড় গিন্নি! সুপ্রিয়া দেবী—বড় বড় দুটো সমিতির সেক্রেটারি আর একটার ভাইস-প্রেসিডেন্ট—চাষাবউ তাকে একদম অপদার্থ আনাড়ি ভেবে বসেছে।

খেতে বসেছে অনুপম। খেতে খেতে বলে, তুমিও বসে যাও সুপ্রিয়া। সেই কখন খেয়েছ। সন্ধ্যায় চা-টা হয়নি—

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বেড়ার ওধারে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ওমা কি ঘেন্না! মেয়েমানুষ পুরুষের সামনে বসে খাবে—কি যে বলো তুমি!

অনুপমের সামনে মাটির উপর সে চেপে বসল। বলে, ডালটুকু ঢালো বলছি। ফেলতে পারবে না, মাথা খাও। বলে ফিক করে হেসে ফেলল।

অনুপম চোখ তুলে বলে, নুনে পুড়ে যবক্ষার হয়ে গেছে, গলায় উঠছে না। জল ঢেলে নাও, গ্লাসে জল রয়েছে।

তারপর মাছের ঝোলের বাটি থেকে এক হাতা কেটে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, এটা?

পানসা। মোটেই নুন দাওনি।

নুন মেখে নাও। গুড়তে দিয়ে দিইছি। একটা হাতপাখা ছিল ওদিকে, কুড়িয়ে এনে সুপ্রিয়া জোরে জোরে বাতাস করে।

কি করো—আহা করো কি? এই ঠান্ডা, জমে গেলাম যে!

পতিসেবা করছিলাম—কেড়ে নিলে তো? নাঃ, কিছু করতে দেবে না—মরে গেলে আমায় নরকে নিয়ে ঠাসবে।

অনেকগুলো মানুষ উঠানে। দুনো ভাড়া কবুল করে হরিহর পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন—মেয়ে জামাই দুজনারই। সঙ্গে আলো নিয়ে দাসু এসেছে। খোঁজ করতে করতে তারা এখানকার খবর পেয়েছে।

সুপ্রিয়ার খাওয়ানো দেখে দাসু অবাক হয়ে গেছে। বাঃ রে, দিদিমণি রান্না করেছে, সামনে বসে খাওয়া করেছে কেমন।

অনুপম বলে, আর রেঁধেছেও একেবারে অমৃত। ওরটা এখনো আছে, চেখে দেখবি নাকি দাসু?



ফুটপাথের উপর মেয়েপুরুষ নানান বয়সী, বেহায়া—বেআবরু...........

পাল্কিতে উঠিবার সময় দ্বারিক আর কার্তিক এসে দাঁড়াল। দ্বারিক বলে, গুহক চণ্ডালের ঘরে রামচন্দ্র এসেছিলেন মা, আমাদের হল সেই বিত্তান্ত। আমিও একদিন যাব তোমাদের গাঁয়ে, রায়-কর্তার চরণধুলো নিয়ে আসব।

সুপ্রিয়া বলে, আমরা কলকাতায় ফিরছি। অনুপমের দিকে কটাক্ষ করে বলে, খুব শিগগিরই—ভগ্নদূত এসে উপস্থিত।......তা চলো না কেন কলকাতায়। যাবে ?

দ্বারিকের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে কলকাতার নামে। আজব শহর। কল টিপলে আলো জ্বলে, কল ঘোরালে জল পড়ে। অমাবস্যার রাতেও অন্ধকার নেই, ভারি স্ফূর্তির জায়গা।

এক খড়ের ব্যাপারির সঙ্গে দ্বারিক সর্দার কলকাতায় গিয়ে ছিল তিন দিন। আজ তিন বছরেও তার গল্প শেষ হল না। ছেলের নূতন বিয়ে দিয়েছে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক সেজে নিয়ে মাদুর বিছিয়ে শোয়, যামিনী-বউ শ্বশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। বুড়ো ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানে সেই সময়টা, আর কলকাতার গল্প করে।

অনুপমও বলল, নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি। যেও কিন্তু, সর্দার। আমাদের বাড়িতে থাকবে, হাঙ্গামা নেই। ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

দ্বারিক উল্লসিত হয়ে বলে, অত করে বলেন কেন ? যাব, ঠিক যাব। শহর তো নয়, সগ্গোধাম। ক্ষেতের ধান গোলায় তুলে দিয়ে চোত-বোশেখের ওদিক গিয়ে উঠব।

সুপারি-পাতার বেড়ার আড়ালে যামিনী। মল আর কাচের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয়া তার কাছে গেল। আলগোছে প্রণাম করে যামিনী বলে, কথাবার্তা শুনেছি। আমিও কিন্তু যাব, দিদি—

যাবি, নিশ্চয় যাবি। তুই তোর বর তোর শ্বশুর—তোদের বাড়িসুদ্ধ যাস কলকাতায়—

এবার আর শুনল না সুপ্রিয়া। বউটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে সে পাল্কিতে উঠল।

চোত-বোশেখ অনেক দিন চলে গেছে। ক্ষেতের ধান বাড়ি এসেছে, কিন্তু গোলায় ওঠেনি। ধানের পালায় পালায় উঠানে পা ফেলা যেত না—এত ধান গেল কোথায় ? কে নিয়ে গেল ?

লোকে ভয় দেখাতে লাগল, ধান বেশি রাখলে বিপদে পড়বে সর্দার। আর দরটাও এমন—যা সাতপুরুষে কেউ কানে শোনেনি। প্রথম-চৈত্রে চাষারা ধান বেচে দিয়েছে। অগুণতি নোট—সিকেয় ঝোলানো লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে এনে এনে রাখত, নোটে নোটে স্তূপাকার হয়ে উঠল। আউশ উঠবার মুখে দর নামবে—টাকার কাঁড়ি রইল, ভাবনা কি ? সেই সময় ধান কেনা যাবে যার যেমন খুশি।

সেই নোটের বোঝা শুকনো পাতার মতো যেন বাতাসে উড়ে গেল। এক জোড়া কাপড় কিনবে তো গুণে দাও এক গাদা নোট। নুন কিনবে, কেরোসিন কিনবে—দাও এক এক মুঠো। আর এমন হয়েছে, আজকে নোটের পাহাড় ঢেলে দিলেও সমস্ত অঞ্চলে এক খুঁচি ধান কেউ দেবে না। ধান-চাল ভেল্কিতে উড়ে গেছে।

হরিহর রায় শুধু নন, যত সজ্জনেরা এসেছিলেন কেউ আর নেই। ইস্কুল করবেন, নতুন রাস্তা টিউবওয়েল বসাবেন, সোনার গ্রাম গড়ে তুলবেন—সে সব সাধু সঙ্কল্প মুলতুবি রইল। জল-জঙ্গল সাপের ভয় ম্যালেরিয়া তার উপর জিনিষপত্র কিছু পাওয়া যায় না—এর চেয়ে বোমার ঘা খেয়ে মরায় আরাম অনেক বেশি। শহুরে মানুষরা পাগল হয়ে শহরে পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে গ্রামের মানুষরাও। পেটের ক্ষিধেয় ছিটকে পড়ছে। বোঁচকা বেঁধে কাঁধে নিয়েছে শীতল; পিছনে শীতলের মা বোন বড়ছেলেটা আর কোলের মেয়ে। উনুন ভেঙে দিল; আর কেউ এসে না রাঁধে—অলক্ষণ। ছেলেটা যেতে যেতে বলে, দাঁড়া পিসি, দোর-ঘুঁড়িটা রয়েছে মাচার উপর; নিয়ে আসি। পিশি বলে, তাইতো—মাচা ভরতি আমার মশালের গাদা। পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে সমস্ত মাঘমাস সে মশাল বানিয়েছে, বর্ষাকালে পোড়াবে বলে।

মুসলমান পাড়ায় শোন গলা-ফাটিয়ে কাঁদছে আতর বিবি, ধুলোয় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। ওদের যে আমি এক কুড়ি বছর চোখে চোখে চৌকি দিচ্ছি—কার কাছে রেখে যাব আজকে ? বছর কুড়ির আগে আতর বিবির একটা চুল পাকেনি, দেহে কুঞ্চনরেখা পড়েনি—তিন দিনের আগ-পাছ তার বর ও ছেলেটা মরে যায়। উঠানের ধারে তেঁতুলতলায় তাদের কবর। বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে অনেক দুঃখে এতদিন ভিটেয় ছিল—শুধু ভিটের মাটি চিবিয়ে থাকবে আর কেমন করে ?

গ্রাম খা-খা করে। বন্যা এসে যেন মানুষ-জন ঘর-গৃহস্থালী ভাসিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল।

সহর অবধি ধাওয়া করল বন্যা। বন্যার জলে মড়া ভেসে এসেছে—জীবন্ত মড়ার দল দেখতে দেখতে সহরের রাস্তা গলি পার্ক ভরতি করে ফেলল।

শহরের যত আলো চুঙিতে মুখ ঢেকেছে। ভাগ্যে ব্লাক-আউট—তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ গৃহস্থালী নজরের আড়ালে থাকে। হরিহর রায়ের চিরকালের অভ্যাস, ভোর থাকতে উঠে গঙ্গা স্নানে যাওয়া। ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে মানুষ বাধে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে হয়, পদপিষ্ট ঘুমন্ত মানুষ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে—যাবেন কি করে? ঘর থেকে তিনি বেরোনই না। চল্লিশ বছরের চেনা কলকাতা আজকে যেন এক নূতন ভয়ানক জায়গা। ফুটপাথের উপর মেয়ে-পুরুষ—নানান বয়সী, বেহায়া, বেআবরু। অবোধ শিশু কেঁদে কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে—কোথায় দুধ? মা গিয়ে রাস্তার কলে আঁজলা আঁজলা জল খাওয়ায়।

সকালে ঘুম ভেঙে শহরের কর্মব্যস্ততা জাগে। রাস্তা গলি ঝেঁটিয়ে সাফ-সাফাই হচ্ছে, করপোরেশনের ময়লা-গাড়ি ছুটছে, ছুটে বেড়াচ্ছে এ. আর. পি. আর সিভিক গার্ডের দল—এই একটা মড়া, ঐ যে ওখানে একটা, ঐ......ঐ......ঐ......

হঠ্ যাও—এই, আরে ওঠ্ না হারামজাদী—পালা—পালা—।

ভাঙা টিনের মগ কি মাটির মালসা হাতে কেউ ছুটল লঙ্গরখানায়, কেউ বা গৃহস্থ-পাড়ায়, কেউ বা গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস যে জায়গায় গিয়ে থামে সেখানে। পথচারীর পা জড়িয়ে ধরছে, গরুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আস্তাকুড় হাতড়াচ্ছে, তাড়া খেয়ে খেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরছে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সুপ্রিয়া অনুপমকে বলে, চলো—পালিয়ে যাই। আমি বাঁচব না এখানে থেকে—

নিচে সদর-দরজার দিক থেকে একটানা আর্তনাদ—মা, মাগো, ওমা—

অনুপম সান্ত্বনা দেয়, ভয় কিসের? মা বলছে—'মা' ডাকের চেয়ে ভাল আছে কিছু?

কেমন এক ভয়ানক বিপর্যস্ত মূর্তি হয়েছে সুপ্রিয়ার। অনুপম বাইরে এসে রেলিং ধরে নিচে তাকায়। অন্ধকারে অবলুপ্ত শহর পরিত্যক্ত শ্মশানভূমির মতো লাগছে।

তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে, একটা-দুটো নয়—অনেকগুলো, যেন প্রেতের মেলা বসেছে। বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকছে, মা—মাগো, ফ্যান দাও, একটুখানি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসা কুলোয় না, ভাত কে দেবে এমন দিনে?—অবিরাম চেঁচাচ্ছে, ফ্যান—ফ্যান—ফ্যান

পুরুষমানুষ অনুপম—তারও বুকের ভিতরে গুমু-গুরু করে ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে, শুনতে পাস না এই দাসু? এই—এই—

দাসুদের ভাত ইতিপূর্বে এমনি একটা দলকে দিয়ে আবার রান্না করতে হয়েছে। খেয়ে দেয়ে এই সবে একটুখানি চোখ বুজেছে—

ফ্যান—ফ্যান দাও—

সুপ্রিয় অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে ওরে দাসু বিদেয় করে দে ওদের—

দিচ্ছি, দাঁড়া—

ঘুম চোখে দাসু রান্নাঘরে ছুটল।

বাবা রে, মেরে ফেলেছে রে! গরম ফ্যান উপর থেকে হাঁড়িসুদ্ধ ঢেলে দিয়েছে মালসার ভিতর নয়, ওদেরই কারও মাথায়। কান্নার চেঁচামেচিতে খণ্ডপ্রলয় বাধল। রাগের মাথায় কাণ্ডটা করে দাসু বেকুব হয়ে গেছে। দ্রুত সে নিচে নামে। টর্চ জেলে অনুপমও ছুটল, পিছনে সুপ্রিয়া। কমবয়সী একটা বউ পোড়ার



কমবয়সী একটা বউ পোড়ার জ্বালায় ছটফট করছে।

জ্বালায় ছটছট করছে, গলা-কেটে-দেওয়া পাখীর মতো। রাস্তার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আর যারা চেঁচাচ্ছিল, এদের দেখে চক্ষের পলকে সরে পড়ে। হয়তো আরও গরম ফ্যান নিয়ে এসেছে, কিম্বা নূতনতর কোন অস্ত্র। অস্থিসার অশক্ত এক বুড়ো কেবল নড়ে না, 'হায়' 'হায়' করছে আর মাথায় ঘা দিচ্ছে। সুপ্রিয়ার দিকে কি রকম চাইছে! মেয়েমানুষ দেখে বোধ করি সহানুভূতির প্রত্যাশায় জোড়-হাতে টলতে টলতে তার দিকে এগুতে লাগল। সুপ্রিয়া ক্ষিপ্তের মতো অনুপমের হাত ধরে টান দেয়, এসো, চলে এসো। দুয়োরে খিল এঁটে দিল।

নিঃশব্দ......ভিখারীর দল পালিয়েছে। শুয়ে শুয়ে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিখুশি বউটির কথা—যামিনীর কথা। গ্রাম থেক নিমন্ত্রণ করে এসেছিল, এসেছে নাকি শ্বশুর আর সেই নূতন বউটি শহরে—আছে কোথাও কোন এক দলের সঙ্গে? বিপাকে পড়ে তিনটি মাস গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামকে ভালবেসেছিল, সেই ছবি সুপ্রিয়ার মনে ভাসে—বাঙলা দেশের সর্বকালের চেহারা। উঠানে পোয়ালগাদা, একটা বাছুর শুয়ে পড়ে আপন মনে পোয়াল চিবোচ্ছে......নারিকেল গাছের ফাঁকে দূর-প্রসারিত সবুজ বিল......পুকুর একটা—টোকা-শেওলা আর কলমিলতায় ভরা, লাউয়ের মাচা চলে গেছে অনেকখানি জল অবধি......কলাগাছ ও বনকচুর উপর দিয়ে ঝিঙেগাছ লতিয়ে চলেছে, হলদে হলদে ঝিঙে ফুল......ঘুঘু ডাকছে এদিকে-সেদিকে, ডাকছে মাছরাঙা ফিঙেপাখী......পুকুরে মাছের আফালি, ঘোমটাদেওয়া বউরা ঘাটে এসে বাসন মাজছে। নিরুদ্বিগ্ন ঘর-গৃহস্থালী, সুপারি-পাতার বেড়ায় ঘেরা পরিপাটি অন্তঃপুর।

আবার যদি যায় কোনদিন, দেখতে পাবে সেই বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙা? সকালে খবরের কাগজে থাকে যুদ্ধের খবর—বোমার আগুনে হাস্যোজ্জ্বল কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! খবরের কাগজে বাঁকাবড়শি-মাদারডাঙার কথা কেউ লেখে না। এসব বাজে খবর, কাগজে জায়গা নেই।



নও জোয়ার

এ কি—জরার জোয়ার এল জীবনে!
দুহিন অঙ্গের তটে
খরস্রোতে উন্মূলে
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলোছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছলি উঠে
শুভ্র চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁঝের পাড়ি
স্বক্-তরঙ্গে পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুব্‌ছে।
হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাস্‌লে লাবণ্য,
গহিন্ ভাঙন-মুখে
ভাঙ্গা রূপগঞ্জে
নিশ্চিহ্ন যে আসন্ন।

ক্ষাটা পাড়ে ধরে টান
গাঙ্‌পাখী ছাড়ে খোপ,
ঝুপ্ ঝাপ্ ভেঙে পড়ে
যুঁইঝাড় বেনাঝোপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে যাওয়া যত ভুল
কোথায় ফিরছে আজ কে জানে,
চোখের সমুখ দিয়ে উজানে!
তপন ডুবছে বাঁয়ে
আবছা গেরুয়া গায়ে,
ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,
তেজ্ কোটালের মুখে
দু'পারে পড়েছে ঝুঁকে
চৈতি ধরণী নিঃশস্যা।
কূলে কূলে উঠে ফুলে
দুঃসহ এ জোয়ার,
পরাণ ধরিতে নারে
তনুধারণের ভার,—সাথী গো!
কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদিছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
রাঙায় অন্ধকার রাতি গো!

উজান জোয়ারি হাওয়া,
হে মম বিহঙ্গমী,
সাধ্য ত নাহি আর
দুজনে অতিক্রমি;
ওগো যৌবন সখি,
বুঝেছ কি, বুঝিছ কি?—
দিবসের শুকশারী—
রজনীর চখাচখী?
আসিছে বাঁশীর ডাক—
জীবন উজানি' যাক্,
যৌবনী অপরাধ
তুমি ক্ষম' আমি ক্ষমি,
অবশ্যম্ভাবীরে
তুমি নম' আমি নমি।

হে মম বিহঙ্গমী,
এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন্ ক্ষতি?
ভেঙে চুরে ধুয়ে যদি
অকূলে একূল যায় খোয়া রে!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কথা

পুরাণো দিনের জন্য অশ্রু
নতুন দিনের জন্য অভিসম্পাত।
হিংস্র দাঁত,
লুব্ধ হাত,
হে অক্লান্ত করাত!
(হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে
পুরুষেরা বলে,)
তোমায় প্রণিপাত!

মেয়েদের সহিষ্ণু হাতে
রুগ্ন শিশুর নৈবেদ্য নিলেন বিধাতা।
পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ পেলেন দাতা।
গ্রামে মড়ক, নদীতে বন্যা,
ক্ষুধার যজ্ঞাগ্নিতে
অন্নব্রহ্ম নিলেন
ভিটে, মাটি, তৈজস এবং কন্যা।

নির্লিপ্ত রাজপথ
এক শূন্যতা থেকে
অন্য শূন্যতার দিকে হাত বাড়ায়।
পথের শেষ কোথায়?

নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন,
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হ্রদের মতো দাম্পত্য!
—তোমাদের হরিদ্বর্ণ আস্তরণে
পৃথিবীর কতোটুকুই বা ঢাকে?
শুধু লাখে লাখে
যুবক-যুবতীর শোভাযাত্রা নিশ্চিহ্ন হয়।
তারপর
এক ফানুসের জয়,
অন্য ফানুসের পরাজয়।
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হ্রদের মতো দাম্পত্য!
নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন!
সমস্ত ভূমিকা মুছে
কে আছে?
চিরঞ্জীব কথারা বাঁচে।

হরপ্রসাদ মিত্র

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরণ হতে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।

পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।

নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মত হতে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয়;—
প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।

কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয়,—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো:
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।

সূর্য অনেক দিন জ্বলে গেছে মিশরের মত নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হ'তে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মত
জীবনের মানে বার ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরো চেতনার ব্যথায় চ'লেছে।

মাঝে মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হ'ল তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।

হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলি ভেঙে যায়
স্প্লিণ্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পূব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কীর লেন-দেন ডলারে প্রতায়;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই:—
অগণন তাপীসাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

—শ্রীজীবনানন্দ দাশ।

ভাবীকাল

মেঘ ভেঙে পড়ে। ঝলমলে সূর্য ওঠে জ্বলে'
প্রাণের আকাশে;
কালের যে রথচক্র অশান্ত ঘর্ষণে তার
স্ফুলিঙ্গ বাতাসে,—
অগ্নি জ্বলে আবর্জনাস্তূপে: লোভ, নীচতার
অন্তরালে যে দুর্বৃত্ত ছিল ছদ্মবেশে—
বাহিরে এসেছে অবশেষে।
সহস্র প্রাণের দীপ্তি সহস্র সংগ্রামে
সহরে ও গ্রামে
সাড়া আনে সুপ্তিহীন ঐক্যবদ্ধ সহস্রের প্রাণে:
স্খলিত যে বুদ্ধিজীবী
আপন সংস্কারে আত্মহারা—
বক্ষ দীর্ণ করে তার ক্ষমাহীন দীপ্তির কৃপাণে।

চারিধারে পোড়ামাটি তবু জানি যে ছোঁয়াবে নব স্পর্শমণি
তারি সাথে আছে পরিচয়—
দুঃখদৈন্যে দুর্ভিক্ষেও তাই দিন গণি'
গাই সেই জীবনের জয়।

মৃত্তিকায় রক্ত ঢালি। আরো রক্ত প্রতিশ্রুত
মৃত্তিকার লাগি';
সম্মুখে দিগন্তরেখা স্থির: যদিও পথের
অন্ধকারে আজো ফণা রয়েছে উদ্যত।
প্রতিক্রিয়া পিষ্ট দেশে-দেশে। নব-নব রূপে
সে রঙ্গিনী
বিষবাষ্প তবুও ছড়ায়—
(মৃত্যুজয়ী সৈনিকেরা থেকো হুঁসিয়ার!)
বহু ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী সওদাগর বিমর্ষ কেরাণী
রাত্রিদিন সে-পাঁকে জড়ায়।

অসমাপ্ত আজো পরিচয়। আকাশে এখনো কিছু মেঘ;
এখনো বাতাস
যেন কার নিরালম্ব বৈরাগ্য নিশ্বাস—
পুষ্পবনে ফোটেনি তো ফুল, পাখীর কূজন
আজো নিরুচ্চার; হয়তো বা গেছে সব উড়ে
বহু দূরে
যেখানে আকাশ ঘেরা নয় আর বাষ্পপূর্ণ মেঘে,
যেখানে মৃত্তিকা
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকা;
যেখানে প্রাণের স্রোত বয় এক উদ্দাম আবেগে।

এখানে আমার মন কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত।
আজো তো তাদেরি একজন
ছিল যারা অভাজন, যাদের চেতনা
মর্মমূলে এনেছে প্রেরণা
বন্যাবেগ সংগ্রামের, সংগ্রামজয়ের।
বিচলিত বুদ্ধিজীবী অক্ষম ভ্রূকুটি তুলে ধরে,
অদ্ভুত হতাশা তার স্বরে—
কেবলি কাঙাল সুরে আপনার স্বৈরাচার সমর্থন করে।

সব কথা সব চঞ্চলতা
কিন্তু ক্রমে চুপ হ'য়ে আসে;
ক্ষিপ্রবেগে তন্দ্রাহীন চলি সঙ্গী সহস্রের সাথে
যেখানে রাতের শেষে
সূর্য জ্বলে সমুজ্জ্বল নতুন আকাশে॥

—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

২২শে শ্রাবণে

২৫শে বৈশাখ ছিল
মুখরিত আনন্দ-উৎসবে ;
উৎসবের নব শংখধ্বনি
দিক্ হতে দিগন্তরে,
ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি ব্যেপে
জীর্ণ ক্লান্তি বিদারিয়া
জীবনের মহানন্দ স্রোতে
এনে দিত তরঙ্গ-ভঙ্গিমা।
প্রভাতের আলো এসে দিত ডাক্
—এল আজ ২৫শে বশাখ।
বর্ষ-প্রবেশের দ্বারে
সস্নেহে হানিয়া করাঘাত
দিনান্তের বিষন্নতা, সুদীর্ঘ রাত্রির অবসাদ
মুহূর্তে নিঃশেষ করি'
বার বার এসেছে বৈশাখ
সম্মানিত ২৫শে বৈশাখ।

জীবনের অভিষেকে
নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ দিনে
উৎসারিত আলোর প্লাবনে
উচ্ছলিল ২৫শে বৈশাখ।
ধরণীরে উচ্চকিয়া
সঞ্চারিয়া জীবন-হিল্লোল,
বার বার দেখা দিল
প্রতীক্ষিত ২৫শে বৈশাখ,
জ্যোতির কনক পদ্মাসনে
ধ্যানমগ্ন দেখিনু কবিরে ;
বহ্নি-বীণা ঝংকারিল তাঁর
জীবনের প্রথম প্রত্যুষে ;—
সে বীণা নীরব হ'ল
মূর্চ্ছনার উদ্দাম আবেগে
মন্দভাগ্য ২২শে শ্রাবণে॥
এই দিনে, ২২শে শ্রাবণে
আজি সে উৎসব নহে
যে উৎসবে জীবনের গান
আপন নির্মোক ভেদি' উদার আকাশে
মুক্ত বিহংগম সম ডানা মেলি বিপুল উল্লাসে
ছুটে চলে বাধা-বন্ধ-হারা ;
আপনার অন্তর-আবেগে
আপনি সে দুর্দম নির্ভয়,—
আজি সে উৎসব নহে
আলোর প্রসাদ লভিবারে
এ মোদের তপস্যার দিন,
উৎকণ্ঠা-অতিষ্ঠ প্রাণ
সমুৎসুক আলোর ভিখারী
আজি তার তীর্থ-পরিক্রমা।
অতীতের উদয়-শিখরে
তমিস্র রাত্রির পরে
উষার অস্ফুট বাণীটিরে
যে রবি ফুটাল ধীরে ধীরে
দলে দলে আলোর কমলে ;
প্রভাতের প্রথম কুসুমে
আঁকি দিল অনুরাগে
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন—
সে রবি ডুবিল ধীরে
অস্ত-গিরি যবনিকা পারে ;
পশ্চাতে রাখিয়া গেল তার
আনন্দ-রূপিণী বাণী
সুন্দরের শাশ্বতী প্রতিমা,
বহ্নি-বীণা ঝংকারের
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভৈরবী রাগিণী
রেখে গেল আকাশে বাতাসে।
তাই মনে মনে ভাবি'
বিগত-বৈভব নহে হতভাগ্য ২২শে শ্রাবণ,
সর্বরিক্ত নহে এ দুর্দিন—
জ্বালার তরঙ্গ আছে—
আছে ছন্দে রুদ্রের আহ্বান
"শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ"—
আর আছে—কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ।
অন্তরের যত ব্যথা
ক্ষয়-ক্ষতি শোকের আবেগ
যতই দুঃসহ হোক্ আজি,
আরতির দীপশিখা
হোক্ না যতই অনুজ্জ্বল,
দিগন্ত-আবৃত মেঘে মেঘে
সন্ধ্যা-অনুগামী রবি
একদিন নবীন প্রভাতে
এনেছিল যে অনল-শিখা,
বৈশাখের হোমানলে
প্রজ্বলিত যজ্ঞশালাতলে
যে তপস্যা সুরু হ'ল
দুঃসহ ব্যথার মন্ত্রবলে ;
দুঃখের সমিধ লভি'
যে অনল সহস্র শিখায়
একবার উঠিল জ্বলিয়া,
ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করি অবহেলা
মেঘশ্যাম শ্রাবণের দুরন্ত বর্ষণে তুচ্ছ করি'
সে তপস্যা উদ্যত বাহুতে
মৃত্যুর উৎসব মাঝে
এনে দিবে প্রসন্ন প্রভাত,
রবিহীন জগতের
মেঘাচ্ছন্ন ২২শে শ্রাবণে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রস্থান

তৃণাঙ্কুরে পরিবৃত
ছায়া-ঘেরা পথের দুধার—
পারে নি কিনারা দিতে;
জীবনের অজস্র বিস্তার
ঠেলে দেয় ক্রমাগত—
সম্মুখের দিকেঃ
দিগন্তের সোণা রঙ হয় হোক ফিকে—
রাত্রিশেষে আছে জানি—
নব সূর্যোদয়—
পাবে ফিরে লুপ্ত গতি স্তিমিত সময়।

আপাতত এই পথ
প্রান্তর-বিলীনঃ
মনে হয় কত দীর্ঘ
ক্লান্তিকর সীমানা-বিহীন।
থমথমে কালো রাত্রি আকাশের গায়ে—
রেখেছে সযত্নে বুঝি কফিন বিছায়ে।
নীচে তার ভারী বায়ু—
বারুদের গন্ধে ভরপুর—
নির্বিশেষে গেছে মুছে
সম্মুখ সুদূর;
দূর থেকে বাজে শুনি মৃত্যুর নূপুর।
মনে হয় মৃত্যু-নীল বিজিগীষু জীবনের সুর।

অন্ধকার মন-স্তম্ভে
কাঁপে তবু স্তিমিত প্রদীপঃ
দীর্ঘপথ যেন সরীসৃপ
এঁকে বেঁকে চলে গেছে
কত স্তব্ধ প্রান্তর ছাড়ায়ে—
যেখানে আলোকে আছে দুবাহু বাড়ায়ে—
জীবনের ছন্দ সুমধুর—
সেই মৃত্যু-তীর্ণ দেশ আর কতদূর?

গোপাল ভৌমিক

একটুকু

সজনীকান্ত দাস

[...বদন সম্পাদকের প্রতি—

কেন　ডাকছ আবার হেথা ভাঙা যে আসর,
কালো　চুলের গোড়ায় হের ধরল যে পাক—
বল　মন্দিরে কে বাজায় ভগ্ন কাঁসর,
শিখে　অনেক ঠেকেই তবে আছি নির্বাক।
জানি　লিখেছি একদা আমি 'কেড্‌স্‌-স্যাণ্ডাল,'
নব　"কুমার-অসম্ভব" "চল্‌তি ছাঁদে"—
হ'ল　প্রশংসা কিছু আর বহু স্ক্যাণ্ডাল,
ফের্‌　পড়তে চাইনে সেই পুরানো ফাঁদে।
ফাঁকা　ইয়ার্কি নয় আর, তবুও যখন
ডাক　দিয়েছ—যদিও জানি এ ডাক চরম—
নারি　অভ্যাসে অবহেলা করতে তখন,
জানি　হবে না ঘুগ্‌নি-চানা গরমাগরম।
সব　দেখিয়া শুনিয়া মন যায় যে দমে,
চাই　যেদিকে সেদিকে হেরি মৃত্যু-আঁধার—
যেন　দুর্ভাগা জাতটাই থামবে সমে
পথ　শ্মশান হবেই হবে ডাহিন-বাঁ ধার।
হেথা　পাবক অগ্নি শুধু গেছেন নিভে,
শব　পড়িয়া রয়েছে সারি—জ্বলে না চিতা;
ছেড়ে　গেছেন মোদের হায়, শ্মশান-শিবে,
হবে　রচনা করতে নব-মৃত্যু-গীতা।
সেটা　সম্ভব নয়, জানি প্রেস-অফিসার,
হ'লে　একটু বেচাল লেখে গোপন-লিপি,
হেথা　স্বামী-কঙ্কাল-কোলে নাচ বেহুলার,
ভরা　বোতলের ঝাঁঝ মারে সোলার ছিপি!
তবে　নিষ্কৃতি পেতে পারো মাতাল হ'লে,
মদে　আপনাকে ভুলে থাকো হাত-পা ছুঁড়ে—
সুখে　বেহুঁস হইয়া থাকো মাটির কোলে,
পরে　শেয়াল-কুকুরে খাবে কবর খুঁড়ে।
দে'তো　হাসির আড়ালে যদি কান্না ফোটে,
দাদা,　সে নয় কাহারো দোষ, মোরা দুর্বল—
হাসি　দেখতে ঋষিরা পায় মড়ার ঠোঁটে,
মোরা　চাপিয়া রাখতে নারি চক্ষের জল।
তাই　অনেক ভাবিয়া স্থির করেছি বিশেষ,
এই　শ্মশানেই দেখ্‌ব যে সিনেমা-ছবি;
বিষ　খাবার আগেই নারী বাঁধেও তো কেশ,
শুয়ে　ফুলশয্যায় সুখে মরেও কবি!
মোর　মনের পর্‌দা জুড়ে গল্প জাগে,
পুরা　কাহিনী নহে তা, যেন স্বপ্নে পাওয়া,
শুনি　একটুকু কথা, ছোঁওয়া একটু লাগে—
চায়　অপূর্ণতাই এই যুগের হাওয়া।]

(এক)

রাজার দুলাল বাঁধিতে পারেনি ঘর,
বাঁধিতে পারেনি রাজপুরী তারে আজো;
মনে মনে সে যে খুঁজিছে তেপান্তর,
শূন্যে ছুটিছে ঘোড়া সে পক্ষীরাজো।
অন্ত-পুরেতে বধূ দুধসাদা শেজে
ব'সে আছে ঠায় চরণে আলতা মেজে
দেউড়িতে ঘড়ি প্রহরে প্রহরে বেজে
ঘোষণা করিছে কেন বৃথা হায় সাজো—
রাজার দুলাল এখনো রয়েছে পর,
ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়ে নাই আজো।

রাজার দুলাল, ঠিক মনে নাই তার
বাণিজ্যে গিয়ে, হ'ল সে অনেক দিন,
সাত সমুদ্র তেরটি নদীর পার
বলি সুমাত্রা হয়তো বা মহাচীন—
পথে যেতে যেতে সহসা পড়িল চোখে
সন্ধ্যা তখনো ঢাকে নাই দিবালোকে
মেঘের মতন থম্‌থম্‌ করে ও কে
আঁখি দুটি তার কোন্‌ দিগন্তে লীন!
দিগ্বিজয়ীর অকারণ মনভার
কোথা সে সুদূরে, কে জানে সে কতদিন!

হ'ল পরিচয়, প্রান্তর নদীতটে
এসেছিল নেমে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
মনের কথা সে কহে নাই অকপটে
ছোট আঁখি দুটি শুধু দেখেছিল চেয়ে।
নদীতরঙ্গে ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়
দুজনারি মন ভারী-ভারী বেদনায়
এপারে-ওপারে নিশীথ আঁধার ছায়
পাহাড়ের মেয়ে আনমনে ওঠে গেয়ে।
রঙের বিলাস জাগিতে আকাশ-পটে
লাজে নত-আঁখি পাহাড় দেশের মেয়ে।

দিন কেটে যায়, নেশা ধরে যায় মনে,
রাজপুত্রের পুড়ে ছাই হ'ল পাখা
মুগ্ধ স্বপন ঘনায় নয়ন-কোণে
দূরে পথখানি ক্ষণিক মায়ায় ঢাকা।
বনের হরিণ দিতে নাহি দিতে ধরা
রূঢ় কম্পনে কাঁপিল বসুন্ধরা
বাঁধা হতে হতে খসে গেল গাঁটছড়া
সচল হইল অচল রথের চাকা।
বনের হরিণী ছুটে চলে গেল বনে
পাখা-পোড়া পাখি পুন ঝাপটিল পাখা।

নয়নের ক্ষুধা বুকে রয়ে গেল জমা
কভু আঁখিপথে বিগলিত কামনায়।
ক্ষণপরিচিতা হ'ল চিরপ্রিয়তমা
অধরা—স্বপনে ধরা দিয়ে দিয়ে যায়।
পাহাড়ের শিরে মেঘেরা জমিল আসি
কবে যে ঝরিবে প্রান্তরে ভালবাসি
নিবিড় আঁধারে হাসিবে পৌর্ণমাসী
তাহারই পুলকে অমাবস্যা মূরছায়।
দেহে পলাতকা মনে হ'ল মনোরমা
মন ফিরে ফিরে কাঁদে দেহ-কামনায়।

এমনি করিয়া মাস মাস হ'ল পার
রাজার দুলাল বসিল রাজ্যপাটে,

অলস দুপুরে শুধু স্মৃতিটুকু সার
হাজারো কাজেতে এ-বেলা ও-বেলা কাটে।
মেদুর মেঘেতে আকাশ পড়িলে ঢাকা
পালঙ্কে শুয়ে মনে হয় ফাঁকা-ফাঁকা
দেখে দিগন্তে পথ চলে গেছে বাঁকা—
কলসকক্ষে বধূরা চলেছে ঘাটে—
কেটে যায় নেশা মন করে হাহাকার,
বেলা গেছে বয়ে সূর্য নেমেছে পাটে।

(দুই)

দেখা কি হয়েছে তাহার পর?
অনেক ব্যাপারে অনেক বার—
গৃহহীনা করে কাহার ঘর,
জলে ভেসে যায় নয়ন তার।
দেখা হলে মৃদু হাসিয়া কয়,
শরীর তোমার ভাল তো নয়!
মনে মনে বলি, হায় কপাল,
এমনি কাটিবে চিরটা কাল!

নিজে মুখ ফুটে বলে না কিছু,
মন বলে, মোরে কর আপন—
চোখাচোখি—করে নয়ন নীচু
কামনাজড়িত নিশি যাপন।
অনেক কামনা হায় রে বুক,
বুক ফেটে যায় ফোটে না মুখ।
সময় শুধুই বহিয়া যায়—
গাছের কুসুম ধূলিরে চায়।

বছরে বছরে পাহাড়-দেশে
শীতে জমে যায় কলস্বর
ছলছল জল গঙ্গা শেষে
রচে ব্যবধান পরস্পর।
বছরে বছরে একটি বার
নামাতে নামাতে মনের ভার
বড় বড়দিন তাও ফুরায়
বলি বলি বলা হয় না হায়!

একটুকু ছোঁওয়া কথা খানিক
মধুর হয় যে মধুরতর
বিরহের তাপে হয় মাণিক
যা ছিল একদা শুধু পাথর।
চিঠির কাগজে পড়ে না দাগ
এ হোলি-খেলায় ওড়ে না ফাগ
দেহধূপ শুধু পুড়িয়া যায়
আপনি পুড়িয়া বাস বিলায়।

(তিন)

স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় সদ্য
পদ্য জমিয়া হয় গদ্য
দেহে ধীরে নেমে এলে ক্লান্তি
তখন মনেরো হয় ভ্রান্তি।
নারী নাহি জানে আন্ পন্থা
সীবন করিয়া ছেঁড়া কন্থা
তাহারই মাঝারে খোঁজে মুক্তি।
পুরুষের দেহ খোঁজে তৃপ্তি
বিহ্বল হয়ে আসে দৃষ্টি,
বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি
ছড়ানো রয়েছে সারা বিশ্বে
আঁখি মজে নবতর দৃশ্যে
আঁখি হতে মন নহে ভিন্ন
দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ছিন্ন।

(চার)

রাজার পুত্র পাহাড়ী মেয়েরে লেখে লিখন
স্থূল হয় তাই একদিন যাহা ছিল চিকন।
পাহাড়ের দেশে এসেছিল মেঘ বোরাক্তো হয়ে
ছায়াবিবর্ণ পাহাড়ীঝর্ণা খবর বয়ে
ছুটে চলেছিল নৃত্যচপল উপল ঠেলে
মেঘ-সংবাদ দিবার সঙ্গী যদি বা মেলে।
এমন সময় প্রান্তর হতে বার্তা এসে
পাহাড়ী মেয়ের মন নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে
প্রহরে প্রহরে দেয়ালের ঘড়ি চলিল বেজে
একই লিপিখানি বারবার করি পড়িল সে যে—

(পাঁচ)

"এ কি আলস্য, এ কি ভুল, এ কি ভয়?
পথিক দুজন পাশাপাশি চলে চোখের ভাষায় কি জানি কি বলে
মুখের ভাষায় কেহ মানিবে না কারো কাছে পরাজয়!
আকাশে সূর্য জ্বলে আর নেভে, কতখানি দেব কতখানি নেবে,
দেওয়া ও নেওয়ার জানাইতে দাবী বয়স বাড়িয়া যায়—
চাঁদে ও চকোরে এ চিরবিরহ জ্যোৎস্নার দরিয়ায়।

হায় সখি, হায়, ভাল ভগ্নাংশই,
যতটুকু আসে বাহুবন্ধনে সুবুদ্ধিজন হিসাবে তা গণে
চোখ মেলে দেখ, ফেলে রেখে দাও প্রেমের পাঠ্য বই!
প্রেমের সত্য যা আমার কাছে—তুমি ভেঙে যাবে পড়িলে সে ছাঁচে
তোমার সত্য তোমাতেই আছে দেহের সীমানা ঘিরে
সিন্ধুর ঢেউ গণনা করো না জীবন-তটিনীতীরে।

সম্মান কর শঙ্কিত বাসনায়—
তোমার জগৎ নয়নে তোমার তার বেশি তাহা কিছু নহে আর
সেই স্বাদ তব ধরা পড়ে যাহা তোমারি ও রসনায়
গণ্ডূষে করে সমুদ্র পান সেই সমুদ্রে মুনি ভেসে যান
তোমার চিত্ত তীর্থক্ষেত্র লভে যদি গোষ্পদে
তাতেই ফোটানো সঙ্গত সখি, তব মন-কোকনদে।

'বৃহৎ বিরাট কঠিন এ আয়োজন'—
মনে মনে যদি ভেবে থাক তাই অতৃপ্ত রবে ছোট ক্ষুধাটাই
আসিয়া আসিয়া ফিরে ফিরে যাবে অনেক শুভক্ষণ।
সব ছেড়েছিল তাই তো রাধিকা রসিকজনের চিরপ্রাণাধিকা
তুমি কি ভেবেছ জানিত না রাধা কৃষ্ণের ইতিহাস—
ফাঁস যদি তুমি খুলিতেই চাও নির্ভয়ে পর ফাঁস।"

(ছয়)

পাহাড়ী মেয়ের চোখে ছলছল করে জল ম্লান হাসি খেলে তার ওষ্ঠে,
বলে, হে অহঙ্কারী, উজ্জ্বল দীপ শত জানো থাকে একই প্রকোষ্ঠে
শিখা-বন্ধনে শুধু ; সে সীমা হইলে পার একই দীপ আনে মহাধ্বংস।
তুমি দেখিয়াছ সেই স্নিগ্ধ দীপশিখা, দেখেছ কেবলি অপ-ভ্রংশ।
সেখানি পূর্ণে তুমি, শুধু কণা কণা পেয়ে পূর্ণ জয়ের কর গর্ব
ভাঙিবে এ ভুল তব শুধু সেই বিশ্বাসে আমি যাপি এ বিরহ-পর্ব।
কাটিল মনের গ্লানি সযতনে লিপিখানি তুলে রেখে দিল হাতবাক্সে,
পুন বলে মনে মনে, আমার মনের ব্যথা গোপনেই মোর বুকে থাক্ সে।
তুমি ভাব অভিমানে, করি না কিছুই দাবী—অভিমানী, নয় তাহা সত্য,
হে অধীর, তুমি শুধু ঘটনা দেখেছ চোখে জানো না, কি পিছে তার তথ্য!


উপহারে—
কালিদাস
অলঙ্কারে
এস, সরকার
ইহা অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত যে এই শ্রেষ্ঠ ও "নির্ভরযোগ প্রতিষ্ঠান"এর কাজ সত্যই অতুলনীয়।
এস, সরকার এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১২৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যদি মন একবার পেঁৗছে লক্ষ্য তার দেখে না তো কোথা সেই লক্ষ্য—
সহস্র ধিক্কারে টলে না মোদের মন করিলেও গুরুগুরু বক্ষ।
তোমরা বুঝিতে নারো সহজ নির্ভরতা, অবহেলা ভেবে হও ক্রুদ্ধ—
তোমারে সে অবকাশ দিলাম বন্ধু আজ, মন থাক্ বুকে অবরুদ্ধ।

(সাত)

জবাব না পেয়ে রাজকুমার
চেনা-অচেনার করে সুমার
আগে দর্শন, পরে চুমার
ধুম লেগে যায় চমৎকার,
কাঙালী যদি বা শিকারী হয়
লোভে লোপ পায় তাহার ভয়
সেও করে ধীরে সর্বজয়
অসি ঝন্‌ঝন্ ঝনৎকার
বীর সুখ্যাতি রটিয়া যায়
ঘটিত না যাহা ঘটিয়া যায়
পাহাড়ী মেয়ে কি চটিয়া যায়?
উদ্দেশে তার লেখে কুমার—

(আট)

"কাহারে দিয়েছি মন?
কৃষ্ণচূড়ার শোণিত-শোভায় মধুপ-গুঞ্জরণ
শুনি বসন্তে, বর্ষায় স্নাত কেতকী কাঁটার বনে
সেই মৌমাছি গুঞ্জন করে শুনিয়াছি মনে মনে।
কৃষ্ণচূড়ার রক্তপরশ শুভ্র কেয়ার গায়
লাগিলে কেয়া কি শিহরিয়া উঠে অভিমানে বেদনায়?
প্রকৃতি আপন খেয়ালেই চলে   নাহিক কলহ যূথী শতদলে
মৌমাছি করে মধু সঞ্চয়—নন্দিত ফুলবন
চলে না বিবাদ অরণ্যপথে   কথার প্রলেপ অভিমান-ক্ষতে
বলিবে কি তুমি ফুলেদের শুধু শোভা আছে নাই মন?

আমি কি করেছি ভুল,
এই সংসার করিয়া তুলেছি অরণ্য সমতুল।
হাল্‌কা পাখায় উড়িয়া বেড়াই বাতাসে করিয়া ভর
ফুলের বুকেতে বসি ততদিন যতদিন সমাদর
যেখানে যেটুকু মনে মনে পাই সংগ্রহ করে আনি
জানি একদিন মরিবে ভ্রমর শুখাবে ফুলেরা জানি
দল বেঁধে এসে বসি মৌচাকে গুঞ্জনহীন মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে
শত্রু কোথায়, সভয়ে চাহিয়া উদ্যত করি হুল
পুষ্পের স্মৃতি বিস্মৃতি-পথে মিলাইয়া যায় মধুপ-জগতে
না হয় গেলই, মানিব না তবু আমি করিয়াছি ভুল।"

(নয়)

গিরি আর প্রান্তরে   ব্যবধান বেড়ে যায়
সন্ধ্যার বহু আগে   নেমে আসে আঁধিয়ার
প্রান্তর-নিন্দায়   সারা পর্বত ছায়
পার্বতী নেমে আসে   বুঝে নিতে অধিকার।
গঙ্গার ধারে সেই   পুরাতন তরুতল
তারি ধার ঘেঁষে এল   বর্ষার জলধার
কুশল পুছিতে গিয়ে   নয়নের নোনা জল
গাল বেয়ে ঝরে ঝরে   কাটাল কি মনভার?
বলে, আমি এসেছি যে   আছে আজো প্রয়োজন?
কবি বলে, শোনো শোনো,   কাব্য সে পড়ে যায়—
নির্জন সন্ধ্যায়   কেটে যায় শুভক্ষণ?
কবিতার সুরে সুরে   মন তারো ভরে যায়—

(দশ)

"বহুরে যা এক করে আমি সেই ব্যথিত সাগর
বিস্তীর্ণ বিক্ষিপ্ত কি না চাঁদ শুধু জানে ইতিহাস—
যে যা বলে মেনে নেব দুশ্চরিত্র লম্পট নাগর
হে তটিনী ভিন্নমুখী করিও না তব জলোচ্ছ্বাস।
সবারে সমান প্রেমে বাহু মেলে বুকেতে জড়াই
সমান গর্জন করি বাঁকে বাঁকে সর্বমোহনায়
সামান্য বিনয় মাত্র, নহে সখি, মিথ্যা এ বড়াই
বহুতে মিলিত আমি কাঁদি না তো অনুশোচনায়।
দক্ষিণ-সাগর কভু, কভু হিম উত্তর-সাগর
স্পন্দহীন জলরাশি জড়তায় স্তব্ধ হয়ে রয়
সে স্তব্ধতা গলে যাবে মেল তব ও আঁখি ডাগর
ঊর্ধ্ববাহু তরঙ্গেরা তটে লেগে হবে ফেনময়।"

(এগার)

কথা কহিল না পাহাড়ী মেয়ে
মৃদু মৃদু সুরে গাহিল গান
আঁধার নামিল আকাশ ছেয়ে
বাতাসে ভাসিতে লাগিল তান—
"একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।"

(বারো)

রাজপুত্রের ডায়ারি হইতে—
"গভীর প্রেমের কোনো পরিচয় পাইনি খুঁজিয়া মুখে ও চোখে
ভয় হয় বুঝি ছিল না কখনো, হয়নি কখনো হবে না কভু।
নয়নে পাই না বচনে খুঁজি
বাহির করি যে স্মৃতির পুঁজি
কখনো ভাবি যে ঠকিয়া গিয়াছি কখনো ভেবেছি ভালই হ'ল—
রজনী দুপুরে ওরে মুশাফির তল্পি-তল্পা যা আছে তোল।

বোকার মতন চেয়ে বসে থাকি হঠাৎ দেখি কি নেশার ঝোঁকে,
বুঝি তুমি নও আর কেউ হবে, আমি ভাল জানি তুমিই তবু।
প্রেমে ঝলমল উজল বাসে
লোভ জাগে মনে টানিতে পাশে,
চকিতে আবার সাবধানতায় নিজেরে ভুলিয়া আমারে ভোল।
মন কয় আজো নামেনি সন্ধ্যা, প্রকাশ্যে বল, তল্পি তোল।

আকাশ জুড়িয়া আলো-উৎসব, জাগো জাগো পাখি, আলোকে জাগো,
নিথর রজনী অস্থিরপদে বিদায় নিয়েছে জানো না তাহা?
পুরাতন দিন আসে না ফিরে
নূতন জন্ম নয়ন-নীরে
নিমেষ সমান কেটেছে কখন জীবন-সায়রে বছর ষোলো—
আজ কালগতি মন্থর হবে? মিছে সে হাঁকিছে তল্পি তোল।

বক্ষে জড়াতে চাহিছ যখন, হে ভীরু, তখনি বিদায় মাগো!
আবাহন পুরা না হইতে দেবী, যজ্ঞশেষের মন্ত্র স্বাহা?
মানুষের মন দেবতা জানে
শুধু কথা হায়, কি তার মানে?
বাসর-শয়নে সাপের কামড়ে বেহুলার স্বামী বৃথা কি ম'ল?
শুকুনো হাড়েই গজাল মাংস—মৃত্যুরে বলি তল্পি তোল।

রাত কেটে গিয়ে ভোর হ'ল পুন, ওগো বিহঙ্গ নয়ন খোল,
ওই হের পুবে ছেঁড়া মেঘ যত আলোর নেশায় রঙীন হ'ল।
দিশাহীন আশা পাখায় তব
যেদিকে তাকাও অসীম নভ
নীড়ের আরামে রহিল যাহারা নীড়ের আঁধারে তারাই ম'ল
তোমার আঁখিতে জীবনের ভাষা—প্রেয়সী, সুখের তল্পি তোল।"



"বড় সাতটির" একটি

ভারত ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ (১৮৯৬)

হেড অফিস ঃ—লাহোর

জেনারেল ম্যানেজার—**মিঃ জে সি জৈন, এম এ**

এই কোম্পানীতে শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে।
সর্ত্তাদি অতীব লোভনীয়।

১৯৪৩ সালে নূতন কাজ	... ...	২,১৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
১৯৪২ সাল পর্যন্ত মিটান দাবীর পরিমাণ		২,৬৭,৭৮,০০০৲ টাকার উপর

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ—

জয়েণ্ট লাইফ্ স্কীম, এডুকেশন এন্যুইটি, ম্যারেজ এনডাউমেণ্ট, ইমিডিয়েট, এন্যুইটিস্, চিলড্রেন এনডাউমেণ্ট ও ফ্যামিলি পেন্সন স্কীম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য লিখুন ঃ—

কলিকাতার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার,

মিঃ জে এন সেনগুপ্ত, বি এ, বি-কম্ (এডিন), ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

বা নিম্নলিখিত যে কোন ব্রাঞ্চ অফিসে ঃ—

ঢাকা, জলপাইগুড়ি, পাটনা।

আগমনীর আগমনে—

দি

নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অ।ফস ঃ
৬, ম্যাঙ্গো লেন
কলিকাতা।

আপনাদের
সশ্রদ্ধ
অভিবাদন
জানাইতেছে।

General Manager:
L. M. Ghosal

Managing Director
MR. H. M. GHOSE,
B.Sc. (Chicago), F.R.E.S.
(London)

অজস্র অফুরন্ত মনোরম সামগ্রী

"ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের" প্রসাধনসামগ্রী

ষ্ট্যান ক্রীম—প্রকৃতিজাত খাঁটি তৈলাদি দ্বারা প্রস্তুত, সামান্য একটু মাখিলেই চুল পরিপাটি হয়, মাথার খুলি পরিস্কার ও সুস্থ থাকে, মরামাস হয় না। ৫ আঃ শিশি—১৷৷০ টাকা।

ব্রিলীয়েণ্টাইন—মাথায় সামান্য একটু মাখিলেই চুল নরম হয় ও চুলের জেল্লা বাড়ে। ল্যাভেণ্ডার গন্ধযুক্ত। টিনে ৷৷৵০ আনা ও বোতলে ১৮০ আনা।

আফ্‌টার শেভ্‌ লোশন—কামাইবার পর এই লোশন মাখিলে ত্বকের সর্বপ্রকার ময়লা দূর হইয়া উহাকে পরিস্কার, মসৃণ ও কোমল করে। ৪ আঃ শিশি ২৲ টাকা।

লিকুইড ব্রিলিয়েণ্টিং—অতি মনোরম মৃদু-মধুর গন্ধ; চুলকে পরিপাটি করে এবং উহা নরম ও চকচকে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। ৪ আঃ শিশি ১৷৷০ টাকা।

আসুন! দেখুন!

"ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের" প্রিয় সামগ্রীগুলির বিরাট আয়োজন

প্রিমিয়ার হেয়ার ডাই—সাদা, ধূসর বা লাল চুল, এই ডাই ব্যবহারে চকচকে বাদামী বা কাল রংয়ের হয়। ইহাতে ত্বকের বা চুলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। মনোরমগন্ধযুক্ত। ৪ আঃ—১৮০ আনা।

আমেরিকান বে রম্‌—ষ্ট্যানিষ্ট্রীট মার্কা বিশেষভাবে প্রস্তুত। একটি চমৎকার অপরিহার্য প্রসাধন সামগ্রী—৪ আঃ শিশি ১৷৷০ টাকা।

সেটিং লোশন—চুল কোঁকড়াইবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। এই সেটিং লোশন বেশ করিয়া, সর্বত্র সমান করিয়া চুলে লাগাইয়া দিন, তারপর আঙ্গুলে, চিরুণী বা কার্লার দ্বারা ইচ্ছামত কোঁকড়াইতে পারিবেন। ৪ আঃ শিশি ১৷৷০ টাকা।

ষ্ট্যা নারোমা—সম্পূর্ণ নির্দোষ, বিশ্রী ঘাম নিরোধ করার জন্য প্রত্যহ ব্যবহার্য। সুমিষ্ট গন্ধ। ৪ আঃ শিশি—১।৴০ আনা।

ডেণ্টিফ্রিস্‌—চমৎকার আরামদায়ক, দাঁত পরিস্কার করে, মুক্তার মত ঝকঝকে সাদা হয়, সুস্থ ও সুদৃঢ় অবস্থায় রাখে। টিনে—৷৷৵০ আনা, রিফিলে—।৴০ আনা।

পিউরিফাইড্‌ ককোনাট্‌ অয়েল—সুবাসিত, অত্যুৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল, সামান্য পরিমাণ মাখিলেই চুল বাড়ে এবং চকচকে ও নরম হয়। ৪ আঃ শিশি ১৮০ আনা।

এন্ট্রিঞ্জেণ্ট টনিক—রুক্ষ ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, মাংসপেশী ও তন্তুসমূহকে সজীব করে, ব্যবহারে মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ ও কুঞ্চন-রেখাশূন্য হইবে। ৪ আঃ শিশি ২৲ টাকা।

লিকুইড্‌ সোপ্‌—এই পচন-নিরোধক লিকুইড সাবানে শতকরা ২ই ভাগ ক্রেসোল আছে, মশার কামড়, ঘামাচী ও চুলকানি ইত্যাদি দূর করিতে অব্যর্থ। ৪ আঃ শিশি—১।৴০ আনা।

"ষ্ট্যানিষ্ট্রীট" মার্কা রূপ-প্রসাধনগুলি একমাত্র ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্যই প্রস্তুত।

আপনি কি জানেন

কোল্ড ক্রীম—ত্বককে সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার করে, কেবল ত্বকের উপরিভাগ নহে, লোম-কূপগুলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহা-দিগকেও পরিস্কার করে। রাত্রে মাখিয়া শয়ন করিলে তন্তুসমূহ সজীব হয়। সুমধুর গন্ধযুক্ত এবং সামান্য একটুতেই বেশ কাজ হয়। মূল্য—১৲ টাকা।

ট্যালকম্‌ পাউডার—সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, নিজস্ব সৌরভের জন্য সমাহিত বায়ুর মত হাল্কা, স্নানের পর ব্যবহারে বিশেষ আরামপ্রদ। প্রতি টিন—১৴০ আনা।

ভ্যানিসিং ক্রীম—দিনে ব্যবহার্য, লোমকূপ বন্ধ করে না, ত্বক কোমল থাকে, সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার উপর পাউডার মাখিলে, সারাদিন নিখুঁত থাকে। মূল্য ১৲ টাকা।

ফেস্‌ পাউডার—সারাদিন নিখুঁত অবস্থায় থাকে, লোমকূপ বন্ধ করে না, আপনার পছন্দমত যে কোন বর্ণের পাইবেন, বহু ঘণ্টা টাটকা মনোরম গন্ধে ভরপুর রাখে। সাত রঙের পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি বাক্স ৪৲ টাকা।

স্মিথস্‌ শ্যাম্পু

আপনার মুখশ্রীর সৌন্দর্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কেশের সৌন্দর্যও তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নহে। এজন্য ঠিক ঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত, স্মিথের শ্যাম্পু এ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী, উহা মাখিলে চুলের জেল্লা বাড়ে ও রেশমের মত হয়।

ওল্ড ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার—অত্যুৎকৃষ্ট জিনিষ তৈরী। **ল্যাভেণ্ডার ফ্লাওয়ার**—ছোট ৸৶০ আনা, মাঝারি— ১৷৵০ ও বড় ৪৲ টাকা।

ইউ-ডি-কোলোন—অতীব আরামপ্রদ, ক্লান্তি-নাশক। ছোট—৸৴০ আনা, মাঝারি—১।৴০; বড়—৩৸৶০ আনা।

হোয়াইট-এওয়েজ

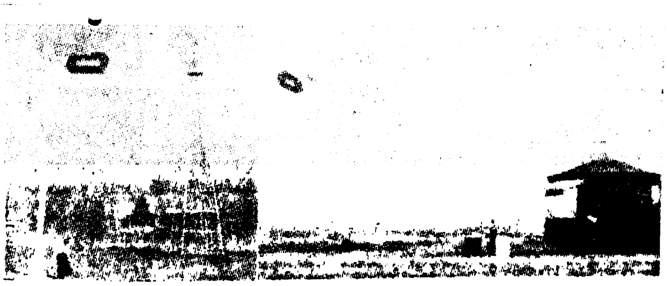
কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ৫২০৪

বিজ্ঞানীর মেঘদূত

শ্রীবনবিহারী ঘোষ

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কবি কালিদাস ঘদূত কাব্যের অবতারণা করেছিলেন, রূপ কথিত আছে। আষাঢ়ের বহাওয়া প্রত্যেক নরনারীর মনে যে ভূতি ও আবেশের সৃষ্টি করে—তারই ছবি রহী যক্ষের মেঘদূত সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে নি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও র্বমেঘ ও উত্তরমেঘের গতি কোন পথে হ'বে, মগিরি পর্বত থেকে ঐ মেঘের গন্তব্যপথে



ঘুড়ির সাহায্যে আবহাওয়ার তথ্য-জ্ঞাপক যন্ত্রাদি আকাশে পাঠান হইতেছে।

অলকাতে যক্ষপ্রিয়ার কাছে সংবাদ পাঠান সম্ভব হ'বে কিনা,—এ ধারণার মধ্যে কাব্য-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কবি কালিদাস হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আবহাওয়া তত্ত্বের আংশিক আভাস দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাধারণ নরনারী—জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বকালে, সর্বদেশে নিজেদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে একান্তরূপে পরিচিত। তাই নিজের নিজের দেশে বৎসরের কখন কোন্ সময়ে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্ সময় কি বায়ু, ঝড়, তুষারপাত, কুয়াসা, শীত বা গ্রীষ্মের আগমন সূচনা করে—এ ধারণা প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা বিশেষে অল্পবিস্তর থেকেই থাকে। আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখে কালিদাসের যক্ষ সেই মেঘের অলকার পথে যাত্রার সম্ভাবনা ধারণা ক'রেছিল। কৃষক ও নাবিকগণও কোন্ কোণে কি আকারের মেঘের সমাবেশ হ'লে ঝড়, জলের সম্ভাবনা—তা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে;—তারা সাবধান হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আবহাওয়া সৃষ্টির সূচনা নির্দেশের জন্য অনেক ভিন্ন ধরণের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চন্দ্রের চারদিকে যখন "দেবতাদের সভা বসে", পাখীরা যখন নীচু হয়ে উড়ে, ঈশান কোণে যখন কালো মেঘ দেখা যায়, বাদল-পোকা যখন বেড়িয়ে বেড়ায়; পর্বতমালা যখন মাথায় মেঘের আবরণ পরে তখন দেশ বিশেষে বিশেষ বিশেষ আবহাওয়ার আগমন সূচনা হ'য়ে থাকে। এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে বিজ্ঞানীর বক্তব্য কি? আবহাওয়া বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত নিজের ক্ষেত্রে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন্ ক্ষেত্রে এর মূল্য কতখানি?

পুরাতন ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সমস্ত সৌধাবলীর ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে—তার থেকে দেখা যায় যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের যখন সময়ের প্রবাহ নিরূপণেরও কোনও উপায় ছিল না—তখন তৎকালীন তথাকথিত যাজকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নক্ষত্রের গতিপথ দেখে আবহাওয়ার সংবাদ আগে থেকেই তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের জানবার চেষ্টা করে এসেছেন। একদিক থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞান একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান—যা গড়ে তুলতে মানুষের আগ্রহ সভ্যতার প্রথমেই দেখা যায়। কিন্তু আজও এই বিজ্ঞানের উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। অনেকে মনে করেন, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ বিস্ময়করভাবে সফলতা পেয়ে থাকলেও—আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট-রূপে সাফল্য পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও বর্তমানে মানুষের কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে—এই আবহাওয়া-বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থাতেও এর মূল্য মানুষের কাছে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি।

নেপোলিয়ান তাঁর রুশ অভিযানের প্রাক্কালে—রাশিয়ায় শীতকালের আবহাওয়া কিরকম হ'তে পারে সে সম্বন্ধে তৎকালীন প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসকে জানাবার জন



মেরুপ্রদেশে আবহাওয়া তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি কেন্দ্র

শ দেন। লাপ্‌লাস যতখানি সম্ভব খোঁজ-
নিয়ে বলেন যে, জানুয়ারী মাসের আগে
য়ায় ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয় না।
পালিয়ান—এই আবহাওয়ার সম্ভাবনা
যায়ী তাঁর অভিযানের পরিকল্পনা করেন।
তু ডিসেম্বরেই হঠাৎ ভীষণ শীত ও
রপাতের ফলে—নেপোলিয়ানের সৈন্য-
হনী লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে ও তিনি বিফল
য় ফিরে আসেন। বর্তমানের মহাযুদ্ধে
লারের রুশ অভিযানের ব্যর্থতার মূলে আর
থাক অন্ততঃ এই ধরণের আবহাওয়ার
ৎ আবির্ভাবের কারণ ছিল না। লাপ্‌লাস্
হিসাবে ভুল করেছিলেন তা নয়। যে বিরাট
মণ্ডলী এই পৃথিবীকে চারদিক দিয়ে
রে আছে তার আলোড়ন বিলোড়নের ধারা
ই অস্থির, এতই সামান্য কারণে তার পরি-
র্ন ঘটে যে, পূর্ববর্তীকালের আবহাওয়ার
নাবলীর সংগৃহীত তথ্য থেকে—

ঘনত্বের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে এই ব্যারো-মিটার যন্ত্রে বায়ুর চাপেরও পরিবর্তন দেখা যায়। যে স্থানে এই চাপের পরিমাণের হঠাৎ হ্রাস হয় সেখানে স্বভাবতঃই ধারণা করা যেতে পারে যে, সেই বিশিষ্ট স্থানের বায়ুর পরিমাণ ও ঘনত্ব কোন কারণে কমে গেছে। সুতরাং আশপাশের উচ্চ চাপের বায়ুস্তর সেই স্থানের বায়ুর চাপ বৃদ্ধির জন্য সেইদিকে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ সেই স্থানে বায়ুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বা জলের আবির্ভাব ঘটবে। গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী এই ধরণের আবহাওয়ার সূচনা হ'তে পারে ব'লে কেবলমাত্র ব্যারোমিটারের উপর নির্ভর করে যে সমস্ত ঘোষণা করতেন তা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল দেখা গেল। তখন অন্যান্য যন্ত্র ও সম্ভাব্য আবহাওয়ার ঘোষণার জন্য অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা চলতে লাগলো। আধুনিক আবহাওয়া নির্ণয় প্রণালীর প্রথম গোড়াপত্তন হয় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে—



মেরুপ্রদেশের আবহাওয়া তথ্যানুসন্ধানী দুইজন বিজ্ঞানীর মৃতদেহের সন্ধানে উদ্ধারকারী একদলের বাসস্থান। এরোপ্লেনের পাখা এই বরফের বাসস্থানের আচ্ছাদন।

আগামী আবহাওয়ার সৃষ্টি কি ধরণের হতে পারে—তা বলা একেবারেই অসম্ভব যদি না বর্তমানকালের কার্যপ্রণালীর ধারা মেনে চলা হয়। একজন রসিক—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন "সবচাইতে আশাবাদী কে? যে আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণায় নির্ভর করে বর্ষাকালেও ছাতা না নিয়ে বাড়ীর বাহিরে যায়।" মন্তব্যের মধ্যে তিক্ততা ও সত্য অনেকখানি থাকলেও বর্তমান আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নতি ও আনুষঙ্গিক চেষ্টা ও সফলতা উপেক্ষণীয় নয়।

পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুস্তরের, পৃথিবী পৃষ্ঠে চাপের পরিমাণ নির্ণীত হয় বায়ুমান (ব্যারোমিটার) যন্ত্রের দ্বারা। আবহাওয়া বিশারদের এটি একটি প্রধান অস্ত্র। আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয় এই বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থায় দেশের বিশিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ এই যন্ত্রে দেখা যায়। হঠাৎ কোনও কারণে—উপরিস্থিত বায়ুর তাপ বা

আমেরিকায়, ব্যারোমিটারের পরে টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ও তার দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই সময়েই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে আবহাওয়া বিভাগের ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে নাই। ১৮৫৩ সালে ম্যাথুফনটেন্ মারে আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে আসেন ও স্বীয় চেষ্টায় জনমত গঠন করে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইংল্যাণ্ডে আবহাওয়া নির্ণয় বিভাগের স্থাপনা করেন। সমগ্র ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন গ্রামে ও সহরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হয় ও ১৮৬১ খৃঃ অব্দ থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিচার ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য সম্ভাব্য আবহাওয়ার সৃষ্টির ঘোষণা ও সেইমত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক থেকে নিরাপত্তার জন্য সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ খোলা হয়। ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রণালী অনুসৃত হয়।

ভারতবর্ষে আবহাওয়া নির্ণয় ও আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘোষণার জন্য দুইটি কেন্দ্র আছে। একটি কলিকাতায় ও আর একটি পুণায়। বর্তমান যুদ্ধের আগেকার ব্যবস্থায় গোটা ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করে পূর্বভাগকে রাখা হয় কলিকাতা কেন্দ্রের অধীনে ও পশ্চিম অঞ্চলকে পুণা কেন্দ্রের অধীন করা হয়। সুদূর বর্মাদেশের নীচে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগে কতকগুলি নির্বাচিত সহর ও গ্রামে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি করা হয়। এই সকল পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র থেকে দিনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময় স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিজ নিজ স্থানের বায়ুর চাপ, গতি, বৃষ্টির পরিমাণ, তাপ, কুয়াসা, মেঘ প্রভৃতির পর্যবেক্ষণের বিবরণ কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগে টেলিগ্রাফের সহায়তায় পাঠিয়ে দেন। এখানে আবহাওয়া বিজ্ঞানী ও বিশারদের অধীনস্থ একদল কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের এই সকল বিভিন্ন স্থানের পর্যবেক্ষণের সংবাদ ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর বিশিষ্ট প্রণালীতে চিত্রিত করে ফেলেন। কোথায় বারিপাত, কোথায় ঝঞ্ঝা, কোথায় কুয়াসা, কোথায় শৈত্য, কোথায় অসহ্য গ্রীষ্ম, কোন্ স্থানের বায়ুর চাপ কত, গতি কোন্ দিকে, মেঘের আকৃতি কি, কোথায় নির্মল, স্বচ্ছ, সুনীল আকাশ, বায়ু স্থির অথবা মৃদুমন্দ গতিতে বহমান এই সমস্ত তথ্যের একটি অখণ্ড চিত্র আবহাওয়া বিজ্ঞানীর সামনে গড়ে তোলা হয়। একই দিনে একই সময়ে সমগ্র দেশের আবহাওয়ার কাহিনী চোখের সামনে থাকায় ও দিনের পর দিন এই চিত্রে কি পরিবর্তন ঘটে বা ঘটছে জানা থাকায় কোন বিশেষ স্থান, গ্রাম, সহরগুলির দিকে কোন্ বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া দেখা দিবে তা এই বিজ্ঞানীর পক্ষে ঘোষণা করা এখন সহজসাধ্য হয়। কতকটা পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য, কতকটা দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কতকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও অনুমানের উপর আবহাওয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে আনুমানিক ঘোষণা করা হয়। উপরোক্ত প্রণালীতে আবহাওয়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে যে সমস্ত স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ একই রকম সেই সেই স্থানকে এক বক্র রেখায় সংযোগ করে নিলে প্রায়ই দেখা যায়, সমস্ত দেশের আবহাওয়া-চিত্রে দুইটি কি তিনটি বৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণতঃ একটির মধ্যে যে স্থানগুলি গণ্ডীভুক্ত হয় সেই সেই স্থানগুলিতে বায়ুর চাপ সর্বনিম্ন, আর তার পরের স্থানগুলির বায়ুর চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অন্য আর একটি বৃত্তের সৃষ্টি করেছে। এই বৃত্তে নিবন্ধ স্থানগুলির বায়ুর চাপ সর্বোচ্চ দেখা যায়। এর প্রথমটিকে বলা হয়, বায়ুচাপের নীচস্থ কেন্দ্র (centre of low pressure on **depression**) আর অন্যটিকে বলা হয়, বায়ুর উচ্চ চাপের কেন্দ্র (Centre of high pressure)। পূর্বোক্ত কেন্দ্রটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি—ঝড়, বজ্রাঘাত, প্রবল বায়ু-

(৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নাটকীয় কথা

(২২ পৃষ্ঠার পর)

সেই মার খাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় তখন আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। অনেক সময়ে 'সাধু' বা 'ভালমানুষ' অর্থে স্বার্থবুদ্ধিহীন ভাববিহ্বল পুরুষই বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ, অতিশয় শক্তিহীন মানুষ। যে আদৌ আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়, সেও একরূপ মহাপুরুষ; এই মানুষই যখন জীবনধর্মলঙ্ঘনের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পায়, এবং যখন তাহার চরিত্রের নিদারুণ দুর্বলতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়—সে যখন একই দুর্বলতার বশে উন্মাদ হইয়া আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনি ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে (যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকের 'যোগেশ') তখন আমাদের ভাববিহ্বলতার অন্ত থাকে না—এই self-pityই আমাদের উৎকৃষ্ট ট্র্যাজিডি-রস। পুরাণ-প্রথিত অবতার-কল্প 'পুরুষ'কেও আমরা শক্তিমান 'চরিত্র'রূপে পূজা করিতে পারি না—ভাবের অশ্রু-প্লাবনে তাহাকে মৃৎপুত্তলের মত বিগলিত করিয়া না তুলিলে আমাদের নাটকাভিনয় সার্থক হয় না। ইহা ছাড়া, আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার আছে, ভাবভক্তির প্রবল বন্যা আছে—এ সকলের তুলনায় জীবন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তুচ্ছ; সে রহস্যভেদ করিবার শক্তিও আমাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই—আমাদের জাতীয় সংস্কারই যেন তাহার বিরোধী।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিদেশীর অনুকরণে আমরা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়াছি। যে জীবন হইতে ওখানে যে নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে—আমাদের জীবন সেরূপ নয়, তথাপি সেই নাটকের আদর্শে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। এককালে আমাদের কবিরা যেমন মহাকাব্য লিখিয়া মহাকবি আখ্যালাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কুমড়ার গাছে নারিকেল ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেইরূপ যাত্রাগানের আসরেই আমরা বিলাতী থিয়েটারের মাচা বাঁধিয়াছি। নাটক যদি জীবনেরই সাক্ষাৎ আভিনয়িক রূপ হয় তবে আমাদের জীবনই যেমন আমাদের নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে, তেমনই আমাদের নাটকের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র হইবে; যে ছাঁচে য়ুরোপীয় নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে সে ছাঁচে আমাদের নাটক গড়িলে তাহার styleই ভুল হইবে, অতএব তাহা সার্থক সৃষ্টি হইবে না। আমি খাঁটি নাটকের যে আদর্শ ধরিয়াছি—তাহাতে জীবনের যে রূপটির উপলব্ধি চাই, তাহার চেতনাই যদি আমাদের সংস্কারে সহজ না হয়, তবে য়ুরোপীয় আদর্শে আমরা যে রঙ্গমঞ্চ খাড়া করিয়াছি, এবং যেরূপ চরিত্র ও অভিনয় তাহাতে যুক্ত করিয়াছি—সে সকলই ব্যর্থ হইতে বাধ্য; 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বা 'বিল্বমঙ্গলে'র মত নাটক যে বিশুদ্ধ নাটক হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমি গল্পের কথাই বলিতেছি না—গল্প যেমনই হোক, তাহাকে নাট্যরূপ দেওয়া যায় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু যাহা মূলে একটা ভাব-জীবন মাত্র, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিগত প্রাণধর্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয়-বস্তু করিয়া তোলা হয়, তবে তাহা নাটক নয়—দৃশ্যকাব্য; তাহা গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের গীতোৎসার—তাহাতে যে ঘটনাগুলি ঘটে, তাহা প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই; 'চরিত্র' বলিতে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তুর প্রয়োজনই হয় না। ভাবোদ্দীপনাই যাহার একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবের গ্রন্থিরূপে সাজাইয়া লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, করুণ, হাস্য, প্রভৃতি কতকগুলি রসকে মানুষের মত পোষাক পরাইয়া রঙ্গমঞ্চে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক নাটকই নয়—আমাদের সকল নাটকই—সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক—এইরূপ ভাবপ্রধান মেলোড্রামা। আমি খুব আধুনিক নাটকের কথা বলিতেছি না।

এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ, আমাদের দেশের দর্শক-আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিদ্যুৎচমকের মত মণ্ডলী আর কিছুতেই সাড়া দিবে না—দিতে পারে না। তাহা হইলে, নাটকের আদর্শ যেমনই হোক—নাট্যকলা ও নাট্যরসের মূলে প্রেরণা যেমনই হোক, যেহেতু নাটক যুগের প্রভাব, জাতির চরিত্র এবং সামাজিক সংস্কার এই ত্রিদোষকে আশ্রয় না করিয়া পারে না—সেই হেতু আমি নাট্যরসের যে তত্ত্ববিচার করিয়াছি, সেই তত্ত্বের অধীন করিয়া দেখিলে, একদিকে যেমন খাঁটি ও উৎকৃষ্ট নাটকের বড় অভাব ঘটিবে—আর একদিকে তেমনই কেবল বহুজনের মনোহরণ করিয়াছে বলিয়াই বহু নাটকের সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমটির কারণ বুঝিতে পারা যায়—পূর্বের আলোচনাতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে কারণ এই যে, ঐরূপ খাঁটি জীবনরস-রসিকতার অনুকূল আবহাওয়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে ও জাতির জীবনে ক্বচিৎ সুলভ হইয়া থাকে। বাহিরের অবস্থার সহিত অন্তরের ঐরূপ রসাবস্থার যোগাযোগ একটা বড় মাহেন্দ্রক্ষণেই সম্ভব—সে যেন মুক্তা ও স্বাতী-নক্ষত্রঘটিত প্রবাদের মত। তবু ওই প্রবাদও এক অর্থে সত্য; এমন অনেক বস্তুই আছে যাহা অনুকূল দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগেই সম্ভব হয়, এজন্য তাহা দুর্লভ হইতে বাধ্য। তথাপি, একবার যদি তাহা কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া মানিতে হয়, এবং পরে আর কোথাও ঠিক তেমনটি না হইলেও, সেই আদর্শের মানদণ্ডেই সেই জাতীয় বস্তুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার আদৌ অসংগত নয়। ইহাও সত্য যে, এক একটা জাতি এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে—তেমন আর কেহ করে নাই; এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তথাপি জাতি ও যুগকে বাদ দিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞানটুকু আর সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। নাটকের ব্যাপারেও তেমনই, প্রাচীন গ্রীক, অর্বাচীন ইংরাজী বা স্পেনীয় নাট্যকলা নাট্যরসের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা সার্বভৌমিকতা দাবী করিতে পারে—উৎকৃষ্ট নাটক যে কি বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত ঐ নাটকগুলির মধ্যে মিলিবে।

দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সত্য বটে, দর্শকচিত্তে সম্যক সাড়া জাগাইতে পারিলেই নাটক এক হিসাবে সার্থক। এজন্য যুগ ও জাতির বিশিষ্ট রস-চেতনার দ্বারা সকল নাটকেরই অভিনয়-সাফল্য একরূপ সীমাবদ্ধ। যুগের দ্বারাও বটে—কারণ এক যুগের রুচি ও রস-সংস্কার অন্যযুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তথাপি, জীবন-রসরসিকতা যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে বাহিরের উপকরণ ও সাজসজ্জাই নূতন হওয়া আবশ্যক—প্রাচীন নাটকের ঐগুলিই বাধা হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের রসপ্রেরণার কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ রসপ্রেরণাহীন নাটকও যদি অতিশয় জনপ্রিয় হয়, তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাহা সাময়িক রুচি ও রসবোধের বড় উপযোগী হইয়াছে, এবং ঠিক সেই গুণে তাহা নাটক হিসাবে সাধারণভাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণেই তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। যদি সেই অভিনয় সাফল্যের মূলে খাঁটি নাটকীয় রস না থাকে, তবে সাময়িক রুচি ও রসবোধের তৃপ্তি সাধন করিয়া সে নাটক অচিরেই কালসঞ্চিত আবর্জনা রাশির সামিল হইয়া যাইবে; সে নাটক সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির অমরত্ব দাবী করিবে না—রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া শাশ্বত সারস্বত চত্বরে আরোহণ করিবে না।

আমাদের এ যুগের সাহিত্যে আমরা বহুবিধ রস-রূপ সৃষ্টি করিয়াছি—বাঙালীর কবিপ্রতিভা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু নাটকীয় রস-সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিভা সত্যই হার মানিয়াছে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত আমরা এমন একখানিও নাটক সৃষ্টি করিতে পারি নাই, যাহা রঙ্গমঞ্চে সাময়িক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোনরূপ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা এ পর্যন্ত অতিশয় অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের মেলোড্রামাতেই চরিতার্থ হইয়াছে। এমন একখানি নাটক আমাদের নাই যাহাতে মানব-চরিত্র

তথা মানব-নিয়তির উদ্ঘাটনে সেই স্থির-গম্ভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিদ্যুৎচমকের মত উদ্ভাসিত হইয়া বাস্তব অনুভূতিকেই একটি অপূর্ব রসে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। জীবন-সত্যকেই এমন রস-সত্য করিয়া তোলা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার কাজ—এই জন্যই একজন নাট্যকারই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই কেন, এই আলোচনা হইতেই তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই—কারণ, যে গাছে যাহা ফুটিবার তাহাই ফোটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমরা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছি এবং আমাদের এক নাট্যকার সেক্ষপীয়ারের চেয়ে বড়, এইরূপ আস্ফালন করিলে এবং সেই আস্ফালনে রসিকতাভিমানী ব্যক্তিগণও যোগদান করিলে, তাহা শুধুই হাস্যকর নয়—যৎপরোনাস্তি লজ্জাকর হইয়া থাকে। বাঙালী অনেক কিছু পারিয়াছে এবং আরও অনেক কিছু পারিবে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র ও বহুকালাগত সংস্কার এমনই যে, ভবিষ্যতেও আমরা তাহাতে সম্যক সফলতা লাভ করিব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিজ্ঞানীর মেঘদূত

(৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

গ, বারিপাত ও আকাশে মেঘের ঘনঘটা এরই ধ্য দেখা যায়। এই দুর্যোগ-কেন্দ্রের যাত্রাপথ ান্‌দিকে হবে, গতি কতটা, কোন্‌ কোন্‌ ান এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে তারও নুমান প্রতিদিনের আবহাওয়া চিত্র থেকেই ওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানেই এই ত্তের সংগঠন সেই স্থানের বায়ু অচঞ্চল, াকাশে মেঘের ঘটা আর এই বৃত্তের চতুর্দিকে বাহিরের বায়ুর বেগও বেশী ও বৃত্তাকারে প্রবাহিত হয়। বৃত্তের মধ্যস্থিত স্থানের বায়ুর াপ কম থাকায় কোন কোন অসুস্থ ব্যক্তির রীরে যন্ত্রণা হয়, পশু ও পক্ষীকুল চঞ্চল য়ে উঠে। সেই স্থানের লোকেরা বায়ুমণ্ডলীর এই অচঞ্চল নির্বাত, নিষ্কম্প অবস্থা দেখে ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ' অনুমান করেন। যেদিকে এই দুর্যোগ-কেন্দ্রের গতি হয়, সেই দিকে কেন্দ্রের পুরোভাগে তরল জলীয় মেঘ সূর্য বা চন্দ্রের এক রকমের ম্লান আভার সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রের পুরোভাগে যদি কোন পর্বতমালা থাকে, তাহলে এই সব মেঘগুলি তাদের শিখরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থানীয় আবহাওয়া সম্বন্ধে নানারকম প্রচলিত কিম্বদন্তীর মূল কথা ইহাই।

বায়ুর উচ্চ চাপের কেন্দ্রের অবস্থা ঠিক বিপরীত। যেখানে এই বৃত্তের স্থিতি পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানগুলিতে ও তাহার চতুঃপার্শ্বের স্থানগুলিতে নির্মল আবহাওয়ার সঞ্চার হয়।

আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য, গবেষণা ও বিচার, অনুমান ও ঘোষণার মোটামুটি প্রণালী এই। এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দেশের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা ও আবহাওার প্রতিফলিত চিত্রের গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। এইজন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ (Surface observations) ছাড়াও পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের (Upper air observations) তথ্য দরকার হয়। পৃথিবীর উপরে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত যে অংশ, তাকে বলা হয় 'ট্রপোস্ফিয়ার'। পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে বায়ুস্রোত ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ মেঘ বৃষ্টি সবকিছুরই, আবির্ভাব ঘটে, এই ট্রপোস্ফিয়ার থেকে। এই অংশের বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়ার সংবাদ নেওয়া হয় বেলুন, ঘুড়ি প্রভৃতিতে সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। বর্তমানে এই উচ্চস্তরের আবহাওয়ার সংবাদ সবিশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক বিমানচালনার যুগে পৃথিবীর কত উপরে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে জানা থাকলে চালক তার বিমান সেইভাবে চালনা করে বা সাবধান হয়। আজকাল শত্রুপক্ষের বিমানহানার জন্য অনেক সহরেই 'বেলুন ব্যারেজের' সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময়ে এগুলিকে অতি উচ্চে উঠান অবস্থায় দেখা যায়, এর অর্থ এই নয় যে, শত্রু বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় পৃথিবী পৃষ্ঠের বায়ুর স্রোত অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের বায়ুস্রোত অপেক্ষা প্রবল থাকায় এইগুলিকে উচ্চস্তরে নিরাপত্তার জনাই তোলা হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়ার রীতিনীতি বিভিন্ন। বাংলাদেশে কালবৈশাখী এক বিশিষ্ট সময়ের বিশেষ প্রাকৃতিক লীলা যা পাশাপাশি অনা স্থানে দেখা যায় না। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক রকম মতবাদ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে মাঝে মাঝে যে প্রবল ঝড় বা ঘূর্ণিবাত্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে তার প্রায় সমস্তগুলিরই উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর। যুদ্ধের পূর্বে বর্মার কতকগুলি স্থান থেকে ও বঙ্গোপসাগরস্থিত জলযান থেকে আবহাওয়ার সংবাদ আসতো। ফলে ঝড়ের কেন্দ্রের (storm centre) গঠনের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থানকাল গতিপথও স্বাভাবের পরিচয় পাওয়া যেত ও সেই মত বন্দর, জাহাজ ও ভূভাগের লোকজনকে ঝড়ের সম্বন্ধে রেডিও ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ দিয়ে সতর্ক করা হ'ত। এই সকল ঝড়ের কেন্দ্র যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় ততক্ষণ তাকে মানচিত্রে উপরি উক্ত প্রণালীতে এনে সতর্ক দৃষ্টিবন্দী ক'রে রাখা হ'ত। এদের বিশেষত্ব ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে যখন ভারতবর্ষের কোন ভূখণ্ডে এসে পৌঁছাত সেখানে এসেই হয় অতি ক্ষিপ্রগতিতে ভূভাগের উপর দিয়ে দূরে মিলিয়ে যেত, আর না হয় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শেষ হ'য়ে যেত। পূর্বোক্ত অবস্থায় যথেষ্ট সতর্ক হবার আগেই লোকজন, পশু ও ধন-সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হ'য়ে যেত। কিছুদিন পূর্বে যে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি সাধন ক'রে গেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ইহাই। আমাদের দেশে শীতকালে এক ধরণের আবহাওয়া দেখা যায়। এটিরও রীতিনীতি এই দেশেরই বৈশিষ্ট্য। শীতকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক ধরণের বায়ুচাপের কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবহাওয়া বিভাগ এর নাম দেন "উত্তর-পশ্চিম দেশের চঞ্চলতা" (North-Western disturbances)। এই "চঞ্চলতার" কেন্দ্র প্রায়ই বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয়। এর পুরোভাগের স্থানসমূহের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, অল্প বিস্তর বারিপাতও হয় ও শীতের পরিবর্তে একটু গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়। এই কেন্দ্রের পশ্চাতে আকাশ নির্মেঘ হয় ও শীতের প্রকোপও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে না তার কারণ অনেক। অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পৃথিবীর একদিকে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় অনেক সময় পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠস্থিত স্থানগুলির আবহাওয়া তাদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষীয় আবহাওয়া অনেক অংশে দক্ষিণ আমেরিকার আবহাওয়ার দ্বারা সবিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। মধ্য ইউরোপের আবহাওয়া উত্তর মেরুর বিশাল তুষারাচ্ছন্ন স্থানের তুষার পাতের কমবেশীর উপর নির্ভরশীল। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। তার কারণ, এর একদিকে আছে সুবিশাল ভূখণ্ড আর অন্যদিকে আছে বিশাল আটলাণ্টিকের জলরাশি। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, আবহাওয়া সম্বন্ধে নির্ভরশীল ও নির্ভুল তত্ত্ব গ'ড়ে তুলতে হ'লে সেই দেশ বিশেষের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের তথ্যই যথেষ্ট নয়—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ও উপরিভাগের সমস্ত স্থানের আবহাওয়ার সংবাদের প্রয়োজন। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই দুই স্থানের আবহাওয়াই সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়াকে সমষ্টিগতরূপে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীর অভিযান হ'ল সুরু। গৃহবাসী বিজ্ঞানী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়লো অজানার সন্ধানে প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে। বিজ্ঞানের বেদীমূলে এদের দেহ ও প্রাণ দিয়ে পূজা বিফল হয় নাই। দুর্জয় দুর্গম মেরু প্রদেশে পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুস্তরেও বিজ্ঞানী তাঁর অভিযান সফলতার সঙ্গে শেষ ক'রেছেন। মানবতার কল্যাণে এই দরদী, নির্ভীক, সর্বত্যাগী বিজ্ঞানীর সাধনা যুগে যুগে যে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে। সেই সফলতা মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হোক—তার ধ্বংসের জন্য নহে



দাদামশায়ের উপহার



আশীষ বলে, তুমি হবে মস্ত পণ্ডিত।
এক বছরে শিখতে চাও হবে নানা [illegible]।
তবে দাদামশায়ের [illegible] example,
সত্তর বছরেও [illegible] ample।
দেখো পরীক্ষায় হবে উত্তীর্ণ
যখন পাকবে চুল, দাঁত হবে জীর্ণ।

দাদামশায়

কার কার লেখা আছে?

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, নিশিকান্ত সেন, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, সুবিনয় রায়চৌধুরী, [illegible] বসু, গজেন্দ্র মিত্র, বিমল ঘোষ, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণা দেবী, বন্দে আলি মিঞা, সুবোধ রায়, ধীরেন বল, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মনোজিৎ বসু।

ছবি এঁকেছেন

শিল্পী সমর দে, সুধীর ভট্টাচার্য, শৈল চক্রবর্তী, জ্যোতিষ সিংহ, ধীরেন বল, অমর দে, কান্তি সেন, কল্যাণ সেন ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

তোমাদের সকলের কবিদাদু, রবীন্দ্রনাথ—তাঁর দৌহিত্রী শ্রীনন্দিতা দেবীকে একদিন ওপরের ঐ ছবি ও কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। আজ শ্রীনন্দিতা দেবীর সৌজন্যে সেটি তোমাদের পুজোর উপহার হিসাবে প্রকাশিত হল। 'মৌমাছি'

[illegible] গান

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এরে অ আ ক কা তালে বেতালে হ্রস্বী দীর্ঘী হ্রস্ব দীর্ঘ
রি লী এ ঐ ও ঔ কেউ কেটা এলো সেটা জানো কেউ।
জানি জানি কেও কেটা নয় ওটা—
মোটাসোটা হবে কেউ
রাশভারী!
খবরদারি বড়াভারি কেউ
ওরে ঐ, ওরে ঐ।
ঝাঁকোটা মাকোটা জলহাওয়ার ঝাপোটা
রাত এখন কতোটা, রাত হ'লো বারোটা।
সুখপাল ওঠা, পাল্কি ওঠা, নাল্কি ওঠা
কোথাও জেগে নাই কেউ
আরে ঐ, ওরে ঐ।
স্বরে অঃ স্বরে আ হ্রস্বা দীর্ঘা হারান্দা, কাসুন্দা ঝালন্দা, মালুন্দ
বলে কা খলে খা দেখো ক্যাটা
মধুলা মজুলা
কিচিকিন্দা মুচুকুন্দা মারো কথা
ওরে ওউ, কেও কেটা নয় কেউ।
কাক ভুসু'ডা বকাক ক পাখ ময়না কপচায় না
বকবকায় বকম পায়রা
ডাক-পাখি ডাকে
এরে অ আ ক কা!



চাঁদের দেশ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক

রাজকনে।

রোদ ঝলমল দিনে ময়ূরপঙ্খীতে হাসেন।

রাজকনে জোছনা ঝলমল রাতে শুকপঙ্খীতে আসেন।

রামধনুর রং পুরী। সাতমহলের পর দুধসায়র। দুধসায়রে রাজকন্যের দুধ ধবধব শ্বেত মহল।

হীরের খাটে পা, সোনার বরণ বেশ,
কুঁচবরণ গা, কাজলছায়া কেশ,
ফুলহাসন খাটে রাজকনে ঘুমান।
আর, রাজকন্যের পুতুলেরা ঘুমায় মণি মাণিক্যের দোলায়।

ফুরফুরে বাতাসে জোছনা হেসে লুটোপুটি......"ও রাজকনে, রাজকনে! ঘুমুবে না, খেলবে? না, খেলবে না ঘুমুবে?"

রাজকন্যের কাজলছায়া কেশে বাতাসের কাঁচ আঙুল। চোকের পাতায় জোছনার কাঁচ আঙুল। শুড়শুড় শুড়শুড়! রাজকনে আস্তে স্বস্তে চোকের পাতা মেলেন। ওমা!

ফুলফুল মুখ
দুলদুল গা,
ঝিলমিল বুক
উড়ু উড়ু পা,

"কারা গো, কারা?"
"আমরা?
ঘুমবাগের পরীরা!"

কোথায় ঘুমবাগান? চোক মেললেন রাজকনে। দেখেন, দুধসায়রে এক শ্বেতপঙ্খী।

দুজনে বলে, "রাজকনে, রাজকনে,
দুধসায়রে— ঢেউ,
যাবে না তো কেউ?"

যাবে না? যে হও সে হও, শ্বেতপঙ্খী ফিরে যাবে! উঠে রাজকনে তাড়াতাড়ি সিঁথিপাটি কাটেন, জোলন শাড়ী পরেন, নূপুরপায়ে হাঁটেন।

রুণু ঝুনু রুনু।
চলেন।

দুই

শ্বেতপঙ্খী চলে সোঁ সোঁ সোঁ।

দুধের ঢেউ দুর দুর, মেঘের ঢেউ চুর চুর, আকাশের ঢেউ ঝুর ঝুর, শ্বেতপঙ্খী শ্বেতরাজ্যে এসে পড়ে। শ্বেত নদীর সোঁত চিক চিক চিক।

"হায়!" টুকটুকে আঙুল গালে, থ'খেয়ে রাজকনে বলেন, "কি যে করলেম!"

দু বোনের চমক, "কি, কি? রাজকনে, কি?"

রাজকনে চুপ। কোলে দুখান হাত, না কথা না কিছু, বলেন, "এলেম তো, মিছে! খেলব কিসে?"

"কেন রাজকনে, কেন?" থমকে দুজন।

"ভুললেম রঙী পুতুল, ভুললেম সংগী পুতুল, ভংগী, তরংগী, অত পুতুল, তা-ও আনলেম না—বোন!"

"রাজকন্যে, রাজকন্যে!" হেসে ওঠে দু বোন,

"মণি মাণিকের দোল্‌না
থাকে থাক্ তোল্‌না,
ভুলেছি তো ভুলেছি!
কোথায় যে এলেম,
জানো
রাজার ঝি?"

তিন

রাজকন্যে অবাক!

দেখেন, আকাশে নেই চাঁদ্‌নো, মেঘে মেঘে পাল্‌নো, চাঁদের দেশ!

শ্বেতপঙ্খী ঘাটে ভিড়ে। আর, বাঁশীতে সুর!

ধুলো চলে পাখায়, পাহাড় ওড়ে চাকায়, ঝরণা হেসে জোনাক্ জ্বলে!

রাজকন্যে এদিকে চান, ওদিকে চান; রূপোলী বন, হীরেলী ফল, ক্ষীরের সায়র টল্ টল্, ক্ষীরের মাছ, ফুলের নাচ!

দু'বোন বলে, "রাজকন্যে, নামি?"

নামেন, আলপনায় আকণ, পথ তো না ......মাখন, নূপুরের সুর হারিয়ে যায়!

চলেন, সাত সাত মুক্তোপুরী, হিরের হাওয়ার ঝুলন, সিঁড়ি, রাজকন্যে চলেন চলেন, চলেন।

চার

পাখীর কিচ!
কে হৈ করে!
পাখার ঢেউ কে কে করে!
"রাজকন্যে, রাজকন্যে!"



রাজকন্যে কি, শোনেন? রাজকন্যের চোকে পলক পড়ে না।

ঘুমপাহাড়ের তল, ঘুমঝর্ণার জল......রাজকন্যে দেখেন...... ফুলপরীতে ছেয়ে আছে! ঘুম পাহাড়ের পাথর, ঘুমবনের পাতা জোছনায় নেয়ে আছে!

সেই ঝুমঝুমী পাতায় পুতুলপরীর হাট! ঘুমঘুমোনো পাখরে কার অঞ্জন পাটি?

পরীর চোখ দেখেন, দেখেন পলক ফেলে। টুকটুকে আঙুল ঠোঁটে, রাজকন্যে দেখেন যত যে কনে, যত রাজকন্যে, ঘুমপাহাড়ের পাথরে ফিস্ ফিস্! অমনি দেখেন যত যে পুতুল, পরী হয়ে ওড়ে, কথা কয় ফিস্ ফিস্!

রাজকন্যের কি আর পলক পড়ে? রঙী ভঙ্গী সঙ্গী আসে আপন পুতুল, "রাজকন্যে! রাজকন্যে!"

যত কনের মধুর সুরে "রাজকন্যে! রাজকন্যে!"

রাজকন্যে?
থতমত!

ফিরে'
চোক চান যেই,
দু' বোন তো,
নেই!

ভোর!

—তা'পর?

জেগে রাজকন্যে দেখেন, ঝলমল রোদ!

কিসের চাঁদের দেশ? মণির দোলায় পুতুল, মাণিকের দোলায় পুতুল!

সন্ধ্যা ভোর।
নিশুত রাত।
রাজকন্যে ঘুমঘোরে খোঁজেন আবার চাঁদের দেশ!
ঘুমের ঝরণা!

পরীরা বলে, "রাজকন্যে, দিনের বেলা যাই, পুতুল হয়ে খেলি। চাঁদের দেশের পাখী, রাতে ফিরে আসি!"

কনেরা বলে, "রাজকন্যে দেশে দেশে থাক, আস তো না, আমরা চাঁদের হাসি, দিন হলে যাই, দু'বোন মাসি পিসির সাথে আসি ভাই!"

ঘুমে নিঝুমে,
রাজকন্যে ভাবেন,
'পুতুলেরা কি চাঁদের পরী?
মেয়েরা কি চাঁদের জোছনা?'

রাজকন্যে জাগেন।

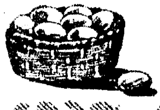
ভোরের পাখী গান গেয়ে বলে—"রাই জো!"
সাঁঝের পাখী বাসায় ফিরে বলে, "তাই তো রাজকন্যে!"

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

শরৎ ভোরে শুভেচ্ছা নাও মধু মনের প্রীতি
শারদ অর্ঘে সাজিয়ে দিলাম সকল জনের গীতি
রূপকথাতে গল্পে ছড়ায় গান গেয়েছেন যাঁরা
আমার তোমার সকলেরই প্রণম্য হন তাঁরা
শ্রদ্ধা ভরে এসো সবাই তাঁদের কথাই শুনি।
পুজোর ছুটির দিনগুলি তাই অমনি করেই গুণি।

—'মৌমাছি'

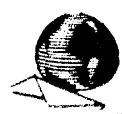


সাফ্ জবাব

শ্রীসুনির্মল বসু

(হাসির কবিতা)

বাবু বলেন, বেজায় রেগে বলেন ডেকে চাকরে—
"যখন তখন অমন কেন তাকিয়ে থাকিস্ হাঁ ক'রে?
দিনরাতে তোর মুখখানা দেখতে নারি দু'চোখে,
তাড়াতাড়ি করবি যদি তাড়িয়ে দেব ছুঁচোকে।
পাঠা যেন হাঁসপুকুরে, বাদ্‌শাহী চাল বড় যে,—
ইচ্ছামত কাজ করবি কেবল নিজের গরজে?
শুয়ে বসে থাকবে খালি, হতচ্ছাড়া বে-আড়া,—
কোনো সময় দেখলে বাঁচি ভূতের মতন চেহারা।
গরুর খোরাক দেওয়া থাকে, হাত দিস্‌না খাড়ুতে,—
রাত সকালে উঠে কেন জল দিস্‌না গাড়ুতে?
তাকের উপর ধূলো জমেছে, পারিস না তা সারাতে?
তোর মত ভাই বজ্জ কুঁড়ে কে আছে এই পাড়াতে?
আমড়াতলে ভীষণ ভিড়, পড়ছে নাকি নজরে?
চটাং করে পাতের উপর চড় লাগাবো সজোরে।
এখন বাকী দু'টোর মজা, তোমার নামটি বাবাজী,—
কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, সমুখ থেকে যা পাজী।
ধান্দা মত কাপড় কাচা একটু যাওয়া বাজারে,
দুটি বেলা রান্না শুধু, একটুকু সাজা রে,
এই কাজেতেই দিন কেটে যায় কেবল ফাঁকি, চালাকি,
দিন রাত্তির আড্ডা মারিস্; শুনতে পাই না, কাজ কি?
হাতে-কলমে আজকে আমি বলেছিলাম দু'পরে,
—ডিম পেড়ে আন মুরগি যেথা আছে খাটের উপরে।
আনলি না তা কিছু, লক্ষ্মীছাড়া, শুনলি না তা কিছুতে,—
বল্‌, এখন কি জবাব দিবি, ভাবিস কেন নীচুতে?
বল কেন ডিম পাড়লি নাকি, ছাড়লি নাকি একাজে—
হুকুম দেখো কেমন খাঁটি, তুলতে চোখ কে পারে?"
ঘাড়টি নেড়ে মুচকি হেসে বলে চাকর [illegible]।
"ডিম বলেছি এই তো আমি ডিম কখনো পাড়িনি।
আমরা তো নই হাঁস-মুরগির মতন কোনো প্রাণী না,—
মানুষ হয়ে কেমন করে ডিম পাড়ব, জানি না।"



কৃষ্ণদয়াল বসু

(নীতি-কবিতা)

বন্ধু পাঠালো পত্র বিদেশ থেকে—
বেয়ারিং-চিঠি, বিশেষ জরুরী লেখা,—
অবাক্ বন্ধু চিঠিখানি খুলে দেখে,—
অমনি ফুটিল হাসির কুটিল রেখা।
শুধু লেখা তায়—"বন্ধু, জানাই প্রীতি।
আমি ভালো আছি—ইতি।"

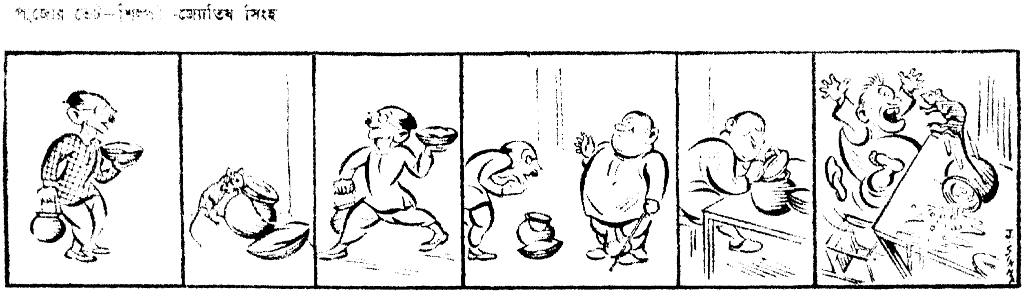
এই তো খবর!—এরি লাগি অকারণে
গুনল মাশুল সেই চিঠি হাতে নিতে!
"লব প্রতিশোধ,"—ভাবিল বন্ধু মনে,
"শঠে শাঠ্যং—নীতি এই পুঁথিতে।"
উদ্দেশে বলে, "ভাই, তুমি এই বলো—
তার পাবে প্রতিফল।"

হপ্তাটেক এক পাথর বোঝাই পুঁটলি—
একবার শুধু আপনার মনে হেসে—
সেইদিনই সেই দুর্ভোগী বন্ধুরে
বিনা মাশুলেই পার্শেল পাঠাল সে।
উপরে লিখিল "প্রীতি-উপহার দিলাম।
মাশুল যা লাগে দিয়ো।"

আকারে বিশাল, ওজনেও হবে তা—
ভিতরে না-জানি কত কী রয়েছে দামী!—
বন্ধু ভাবিল, "বন্ধুর উপহার—
যা লাগে মাশুল, এক্ষুনি দেব আমি।"
দিয়ে মাশুল, নিয়ে সে বাক্স খুলে
দেখে, তাতে [illegible]!—

"এ কি এ ... আহা!"—কপালেতে কর হেনে—
ছোট চিঠি ছিল তাতে শুধু লিখা ভাই—
"বিদ্রুপ বন্ধু, তুমি এতো ভাল জেনে,
মনে ছিল জেনো বুকের মধ্যে নাই!
অথবা, বুকে ছিল যে পাষাণ-ভার,
রইল না বুকে আর।"

পূজোর ভেট—শিল্পী জ্যোতিষ সিংহ



ভেট কিনে— —এনে তাড়িয়ে রাখলো— সকালে চল্লো— বড়বাবু সন্দর্শনে। দেখি কিঞ্চিৎ চেখে —ওরে বাব্‌বা!

'দুটি চোখ'

—(রূপক)—

মনোজিৎ বসু

দুটি চোখ। পলক পড়ে না। শুধু দেখে।

সম্মুখে এক বিরাট রাজ্য। ধূ ধূ করে তার মাঠ, মাঠে ফসল নেই। বয়ে যায় নদী, কিন্তু শব্দ করে না। গাছের ফল পেকে পড়ে যায়—খাবার লোক নেই। জনহীন প্রান্তর। মাঝে মাঝে দু একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, কিন্তু সে ডাক শেয়ালের [illegible]! দিনের বেলাতেই শেয়াল হাঁকে—হুক্কা হুয়া, ক্কা হুয়া!

চোখ দুটি আরো ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে। দেখে—কুৎসিৎ একজোড়া পা, আর তার চেয়ে কুৎসিৎ একজোড়া হাত—পিঠে প্রকাণ্ড এক বস্তা। লোকটা বস্তার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। মাথা দেখে চেনবার উপায় নেই। কিন্তু কী যেন ঠক্ ঠক্ করে মাটিতে।

সোণালী ধান। বস্তার ফুটো দিয়ে পড়তে পড়তে যায়। লোকটা টের পায় না। কিন্তু চোখ দুটি সাক্ষী থাকে।

সোনালী ধান। [illegible] সোনালী—সেই ধান। [illegible] সোনার মতো [illegible]।

[illegible]

বুড়ীর [illegible] মানুষ [illegible]। চোখ দুটি [illegible] আপন মনেই [illegible]।

[illegible]

চোখ দুটি দেখে, [illegible] বুড়ীর [illegible] দেহ [illegible]।

বুড়ী শুধু [illegible] না। [illegible] দেশের লোকের [illegible] দেশ যাবে! [illegible] অত্যাচার, [illegible]—প্রতিবাদ করবার যাদের ক্ষমতা [illegible] সবাই মিলে যারা নিজেদের জিনিস নিজেরা [illegible]—তাদের জিনিস কে রক্ষা করবে! [illegible] কাজই হচ্ছে লুণ্ঠন করা, সে সব লুটে নেবে।

বুড়ী চলতে পারে না। মাটিতে বসে পড়ে।

চোখ দুটি দেখতে পায় বুড়ীর দু'চোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে।

বুড়ী বলে—আমি মা, আমি [illegible] বেঁচে আছি। দস্যু আমার ছেলেদের [illegible] খাঁচায় পুরেছে, কারণ তারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। খাঁচায় বন্ধ করে তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। মেয়েরা মরেছে তিল তিল করে না খেতে পেয়ে। আমি বুড়ী-মা সব দেখেছি নিজের চোখে—প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছি, কিন্তু বুড়ীর সে কথা ও-দস্যুর কানেই পৌঁছয়নি। হা ভগবান, তবু কি আমার মরণ নেই!

চোখ দুটিতে জল টলমল করে। ঝাপ্সা লাগে।

বুড়ী মাটিতে গা এলিয়ে দেয়। ভাঙা ভাঙা গলায় তখনো বলে চলে—এ দস্যুর অত্যাচার কে বন্ধ করবে? [illegible] চাই যাদের বুকের রক্ত ফুটছে টগবগ করে, চোখে যাদের অসীম বল, চোখে যাদের সাহস ও দীপ্তি—চাই সেই কিশোরদের [illegible]। তারাই বন্ধ করতে পারে দস্যুর অত্যাচার, তারাই [illegible] এই শ্মশানকে আবার সোনার [illegible] করতে। কিন্তু এই বুড়ীর ডাক কি তাদের কানে পৌঁছবে, [illegible] ঘুম-ঘোরে [illegible] ঘুমিয়ে [illegible]? বুড়ী [illegible] আর কথা বলতে পারে না।

চোখ দুটি দেখে [illegible]।

[illegible] কিশোর [illegible]। বুড়ীর [illegible] দুটি হাত। বুড়ী-মা চমকে ওঠে। মায়ের [illegible] হাত [illegible] বুড়ী-মা [illegible] হাজার হাজার [illegible] জেগেছে।

[illegible]

[illegible] দুটি চোখ [illegible] ওঠে।

[illegible]

কিশোরের বন্ধু

[illegible]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[illegible] মিণ্টুর [illegible] মিণ্টু [illegible]।

[illegible] চিৎপ্রসাদ [illegible] মিণ্টুর বাবা আর [illegible] জমিদার [illegible] মিণ্টুর [illegible] মিণ্টু কিন্তু তার সব [illegible]।

মিণ্টুর মা [illegible] কি তুমি ভুলোকে বিক্রী [illegible] আর [illegible]।

মিণ্টুর বাবা [illegible] কি করবো বল। [illegible] জমিদারের [illegible] দিতে চাইছে। [illegible] দিন [illegible] আর কি আর বিক্রী করছি, সেটা ভেবে দেখ ত।

মিণ্টুর মা [illegible] মিণ্টু [illegible] উঠবে, [illegible] মিণ্টুর বাবা [illegible] জমিদারের [illegible] সকাল বেলা আসতে বলেছি। এই [illegible] মশাই এসে পড়েছেন। কাম্বিসের [illegible], মাথায় টুপি [illegible] গোমস্তা মশাই এসে হাজির হলেন।

আদরের ছোট্ট বন্ধুটিকে বুকে ভুলোকে চুপি চুপি বাইরে নিয়ে আসা হল। কেঁউ কেঁউ করে ভুলো আপত্তি জানালে। কিন্তু তখন তার আপত্তি শোনবার মতো লোক কেউ আশে-পাশে ছিল না। গোমস্তা একটা বকলেস আর শেকল পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেইটে ভুলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে টানতে টানতে তাকে নিয়ে রওনা হলেন।

ভুলো সোজা হাঁটাপথে এসে হাজির হল গঞ্জের জমিদার বাড়ীতে। দুটো চাকর তার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। হাতে তাদের কুকুরের সাবান, গা ঘসার সরঞ্জাম, তোয়ালে এইসব। টবে আলাদা করে জল তোলা ছিল। দু'জন মিলে ভুলোকে দিব্যি করে ঘসে ঘসে স্নান করিয়ে দিলে। তারপর জমিদার [illegible] হাতের তৈরী পিতে ৮ কড়ার একটা [illegible] দিয়ে দু'টো চাকর তাকে সাজ পরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এলো খাবার। মাংসও ছিল [illegible] দুধ পাউরুটিও ছিল। ভুলো একবার নাক দিয়ে শুঁকে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। এর চাইতে মিণ্টুর [illegible] খাওয়া তার অনেক বেশী মিষ্টি।

জমিদারবাবু প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ নিয়ে এসে এক বার তাকে আদর করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভুলোটা এমন জোরে ঘেউ ঘেউ করে খেঁকিয়ে উঠল যে [illegible] পালাবার পথ পান না।

[illegible] দু'টো [illegible] শিকল দিয়ে বেঁধে [illegible] একটা যায়গায় আটকে রেখে দিলে।

[illegible] বন্দী হয়ে থাকবার অভ্যেস ভুলোর [illegible] নেই। [illegible] থেকে থেকে কান্না পেতে লাগলো। [illegible] কেমন একটা [illegible] লাগলো। জমিদার মশাই ডেকে বলেন, কুকুরটার অসুখ করেছে—একটা ডাক্তার ডেকে আনতে হবে।

[illegible] মধ্যে ঠিক পড়ে গেল। পাগড়ীটা মাথায় [illegible] ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। ভুলো বসে বসে ঝিমুচ্ছে। এই নতুন যায়গাটা তার আদপেই ভালো লাগছে না। [illegible] করে [illegible] থেকে লালা টপ্‌টপ্‌ করে পড়ছে। খিদে হয়েছে খুবই পেয়েছে কিন্তু [illegible] খাবার ভুলোর মুখে দেবার আদৌ [illegible] চারটে [illegible]।

[illegible] ভুলোর [illegible] হয়ে উঠলো। এই [illegible] ইস্কুলের ছুটি হল আর ভুলো মিণ্টুদের ইস্কুলের সামনের [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] ভুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। [illegible] চারিদিকে লোহার বেড়া। ভুলো [illegible] ছুটোছুটি করল, [illegible] দিয়ে [illegible] মিনিট [illegible] মিনিট [illegible] মিনিট। [illegible] ভুলো [illegible] দিয়ে দেওয়া [illegible] দিলে, [illegible] ছুটে ইস্কুলের সামনে গিয়ে হাজির হল। মিণ্টু [illegible] গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটে এসে ভুলোকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। কতক্ষণ তাদের এইভাবে কেটেছে কেউ জানেনা!

হঠাৎ দেখা গেল মিণ্টুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গোমস্তা মশাই সেইখানে এসে হাজির। হাতে তার একটা নতুন বকলেস।

মিণ্টুর চোখে জল এলো, সে চেয়ে দেখলে ভুলোটা তারই দিকে তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দু ফোঁটা জল তারও চোখে চিক্ চিক্ করছে! কিন্তু বয়েসে বড় মানুষদের সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। গোমস্তা মশাই ভুলোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্লেন। ভুলো কেঁউ কেঁউ করে কত কাঁদলে। বহু দূর অবধি তার কান্না শোনা যেতে লাগলো।



আজব প্রথা

—দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কান দিয়ে আমি নিঃশ্বাস নেবো, চোখে নাকে আমি বইব কথা—
তেরশ তিরিশ [illegible] সালে চলবেই এই আজব প্রথা—
লেখাপড়া আমি [illegible], [illegible] পড়বো চুলে ও লিখবো মুখে
হাত উঁচু করে [illegible] বাগানে [illegible] মনের গন্ধ শুঁকে।
জুতো জোড়া আমি [illegible] পরাবো শার্ট পাঞ্জাবী পোরবো পায়ে—
পাউডার দিয়ে চুল আঁচড়াবো, [illegible] দেবো ঘামাচি গায়ে।
দাঁড়কাক [illegible] [illegible] পড়াবো নিত্য কৃষ্ণ-রাধা—
ঘোড়ার গাড়ীতে জুড়ে দেবো [illegible]—[illegible] গাড়ীতে ঘোড়া কি গাধা।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রোদে,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গলায় [illegible] [illegible]-বোদে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হলেই চিবিয়ে খাবো—
[illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] ছাদে,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাকে [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
আম খাবো আমি আঁটিটা [illegible], [illegible] [illegible] দেবো [illegible] [illegible],
খাতার পাতায় [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] চাল।
প্রথম ভাগের অ আ [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible]।
[illegible] ডাকবো—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] ডাকবো—[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] রাস্তা [illegible] [illegible],
একা একা আমি [illegible] করে জমিয়ে তুলবো [illegible] সভা।
বাজারেতে গিয়ে দশ টাকা দিয়ে কিনবো [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
সাইকেল চড়ে [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
পাখির গলাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
রান্নাঘরেতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।
কাদা দেবো আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] দেবো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] জুতো [illegible]।
পৃথিবীটা [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
এফোঁড় ওফোঁড় [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] যখন [illegible] [illegible] [illegible] তখন চাঁদের হাসি,
[illegible] দিয়ে ওই [illegible] দিয়ে চাঁদের আলোয় [illegible] বাঁশী।
পা দুটো যদিও মাটিতে থাকবে মাথাটা থাকবে নীচের দিকে,
কেন পড়বো না নিউটন তার থিওরী গেছেন আগেই লিখে।
তারাগুলো যদি গোলমাল করে, ছিপ ফেলে তবে আকাশে তুলে,
বাল্‌বগুলো [illegible] [illegible] [illegible] করে দেবো [illegible] [illegible]।
বিমানধ্বংসী কামান দাগ্‌বো—সূর্য পড়বে মাটিতে ঝরে,
কয়লার মত হাতুড়ীর ঘায়ে গুঁড়ো করে দেবো উনুনে ভরে।
স্বপন দেখবো দূরবীন দিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াবো গভীর ঘুমে,
চপ্‌-কাটলেট সাজিয়ে রাখবো ফুলদানী করে ড্রইং রুমে।
আকাশের গায়ে পেরেক পুঁতবো দৃশ্য ঝোলাবো বাঁধিয়ে ফ্রেমে,
গ্রহতারা ধরে ভাই ভাই বলে হাবুডুবু খাবো বিশ্বপ্রেমে।
আর যদি মরে ভূত হয়ে যাই?—মহাভাবনার কথাই বটে—!
আচ্ছা দেখি ত তেরশ তিরিশে আজব প্রথার আগে কি ঘটে।

বেহারী

রেখা ও লেখা ধীরেন বল

লম্বা পুজোর ছুটী পেয়েই ছোড়দা গেলো দেশের বাড়ী,
ফিরে এলো সঙ্গে নিয়ে নতুন চাকর—নাম বেহারী।
"জানিস্ সুধা, বেহারীটা ভীষণ রকম কাজের ছেলে!
উন্নতি ঠিক করবে দেখিস্ একটু খানিক সুযোগ পেলে।
পাড়াগেঁয়ে বলেই নিরেট ভাবিস্ নে এই বেহারীকে,
[illegible] [illegible], ঝোঁক আছে তার নিত্য নতুন শেখার দিকে!
আমাদের এই [illegible] [illegible] রামচরণের [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মিথ্যে তারিফ্ করিস্ তোরা।
[illegible] [illegible] কায়দা কানুন শেখাই যদি—দুচোখ দিনে
[illegible] কি বেহারী, আর পারবি নাকো উঠ্‌তে চিনে।
[illegible] [illegible] [illegible] থেকে—রামচরণটা রাম বল ছিঃ!
[illegible] [illegible] শেখাও সাধ, আস্ত যেন চাংড়া কচি!
[illegible] [illegible] শিখিয়ে দিলে সত্যি কিনা দেখিস্ ওরে—
[illegible] [illegible] যাবে একেবারে [illegible] মেরে!"
[illegible] [illegible], রান্না এবং জুতো [illegible], জামা ঝাড়া,—
[illegible] [illegible] মনের মতন হয় না বেহারীকেই ছাড়া।
[illegible] [illegible], আমরা খুশী এবং খুশী ছোড়দা আরো,
[illegible] [illegible] [illegible] এখন বেহারীকে চিনতে পারো?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিখলো নাকো গোটা [illegible],
[illegible] [illegible] এ [illegible] পারে [illegible] [illegible]!
[illegible] [illegible] দিয়ে বাজায় ওর ইচ্ছে ভারী,
[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] এই বেহারী?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—ছোড়দা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]—[illegible]—ও ঘরে ওই টেলিফোনের [illegible] বাজে,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি এক কাজে,—
[illegible] [illegible]—দেখি সে ঠিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!
[illegible] [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] না যদি হয়, ও আমাদের [illegible] [illegible]!
[illegible] মিনিট নেই যে [illegible], [illegible] [illegible] হয়েছে হবে,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—ব্যাপারটা কি দেখিস তবে!



"ও আবার কি! ও বেহারী, ফোনটা নিয়ে অমন হেন
কোমর হেলে ঘাড়টা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছ হোথায় কেন?"
বেহারী কয়—"দিদিমণি—বল্‌ছে খালি—'হেলো-হেলো,'
হেল্‌বো দেখ কতই আরো? হেল্‌তে যে মোর কোমর গেলো।"

শ্রী ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজে লেগে থাকা চাই কিবা দিন রাত্র—
পুঁথিতে পড়েছে ভালো—নরহরি পাত্র।
তাইতো সে এক পলাও করেনাক নষ্ট,
ভয়ানক কাজ করে প্রহরেতে অষ্ট।
রাত থেকে ভোর আর ভোর থেকে সন্ধ্যা—
ছুটোছুটি করো বলে—ওরে নিং—নন্দা—
ওরে ভুলো, নিয়ে, শ্যামা ভুলো যদি চাস্ রে
[illegible] মুখ দেখে দুপুরেতে হাস্ রে।
ঘাস খেয়ে হাঁস্ [illegible] উঁচু।
অন্ধকার ঘটিতে বলো আর ছুঁচ।
পাঁঠারে মিছিমিছি কেন মারো নিন্দু?
তার চেয়ে হাওয়া ভালো জন্মু কি আন্দ্রা।
খোলা মাঠে গান গেয়ে উঠি [illegible]—
খোলা মাছ ধরা ভালো [illegible] চক্ষু।
[illegible] কে বল্!
মিছিমিছি [illegible]।
এই হাতে [illegible] উঁচু।
[illegible]
তার চেয়ে [illegible] যাচ্ছে
[illegible]
[illegible] হাতে—
[illegible]
[illegible]
[illegible]



ফটো তুলেছেন কুমার রবীন রায় (সন্তোষ)

পূজোর সওদা

শ্রীবিমল ঘোষ

পয়সা দিয়ে সব কেনা যায় বাবের দুধও মেলে,
এমন কথা, এই সেদিনে বলছিলো এক ছেলে।
তার কথাটা শুনে আমার বেজায় হাসি পেলো,
এই কটা চীজ্ কিনতে পারো? পয়সা যদি মেলো।
চাঁদের মুখের পাউডারটা, পাবে কোথায় গেলে,
চিরুণীর ঐ দাঁতের মাজন কোন্ দোকানে মেলে?
কলার হাতের আঙটি বলো কোন্ দোকানে পাবে?
ঠিকানাটা দাও তো দেখি বলো আমার চাবে।
খাটের পায়ের বুটজুতো কি কিনতে তুমি পাবে?
আনারসের চোখের চশমা? দাঁড়িও আছে আবার!
কোট একটা পরাতে চাই ঐ দেওয়ালের গায়,
বেহালা তার কান সাজাতে কানপাশা যে চায়।
এগুলো ভাই দাও না কিনে পয়সা আমি দেবো,
গামছা আমার সাথেই আছে, তাতেই বেঁধে নেবো।
আর একটা কথা শোনো বলি চুপি চুপি,
তালগাছটার মাথার তরে চাই একটা টুপি।
কলসীটার ঐ গলায় মানায়, এমন একটা টাই,
সত্যি বলছি দাদা আমার, আজ এখনই চাই।
জুতোর জিভের জিভ্ছোলা চাই এটাও তুমি জেনো,
জানলার পাখীর ছাতু কিছু সেই সঙ্গে এনো।
এসব নিয়ে স্বর্গে যাব—সুখ কি হেথায় ভাই?
স্বর্গদ্বারের তালা-চাবি সেটাও কেনা চাই।
পূজোর সওদা এইগুলি মোর, তোমরা দেবে কিনে?
লুটের পয়সা সস্তা শুনি, এই যুদ্ধের দিনে!

কিশোরের ব্যথা

শ্রীসুবোধ রায়

শরৎ এলো, সবার মুখে
ফুটলো তোমার হাসি,
তোমার বুকে দাঁড়িয়ে দিকে
বাজে আলোর বাঁশী।
সেই সুরেরই সুরে মিলায়ে
গাইতে যে চাই গান,
মিলুক যেমন আলোর সাথে
নদীর কলতান।
কিন্তু মা গো,—গাইতে গিয়ে
গাইতে পারি না যে,
সব আনন্দ আড়াল করে
বুকে ব্যথাই বাজে।
যতই করি—কণ্ঠে আমার
সুর যে নাহি ফোটে,
সকল হাসি ছাপিয়ে মোর
অশ্রু হ'য়ে ওঠে!
অনাহারে, রোগে ভুগে,
কত মায়ের খোকা
মরছে যে হায় দিনে দিনে,
যায় কি লেখা-জোখা?
মায়ের কোলে মরলো যে মা,
তারা পথের ধারে,
এক ফোঁটা জল মরণকালে
দিলো না কেউ তারে;
নিয়ে গেলো আমার যত
সব মায়ের ছেলে
অবশেষে শেষের টানে
মাকে হায়রে ফেলে!
অনাথ হলো, নিঃসহায়
সে সব মায়ের মুখ
সুখকে মা এই সুখের দিনে
কাঁদায় কেবল বুক।
সে সব মায়ের মুখে কভু
জাগবে কি আর হাসি?
শরৎ আলো তাদের তরে
বাজাবে কি বাঁশী?
তাই তো কেবল ভাবি—"কেন
এমন নিয়ম হায়!
কেউ বা পথে মরে, কেউ বা
মোটর চ'ড়ে যায়!
খাবার ছড়ায় কেউবা, কেহ
খেতেই নাহি পায়!
দুঃখীর পানে ধনীরা কেউ
ফিরেও নাহি চায়।"

লণ্ঠনে ছবি অদ্ভুত

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

জীবনী-গল্প

অনেক দিন প্রায় তিনশ' বছর আগেকার কথা। ভিন্‌সেন্‌ৎসিও বলে একটি সাত বছরের ছেলেকে ডেকে তার বাবা বললেন, 'দেখ বাবা, তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারি, সে সঙ্গতি আমার নেই। বসিয়ে খাওয়াতেও পারব না। আর এখন ত দিব্যি বড় হয়েছ, এইবার তুমি তোমার পথ দেখ। সৎপথে থেকো, তাহ'লে ঈশ্বর আর মানুষ দু'জনেরই দয়া পাবে।'

এই উপদেশ আর অল্প গুটিকতক টাকা দিয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

ইতালীর যে গ্রামটিতে ওদের বাড়ী, তার কাছাকাছি শহর হ'ল ফ্লোরেন্স। ভিন্‌সেন্‌ৎ আর কি করে, সে দুটি গুটি কাপড় জামার পুঁটুলিটি বগলে করে শহরেই এল। বয়স কম, লেখাপড়া আরও কম, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি ছেলেটির ভালই ছিল, সে শহরে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল পয়সা রোজগারের কোন ফিকির করা যায় কি না।

তখন ম্যাজিক লণ্ঠন সবে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানের সামনে ঐ রকম লণ্ঠন সাজানো রয়েছে দেখে একটা মতলব ঝাঁ করে ওর মাথায় খেলে গেল। এ জিনিষ এখনও নতুন, গ্রামে গ্রামে যদি এর ছবি দেখানো যায় ত দু' পয়সা হবে না? সে দোকানদারকে গিয়ে বললে, 'কি করে এতে ছবি দেখাতে হয় আমায় বুঝিয়ে দাও!'

দোকানদার ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর সে পকেট থেকে সমস্ত টাকা পয়সা বার করে ওর সামনে ধরে বললে, 'এর কত দাম জানি না, কিন্তু এতে কি হবে?'

দোকানী হেসে বললে, 'ওতে ত হবেই না, ওর দশগুণ টাকাতেও হবে না।'

ভিন্‌সেন্‌ৎ খুবই দমে গেল। ওর মতলব দোকানী আগেই শুনেছিল, তাই ফিরে যাবার সময় ওর চোখ ছলছল করছে দেখে দোকানীর দয়া হ'ল, সে বললে, 'কিনতে তুমি পারবে না; তা এক কাজ করো না কেন, তুমি ভাড়া নিয়ে যাও। তোমাকে দেখে সৎ ছেলে বলেই মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারি। এ ছবি দেখিয়ে যা পয়সা তুমি পাবে তার অর্দ্ধেক তুমি প্রতি শনিবার এসে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেও, সেইটেই হবে আমার ভাড়া।'

ওর মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে যন্ত্রটি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

* * *

ভিন্‌সেন্‌ৎসিও সেই লণ্ঠন নিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিন দেখিয়েই বুঝতে পারল লোকের দেখবার যতটা চাড়, পয়সা দেবার বেলায় তার কিছুই নেই। এক সপ্তাহ পরে যা টাকা ও পেলে তা নিয়ে দোকানীর কাছে গেলেই ওর অর্দ্ধেক দোকানী ছাড়া ... তারপর ... দিয়ে যা বাঁচল, তা থেকে এক বেলা খেতেও ওর কুলোয় না।

এমনি করে আরও দু' তিন সপ্তাহ ও ঘুরে বেড়াল। ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় সবটাই বুড়ো হয়ে গেছে ও তখন। তাছাড়া এমন করে না খেয়ে আর কদিন পারে? শেষে ও স্থির করলে যে, গ্রামে না ঘুরে শহরেই ঘুরবে, শহরের লোকের পয়সাও বেশী, সুতরাং বেশী দু' পয়সা হতে পারে।

কিন্তু হায়, হায়! ফ্লোরেন্সের রাস্তায় রাস্তায় সারাদিন ধরে ঘুরেও কোন সুবিধে হ'ল না, সপ্তাহের শেষে দেখলে আগের হপ্তার চেয়ে তার আয় আরও বেশী কমেছে।

তবু সে হাল ছাড়ল না। শীতে কেঁপে, রোদে পুড়ে না খেয়েও নিয়ত ঘুরে দিন গুজরান করতে লাগল। অবশেষে একদিন ওর অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'ল। সেদিন ঘোর বর্ষা, ও শহরের একটা মোড়ে বসে ভিজছে আর শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে —এমন একজন লোকও সকাল থেকে পায়নি যে ছবি দেখে দুটো পয়সা ওকে দেয়। একেবারে সন্ধ্যার সময় একটি ভদ্রলোককে সেই পথ দিয়ে যেতে দেখে ও প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে গিয়ে তাঁকে বললে, 'একবার একটু দাঁড়িয়ে আমার লণ্ঠনের ছবি দেখে যান না! অনেক পাঁচ মিশেলি সূর্য্যের ছবি আছে বিস্তর!'

ভদ্রলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসলেন, বললেন, 'সূর্য্যের ছবি দেখাবে খোকা? আচ্ছা চলো দেখি।'

ওর ত মহা উৎসাহ। ছবি দেখাতে দেখাতে সৌরজগৎ আর সূর্য্যের সম্বন্ধে, ও দোকানীর কাছ থেকে যা শুনেছে, একটা বক্তৃতাও দিয়ে দিলে। ভদ্রলোকটি খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন, সাত বছরের ছেলের বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে তিনি কী দেখলেন তা তিনিই জানেন, বললেন, 'খোকা তুমি এই সব আরও ভাল করে শিখতে চাও?'

ভিন্‌সেন্‌ৎসিও সাগ্রহে জবাব দিলে 'চাই।'

'আমি যদি তোমাকে এই সব শেখাবার ব্যবস্থা করে দিই, তুমি বরাবর আমার সঙ্গেই থাকতে পারবে কাছে?'

আশায়, উত্তেজনায় ওর চোখ জ্বলে উঠল, সে বললে, 'থাকব।'

'তবে চলো।'

সেইদিন থেকে ভিন্‌সেন্‌ৎসিও সেই ভদ্রলোকটির আশ্রয় পেলে। তিনি যে আর কেউ নন, তিনিই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। ... সূর্য্য সম্বন্ধে যাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, ভিন্‌সেন্‌ৎসিও তাঁকেই ডেকে এনে সূর্য্যের রহস্য বোঝাচ্ছিল।

তারপর?

তারপর আর কি? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভিন্‌সেন্‌ৎসিও ভিভিয়ানীর কথা কে না শুনেছে। আশী বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন, তার জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের চর্চা করে কাটিয়েছেন। দেশ বিদেশের রাজা-রাজড়া ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে সম্মান দেখিয়ে নিজেরাই ধন্য হয়েছেন। কোথায়, সেই ম্যাজিক লণ্ঠনটি তিনি রেখে দিয়েছিলেন কিম্বা দোকানীকে ফেরৎ দিয়েছিলেন—তা ঠিক জানা যায়নি।

তবুও আমায় 'গবা' বলে!



"বাছুর নিয়ে খেলতে ভালো,—খেলছি তাকেই নিয়ে
দুষ্টোর মা সে বড়ই টানি নাকে দড়ি দিয়ে।"

"আচ্ছা যেটা পালিয়ে গেছি, আমার ফাঁকি দিয়ে,
খেলার গরু দড়ি বাঁধা তাই এসেছি নিয়ে।"

"আমার গরু নিয়ে খেলা—সাহস বটে বলি,
হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিলে বদমেজাজী ডলি।"

(সামনের পাতায় দেখ)

ব
ল
তো
কি
কি
আ
ছে
?



(পল্লী-কবিতা)

খোকন যাবে বাণিজ্যেতে

বন্দে আলী মিয়া

খোকার বাড়ী কলম ডাঙার গাঁয়
শালিক ঘুঘু ডাকে সেথায় সবুজ পাতার ছায়।
সেইখানেতে ফোটে শালুক পদ্ম বিলের জলে
পানকৌড়ি ডুব ভাঙিয়া সাঁতার দিয়ে চলে;
সেই বিলেতে দাম বেঁধেছে কল্মী কাজল লতা
সেথায় ব'সে ডাহুক বকে জানায় মনের কথা।
পাল তুলিয়া ওই গাঁ পানে নৌকা ভেসে যায়
মাঝিরা সব বৈঠা ফেলে সারির গান গায়—
সে গান শুনি খোকন মণি রইতে নারে ঘরে
বেরিয়ে আসে আগড় খুলি পদ্ম-বিলের চরে।
চেয়ে থাকে চোখ তুলে সে দূরের সীমানায়
যখন বড় হবে খোকন যাবে সে ওই গাঁয়;—
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে দশখান যাবে না'
লোকজন যে কত যাবে নাই তার ঠিকানা।
ময়নামতী-কন্যা আছে কোন্ বা অচিন দেশে
নৌকা নিয়ে ঘুরে ফিরে সেথায় যাবে শেষে।
সোণার কাঠি ছুঁইয়ে তার ভাঙিয়ে দেবে ঘুম—
তাহারে নিয়া ঘরেতে আসি লাগিয়ে দেবে ধুম।
খোকন থাকে কলম ডাঙার গাঁয়
ফুলের বনে প্রজাপতির সাথে সে বেড়ায়
তালিপাতার আব্‌ডালেতে চাঁদ যে ওঠে রাতে
বাঁশের বনের দীঘল ছায়া পড়ে আঙিনাতে।
জোনাকীরা হীরার মত জ্বলে কেবল জ্বলে
ঘুম-পরীরা দল বাঁধিয়া নাচে গাছের তলে;—
খোকার গায়ে কাতুকুতু দেয় যে স্বপন বুড়ি
ঘুমের ঘোরে হাসে সে তাই আঙুলে দেয় তুড়ি।
পংখীরাজে চড়ে খোকন মায়ার দেশে যায়
পিছন হতে দত্যি দানা ধর্‌তে পিছু ধায়।
বীর সিপাহী খোকন দাঁড়ায় খুলে তরোয়াল
বাঁ হাতে তার ঝল্‌কে ওঠে মকর-মুখী ঢাল।
সড়কী হাতে বাগিয়ে ধরে খোকন যায় তেড়ে
পালিয়ে বাঁচে দৈত্যেরা সব—পালায় সে দেশ ছেড়ে।
ঘোড়ায় চড়ে হাওয়ার বেগে এগিয়ে আরো যায়
সোণার গাছে মাণিক ফলে দেখ্‌তে সে দেশ পায়।
হীরার ফল জ্বলে সেথায় মুক্তা পাহাড় ঘিরে
কোঁচড় ভরে নিয়ে খোকা আস্‌বে দেশে ফিরে।
মা দেখে খুব হবেন খুসি—চুমো খাবেন মুখে
গর্ব ভরে খোকন বসে হাস্‌বে মনের সুখে।

ছবি ও কবিতা—শিল্পী শৈল চক্রবর্তী



"চ্যালা কাঠে বাঁধলে দড়ি—দিব্যি গরু হবে!
এধার ওধার টানবো তাকে—মুখ বুজে সব সবে।"

"কাঠটা নিয়ে গেলি কোথায়?" মা বল্লেন হেঁকে—
দৌড়ে এসে দড়ি থেকে ছিনিয়ে নিলেন ঝোঁকে।

দড়ি দিয়ে বাঁধবো কাকে? কোথায় গরু খাঁটি?
নিজের কোমর থাকতে কেন মিথ্যে ঘুরি মাটি!

নিদ্রাভঙ্গ

নিশিকান্ত সেন

[ইতিহাসের গল্প]



অমর সিংহ ভারতগৌরব মহাবীর প্রতাপ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন মিবারের সিংহাসনে বসলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছে। অমর অনেক দিন পিতার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম রাজ্যের শাসন ও অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা করেন, তা বেশ প্রশংসার যোগ্যই হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি পিতার আদর্শেই চলেছিলেন বলে মনে হয়। সময়ে সেই আদর্শের ছাপ যেই মন থেকে মুছে গেল, অমনি তাঁর পতন আরম্ভ হলো। না রইল তাঁর রাজকাজে মন, না রইল কোনো কর্তব্যজ্ঞান; অত্যন্ত হাল্কা সুখের স্রোতে তিনি গা ভাসিয়ে দিলেন।

মিবার—প্রতাপ সিংহের সাধের জন্মভূমি—মিবার অমরের মুখের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে রইল। ও বীরভূমি একদিন দিল্লীর শক্তিমান বাদশার হাতে চলে গিয়েছিল। প্রতাপ উদ্ধার করেন। কি করে জানো? দুঃখ ও বিপদকে চিরসঙ্গী করে, জীবনভোর যুদ্ধে বলবীর্য স্বাস্থ্যসুখ সব ক্ষয় করে, কত দরদী আত্মীয়স্বজন আর অনুগত সর্দার-সামন্তদের জীবন বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু এত করেও কি পেরেছিলেন সবটা ফিরিয়ে আনতে? না, তা পারেন নি। প্রতাপের কল্পনার স্বর্গ, পূর্বপুরুষদের পুণ্যস্মৃতির পবিত্র তীর্থ চিতোর তখনো মোগল বাদশার হাতে।

প্রতাপের মনে শান্তি ছিল না। মরণকালে তাঁর ঐ অশান্তি চরমে ওঠে। তখন তিনি পেসোলা-সরোবরের তীরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। ওখানে খান-কতক কুটীর প্রতাপ নিজেই তৈরি করিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সর্দার-সামন্তদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ওখানে এসে বাস করতেন। কুটীর ভেঙে কোঠা যে তিনি গড়তে পারতেন না, তা নয়; কিন্তু তেমন ইচ্ছাই হয়নি তাঁর। সাবেক রাজধানী চিতোর যতদিন উদ্ধার না হয়, ততদিন কোনো রকম খোশখেয়ালে ভোগবিলাসে মন দেবেন না—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রতাপের মৃত্যুকালে তাঁর অশান্তি বুঝতে পেরে সর্দারেরা যখন কারণ জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, চিতোর উদ্ধার হলো না। আর যে হবে, তারও সম্ভাবনা নেই। আমার স্নেহের দুলাল অমরের দ্বারা সে কাজ হবে না। সে তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এত কষ্ট করে, এতদিনের চেষ্টায় যে রাজ্য উদ্ধার করলুম, তাও সে পারবে না রক্ষা করতে। দুঃখকষ্ট কাকে বলে তা সে জানে না, সে আয়েসী—ভোগবিলাসী। এই যে কুটীর তোমরা আজ এখানে দেখছ, দুদিন বাদে আর তা পাবে না দেখতে। এখানে জমকালো বাড়ী উঠবে—বিলাসভবন তৈরি হবে। জন্মভূমির দুঃখ ভুলে অমর ভোগবিলাসের দাস হবে। এবং তোমরাও তার সে অকাজের সহায় হবে।

সর্দারেরা প্রতাপকে ভরসা দিয়ে বললেন, না, তা হবে না। কেন আপনি ভাবছেন? অমরের অমন কুমতি কখনো হতে পারে না। আর হলেও আমরা কখনো তার প্রশ্রয় দেব না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, যতদিন একজন রাজপুতের দেহেও প্রাণ থাকবে, ততদিন জন্মভূমি মিবারকে তাঁরা শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবেন না।

সর্দারদের সে সব কথা, এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়াল। প্রতাপ যা যা অনুমান করেছিলেন, একে একে সবই ফলতে চলল। অমর কুটীর ভেঙে সত্যি সত্যিই প্রমোদভবন তুললেন। নাম হলো তার,—অমরমহল। এখানে মোসাহেব পারিষদের দল তাঁকে চেপে ধরল, আগাছার মতো। ওরা যে তাঁরই রস-সার শুষে নিয়ে তাঁকে জেরবার করে তুলবে, তা তিনি মনেও করলেন না। নিশ্চিন্ত মনে ওদের সঙ্গে হাসিগল্পে খেলা-ধুলোয়, পানভোজনে দিন কাটাতে থাকলেন। রাজপুত জাতির ধর্ম যে অস্ত্রশস্ত্রের চর্চা, তা তিনি একরকম ভুলেই গেলেন।

হয়তো অমর ভাবছিলেন, জীবনটা তাঁর এমনি করে একটা সুখস্বপ্নের মতোই কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধল, মিবারের প্রান্তে মোগলের রণডঙ্কা বেজে উঠল আড়ম্বরের সঙ্গে।

প্রতাপ সিংহের মতো প্রবল শত্রু আকবর বাদশার আর কেউ ছিল না। আকবর মিবারের ঐ সিংহটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। এক রকম গোটা ভারতেরই মালিক তিনি। তাঁর চেষ্টা তো বড় চারটিখানি কথা নয়। তাতেও পারেন নি তাঁকে আটকাতে। উল্টে তিনিই ওঁর হাত থেকে মিবার কেড়ে নিয়ে ওঁকে অপদস্থ করেছিলেন।

এহেন প্রতাপের বংশধরদের ওপর যে আকবরের বংশধরদের আক্রোশ থাকবে, আশ্চর্য কি? আকবর তখন বেঁচে নেই, পুত্র জাহাঙ্গীর বসেছেন বাদশাহী তক্তে। মিবারের রাণা অমর সিংহ সিংহবিক্রম ভুলে শেয়ালের পার্ট অভিনয় করছেন—এ খবর তাঁর অগোচর ছিল না নিশ্চয়ই। তিনি বুঝেছিলেন, এই হচ্ছে উত্তম সুযোগ। রাণা প্রতাপের দলবল এতদিন ধরে মোগলদের যে হয়রাণ করেছে, এবারে তার শোধ তুলতে হবে সুদে-আসলে। তোড়জোড় করে এসে মারলেন রণডংকায় ঘা।

অমর চমকে পারিষদদের মুখের দিকে চাইলেন, ব্যাপার কি?

দলের মুরব্বি ভরসা দিলেন, কিছু নয় উতলা হবার কারণ নেই। বোধ করি, কোনো পর্ব উপলক্ষে বাদশাহী সেনারা মিছিল করে বেরিয়েছে। ও তারই ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু দূত খবর নিয়ে এসে বললে, আওয়াজটা ফাঁকা নয়। বাদশা জাহাঙ্গীর অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মিবার আক্রমণ করতে আসছেন।

মুরুব্বি বললেন, তা হলেই বা ব্যস্ত হয়ে কি লাভ? যা কর্তে হবে, ভেবেচিন্তেই করা ভাল। চট্ করে বাধা দিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কথাটা যদিও অমরের মনের মতোই বটে, তবু, বাধা না দেওয়াটা প্রতাপ সিংহের পুত্রের উপযুক্ত কাজ হবে কি না—অমর গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

মুরুব্বি বললেন, ওরা কতদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল, কে জানে। আর আমরা একেবারেই অপ্রস্তুত। এমন অবস্থায় যুদ্ধ করতে গেলে হার নিশ্চিত।—মিছিমিছি কতকগুলি জীবননাশ, আর অর্থের শ্রাদ্ধ।

রাণা বললেন, তা হলে কি যুদ্ধ না করেই তোমরা আমাকে হার মানতে বলছ?

মুরব্বি বললেন, তা কেন বলব? রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র যে কাপুরুষ নয়, তা আমরা জানি।

চিন্তিতভাবে রাণা বললেন, তা হলে কী করা যায়? যুদ্ধও করব না, আবার নতি-স্বীকারেও রাজি হব না!—

মুরুব্বি বললেন, সন্ধি! সন্ধি ছাড়া আর কিছুই করবার নেই রাণা।

ভুরু কুঁচকে রাণা বললেন, তাতে যে ওরা রাজি হবে, তা কে বললে? যদি না-হয় রাজি?

মুরুব্বি মুরুব্বি-আনা চালে বললেন, আলবৎ হবে। রাণা প্রতাপের প্রতাপে মোগলদের ক্ষতি হয়েছে অসম্ভব, হয়রাণিও কম হয়নি। বহুবার বহু যুদ্ধে আকবর তাই তাঁকে ধ্বংস করবার চেষ্টা

করেছেন; কিন্তু পেরে ওঠেন নি। তাঁর পুত্রকে আকবরের পুত্র যদি বিনা যুদ্ধেই হাত করতে পারেন, সে কি তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা?

রাণা ভাবতে থাকেন, প্রস্তাব করবেন, কি, করবেন না; এবং করলে কি কি সর্তে করা যায়।

রাণার অবস্থা দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন, সেনা-সামন্তরা সবাই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা তোমরা মনে কোরো না। অনেক দিন থেকেই অনেকে মনে মনে খুব অশোয়াস্তি বোধ করছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা দেখছিলেন পারিষদের দল তাঁকে চব্বিশ ঘন্টাই ঘিরে বসে আছে। তাঁদের কথাতেই তিনি ওঠেন বসেন, ঘোরেন ফেরেন—তাঁদের অমতে তাঁর কিছুই করবার উপায় নেই। এই অবস্থায় গণ্ডী কেটে রাণাকে ধরা এবং তাঁকে সুপথে আনার মতো শক্ত কাজ আর কিছুই নেই।

কিন্তু আজ রাণার সর্বনাশের আর বড় বাকী নেই দেখে কতকগুলি সর্দার আর পারলেন না স্থির থাকতে। ধরলেন গিয়ে চন্দাবৎ সর্দারকে। তাঁদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবার চেয়ে সাহসী এবং বিচক্ষণ। তাঁরা যে যোগ্য ব্যক্তিরই স্মরণ নিয়েছিলেন, তার সন্দেহ নেই। সর্দার তাদের সবাইকে নিয়ে তখনি হাজির হলেন গিয়ে অমর-মহলে—যেখানে পারিষদগণ অমরকে নিয়ে আসর জমাচ্ছেন।

চন্দাবৎ সর্দার মজলিসের সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে বললেন, মহারাণা, এ কী দুর্মতি আপনার! প্রবল শত্রু এসে রাজ্যে হানা দিয়েছে; এখনো আপনার হুঁস নেই! চাটুকারদের চাটুবাণীতে ভুলে বসে আছেন! এমন করে আর কতক্ষণ চলবে? রাজ্য যাবে, রাজপুতের মা-বোনরা বেইজ্জৎ হবে, দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। পারবেন এসব চোখে দেখে বরদাস্ত করতে? আপনি না মহাবীর প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র? যদি না পারলেন পূর্ব-পুরুষদের কীর্তি, জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে, কেন তবে এ পবিত্র বীর কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ধিক্—শত ধিক্ আপনাকে!

সর্দারের উত্তেজনাপূর্ণ ধিক্কারে সভাঘর যেন ফেটে পড়তে লাগল; কিন্তু আশ্চর্য এই, রাণা ও রাজপারিষদবর্গ সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁদের কাণে যে একটি কথাও প্রবেশ করেছে, ভাবে তা মনে হলো না। তাঁরা নিজেদের ভাবে যেমন বিভোর হয়েছিলেন, তেমনি বিভোর হয়েই রইলেন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় সর্দারের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। তিনি এই অসাড় অচেতন রাজ-মজলিসকে চেতিয়ে তোলবার জন্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। সভাঘরের একদিকে এক-খানি মস্তবড় আয়না ছিল দাঁড় করানো। ওটি ঘরের শোভা ও সৌষ্ঠবের একটি প্রধান আসবাব; কাজেই খুব দামীও। সর্দার মেজের ওপর থেকে একখানি পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো তার গায়। ভয়ানক শব্দে আয়নাখানি ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মজলিসের চটকা ভাঙ্গতে আর দেরী হলো না এক মুহূর্তও। তখন মজলিস-ওয়ালাদের মনের ও মুখের ভাব যে কি হয়েছে, সে আর বলবার নয়।

কিন্তু কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবার আগেই সর্দার ছুটে গেলেন অমরসিংহের কাছে। তাঁকে ধরে নিয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন। সঙ্গের সর্দারদের ডেকে বললেন, আসুন, সবাই আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—শত্রুসেনার সম্মুখীন হই। প্রতাপসিংহের পুত্রকে মহাকলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করি। এই না বলে রাণাকে ধরে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।



রাণা অমরকে যে এই রকম অপদস্থ হতে হবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অধীন, স্নেহের পাত্র যে সর্দার, সেই করছে তাঁর ওপর জুলুম-জবরদস্তি! সেও আবার আর কোথাও নয়, তাঁরই অন্তরঙ্গ পারিষদদের সম্মুখে! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মুখে যা এল, রাণা সর্দারকে তাই বলতে লাগলেন—অসভ্য, গোঁয়ার, রাজদ্রোহী—আরো কত কি।

কিন্তু চন্দাবৎ সর্দারের প্রাণে তখন আনন্দের বাণ ডেকেছে। রাণাকে তিনি কাপুরুষের দল থেকে—দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পৌরুষের ও স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছেন; এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আর কিছু আছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। এখন যদি রাণা তাঁকে কেটেও ফেলেন টুকরো টুকরো করে, তাতেও তাঁর দুঃখ নেই। ভর্ৎসনা মনে হলো যেন আশীর্বাদ—স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি।

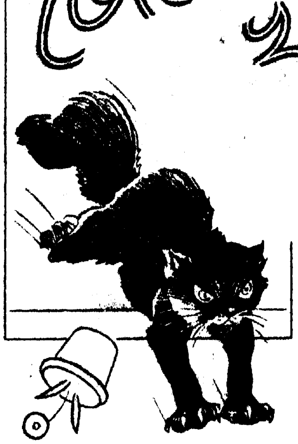
হঠাৎ এক আশ্চর্য পরিবর্তন! কিছুক্ষণ বন্দীর মতো অনিচ্ছায় পথ চলবার পর রাণার মনের ভাব গেল একদম বদ্‌লে। তাঁর চেতনা ফিরে এল। চন্দাবৎ সর্দারের ওপর যে রাগ ও বিরক্তি জন্মেছিল, তা দূর হয়ে, মন তাঁর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি সর্দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তুমিই আমার পিতার প্রকৃত বন্ধু, আমার সত্যিকারের হিতৈষী বান্ধব। নইলে কেন জোর করে, আমার ঘোর নির্যাতন সহ্য করেও, তুমি আমায় সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে আসবে!

রাণার কথা শুনে আর তাঁর পরিবর্তন দেখে সঙ্গের সর্দার সামন্তরা উৎসাহ-উদ্দীপনায় অধীর হয়ে উঠল। আকাশ ফাটিয়ে রব তুললে, জয়! রাণা অমরসিংহের জয়! দিকে দিকে পাহাড়ে বনে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজল। মরুর তুল্য নিথর মেবার দেখতে দেখতে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। রাজপুত যোদ্ধারা নানাদিক থেকে জল-স্রোতের মতো বেরিয়ে এসে রাণার দলে যোগ দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যেমন হলো বিশাল, তেমন দুর্দাম। অন্যপক্ষেও ঘটা বেশী বই কম ছিল না, বাদশা অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ দেবীর মাঠে যে যুদ্ধ বাধল, সে অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু রাজপুত সেনাদলের প্রচণ্ড বেগ মোগলরা রোধ করতে পারলে না—ছিন্নভিন্ন হয়ে তারা পালাতে বাধ্য হলো। বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে রাণা অমরসিংহ মহা উল্লাসে রাজধানী উদয়পুরে ফিরে গেলেন।

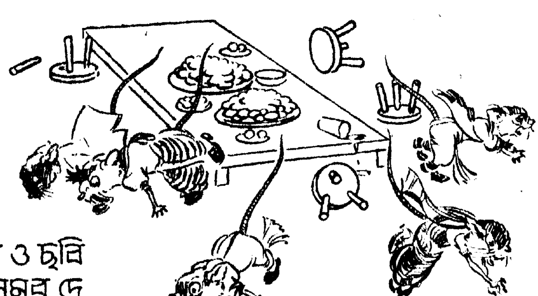


শিল্পী—কল্যাণ সেন

ভোজের খাওয়া!



জামা-জুতো, শাড়ি পরে
পাঁচটি ইঁদুর সেজেগুজে—
খাবার জিনিষ সাজিয়ে নিয়ে,
বসলো খেতে চক্ষু বুজে।
সহসা এক বিড়াল মশাই
ম্যাও বলে দেয় সেথায় লাফ্,
আঁত্‌কে উঠে ইঁদুর যত,
দৌড়ে পালায় "বাপরে বাপ্।"



ছড়া ও ছবি
শ্রীসমর দে

ভরসা কোন নাই

সুবিনয় রায় চৌধুরী

দেশ জুড়ে আজ চিনির আকাল, সবাই বলে হায়।
বাজার ঘুরে একপো চিনি মেলাই হ'লো দায়।
ছোট্ট খোকাবাবু ব'সে শুক্‌নো রুটি হাতে,
ভাবে ব'সে, কেমন ক'রে মাখায় চিনি তা'তে।
মৌমাছি এক কানে কানে বল্‌তেছে গুন্‌গুনি,
"তোমার মুখে কেন এত ভাবনা বল শুনি।"
খোকা বলে, "কেমন ক'রে শুক্‌নো রুটি খাই,
বাজারেতে খুঁজে খুঁজে চিনিই মেলে নাই।"
মৌমাছি তায় বল্‌লে হেসে, "ভাবনা কেন করো?
যাচ্ছি আমি, তোমার তরে কর্‌ব মধু জড়ো।"
সারাটা দিন খোকাবাবু বসে মধুর আশে,
সন্ধ্যাবেলা মৌমাছিকে খোঁজে ঘরের পাশে।
দাদাটি তার দেখ্‌তে পেয়ে সুধায় "ওরে খোকা!
সন্ধ্যাবেলা ঘরের পাশে কি খুঁজিস্‌রে বোকা?"
খোকা বলে, "আজ সকালে মৌমাছি ভাই,
আমার তরে মধু জড়ো কর্‌লে সুরু, তাই
খুঁজ্‌ছি আমি মৌমাছিরে, সুধাব তায় ডেকে,
কত মধু জমাল সে আজকে সকাল থেকে।"
দাদা হেসে বলে, "ওরে এ তো খুবই সোজা,
হিসেব ক'রে দেখ্‌লে পরে সহজে যায় বোঝা।
বইএ লেখে, একপো মধু জমাতে তা'র চাকে,
বারো বছর ফুলে ফুলে ঘুরতে হবে তাকে।*
আজ দুপুরে এক-আধ ফোঁটা জমেও যদি থাকে,
দুইটি মাস আরো তবু খাট্‌তে হবে তা'কে;
তবে তোমার রুটিতে তাই মাখিয়ে খেতে পাবে,
তারপরে পথ চেয়ে আবার দুইটি মাস যাবে।"
শুনে খোকা হতাশ হ'য়ে বল্‌তেছে, "দূর ছাই!
চিনি ছেড়ে মধু খাবার ভরসা কোন নাই।"

* হিসাব ক'রে দেখা গেছে, এক পাউন্ড (প্রায় আধ সের) মধু সংগ্রহ কর্‌তে একটি মৌমাছির ২৫ বছর সময় লাগ্‌বে।

টিপ্ দিয়ে যা

(ছড়া)

বীণা দেবী

'চরকাকাটা বুড়ি' দেখি বসে' চাঁদের মাঝে
কদমতলায় ব্যস্ত বড়ই সুতো কাটার কাজে।
ধবলী গাইয়ের ধবল দুধে সাত-সাগরের ঢেউ,
কে দেখেছে প্রথম এসব—জানি না তো কেউ?
শুধুই জানি—সুতোটি না কাট্‌লে চাঁদের মা
জোয়ার-ভাঁটা, কাপড়-জামা কিছুই হবে না!
শুধুই জানি চাঁদামামা টিপ্ দিয়ে যায়।
তাইতো ডাকি সবাই মিলে আয় চাঁদ আয়।
চাঁদের টিপের শোভা শুধুই দেখি শিবের ভালে,
তাই কি সবাই চাস্ মা তোরা—চাঁদ-কপালে ছেলে?
তাই কি লো মা ডাকিস্ তোরা—"আয় চাঁদ আয়,
খোকার কপালে মোর টিপ্ দিয়ে যায়—?

বাংলা থিয়েটারের একটি বছর

(১৩৫০ ভাদ্র হইতে ১৩৫১ ভাদ্র)

— শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এ বছরে বাঙলা থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা আরও উন্নত। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত রোজগারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, হয়ত বা কর্মব্যস্ততার জন্য চিত্ত-বিনোদনের আগ্রহবৃদ্ধিও থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েচে। কোন কোন থিয়েটার ঋণমুক্ত হয়েচে, কোন কোন থিয়েটার ভবিষ্যতের জন্য কিছু-কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করতেও সক্ষম হয়েচে। এমন থিয়েটারও আছে যেখানে একাধিক অভিনেতা মাসিক হাজার দেড় হাজার টাকা উপার্জন করচেন—থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে গলগ্রহ বলে মনে করেন না। আবার এই বছরেই শহরের শ্রেষ্ঠ একটি থিয়েটার গৃহ-হারা হয়েচে। সেই থিয়েটারটি 'নাট্যভারতী' নামে পরিচিত ছিল। প্রগতিশীল থিয়েটার বলেই 'নাট্যভারতী' প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। 'নাট্যভারতী'র কর্ম-ব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করতেন থিয়েটারের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অসীম। থিয়েটারকে নতুন রূপ দেবার কল্পনা তাঁদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক আর শ্রীযুক্ত সতু সেন। দুজনেই পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশে এসেচেন। দুজনেই চাইছেন এ-দেশের থিয়েটারকে জাতীয় কল্যাণে নিয়োগ করতে। লীজ-সংক্রান্ত গোলযোগের জন্য তাঁদেরকে 'নাট্যভারতী' ভেঙে দিতে হয়েচে। সে সময়ে শহরে আর একটা বাড়ি যদি তাঁরা পেতেন, তাহলে তাঁদের কাজে বাধা পড়তো না এবং আশা করা অসংগত হোত না যে, এক বছরে তাঁরা থিয়েটারের প্রগতির পরিচয় দিতে পারতেন। 'নাট্যভারতী'র অর্থাৎ সতু সেনের প্রভাব এ-বছরের অধিকাংশ মঞ্চ-রূপে চোখে পড়ে। বাড়ির অভাবে বাধ্য হয়ে শ্রীযুক্ত মল্লিককে আজ নাট্য-জগতের বাইরে থাকতে হয়েচে। আর শ্রীযুক্ত সতু সেন রঙমহলে যোগ দিয়ে তাঁর সাধনায় নিযুক্ত রয়েচেন।

নাট্যলোক ও চিত্রকথা

বায়োস্কোপের প্রতিযোগিতা

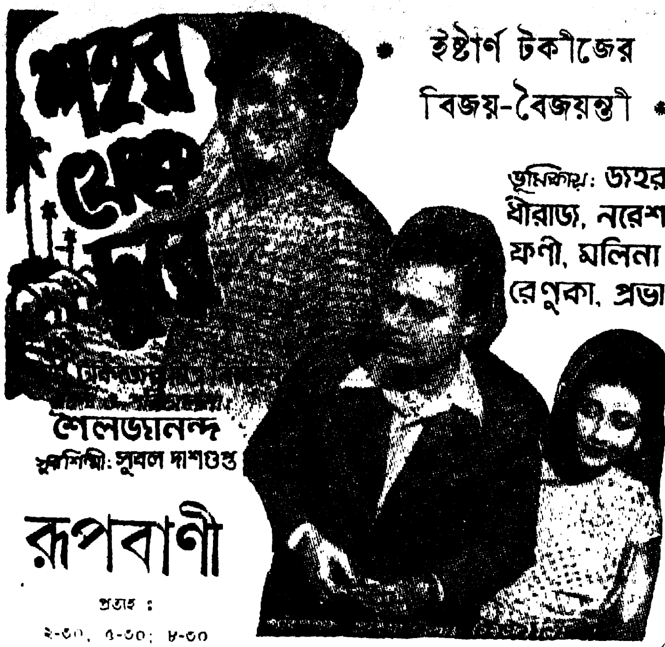
'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তি নাট্যরসিকদের ব্যথার বিষয় হয়ে রয়েচে। ব্যর্থতা বা ব্যবসায়ে অসাফল্য 'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তির কারণ নয়। তার বিলুপ্তির কারণ বায়োস্কোপের সর্বগ্রাসী দাবী। বাড়ির মালিক বায়োস্কোপ প্রদর্শকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেন, ভাড়া হিসেবে কোন থিয়েটার সে পরিমাণ টাকা দিতে অসমর্থ। থিয়েটারে সপ্তাহে সাধারণতঃ পাঁচটি অভিনয় হয়, কিন্তু বায়োস্কোপ হাউসে সপ্তাহে হয় একুশটি অভিনয়। লোকবৃদ্ধি ও অর্থবৃদ্ধির জন্য বায়োস্কোপের আয় তাই থিয়েটারের আয়ের অনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে গিয়েচে। যুদ্ধের আগে বায়োস্কোপ-বাড়ির ভাড়া যোগাতে প্রদর্শকদের কাল-ঘাম ছুটে যেতো। আজ তাঁরাই যে-কোন ভাড়া দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি দখল করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েচেন। যদি লীজসংক্রান্ত আইন বলবৎ না থাকতো, তাহলে আজ কলকাতার একটিও থিয়েটারের বাড়ি বায়োস্কোপের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতো না। বায়োস্কোপের এই জোর কিন্তু থিয়েটারের দুর্বলতার দরুণ বৃদ্ধি পায়নি। বায়োস্কোপের মত থিয়েটারও আজ সকল দর্শকদের ঠাঁই দিতে পারেন না। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বাঙলাদেশে থিয়েটার আজও বঞ্চিত নয়। বায়োস্কোপ হচ্ছে ধনিকদের ব্যবসা। লাখপতি ক্রোড়পতিরা এ ব্যবসায়ে টাকা ঢালচেন। আর বাঙলা থিয়েটার গড়ে তুলেচেন প্রায় নিঃস্ব সব লোক। তাঁদের মাঝে যাঁরা কিছু মুনাফা করতে পেরেচেন, তাঁরা শুধু শক্তির জোরে, নিষ্ঠার জোরেই তা করেচেন। বায়োস্কোপের নিজস্ব বাড়ি আছে, একটি থিয়েটারেরও তা নেই। তা না থাকবার কারণ এই যে, বাড়ি করবার মতো মূলধন নিয়ে কোন থিয়েটারই ব্যবসা শুরু করে নি। যে-কোন বাড়ির মালিক যে-কোন থিয়েটারের বাড়িকে বায়োস্কোপের জন্য ছেড়ে দিতে পারেন। 'নাট্যভারতী'র বাড়ির মালিকও তাই দিয়েচেন। বাকি ক'জনা থিয়েটার বাড়ির মালিকও যদি তাই করেন, তাহলে বাঙলা দেশ থেকে স্থায়ী থিয়েটার লোপ পাবে। তাই আজ প্রয়োজন হয়েচে থিয়েটারের নিজস্ব বাড়ি। এই বাজারে থিয়েটারের যে-সব মালিক অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েচেন, তাঁদের উচিত নিজস্ব বাড়ি করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। থিয়েটারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বাঙালী ধনিকেরও অভাব নাই। তারা যদি থিয়েটারের জন্য বিশেষ করে কয়েকটি বাড়ি করেন, তাহলে তাঁদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙলাদেশেই স্থায়ী থিয়েটার রয়েচে এবং কোন প্রকার সরকারী সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র বাঙালীর প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার জোরেই টিঁকে রয়েচে। শিক্ষিত বাঙালী ধনিকরা যদি থিয়েটারের সহায়তায় এগিয়ে আসেন, তাহলে বায়োস্কোপের অ-বাঙালী ধনিকরা থিয়েটারকে গৃহ-চ্যুত করতে পারবেন না। লিমিটেড কোম্পানী করে বেশী মূলধন সংগ্রহ করে থিয়েটারের ব্যবসা শুরু করলে বাঙলা থিয়েটার অসম-প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করবার অবসর পাবে।

বছরের জনপ্রিয় নাটক

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' এ বছরে সব চেয়ে বেশী দর্শক আকর্ষণ করেচে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেচেন বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং তাকে মঞ্চোপযোগী করে দিয়েচেন স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। শুধু তাই নয়, উদ্বোধন-বাসরে এবং পরবর্তী দুইটি অভিনয়ের প্রাক্কালে তিনি তাঁর থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় তিনটি বক্তৃতা দিয়েচেন এবং তাঁর প্রতিভার সম্পদ্ তাঁর অনুজ পরিচালক বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হস্তে ন্যস্ত করে নাট্য-জগৎ থেকে আপাততঃ অবসর গ্রহণ করচেন জানিয়ে তাঁর থিয়েটারের প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি ও সমর্থন যাচ্ঞা করেচেন। সহৃদয় দর্শকরা নাট্যাচার্যকে নিরাশ করেন নি। তাঁর থিয়েটারও করে নি দর্শকদের হতাশ। সুষ্ঠু, সুন্দর, সু-অভিনয় দ্বারা 'শ্রীরঙ্গম' দর্শকদেরকে প্রীত করেচে। 'বিপ্রদাসে' যে জনসমাগম এবং থিয়েটারের যেরূপ অর্থাগম হয়েচে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

'নাট্যভারতী'র শেষ নিবেদন 'ধাত্রীপান্না'ও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু দশটি অভিনয় হবার পরই 'নাট্যভারতী'কে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয় বলে 'ধাত্রীপান্না'র অভিনয়ও বন্ধ হয়ে যায়। মিনার্ভা থিয়েটার এই নাটকখানির পুনরভিনয়ের আয়োজন করচেন। 'ধাত্রীপান্না'র বিশেষত্ব ছিল এই যে, নাটকে কোন অঙ্কিত দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় নি, অথবা নাচ-গান দিয়ে নাটকের গতিকে ব্যাহত করা হয়নি। অভিনয়ই যে নাটকের সব চেয়ে বড় বিষয়, তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ছিল সতু সেনের পরিকল্পনা।

যে কথাচিত্রখানি ৩৯ সপ্তাহেও অম্লান গৌরবে চলিতেছে!



* ইষ্টার্ণ টকীজের
বিজয়-বৈজয়ন্তী *

ভূমিকায়: ডাহর
ধীরাজ, নরেশ
ফণী, মলিনা
রেণুকা, প্রভা

রূপবাণী

প্রত্যহ :
২-৩০, ৫-৩০; ৮-৩০

শহর থেকে দূরে

পল্লীর স্নিগ্ধশ্যামল পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পিত **শৈলজানন্দের** এই সার্থক সৃষ্টি বাংলার সর্বত্র সকল চিত্রের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।

শহর থেকে দূরে

আসিতেছে

শৈলজানন্দের
অপূর্ব ভাবধারার রসপুষ্ট
আর একখানি যুগান্তকারী চিত্র
কালী ফিল্মসের

অভিনয় নয়





কাহিনী ও পরিচালনা : **শৈলজান[ন্দ]**
পরিবেষক : **ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ,**
ফোন: ক্যাল ৪৯৮৯ ৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—মতিমহল থিয়েটার্সের নিবেদন—

শ্রীদুর্গা

—দ্রুত সমাপ্তির পথে—
কাহিনী ও পরিচালনা : **শৈলজানন্দ**
ইষ্টার্ণ টকিজ রিলিজ
পরিবেষক : **মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ**
৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।